শনিবারের চিঠি

ব্যঙ্গ-সংকলন

সম্পাদনা

রঞ্জনকুমার দাস

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৫ ।। মাঘ ১৪০১

প্রচ্ছদপট ।। গৌতম রায়

নাথ পাবলিশিং-এর পক্ষে সমীরকুমার নাথ
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস কলকাতা ৭০০০২৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি রেইনবো ১০বি আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত

সুধারাণী দাসের স্মৃতির প্রতি

পাঠকের প্রতি

"শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে---তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গসাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গযাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গতি আছে, যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর অস্ত্র তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের 'পরে।...ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবি আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,--নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।"

২৩শে পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত এবং মাঘ ১৩৩৪ সনে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে বারবার বিপর্যস্ত ও বিচলিত কবিগুরুর প্রশংসাবাণী একদিকে যেমন এই পত্রিকার লেখকদের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাতে অতি উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছিল অন্যদিকে তৎকালীন লেখক ও পাঠক সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গরচনার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহান্বিত করিতে কম সহায়তা করে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের পর যথার্থ ব্যঙ্গসাহিত্যের জয়যাত্রা শনিবারের চিঠিতেই শুরু হয় এবং নিঃসংকোচে বলিতে পারা যায় অন্য কোনও পত্রিকায় এই জাতীয় রচনার আবির্ভাব এযাবৎ ঘটিয়া উঠে নাই। ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে শনিবারের চিঠির অসাধারণ সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ বরাবর মুগ্ধ ছিলেন। বারংবার আঘাত পাইয়া তিনি সাময়িকভাবে বিরূপ হইলেও শনিবারের চিঠির প্রতি তাঁহার স্নেহমমতা ফল্গুধারার মত সদাপ্রবাহিত ছিল। শনিবারের চিঠির তীব্র কশাঘাতে ডাহিনে-বামে বিরোধী পক্ষের বহু লেখককে ক্ষতবিক্ষত হইতে দেখিয়া তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেও ভোলেন নাই। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ 'প্রবাসী'র "সাহিত্য-সমালোচনা" প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "শনিবারের চিঠির লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি ; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে।"

শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ-রচনাগুলির মধ্যে অধিকাংশই সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত। মূল লক্ষ্য বা 'টার্গেট'--বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানী প্রাধান্য এবং উর্দু শব্দের গা-জোয়ারি বিস্তার, ধর্মের ক্ষেত্রে তথাকথিত গুরুবাদ, বিবিধ কু-সংস্কারের প্রসার, রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজশক্তির দমননীতি ও অত্যাচারের ব্যাপকতা। সর্বোপরি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যরথীরা শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গে বিদ্রূপে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। [সম্পূর্ণ ইতিহাস ভাল করিয়া জানিতে সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থটি অবশ্য দ্রষ্টব্য।]

এই প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ-সংকলনে উদ্ধৃত কয়েকটি অতি মূল্যবান রচনার নাম করিতে পারি : হিঞ্জলী-দর্শন, উর্দোস্কৃত-প্রচারিণী-সভা, পীর-তাঁবেদার হালিম ছাহেবের কোকিল ধ্বংস ফতোয়া, নরকের কীট, আধ্যাত্মিক জাতি, মাইকেল-বধ কাব্য, চিপোর্ট, ছবিতা, ব্যঙ্গচিত্র, তরুণের লজ্জা, টেক্সট-বুক সাহিত্য, তারিখ-ই-বাঙ্গালা, গোঁড়াতলা সাহিত্য, জয়ন্তী, জয়জয়ন্তী, পুরাতনী, কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ।

সজনীকান্ত তাঁহার 'আত্মস্মৃতি'তে 'উর্দোস্কৃত' সম্পর্কে বলিযাছেন---"উর্দোস্কৃত' একটি নিত্যরসে টলমল মাণিক্যবিশেষ।...আজ সমগ্র ভারতের কল্যাণে বঙ্গবলিদানের পর উর্দোস্কৃতের মহিমা আমরা সঠিক বুঝিতে পারিব না, কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে সত্যই উহা ভয়াবহ মূর্তি লইতে বসিযাছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিণ্ডিকেট সভার মিনিট বইয়ে ইহার অনেক প্রমাণ মিলিবে।"

ব্যঙ্গ-সংকলনের লেখা নির্বাচন করিতে গিয়া দেখিতেছি উচ্চমানের অনেক রচনা পত্রিকার পৃষ্ঠায় রহিয়া গেল। সংকলনের আকার বৃদ্ধি এবং ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কায় আরও কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব হইল না। পরবর্তী প্রকাশিতব্য "সংবাদ-সাহিত্য-সংকলনে'র পরে ব্যঙ্গ-সংকলনের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশের চেষ্টা করিব।

বর্তমান গ্রন্থে কয়েকটি হাসা-কৌতুক-আশ্রিত সরস রচনা স্বাভাবিকভাবেই স্থান করিয়া লইযাছে। সরস রচনার আলাদা একটি সংকলন প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রহিল।

এই রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা-পত্রগুলি হইতে অনেক উদ্ধৃতি দিয়াছি। এ যুগের পাঠকের জন্য আর একটি দুর্লভ এবং অত্যাশ্চর্য প্রশংসাবাণী মুদ্রিত করিতেছি। 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদকীয় "মাসিকী"তে সম্পাদকদ্বয় বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত বলিয়াছিলেন : " 'শনিবারের চিঠি' দেশের লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করবেই বা না কেন? বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যাকে সস্নেহ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা--সে পত্রিকার কিছুমাত্র মর্যাদা বা মূল্য নেই এ-কথা কেমন করে বলি? 'চিঠি'র লেখকদের রচনাভঙ্গীর চাতুর্য, জ্ঞানের অদ্ভুত বিস্তার, কোনো বিশেষ লিখনভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করবার আশ্চর্য শক্তি, হাস্যরসের ওপর অধিকার---এ-সব কাকে না মুগ্ধ করেছে?..."

মাঘ ১৪০১

অলমতিবিস্তরেণ
রঞ্জনকুমার দাস

ছড়া

সুকুল দাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
মনির মিঞা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালি ধান্য।
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজারে ডুগডুগি,
কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

রামছাগলের মোটা গলার ভ্যাভ্যা রবের ডাকে,
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে হাঁচে হাঁচে যতই হাঁচি ছাড়ে,
বাতাসে ঘুরে ঘনঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্তবাড়ির ছাতের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হুড়মুড়ি, বকের ভাঙে ধ্যান।
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।
হাঁচির শব্দ একখানি, এটার গুজব মিথ্যে
এই নিয়ে সব শঙ্কা, ভয় বিলাতীদের চিত্তে
অমনি কিছু লাগল বাঁধা, বললে সবার পাকে,
বললে, "ফিচকিনে পাড়ে কেবল ধুলো লাগায় চোখে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা, শুধু ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত করো সে।"
এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া,
হায়রে কারো ভাঙল কপাল, কেউবা হোলো খোঁড়া।
গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের ও পারেতে এরেই বলে লড়াই।
সিন্ধু পারে যুদ্ধ দলের চলছে নাচানাচি,
বাংলা দেশের শিমুল বনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা অত্যুক্তি হোক, — আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
ছেলেরা সব হাততালি দেয় বাজায় ডুগডুগি,
গভীর জলে কাংলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি॥

রবীন্দ্রনাথ

অবচেতনার অবদান



অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারি এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হ'লেই আশাজনক হবে।

গল্‌দা চিংড়ি, তিংড়ি মিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল।
পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়
মাকড়শাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর
ল্যাজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চটকি । খায়
সত্যিপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট।
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম,
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।
গরাণহাটায় সজনেডাঁটা
কিনছে পুলিস সার্জন।
চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী
কাৎ হয়ে মরে চারজন।
পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
শর্ষে ক্ষেতের চাষী।
কাঁচা লঙ্কার ফোড়ন লাগায়
কুড়োন চাঁদের মাসি।
পটোলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুর্গিহাটার মিঞা।
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও কেঁয়াও কিঞা।
ঠনঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা।
মুখ ভেংচিয়ে হেডমাস্টার

মস্তরে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইনফ্লুয়েঞ্জা।
বিরিঞ্চিদের খাতাঞ্চি ঐ
চণ্ডীচরণ সেনজা।
শিলচরে হায় কিল চড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র।
হাজি মোল্লার দাঁড়িমাল্লার
বাকি একজন মাত্র।
দাওয়াইখানায় সিঙাড়া বানায়,
উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়।
কনেস্টেব্‌ল পেতেছে টেব্‌ল
ক্ষুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরে পোকার লেগেছে মড়ক,
তুবড়ি ছোটায় পঞ্চু।
ন্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর
কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মীটিং,
তুলো বের করা বালিশ।
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে,
বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা।
ন্যাড়ানেড়ি দলে হরি হরি বলে,
শেষ হ'ল রামযাত্রা।।

"পুনশ্চ"
১৯।১১।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

মাছিতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে
আজন্ম ধ্যানী সে।
সাধনের মন্ত্র তাহার
ভন্ ভন্ ভন্ ভন্‌কার।
সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ
দক্ষিণ বাম আর ভক্ষ্য অভক্ষ্য
কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
দ্বৈতবিহীন হয় বিশ্ব।
সুগন্ধ পচাগন্ধের
ভালো মন্দের
ঘুচে যায় ভেদ-বোধ বন্ধন,
এক হয় পঙ্ক ও চন্দন।
অঘোরপন্থ সে যে শবাসন সাধনায়
ইঁদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই,—
ব'সে রয় স্তব্ধ,
মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ।
ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য দীপ্তি
ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি।
লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব,
ভুলে যায় মাছিত্ব।

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত,
বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
হার না মানিতে চায় কভুও।
পৃথক করে না কভু ইষ্ট অনিষ্ট,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ,
সম বুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট।
সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত,
পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত।
এদের ভাষায় নেই "ছি ছি,"
শৌখিন রুচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিছিমিছি।
অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে,

কেবলি ঘুরিয়া দেখে, কোথায় যে কী আছে!
বিশ্রামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,
ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলো কে-ই!
চারিদিকে মানবের বিষম অহংকার,
তারি মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শংকার।
আকাশ-বিহারী তার গতি নৈপুণ্যেই
সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই।
এই তার বিজ্ঞানী কৌশল,
স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।
মানুষের মারণের লক্ষ্য
ক্ষিপ্র এড়ায়ে যায় নির্ভয় পক্ষ।
নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়,
কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয়।
ভন্ ভন্ ভন্‌কার
আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডংকার।

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত
বারবার তাড়া খেয়ো, নাহি হোয়ো ক্ষান্ত।
অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ
কখন অকস্মাৎ,
তবু মনে রেখো নির্বন্ধ
সুযোগের পেলে নাম গন্ধ
চ'ড়ে বোসো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,
কোরো তারে বিষম অতিষ্ঠ।
সার্থক হোতে চাও জীবনে
কী শহরে, কী বনে,
পাঠ লহ প্রয়োজন-সিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিদ্যের,
নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্ ভন্‌ভন্
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন।।

উদয়ন
২২।২।৪০

চৈত্র ১৩৪৬

নানা পংহি *

রসুন্ আলী

একহী দরখ্ত্ পর
      সামকো দাখিল হো গিয়া,
চুল্‌বুলাতে রহ্ গিয়া
      বহ্‌তী মজে পর!—
কাউয়া কবুতর এক জগা পর
এক ডারমেঁ বাজোঁ বুল্‌বুল্
বোলতে চুহঁবুল্ চুহঁবুল্ চুহঁবুল্
      গুল্‌তন্ মচায়া।
রাত গুজরা ফজর্ হুয়া তো
ঝট্‌কা মারা এক দুস্‌রে কো
            বড়ি জোরদার
            পড়ি সোরসার,
কাউয়া বোলা
      হটো কবুতর
হট্ বুল্‌বুলা
      হট্‌তেই চল্
তিস্‌রে পহর বাদ
চৌথে পহর মে
কোই ন ওঁহা
বৈঠতী মজেমেঁ
একসে ঔর্ জুদা ঝট্‌পট্
রৌশন্ চৌকী চট্‌পট্
      বোলতী

১ম বর্ষ / আশ্বিন ৪ / ১৩৩১

* নানা জাতির, নানা ধর্মের নানা ভাষার নানান্তর আদর্শ, উৎকর্ষ, সঙ্গীত, বক্তৃতা, ঔৎসুক্য, দোষ, গুণ ত্রুটি, হাটের হাঁড়ি, কাটা কান ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সব ইতিহাসের কথা, কালকের কথা, যা হয়ে গেছে ও হয়ে এসেছে তার কথা। ও সব নিয়ে ঘাঁটানো ভাল না। আমরা চাই মিলন, চাই একতা। সমস্তের মিলনাশায় ভবিষ্যৎ রঙীন, বর্তমান মশগুল। বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে একতা ও মিলনের প্রেমসূত্রে সেলাই করে যে প্রচণ্ড সংহত শক্তি, যে উন্নত সভ্যতার উদ্ভব হবে; এই কবিতাটি সেই উন্নতিরই প্রথম ধাপ। সঃ শঃ চিঃ

পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের কোকিল-ধ্বংস-ফতোয়া

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আরব দেশে মেদিনা নামে একটি শহর আছে। নগরকে ফারসীতে শহর ও সংস্কৃতে পুর বলে। এই জন্য কাফেররা মেদিনা শহরকে বাংলাদেশের মেদিনীপুর মনে করে, পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের জন্ম হয় বাস্তবিক আরবদেশের মেদিনা শহরে, কিন্তু কাফেররা ভুল করিয়া বলে তিনি পয়দা হন মেদিনীপুরে। আরবদেশে জন্ম বলিয়া তিনি আক্‌ছার আরবী জবানেই গুফ্‌তগু করেন, কিন্তু কাফেররা বুঝিতে না পারিলে বাংলা লব্‌জ্‌ও ইস্ত্‌মাল করেন।

তাঁহার বাড়ির নিকট একটি মস্‌জিদ আছে। তাহার মোল্লা ছাহেব একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনাব, মস্‌জিদের ছাম্‌নে কেহ গাওনা বাজনা গোলমাল আওয়াজ করিলে কি করিব?" পীর হালিম বলিলেন, "তাড়াইয়া দিও।" মোল্লা ছাহেব ফের জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্রাম গাড়ি, মোটর গাড়ি, মোটর ভেঁপুর আওয়াজ হইলে কি করিব?" পীর তাঁবেদার মনের কথা গোপন রাখিয়া বলিলেন, "ও গুলার জান্ নাই, উহারা জানোয়ার নহে। উহাদের আওয়াজ মস্‌জিদে শুনা গেলে গুনাহ্ হয় না, যাহাকে কাফেররা পাপ বলে।"

মোল্লা ছাহেব ফের পুছিলেন, "মানুষের তো জান আছে। মানুষে মস্‌জিদের ছামনে গোলমাল করিলে মারধর করিয়া তাড়াইব কি?" পীর ছাহেব আবার আসল কারণ ছিপাইয়া বলিলেন, "মানুষের জান আছে বটে, কিন্তু মানুষ জানোয়ার নহে। জানোয়ারে আওয়াজ করিলে যেমন করিয়া হউক, তাড়াইয়া দিও।"

তাহার পর দিন মোল্লা ছাহেব ফের হাজির হইয়া বলিলেন, "মসজিদের ছাম্‌নে কাকগুলা বড় আওয়াজ করে, সাম্‌নের বাগানে কোকিলগুলাও কুহু কুহু করে। কি করিব?"

তাঁবেদার হালিম ছাহেব কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কাক ও কোকিল কাফের কিনা তাহা আগে ঠিক কর। তাহারা কোন্ জবানে কথা বলে?" মোল্লা ছাহেব পণ্ডিত দীনদয়ালু শর্মা হইতে মৌলানা শৌকৎ আলী পর্য্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কাক-কোকিলের ভাষার কোন সন্ধান পাইলেন না। তাহা হালিম ছাহেবকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায় কি?" পীর ছাহেব বলিলেন, "কাক ও কোকিল আমাদের খানা খায় কি?" মোল্লা ছাহেব বলিলেন, "কাককে আমাদের গোস্তের হাড় ও টুক্‌রা ঠোকরাইতে দেখিয়াছি বটে; কোকিলকে দেখি নাই।" তখন পীর ছাহেব আঁধারে আলোক পাইয়া খুশী হইয়া বলিলেন, "কাক কাফের নহে কোকিল কাফের, কোকিল কুহু কুহু করিলেই মারিবে, কাককে কিছু বলিও না।" মোল্লা ছাহেব বলিলেন, "কোকিলকে ত প্রায় দেখাই যায় না, আওয়াজই শোনা যায়। মারিব কেমন করিয়া?" পীর তাঁবেদার হালিমের তখন হঠাৎ মনে পড়িল কলেজে পড়িয়াছিলেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন ঃ—

"O Cuckoo! Shall I call thee Bird
Or but a wanderering Voice."

তিনি বলিলেন, "কোকিল দেখিতে নাই বা পাইলে? ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, কোকিল চিড়িয়া নহে, সেরেফ একটা মুসাফির আওয়াজ মাত্র। যেদিক হইতে কুহু কুহু ডাক শোনা

যাইবে সেই দিকে আল্লার নাম করিয়া ঢিল ছুড়িবে এবং তাহার পর গিয়া দেখিবে কোন জানোয়ার মরিল কি না।"

তাহার পর হইতে মোল্লা ছাহেব পীর হালিমের ফতোয়া মোতাবেক কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া পাড়ার হিন্দু মোছলমান সব ছাওয়াল লুকাইয়া রোজ সব সময় কুহু কুহু করিতে লাগিল। মোল্লা ছাহেব আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিক্-বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া ঢিল ছুড়িতে লাগিলেন। ঢিল ছুড়িয়াই তিনি চিড়িয়া শিকার হইল কিনা খোঁজ করিবার জন্য আওয়াজের দিকে যাইতেন। একদিন পীর ছেখের ছেলে করিম সাঁঝের বেলায় তাহাদের সার ডোবার পাড়ের ঝোপে লুকাইয়া যাই না কুহু কুহু করা আর অমনি মোল্লা ছাহেব ঢিল ছুড়িয়া ডোবার দিকে দৌড়িলেন। আঁধারে ডোবা লক্ষ্য না হওয়ায় একেবারে আদাড়ি পাদাড়ে নিমজ্জিত হইলেন। কষ্টে সৃষ্টে কোন প্রকারে উঠিয়া রাগে ক্ষোভে একেবারে পীর তাঁবেদারের কাছে হাজির। তিনি মোল্লা ছাহেবের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া ও খুশবু পাইয়া "তওবা তওবা" করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোল্লা ছাহেব এমন হাল কেমন করিয়া হইল?" জবাবে মোল্লা ছাহেব কি বলিলেন ও কি করিলেন এবং পীর ছাহেব মোকান হইতে মোল্লাজির দেহ সৌরভ দূর করিবার জন্য কত সাবান ও আতর খরচ করিলেন সে সব কেচ্ছা আজ বলিবার সময় নাই।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

সেকেলে কবির একেলে বিচার

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আদালৎ-ই-ফানুস্-ই-ঘর্মঘাণী

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত)

একেলে হকিম। তুমি কি তোমার একখানা মহাকাব্যিতে লিখেছ—
"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।"

সেকেলে কবি। হুজুর, লিখেচি।

একেলে হকিম। তুমি এত বড় আহাম্মক যে মানুষের চেহারার তুলনা কর মনসা-সিজ গাছের সঙ্গে—যাকে আমরা বলি ইউফোবিয়া নেরিফোলিয়া, তার সঙ্গে? মানুষ কখন গাছের মত হ'তে পারে? তুমি প্রাণিবিদ্যার সঙ্গে নৃতত্ত্বের প্রভেদ জান না? মেডিকাল স্কুলে বা মেডিক্যাল কালেজে কখন পড়নি? অনাথ চাটুজ্যের নৃতত্ত্বের বক্তৃতাও শোননি?

সেকেলে কবি। আমি মানুষের সঙ্গে মনসা-সিজের তুলনা করিনি হুজুর; "মনসিজ" কিনা কন্দর্পের সঙ্গে মানুষের তুলনা করেচি।

একেলে হকিম। তা হ'লে তো তুমি আরও আহাম্মক। সিজ মনসা তবু চোখে দেখা যায়, মাপা যায়; কন্দর্পকে কখন দেখেছিলে?

সেকেলে কবি। কখনো দেখিনি।

একেলে হকিম। তবে কেন এমন উপমা দিলে? যা কিছু লিখ্‌বে, এক্কেবারে রিয়্যালিস্টিক্ হওয়া চাই।

সেকেলে কবি। যে আজ্ঞে। কিন্তু সাধারণ কথাবার্তাতেও কি পটোলচেরা-চোখ বল্‌তে পাবো না? চোখের আকৃতিটা যদিই বা কতকটা চেরা পটোলের মতন হয়, চোখের ভিতর কিন্তু পটোলের মত বীজ থাকে না কিনা।

একেলে হকিম। তুমি তো দেখ্‌চি বড়ো ত্যাঁদড় হে। চুপ কর বল্‌চি। আর একটা সওয়ালের জবাব দাও। তুমি লিখেছ, এক জোড়া চোখ পদ্মের পাতার মত। চোখ কখন অত বড়, আর ঐ রকম আকৃতির হয়?

সেকেলে কবি (স্মিত মুখে)। আজ্ঞে, পদ্মপত্র মানে পদ্মফুলের পাপড়ি।

একেলে হকিম। আচ্ছা, তুমি না হয় ভুল ক'রে তাই ভেবেছ; কিন্তু মানুষের চোখ কি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো হয়? আর, তুমি যে লিখেছ "যুগ্মনেত্র", তা, চোখ দুটোর মাঝখানকার নাকটা কোথায় গেল? দুটো চোখ কি একেবারে জোড়া লেগে যায়? আর···

সেকেলে কবি। আজ্ঞে হুজুর, যুগ্ম মানে···

একেলে হকিম। আবার কথার উপর কথা? দুছত্তর কবিতে লিখেচ, তাতে আরো কত ভুল আছে শোন। লিখেচ, চোখ দুটো কান ছুঁয়ে আছে। 'চোখ এক্কেবারে কান ছুঁয়ে আছে, কখন এমন দেখেচ? কি হে অপ্টিশিয়ান্ (চসমাওয়ালা) ভায়া, তোমরা ত হর্‌দম্ চোখ দেখ্‌চো, কখনো কান্ ছোঁয়া চোখ দেখেচ?

চসমাওয়ালা। না মশায়, তাও কি কখন হয়?

একেলে হকিম। শোন হে শোন, কবি।

সেকেলে কবি। যে আজ্ঞে।

একেলে হকিম। তুমি লোকটা বেশ বাধ্য ও ভালমানুষ। তোমাকে কোন শাস্তি না দিয়ে সাবধান ক'রে ছেড়ে দিচ্চি। ওরকম বাজে উপমা-টুপমা দিও না কিন্তু আর।

সেকেলে কবি। তা দেবো না হুজুর; কিন্তু অন্য দু'একটা উপমা দেব কিনা জিগ্‌গেস ক'রে নি। পদ্মপলাশলোচন, করপল্লব, ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ, প্রাচীন কবিদের এসব তুলনাগুলো কি বাতিল হবে?

একেলে হকিম। আলবৎ হবে, অবিশ্যি হবে।

সেকেলে কবি। হুজুর, আমি সেকেলে মানুষ, হুজুরের হুকুম তামিল কর্‌বো। কিন্তু একেলে জলজ্যান্ত অবনী ঠাকুর, নন্দলাল বোস, আর তাদের কত চেলা-পোটোরা যে করপল্লবের মত হাত ও আঙুল আঁকে, তাদের উপর তো আপনি কোন হুকুম জারি করেন নি?

একেলে হকিম। আলবৎ করেচি। সব কাগজে ইস্তাহার দিয়েচি, যে, যদি কেউ কাব্যি লিখ্‌তে চায় কিম্বা পট আঁকতে চায়, তা হ'লে তাদিকে মেডিক্যাল কালেজে পড়্‌তে হবে, আর তারপর শূ-মেকার, হেয়ারকাটার, টেলার আর চসমাওয়ালার দোকানে কয়েক বৎসর এপ্রেন্টিসী কর্‌তে হবে। নিতান্তই যদি কেউ তা কর্‌তে না পারে, তা হ'লে তাকে কাব্যি লিখবার সময় আর পট আঁকবার সময় একজন শূ-মেকার, একজন টেলার, একজন হেয়ারকাটার ও একজন চসমাওয়ালাকে কাছে মন্ত্রী রাখ্‌তে হবে। যদি ঠিক্ লায়েক শূ-মেকার, টেলার, হেয়ারকাটার, আর অপ্টিশিয়ান কেউ না পায়, তা হ'লে এই ফানুস্-ই-ঘর্মঘানী আদালতে দরখাস্ত করলে লায়েক লোকদের ঠিকানা জানিয়ে দেওয়া হবে।

সেকেলে কবি। যে আজ্ঞে হুজুর। বহুৎ বহুৎ সেলাম।

কার্তিক ১৩৩৪

খাঁটি

বিনামা

আমি গেঁয়ো মানুষ, তামুক খাবার একটু অভ্যাস আছে। ভাবলুম কলকাতায় তামুক-টামুক সব আছে, পথে আর মোট বাড়াই কেন? কলকাতা পঁহুছেই তামুকের পিপাসা হ'ল, তাড়াতাড়ি টিকে তামুক আনতে ছুটলুম। আধ ক্রোশ হেঁটে তামুকের দোকান পেলুম, তাও ভাগ্যে একজন বলে দিলে। "বাপু, তোমার কোন তামুক বেশী বিক্রি হয়, সেই তামুক দাও।" দোকানীকে আর কিছু বলতে হ'ল না, সালপাতা দিয়ে মুড়ো দোড়ী ঝুলিয়ে দিলে। বাসায় এসে দেখি, গিন্নী রামাকে দিয়ে জল আনিয়ে ঘর ধুচ্ছেন, কোথাকার কোন নোংরা এই ঘরে ছিল, রান্নাঘরে রেঁধেছিল। কলকাতায় তো বিচার নাই। ইতিমধ্যে হুঁকার জল ফেরানো হয়েছে, কলকের আগুন বেশ ধরেছে। এক টান টানা, আর চড়াক্ করো মাথা টেনে ধরা, বাসী মড়ার গন্ধ ছাড়া। দু' টান আর টানতে হ'ল না, দোকানী নিশ্চয় বিষ দিয়েছে। কিংবা কলকাতার লোক লোনার ভয়ে তামুকে বিষ মেখে খায়। তামুক নিয়ে আবার আধক্রোশ ছোট। দোকানীকে বললুম, 'বাপু, তুমি যে তামুকের নামে বিষ দিয়েছ? তোমার চারি আনা সের রেখে দাও, আটআনা সের ভাল তামুক দাও।"

"মিঠে কড়া দোব?"

"আর কড়ায় কাজ নাই, মিঠেই দাও; আর এক টান দিলে ব্রহ্মহত্যা হয়েছিল আর কি।"

তামুক নিয়ে ফেরবার পথে তেল আর ঘি কিনে নিলুম। শুনেছিলুম, কলকাতায় খাঁটি তেল, ঘি পাওয়া যায় না। কিন্তু পথে দেখলুম কিনা হ'ক পাঁচখানা "বিশুদ্ধ ঘৃত ভাণ্ডার" আর সাতখানা "খাঁটি সরিষার তৈল।" বুঝলুম, কলকাতার লোক বাবু কি না, 'বিশুদ্ধ' ও 'খাঁটি' নইলে খেতে পারেন না।

বাসায় এসে আবার তামাক সাজা, আবার আগুন করা। বেলা দশটা বাজে, বাড়িতে থাকলে অন্ততঃ পাঁচ ছিলিম পুড়ত, কলকাতায় এসে এখনও এক ছিলিম পোড়ে নাই। এক টান, দু' টান; ব্যস, আর টানতে হ'ল না, এ যে পেয়ারা পাতা আর কুল পাতা! তামুক কই?

যাঁর বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, তিনি নিশ্চয়ই সজ্জন, খুব ধনী। এক ছিলিম তাঁর বাড়িতে খেয়ে পিত্ত রক্ষা করি। যাবামাত্র তিনি বসতে চেয়ার দিলেন, একথা ওকথা কইলেন, কিন্তু তামুকের নামগন্ধও করলেন না! বুঝলুম কলকাতায় সে পাঠ নাই। দেখলুমও তাই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দোক্তা বিক্রি হচ্ছে, বলে বিড়ী আর সিগারেট। কলকাতা বাংলা দেশ নয়। কাজেই শুখ্‌না দোক্তা খেয়ে সকাল বেলাটা কাটাতে হ'ল। বিকালে আবার তামুকের দোকানে গেলুম। দোকানীকে বললুম, "বাপু, একবার দিলে বিষ, একবার দিলে কির্-কিরা পেয়ারা পাতা। খাঁটি তামুক নাই?"

"মসলা না দিলে কি তামাক মিঠে হয়? আপনি বলছেন বিষ!"

"কি মসলা?"

দোকানীটি ভদ্র। বললে, "শুনেছি, চুন সাজিমাটি দিয়ে তামাক কড়া করা হয়।"

"আর গলা কির্-কিরা?"

"কই, একথা তো শুনিনি। তবে, মিঠে তামাকেও মসলা আছে।"

"আমি তোমার মসলা দেওয়া তা মা-ক চাই না, চাই খাঁটি তা-মু-ক।"

দোকানীর নিবাস বাংলাদেশের গ্রামে। সে বুঝলে, আর বললে, "খাঁটি তামুক এখানে পাবেন না।"

এমন সময় দেখি ইস্কুলের ছেলেরা, জোড়া জোড়া এসে, এক পয়সা দু' পয়সার নস্য কিনতে লাগল। তারা চলে গেলে দোকানীকে জিজ্ঞাসলুম, "ছেলেরা নাকে নস্য নিতে শিখেছে বুঝি।" দোকানী একটু হাসল, কিছু বললে না।

কেমন করে বলি, কলকাতা বাংলা দেশ?

ইতিমধ্যে মধ্যাহ্নে আহার সময়ে আর এক পালা হয়ে গেছে। শাগ মাছ ভাজা শুখ্‌না দেখে ভাবলুম, কলকাতায় খরচ ভেবে গিন্নী তেল খরচ কমিয়েছেন। গিন্নী বললেন,

"তুমি যেমন তেল কিনেছ! আধ বাটি তেল ঢেলেও ভাজা শাগমাছ তেলা করতে পারলুম না।"

"সে কি? আমি "খাঁটি সরিষার তেল" দেখে কিনেছি!"

ভাজা চুলায় যাক্। ডালে দেখি, বোট্‌কা গন্ধ! হতভাগা দোকানী খাঁটি সাপের আর ইঁদুরের চর্বি দিয়েছে: ন-সিকা সের চেয়েছিল, চর্বির ভয়ে আড়াই টাকা সের নিয়েও এই দশা!

বাড়িতে একটি গাভী আছে, অল্প-স্বল্প দুধ নইলে চলে না। কিন্তু জানতুম, কলকাতায় দুধ দুর্মূল্য। তাই ছ-আনা সের দুধ কিনেছিলুম। দুধের বাটিটি নিয়ে ভাবছি, সর পড়ে নাই কেন? গিন্নী বুঝতে পেরে ব'ল্লেন,

"ভাবছ কি? তোমার দুধ কিনবার যেমন ছিরি! এক সের দুধ মেরে আধসের করলুম, তবু সরের দেখা নাই।"

অগ্নিপিণ্ড কোনও রকমে গিলে সে বেলা কেটেছে। ভারি রাগ হ'ল। দোকানী আমায় পাড়াগেঁয়ে বুঝে ঠকিয়েছে। তেলের দোকানে গিয়ে বললুম, "বাপু, তেলে পাক্‌রা-মাক্‌রা মিশাল নাই তো? শুনেছি, পাক্‌রা কেন বিষ।"

"বলেন কি মশায়? খাঁটি তেলে ভেজাল চলে কি?" "খাঁটি ঘৃত-ভাণ্ডারেও সেই কথা। ভাণ্ডারের একটা টিনও কখনও ফেলা যায়-নি, মুনসিপালিটির লোক ফি হপ্তায় আসে। তবে আমাদেরই পাড়াগাঁয়ের লোকদের নাকের দোষ।

ওবেলা আহার হয় নাই, ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন, দই, ও রাবড়ী কিনে বাসায় ফিরলুম।

দই দেখে গিন্নী বললেন,

"এ কি দই? শাদা ধবধবে কেন?"

"কলকাতার লোকে কি লালচে দই খাবে?"

"ওমা! কি কর্‍্যে বসালে গো! জলে যে ভাস্‌ছে?"

"এইত কারিকরি। দুধ পাবে না, দই জমাতে হবে।"

"তাই বুঝি চালে চুন-মাখানো?"

"চালে চুন? রামা হতভাগা শেষে 'বেরিবেরি' না টেনে এনে ছাড়বে না।"

"রামার দোষ কি? ভাল চাল চেয়েছে, দোকানী শাদা চাল দিয়েছে। চাল ধুলে চুন যাবে, কিন্তু কি বলে নারকেল তেল নামে কেরাসীন আনলে?"

"কেরাসীন কি? ও যে "খাঁটি" নারকেল তেল।"

"তোমার তেল রেখে দাও। মাথায় কেরাসীন মাখলে কি বাঁচব?"

দেখলুম, বিপদের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ক্ষুধা তো বিপদ-আপদ মানে না। মুখ হাত ধুয়ে একটু জল-যোগ করতে বসলুম।

"গিন্নী, আর যাই বল, এখানকার ময়রার তারিফ করতেই হবে। মিষ্টান্নের নাম শুনলেই বলবে কলকাতা শহরের মতন শহর বটে।" এই বলে যেমন একটা একটা চাখতে লাগলুম, অমনই বুঝলুম ঘিয়েভাজা খাবারের কোনটায় গন্ধ নাই চীনে বাদামের তেলে ছাঁকা, কোনটায়

পচা চর্বির গন্ধ এমন যে অন্নপ্রাশনের অন্ন বেরিয়ে আসে। সন্দেশ রসগোল্লায় ছেনা আছে-কি-না আছে। চিঁড়ে ভিজিয়ে বেটে ছেনা না কি, কে জানে। ময়রার বলিহারি বলতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনি কেরাসীন তেলে জল, উনানের কয়লা ধরছে না।

"জলে তেলে মিশবে কেন?"

"দেখ না এসে, কলকাতার জলে মেশে কিনা।" রান্নাঘরে ঢুকে দেখি ঘরখানি তিন হাত পাঁচ হাতের বেশী হবে না, অন্ধকার, দরজা আছে, জানালা নাই, উপরে টীন মাথায় ঠেকে। বর্ষাকাল হ'লেও দারুণ গরম। ঢুকবামাত্র গলদ্‌ঘর্ম। গিন্নীর হাতের পাখার বাতাস উনানে না গিয়ে তাঁর দেহেই লাগছে। আমার বুদ্ধি উপস্থিত হ'ল। "রামা, কেরাসীনের নারকেল তেলটা আন্।"

গিন্নী বললেন, "এ যে কেশের বউএর ছাগল রাখবার ঘর। কালামুখীরা এঘরে বসত কেমন করো?"

"কাজের সুবিধা কত, আস্ত ছাগল ভাজা হয়ে যেত।"

"কালামুখী ব'লও না, এখানকার মেয়েরা সবাই চাঁদমুখী। তাঁরা আকাশে থাকেন, রাঁধেন ঠাকুরে।"

"ঠাকুরে?"

"এদেশে রাঁধনী বামুনকে বলে ঠাকুর। বামুনের মান কত দেখেছ? 'ঠাকুর' কিনা, তাই এমন ঘর।"

কেরাসীনের নারকেল তেল ঢালা হ'ল। কোনও গতিকে আগুন ধরল। ভাতে ভাত নামল।

বাজার হ'তে "বিশুদ্ধ চাঁচাই গব্য ঘৃত" এনেছিলুম। ভাতে ঢেলে দেখি, 'গ' টুকু আছে 'ব্য' টা নাই। কুমীরের চর্বি না থাকলেই রক্ষা। বিশুদ্ধ দধির গোয়ালার বাহাদুরি আগেই বুঝেছি। ভাগ্যে চিনি ছিল, সরবৎ মন্দ লাগল না। রাবড়ী দিতে গিয়ে গিন্নী ব্যাকুল, সর ছেঁড়া যাচ্ছে না।

"যদি ছিঁড়তেই পারবে, তা হ'লে ছআনা সের দুধে এক টাকা সের রাবড়ী হবে কেন?"

আচমনান্তে বললুম, "গিন্নী আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলকাতা আমাদের সইবে কেন? এখানকার লোকের নাক নাই, কেবল চোখ আছে। চোখে যা ভাল, তাই ভাল। বাড়ির মালিককে বুঝিয়ে শুঝিয়ে কিছু দণ্ড দিয়ে গাঁয়ে গিয়ে হাঁফ ছাড়িগে।"

"আমার গঙ্গাস্নান হ'ল না, কলকাতা দেখা হ'ল না, অমনই ফিরে যাব?"

"কলের জলে নেয়েছ তো? সেই তো গঙ্গাজল। 'খাঁটি' কলকাতা দেখেছ, আর বেশী কি দেখবে?"

"তাই তো। এত বাড়ি গাড়ি, ভাল খাবার যোগ্যতা নাই!"

"যোগ্যতা খুব আছে। নইলে এত "খাঁটি" চলে কি? ঝুটা চায়, ঝুটা পায়। মারোয়াড়ী কখনও চর্বি-ঘি খায় না, কারণ চায় না। তারাই খাঁটি, আর সব ঝুটা। কলকাতা ঝুটার শহর।"

ভাদ্র ১৩৩১

লুপ্তোদ্ধার

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থান—কৈলাস

উমা। জয়া, একবার দেখে আয় দিকি কর্তা কি করছেন? ধ্যানস্থ কি?

জয়া। তাঁকে আবার জ্বালাতন করা কেন?

উমা। আমি একা আর কত জ্বালাতন হব, আমি যে গেলুম! দিন-রাত "মা মা" ক'রে ছেলেরা যে অস্থির করছে! আবার কি হ'ল? একটা না একটা লেগেই আছে!

জয়া। নতুন কিছু নয়, সে তো দুই-তিন বছর চলছে।

উমা। দুই-তিন বছর? কই, তা তো কিছু জানি না?

জয়া। আমার নন্দীর কাছে শোনা। তারা বহুদূরের, সেই অস্তগামীর দিকে থাকে কিনা, "মা মা" কবে না, তাই শুনতে পাও নি। তারা নিজেকেই জানে, নিজের ওপর নির্ভর রাখে।

উমা। সত্য-যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝি,—বেদান্ত-চর্চা করছে? ভালই হয়েছে—

জয়া। না. অতটা হয় নি, অহংকে আঁকড়ে ধ'রে মিথ্যাকে একদম সাফ ক'রে ফেলেছে, তাকে না সরালে সত্যের স্থান হয় না যে।

উমা। বলিস কি! ভেতরে ভেতরে ঠিক ভুলটি ধরেছে তো। হবে না, একদিন হতেই হবে, তা জানতুম। বড় আনন্দ পেলুম, বেঁচে থাক সব। ভারত একদিন আচার্যের আসন নেবে বইকি। কিন্তু কি লজ্জার কথা বল দিকি? ওঁর অপেক্ষা কেউ করলে কি, কেউ পুছলে? কতদিন আর সইবে? যাই, একবার শুনিয়ে আসি—(দ্রুত চলে গেলেন)

জয়া। (নিজে নিজেই) তাই তো, নন্দীর কথা শুনে কি করলুম! সেও তো টানে, না টেনে ওঁকে দেয় না। মিছে হ'লে ধমক খেয়ে না আসেন। যাই, বেলতলাটা ঝাঁট দিতে দিতে একটু শুনিগে। (প্রস্থান)

শিব আসনে ব'সে ঘন ঘন হাই তুলছেন—চক্ষু বুজেই আছেন।

উমার প্রবেশ। তাঁর গতিটা একটু তরস্থ ছিল, শব্দ শুনে নন্দী ভেবে—

শিব। হাবামজাদা, এখন তোমার হুঁশ হ'ল? আজ না অমাবস্যা, রাত আর কতটুকু আছে? আমার সব কাজ বাকি—

উমা। রাত আবার কি? একপোর বেলা হয়ে গেছে। তিনটে চোখেও কুলুচ্ছে না নাকি?

শিব। কে, উমা নাকি—এত রাত্রে? কার্তিক ভাল আছে তো?

উমা। আবার রাত? একবার চেয়েই দেখ না।

শিব। (হাই তুলে. চোখ না খুলেই) ইস, তাই তো!

উমা। (রুষ্টভাবে) আমার মাথা,—চোখ বুজেই—

শিব। পারি না বুঝি, এই দেখ। (ভুরুটা কেবল কোঁচকালেন।)

উমা। তাই তো, খুব হয়েছে। আর কাজ নেই, শেষ কালিদাসকে আবার জন্মাতে হবে। "উমাবিলাপ" লিখতে থাক, এদিকে যে শিবত্ব ঘোচে।

শিব। ঠিক বলেছ, পঞ্চত্ব ওই হারামজাদাই পাওয়াবে। রাত পোয়ায়—বেটার হুঁশ নেই।

হাই তুলে তুলে হাঁ বেড়ে গেল। একবার দেখ না, বেটা ঘুমুচ্ছে বুঝি—

উমা। ফের—আবার রাত?

শিব। আহা, বুঝছ না—বেটা গণ্ডমূর্খ, "ন দিবা শান্তি" ও জানে না। একটা ইংরিজী-জানা লোক দেখ—ওকে নিয়ে আর—

উমা। ঐ ইংরিজী-জানা পণ্ডিতদের কথাই তো বলতে এসেছি।

শিব। আঃ, বাঁচালে দয়াময়ী! এত দিকে নজরও রাখতে পার! শুনেছ বুঝি—এখন দরোয়ান পিওনদেরও ম্যাট্রিক পাস ক'রে চাকরি পেতে হয়? দূর ক'রে দাও, দূর করে দাও হারামজাদাকে,—অভাব কি? এখন ভিখিরীও ভিক্ষে নিয়ে থ্যাঙ্কস দেয়, আর এ গর্দভ—পোড়া কলকে দেয়! বেইমান, ব্রুট—এইবার বুঝবে বেটা—

উমা। এখন তুমি বুঝলে যে বাঁচি।

শিব। দেখে নিও। আমার এ "মরদকি বাৎ"।

উমা। ওদিকে মদ্দামি যে যায়! তোমার গেঁতোমি দেখে সুসভ্য শিক্ষিতেরা তোমার তক্কা না রেখে নিজেদের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেছে, "পুরুষকারে" পৌঁছে গেছে। বেদান্তের সারে পৌঁছে গেলে আমাদের আর পুছবে কে? তারা আর "বাবা বাবা"ও করে না, "মা মা"ও করে না—স্বয়ংসিদ্ধ। নিজেকেই জানে, নিজের ওপরেই বিশ্বাস। বলে—সায়েন্সই সবার বড়, বুদ্ধির জোরে তাকে হাত করতে পারলে, কোনও মিঞার পরোয়া রাখি না।—কানের তো পলক নেই—শুনছ?

শিব। একটু আছে বইকি—ঐ জটাগুলো।

উমা। আরও ঘটা ক'রে বাঘ-ভাল্লুকের বাসা বানাও।

শিব। সাপগুলো মাথায় উঠেছে, দিন কত আনন্দ করুক না। ওরা নিজের ছেনা নিজেরা খায়—

উমা। কথাটা বুঝছ না, তুমি ধ্বংসের মালিক কিনা, এখন তারা তাইতো মাথা দিয়েছে ধ্বংসের কল বানিয়েছে—বানাচ্ছে। "গেল গেল" রব প'ড়ে গেছে দুনিয়াময়।

শিব। আমার পরম সহকারী ভক্ত বল।

উমা। সহকারী নয়—কীর্তিহারী। তোমাকে বাতিল করাই উদ্দেশ্য—ক'রেই দিয়েছে। বুঝেছ—দেবতা আবার কি? সব আমরা। আরও চোখ বুজে থাক—ভিক্ষেও মিলবে না। আমার কার্তিক—(সুরটা ক্রন্দনের আওয়াজ দিল)

শিব। আহা, শোন না। আমার কাজের বাধা তো তুমিই। সাধে কি চোখ বুঝেছি? একবার 'মা' বললেই মাফ! ওদের 'সায়েন্সে' সেটি পারে না—শিশু-সুদ্ধ মা সাফ। দোষী নির্দোষ নেই। দেখ দিকি, কেমন সোজা রাস্তা! একে বলে বুদ্ধি,—তাদের বৃদ্ধি হবে না? যাক, কাদের এত বুদ্ধি বাড়ল? ভারতবাসীর?

উমা। ওগো না, তারাই তো "মা মা" ক'রে আমায় জ্বালাচ্ছে।

শিব। এখনও মুখ্‌খুরা আছে? যেতে দাও না, দু নৌকোয় পা দিয়ে দিয়ে থাকা কেন, যাক না। বছর বছর বাপের বাড়ি যাও কি চোখ বুজে? কেবল আমাকেই চোখ বুজতে দেখ! ওর যে আরাম কত, তা তো জান না।

উমা। কেন আমি চোখ বুজে যাব কেন? বাড়ি, ঘর, রাস্তা ক্রমেই পাকা হয়ে যাচ্ছে—দেখব না কেন? তুমি একবার চক্ষু সার্থক ক'রে এস না—মা কত বলেন—

শিব। বটে, সব পাকা হয়ে যাচ্ছে! আর তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত, আমাকে উৎসর্গ করা মন্দিরগুলো সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে! রাতে গরুর গাড়ি ক'রে কেউ আমার গঙ্গাজলী ক'রে আসছে, কেউ পাকা বাড়ির ভিতে গোর দিয়ে বাড়ি পোক্ত করছে, না? পরের মুখে ঝাল খাওয়া বিদ্যে শিখছে—বুদ্ধি বাড়ছে, ক্রমে পইঠে বানাবে, সেইটের অপেক্ষা করাছি। পথ পাও তো এইবার দেখে এস—বাপের বাড়ি

খুঁজে নিতে হবে কিন্তু। আর 'কণকাঞ্জলির' লোভ যেন না থাকে।

সচকিত ভাবে কানঢাকা জটাগুলো সরিয়ে

বীণাবাদ্য না?

বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ

নারদ। এই যে, মাও উপস্থিত! (উভয়কে প্রণাম)

উমা। এস, নারদ এস। অভীষ্ট লাভ কর।

শিব। এত রাত্রে যে? সব মঙ্গল তো?

উমা। আবার ঐ কথা?

শিব। না, এত বেলায় যে? (নারদের প্রতি) উনি বুঝতে পারছেন না, রাত কি দিন। (উমার প্রতি) হারামজাদাকে একবার ডেকে দাও না, হাই তুলতে যে আর পারছি না।

রুষ্ট হাস্যে উমার প্রস্থান

(নারদের প্রতি) দুনিয়ার হালচাল কি দেখে এলে, সব ভাল তো?

নারদ। (মাথা চুলকুতে চুলকুতে) মববার বয়স পেরিয়ে গেলুম, কিন্তু ঐ "ভালর" অর্থটা মাথায় ঢোকে নি প্রভু। একজনের ভাল, আর একজনের মন্দ না হ'লে তো বড় দেখতে পাই না। কার কথা বলব—একটা খুঁট ধরিয়ে দিন।

শিব। ধর—এই যেমন 'সায়েন্স'।

নারদ। ও, ও তো আপনার ডিপার্টমেন্টের কথা। তার প্রভাবই তো এখন পৃথিবীময়। প্রধান স্থান সেই নিয়েছে। বাহবা প'ড়ে গেছে। আপনাকে আর আসন ছেড়ে উঠতে হবে না, কাজ আপসে চলছে ও চলবে। তোফা জিনিস বানিয়েছে, একটা ছাড়লেই হাজার লোক ফিনিশ। দেবরাজের বজ্র তার কাছে এখন চীনে পটকা—আপনার 'টিকি' ধরবার কাজে লাগতে পারে বটে।

শিব। বল কি হে নারদ—এমন?

নারদ। বলেছি আর কই, অমন কত কি রয়েছে; এক রকম তো নয়। একটার কথা বললুম। ফলে আপনাকে আর ভাবতে হবে না।

শিব। বাবাজীর নামটি কি?

নারদ। সেটা পরে শুনবেন, আমার সাহসে কুলুচ্ছে না। আর একটার কথা বলি।

শিব। সে আবার কি, তাঁর কাজ?

নারদ। তিনি উভচর, যাতে ঠেকেন, তিনি আর টেঁকেন না, তা জলেই কি আর স্থলেই কি। রাজপ্রাসাদকে স্পর্শ করলে দ পড়িয়ে হ্রদ বানায়, না হয় মরুভূমি। সমুদ্রে লৌহদেহ মানোয়ারি জাহাজে ঠেকেছে কি তিনি মাল-মানুষ সমেত তলসই। তাঁর নাম 'টরপেডো'। একটা গ্রাম গ্রাস করতে একটিই যথেষ্ট।

শিব। বড় সুখবর শোনালে নারদ। হ্যাঁ, ঐ প্রথমটির নামটি যে শোনা হয় নি।

নারদ। অভয় দিতে হবে কিন্তু, না অনুমতি নিয়ে একটা বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি প্রভু। বয়স হয়েছে, স্নায়ু দুর্বল, সহজেই ক্রোধের উদয় হয়, সইতে পারি নি।

শিব। সে তো আমারও গো। এই দেখ না, নন্দী হারামজাদা আজ জুতো খাবে দেখছি। ভাগ্যে তা নেই, তাই বেঁচে যাচ্ছে। আজ আর রাগের ভাগ অন্যে পাবে না, তুমি অসঙ্কোচে বলতে পার। দুনিয়ার খবরের জন্যে আমি উৎসুক নই, তারা স্বাধীন জাত, মারতে জানে, মরতে জানে, আমার কাজ সহজেই চালাতে পারবে। পেনশন নেবার বয়স হয়ে গেছে, কেবল কার্তিকবাবুর জন্যে এক্সটেনশনে থাকতে হয়েছে। বেটার পোশাক এসেন্স আর চুল-ছাঁটার বিলেই পিলে শুকুচ্ছে। আবার কে 'পেলিটি' আছেন, তিনিই ছেলেটির মাথা খেলেন। যাক, আমাকে ভারতের খবরটি শোনালেই হবে।

নারদ। (স্বগত) ফেললে গাড়ি নন্দামায়। (মাথা চুলকে প্রকাশ্যে) সব চাক্‌রে কিনা,

আফিসে অধিকাংশেরই কাপি করা কাজ, তাই সব বিষয়েই তারা অনুকরণপ্রিয়, দাগা বুলুতে দক্ষ হয়ে পড়েছে, দোষ বড় নেই। বিদেশীদের যা দেখে, তাই শেখে। তাই পূজাপাঠ উঠে গেছে—ওদের নেই কিনা। মন্দিরগুলোয় লোক ঢোকে না, ঢোকে ছুঁচো প্যাঁচা আর চামচিকে। শ্যাল-কুকুরের আড্ডাও হয়েছে। নাম আর করব না, সেদিন দেখি মন্দিরগুলো মিউনিসিপ্যালিটিকে বেচেছে, তারা মন্দির ভেঙে—; আর শুনে কাজ নেই।

শিব। (জটা খাড়া হয়ে উঠছিল) বল, বল, শেষ কর—

নারদ। (বল পেয়ে) শেষ হবার দেরি নেই, আপনিই হবে। পূজো মনে মনেও চলে, চলতও, কিন্তু 'বমবম'টা এক-একবার সাড়া দিত। কোথাও তা কানে এল না, তখন প্রাণে এল রাগ, অপরাধ ক'রে ফেলেছি প্রভু, ক্ষমা চাইতেই এসেছি।

শিব। (ক্রমোচ্চ স্বরে) তারপর, তারপর? (বলতে বলতে তৃতীয় চক্ষু ধকধক ক'রে জ্ব'লে উঠল) বল, বল, তারপর?

নারদ। (কাঁপতে কাঁপতে, স্বগত) তাই তো, করলুম কি? (প্রকাশ্যে) থাকতে পারলুম না প্রভু। সায়েন্টিস্টদের ঠিকানা জানি না। একে ওকে জিজ্ঞাসা করি, বুড়ো আর এই চেহারা দেখে সব পাগল ভাবে—কেউ লালবাজারের থানা, কেউ ধাপার মাঠ দেখিয়ে দেয়। ভাবছি ব্রহ্মার শরণ নিই, এমন সময় হঠাৎ এক বিকট কান্নার স্বর। বাঙালীদের কি দয়ার শরীর, মেয়ে মদ্দে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, বোধ হয় সান্ত্বনা দিতে। ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। কি গা, কি হয়েছে—কোথায়, কার? কেউ কথা কয় না। একজন পাজামা-পরা প্রবীণ আমাকে ধাক্কা মেরে বললে, সত্বর একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়, সার্সিওয়ালা বাড়ি না হয়। বাইরে উঁকি মারবার চেষ্টা ক'রো না—শিগগির। ছুটলেন। আর একজন আমাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে একটা বাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে। সেটা বাইরের ঘর, আরও কজন ছিল, সব কাঁপছে আর ত্রাহি ত্রাহি দুর্গানাম। কথা কইলেই ধমক দেয়। তিন মিনিটেই আকাশ ফুঁড়ে উল্কা! চন্দ্র সূর্য যেন চারদিকে আলো ক'রে নামছে, আবার তার আওয়াজ কি! বজ্রপাত মেঘগর্জন তার কাছে বোবা মেরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শহরময় হৈ-চৈ—পরেই হাহাকার, গেল গেল রব। পরে শুনেছি, উনিই সেই প্রথম নম্বরের তিনি, নাম "বোম্"।

শিব। (উত্তেজনার সহিত) কিছু কাজ হয়েছে?

নারদ। কিছু হয়ে থাকবে বইকি, বস্তুটি কাঁচাখেগো কিনা। তবে ঠিক খবরটা কে রাখে? যাদের কেউ গেছে, তারা রাখে বটে।

শিব। যে নাম শোনালে সে অকেজো হতেই পারে না, যমের সঙ্গে 'বমে'র অমন সুমিল যখন রয়েছে, কাজ করেছে বইকি। ধর্মরাজের লিস্টখানা তলব করলেই পাব।

নারদ। শুনলুম, তারা যা ছেড়েছিল, তা নাকি কিছুই নয়, খেলাঘরের পটকা, লোককে একটু ভয় দেখানো। এখনও আসল মাল ছাড়ে নি।

শিব। (উৎফুল্ল হয়ে) শনৈঃ পন্থাঃ।

নারদ। আমার ঐতেই কাজ হয়ে গেছে প্রভু। এখন মেয়ে-মদ্দ, এণ্ডাবাচ্চা, বালক-বৃদ্ধ সবার মুখে দিনরাত বম বেরুচ্ছে। বম ছাড়া কথা নেই। মোটর মেরে বাইরে বেড়ানো থেমে গেছে।

শিব। ওটা যে তেলের কাজ, তেল ফুরিয়েছে বুঝি—(অদূরে উমাকে ও পশ্চাতে নন্দীকে কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে আসতে দেখে) নারদ, কথা বদলাও, কথা বদলাও। তোমার ছিঁচকাঁদুনি মা-টি আসছেন। ওল্ড ফিমেল, বুঝেছ তো, হোল্ড ইওর টাং।

উমা এসে পড়লেন

(নন্দীর প্রতি) আর ফুঁ দিতে হবে না রাস্কেল। ওতে কিছু আছে কি? টেনে এনেছ

তো?

কলকে নিয়ে একটানে চতুর্দিক ধূমাকার

উমা। (চোখে মুখে আঁচল ঢেকে) ধোঁয়ে যে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

শিব। হবে না? আগুনে জল পড়ল যে! কলকে বেটা ফায়ার ব্রিগেড এনেছে। হ্যাঁ, নারদ, যা বলছিলে এইবার বস, উনিও এসেছেন, শুনুন। চোখে তো দেখতে পাব না, শুনেই সুখ। ওই তোমার দ্বারিক মোদকের দরবেশের কথাটা হে।

নারদ। বললুম তো।

শিব। ছাই শুনেছি। তখন কি আমার শোনবার অবস্থা ছিল?

উমা। বল না নারদ, আমিও শুনি।

নারদ। মা, সে আর কি বলব, দ্বারিক মোদক এমন তোফা মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার খুলেছে, আর এমন সব জিনিস বানাচ্ছে, আগেকার পক্কান্নো, মোণ্ডা, মেঠাই, রসগোল্লা সব গোল্লায় গেছে, এখন তারা কেউ 'পরিতোষ', কেউ 'পরিমল', কেউ 'পারিজাত'। পার্শেলের প্যাকেট, সুটকেসের বাছারা ব'য়ে নিয়ে যায়।

উমা। কোথায়?

নারদ। যেখানে বাঙালী আছে মা—পেশোয়ার, ফ্রন্টিয়ার সর্বত্র। তৃতীয় নয়নটি তো খুলবেন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ষষ্ঠীবাটার ঘটা যদি দেখতেন! একেবারে অমৃত বন্টন হচ্ছে! চাটগাঁ পর্যন্ত তার সুগন্ধ পৌঁছেছে। রাজবাড়ি, জমিদারবাড়ি নিত্য বরাদ্দ। লোকের ভিড় কি! মোদকের দেরাজে প্রশংসার পদক আর ধরছে না, দেশের অবস্থা ভালই মা। পুরুষেও নাচে, বলে শিব-নৃত্য। কই বাবাকে তো কোন দিন নাচতে দেখি নি।

শিব। দেখবে দেখবে, দেখাব।

উমা। তোমার বাবার তরে দুটো মিষ্টান্ন আনতে হয়।

নারদ। লজ্জা দেবেন না মা, মনে যে হয় নি তা নয়। বাবুদের গান শুনিয়ে কিছু টিকিটও যোগাড় করেছিলুম।

উমা। টিকিট!

নারদ। সকলের পকেটেই ওই, তাইতেই পয়সার কাজ হয়, অথচ ছোঁয়াচে রোগ চালান দেয় না। এমন সময় দেখি, আমারই মত পাকাদাড়ি একটি প্রবীণ রাস্তায় দাঁড়িয়েই একটা 'সরোজকলি'তে কামড় দিয়েছে। একেবারে বেহাল, রসে দাড়ি ভেসে বসুধারা শুরু। মৌচাক যেন খোঁচা খেয়েছে। লোকটি অপ্রস্তুত, ফেলে দিয়ে বাঁচে। তাই সাহস হ'ল না মা, পাহাড়ী পথে—

শিব। হয়েছে, থাম, আর বর্ণনা বাড়িও না। (উমার প্রতি) ও আর শুনবে কি, ওইসব কথায় এতক্ষণ আমার মাথা খাচ্ছিল, ভাগ্যিস এসে পড়লে।

উমা। (নারদের প্রতি) বেশ করেছ যে, আন নি বাবা, পথে বিপন্ন হতে? গণশাকে যেন শুনিও না, একে পেটুক, তায় পেটের অসুখ লেগেই আছে। ভালই করেছ। সেখানে ছেলেরা খাচ্ছে, তাতেই আমার তৃপ্তি, তারা ভাল থাকুক। (শিবের প্রতি সহাস্যে) শুনেছ? ভারি মজা হয়েছে। আশ্চয্যি কাণ্ড! তোমার তরে নন্দীকে বলতে গিয়ে দেখি, একমনে ইংরিজী পড়ছে। হতভাগা তোমার সঙ্কল্পটা শুনলে কার কাছে?

শিব। সেটা আমি জানি, যার মা আছে তার শোনবার অভাব থাকে না। কিসেবই বা থাকে? (নন্দীর প্রতি) কি শিখেছিস, একটু শোনা দিকি, এদিকে আয়।

নন্দী। Rifle বলে বন্দুককে, Cannon হয় কামান
বড় বড় কেল্লার গর্ব এক গোলাতেই থামান।
Shell হন তোপের গোলা—গুলির ঠাকুরদাদা,

পাথরের প্রাকার ভেঙে বানায় বালির গাদা।
Tommy gun তোপের বাচ্চা—কাজ সারেন দ্রুত,
দ্বাপরের অভিমন্যু—অর্জুনের সুত।
মাসতুতো ভাই Machinegun—হন হাজারীলাল,
ছারপোকার বংশ ছাড়েন—কামড়েতে কাল।
চাকায় চ'ড়ে সর্দার আসেন—নাম তাঁর Tank
অস্ত্রের গুদাম তিনি—সবার বড় Rank,
Torpedoও রাখেন পেটে—তাঁর জলে স্থলে গতি
দুর্গ কি জাহাজের যম—ধ্বংসই নিয়তি।
Gunboat, Uboat কিংবা Cruiser,
Destroyer হউন না কেন স্পর্শেই পাচার।
Battlleship সে সামনে পেলে Cattle সম মারে,
ডুব মেরে Submarineগুলো সহজে কাজ সারে।
নানাবিধ Gasও হাজির, নাকে ঢুকলেই জখম,
হাসায় কাঁদায় অক্কাও দেয়, আছে কত রকম।
হ্যাঁ, Fire আগুনকে কয়, Steel ইস্পাৎ,
এই দুই কর্তা-মিলেই বাধায় উৎপাত।
তার চেয়ে জানা ভাল Hemp মানে গাঁজা,
বলেন তো এক ছিলিম সেজে আনি তাজা।

শিব। (উৎফুল্ল হয়ে) যা যা, শিগগির যা। চাকরির তরে আর ভাবিস নি রাস্কেল, এখন সাতপুরুষ বাধামুক্ত, সরকারী ভাষার গুণই ওই। বেঁচে থাক।

কলকে নিয়ে আনন্দে নন্দীর প্রস্থান

(উমার প্রতি) তাই তো গো, বেটা দরকারী কথা সবই শিখে ফেলেছে দেখছি। এমন ওস্তাদ মাস্টার পেলে কোথায়?

উমা। তুমি তো আমার গ্রাজুয়েট কার্তিককে দেখতে পার না।

শিব। বটে, তার এত বিদ্যে? বিলেত যাক, বিলেত যাক। অমন সোনার চাঁদ ছেলে এখানে মাটি হয় কেন?

তাজা ছিলিম হাতে নন্দীর প্রবেশ

ওকে আজ দুখানা বিস্কুট খেতে দিও। যাও, এখন সব ছুটি।

নন্দীর প্রস্থান

উমা। (যেতে যেতে নারদের প্রতি) না খেয়ে যেন যেও না বাবা।

নারদ। প্রসাদ না পেয়ে তা কি পারি মা? এখানে চাল কত ক'রে পাচ্ছ মা?

উমা। (সহাস্যে) তোমার সে খোঁজে কাজ কি?

শিব। চারদিকে ঘোরে কিনা, খুব সস্তা দেখে এসেছে, এই সুযোগে এখানে এনে ব্যবসা করতে চায়। ঢেঁকি তো সঙ্গেই আছে। আমাদের কুটবে বোধ হয়।

উমা। তোমার যেমন কথা! সস্তা শুনে স্বস্তি পেলুম, ছেলেরা পেট ভ'রে খাক।

(চ'লে গেলেন)

শিব। (নারদের প্রতি) কতদিন স্নান করা হয় নি মনেই নেই। চল, একবার মানস সরোবরটা হয়ে আসি। রাজহাঁসগুলো কেমন সুখে সাঁতার দিচ্ছে দেখে আসি, কদিন আর দেখতে পাব, কে জানে!

নারদ। কেন, স্নান করেন নি কেন?

শিব। (সহাস্যে) একটা অষ্টবজ্র যোগ খুঁজছি, একেবারে মুক্তিস্নানের ইচ্ছা, ছোটখাট

বিয়োগ-যোগ আর নয়, অনেক হয়েছে। সাপগুলোও মুখ চেয়ে থাকে, শীতে মরে, তাই পারি না। তাদের খুশি রাখতে হয়।

নারদ। আহা! দেবতার দয়াতেই চ'লে যাচ্ছে।

শিব। ওরাই তো নিশ্চিন্ত ক'রে রেখেছে, মাছিটি পর্যন্ত ঘেঁষতে পায় না, লাফিয়ে কামড়ায়। ধ্যানের বড় সুখ। সুখে ডুবিয়ে রেখেছে। তেল মাখবে কি? বোধ হয় নেই। (উভয়ের প্রস্থান)

চৈত্র ১৩৪৯

নরকের কীট

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

১

নরক?—নরকেই ত আছি হে। Been there since 1876 একটা idea দিই। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর.—হাঁ হাঁ তাই! I mean your—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—অর্থাৎ কিনা যে দেশে আখ খেজুরের চাষ হয়, এবং জাভা থেকে চিনি আমদানী করতে হয়, যে দেশে জলকষ্ট একটা দৈনন্দিন ব্যাপার ; এবং যেখানকার মহামান্য চিকিৎসকগণ propaganda work করচেন খোলা বাতাসের বিরুদ্ধে।—নাঃ তোমাদের দোষ কি? দোষ সব অশ্লেষা মঘার।—১২৯৯ সাল থেকে দাসত্ব করে আস্‌চে.—অথচ জাতকে জাত সমুদ্রে ডুবে ম'ল না। আজও বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়।—আজও বংশবৃদ্ধি কর্‌চে, আর রেখে যাচ্ছে কতকগুলো হ্যাংলা ক্যাংলা ছেলের পাল, যাদের পেট ভর্‌বে শুধু পীলে আর লিভারে A colony of maggots in a dungheap!

ধানের ক্ষেতে লাঙল পড়ে না। তা হোক্, ছেলের ক্ষেত পতিত থাকবার জো নেই, Consent Billএর নামে হাহাকার একেবারে!

—Morality?—হাঁ, ও জিনিসটা তোমাদের আছে। সুবোধকে চিন্‌তে? ও রকম moral লোক প্রায় দেখা যায় না। চুরি করতে পারলে না ব'লে M. A.তে fail করলো, ঘুষ দিতে পারলো না ব'লে চাকরি খোয়ালো। হাতে টাকাকড়ি কোন কালেই বিশেষ কিছু ছিল না। বেকার অবস্থায় একেবারে কিছু না থাকবার কথা। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তার স্ত্রী একটু লেখাপড়া জানতেন। Higher mental sphereএ মিশবে বলে হয়ত শিক্ষিত মেয়ে বে করেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফল হয়েছিল—চারটে না ক'টা ছেলে। এই গুলোকে নিয়ে স্ত্রী এক স্কুলে কর্ম নিলেন। সেও আবার বরিশালে না কোথায়? সুবোধ কলকাতায় মেসে থেকে অর্থচেষ্টা করতে লাগল। কিছু উপার্জনও হয়ত করেছিল। কিন্তু সবটাই বোধ হয় খরচ হয়েছিল Scott's Emulsionএ। ভদ্রলোকের একটু বুকের রোগ ছিল,—a most moral disease! পাপের ফলে যে সব 'দুষ্টরোগ' হয়, এ রোগ সে দলে নয়। অতএব sympathy করতে পার।

ছেলে-পুলের সমস্ত ভারটা স্ত্রীকেই বহন করতে হ'ল। তিনি বেতন পেতেন অল্প। তাই স্কুলের কাজের পর সমস্ত দিনটাই প্রায় tutionই ক'রে কাটাতে হ'ত। প্রবাসে, নিরানন্দে. গুরুশ্রমে তিনি বেশ রুগ্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু কাজ পুরোদমেই চালাতে হ'ল। সুবোধ স্ত্রীর জন্য হা-হুতাশ করতো অনেক। কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারতো না। তবে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতো, এবং একটি ক'রে সন্তান দিয়ে আসতো। ঐ অবস্থাতেই তাঁর গর্ভে আরও ৪।৫টা সন্তান উৎপাদন করেছিল।

—Human weakness? It is inhuman weakness!

আমি তাকে বলেছিলুম ঐ শ্মশানের মড়াটাকে ছেড়ে দাও। তুমি না হয় একটু কুপথে যাও। But he had not the pluck to be immoral He had a homicidal morality

স্ত্রীকে তুষ্ট করবার জন্য সে এই কাজ করেছিল? It is a lie. It is worse than that It is হিতোপদেশ! ঐ হিতোপদেশের 'অষ্টগুণ কামাগ্নি'র তুষানলে তোমরা পুড়ে

খাক হয়ে গেলে। আজও আগুন নিবলো না। আজও পথে ঘাটে তোমাদের তরুণ-সাহিত্যের Freudism and Psychologyর মধ্যে আমি দেখতে পাই ঐ আদ্দিকেলে তুষানলের হল্কা।—সুবোধকে কামনা করা দূরে থাক্‌, তার স্ত্রী পায়ে ধ'রে তাকে বলেছিল, 'ওগো, আমার ওপর দয়া কর। আমার কাছে আর এসো না।' প্রথমটা অনুরোধ উপরোধ, তার পর রাগারাগি, শেষটা she refused to meet him.

কিন্তু সবল পুরুষ এত সহজে তার property ছাড়বে কেন। খুব খানিকটা লাঠালাঠি, পুলিস পেয়াদা মামলা মকোদ্দমার গুজব শুনছিলুম। তবে ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াল না। স্ত্রীটা manage : die in a hospital during childbirth.

সুবোধও মারা গেছে, আজ কয়েক বৎসর হ'ল, জান বোধ হয়।

—ছেলেগুলো? হা হা হা হাঃ। সেগুলো ডিম ভাঙা মাকড়সার বাচ্চার মত ছর্‌ ছর্‌ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমি করিছি? হঁা, তা করিছি ত। করিছি, in atonement of the sins of my parents.—করিছি তাতে কি? তাতে সুবোধের morality কিছু কমলো?

—ওঃ! আমার মহানুভবতা? তা বটে! But don't you know I use to love that girl?

—না, না, না, না! সে রকম কিছু না। ভয় পাবার মত কিছু নেই। তাঁর মধ্যে প্রেমের লেশমাত্রও ছিল না।—স্বামীর প্রতিও না, পরপুরুষের প্রতিও না। She was nothing but a mother এবং মাতৃত্ব ছিল তাঁর দুচক্ষের বিষ।

আঃ বাঁচা গেল? কি বলো? সুবোধের স্ত্রী আমাকে ভাল-বাসতো, এমন হলে গল্পটা একেবারে মাটি হয়ে যেত। কেমন, না? আশ্চর্য মন তোমাদের! মাছির ঝাঁকের ভেতর থেকে ভাত খুঁটে খুঁটে খেতে তোমাদের গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে না। তোমরা আঁৎকে ওঠ, যদি শূদ্রে ছুঁয়ে দেয়। তোমাদের শরৎ চাটুজ্জের সতীশ-সাবিত্রী, আর রবিবাবুর রমেশ-কমলাও এই ছোঁয়া বাঁচিয়ে ত'রে গেল। করবে কি! নইলে যে তোমাদের sympathy থাকে না। পাপকে যে তোমরা সহ্য করতে পার না একেবারে। তোমাদের দেশে সীতা পরিত্যাজ্য হন, কারণ রাবণ লোক ভাল নয়। যদি ছুঁয়ে ফেলে থাকে।—দেখ সমাজের মধ্যে একটা শাখিনী সাপ ঢুকেছে। তার দুটো মুখ,—'ধর্ম' আর 'সতীত্ব' এই দুটো মুখে সে যে হত্যাকাণ্ডটা ক'রে চলেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। The wanton, most atrocious, the most devastating crime যত কিছু আছে, তার মূলে আছে হয় ধর্ম, না হয় সতীত্ব। আমরা ক'টি অপোগণ্ড একটু মিলেমিশে থাকতে পারতুম যদি এই ধর্ম আর সতীত্বের ফোকর দিয়ে লোককে স্বর্গে পাঠাবার প্রবৃত্তি একটু কম হত।—কি বললে? স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাল না বাসে ত সমাজের স্থিতি রক্ষা হয় না? I agree with you there. সমাজের বর্তমান অবস্থায় স্ত্রীর একনিষ্ঠা খুব convenient. কিন্তু সকলকে সব সময়ে convenience মেনে চলতে হবে, এ হুকুম জারী করবার কে তুমি? চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রীতি বা অরবিন্দের দেশপ্রেম was most inconvenient. তা ব'লে আমি ত তাঁদের জাতিচ্যুত করতে পারবো না। তুমি করো।—হাঁ, একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি 'একনিষ্ঠ' শব্দটা ব্যবহার করিছি পতিভক্তির প্রতিশব্দরূপে। ওটা অন্যায় হয়েছে। একনিষ্ঠার সঙ্গে পতিভক্তি বা প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। যারা যারা স্বামীর পা কামড়ে প'ড়ে আছে তা'রা সবাই স্বামীকে ভালবাসে না। যারা যারা পরপুরুষকে ভালবাসে তারা সবাই স্বামীর ঘর ভেঙে চলে যায় না।

—ভুল?—কার? আমার না তোমার?—

একটা গল্প বলি :—আমি তখন মৈমনসিংহে practice করি। নামটা মনে রেখো,—মৈমনসিংহ। সিংহের বাচ্ছারা কখনো দুর্বল হ'তে পারে? এরা সবাই বীরপুরুষ। এরা জন্মগ্রহণ করে লাঠি সড়কি হাতে। এদের vocal cord থাকে বল্লমের ডগায়। সেখানে

থাকতে criminal caseএ হাত পাকিয়ে ছিলুম। অনেক case করিছি। তার মধ্যে একটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। একটা cut-throat case. একটা সতেরো আঠারো বৎসরের মেয়ের গলায় কে ছুরি বসিয়েছিল। বেশ ভাল ক'রেই বসিয়েছিল। কিন্তু কে যে সেই বীরপুরুষ তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। মেয়েটা যখন হাঁসপাতাল থেকে ফিরলো, তখন তার ক্ষত সম্পূর্ণ সারে নি। গলার একটা ছেঁদা দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যায়,—মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। যা হোক, ইসারা ক'রেও ত সে কিছু সন্ধান দিতে পারতো। তা দেয়নি। তাকে অনেক জেরা করা হ'ল,—'তুমি নিজে করেছ?' 'তোমার স্বামী করেছে?' 'আর কেউ করেছে?' সে 'হাঁ'ও বলে না 'না'ও বলে না। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রৈল।

পুলিস স্বামীটাকে ধরেছিল আসামী ব'লে। আর আমি ছিলুম, আসামী পক্ষের উকীল।

উকীল হ'লে সাক্ষীসাবুদ সামলে নিতে হয়। আমিও সে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু মেয়েটাকে তৈরী ক'রে নিতে পারলুম না। আমার সমস্ত সাধ্যসাধনা পণ্ড করে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রৈল। এবং শেষে একদিন আকুল হয়ে কেঁদে আমার বুকের ওপর লতিয়ে পড়লো। হিতোপদেশ পড়া থাকলে বুঝতে পারতুম, মেয়েটার মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু তুমি জান, I hate all শাস্ত্রs all অনুষ্টুভ, তাই অনুমান করলুম সে হয় ত আমার আশ্রয় ভিক্ষা করচে। কিন্তু এই রকম ক'রে আশ্রয় ভিক্ষা করা! বিশেষতঃ স্বামীর সাক্ষাতে! বল কি? ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল যে! কাজেই আমি জোর ক'রে তাকে সরিয়ে দিলুম। এবং খুব আল্‌তো আল্‌তো পিঠ চাপড়ে বল্লুম, 'ভয় নেই, তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দোবো।'

স্বামী তখন পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। করবেন কি? ও দৃশ্য দেখে সংযত হয়ে থাকা ত পুরুষের কাজ নয়। এদিকে অসংযত হ'লেও স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা।

তোমাকে বলবো কি? বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল। আমি ত সান্ত্বনা দিলুম, 'স্বামীকে বাঁচিয়ে দোবো।' কিন্তু সে কি এই আকুল আবেদন জানালে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য, না স্বামীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য? কেমন সন্দেহ হ'ল স্বামীটাই খুনী। গলায় ক্ষতটা দেখলে ত suicidal ব'লে মনে হয় না।—দুটো তিনটে আঁচড়, আর একটা deep cut. একটা সতেরো বছরের মেয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য এতটা চেষ্টা করেছে? অসম্ভব! এ নিশ্চয় ঐ স্বামীটার কাজ। স্বামী ব'লেই তাকে ধরিয়ে দিতে পাবেনি। কেন না, সেই স্বামীর কাছেই আবার ফিরতে হতে পারে। Out of love!— কি বল?

যাক্। এ সব চিন্তা করা আমার কাজ নয়। I was paid to save the husband, and save him I did.

—অবাক্ হ'লে? অবাক্ হবার কি আছে? বাঁচাতে পারি, তাই বাঁচালাম। মেয়েটা এখনও হয়ত নিঃশব্দে তার পতি-দেবতার বন্দনা মেজে চলেছে।

—অনুতাপ?—Man, this was the one sacred act of my life! স্বামীটাকে মেরে ফেললে কি সুবিধে হত শুনি?—পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা?—A cut-throat husband is safer. খেয়ে পরে বাঁচতে হ'লে a woman must sale her body,—to one man, or to many Tracheotomy tube-পরা মেয়ের কোন খদ্দের নেই। Let her go to the only available market,—the husband—হ্যাঁ, দাদা-খুড়োর ঘাড়ে চেপে অনেকে থাকে জানি,—আব আঁচিলের মত। তাকে থাকা বলে না। তার দুঃখ—ও! তুমি বলচ দুঃখ কিছু কিছু থাকবেই সংসারে। তোমরা মহাপুরুষ এ কথা বলতে পার। তোমাদের বড় বড় মনের engineএর তলায় মানুষ গরু মাড়িয়ে চ'লে যেতে পার,—with colossal unconcern. আমি তা পারি না। আমি ক্ষুদ্র জীব,—bicycle নিয়ে কারবার,- -একটা কুকুরছানার গায়ে আঘাত লাগলে একেবারে কাৎ হয়ে পড়ি।—ঐ নির্বাক্ মেয়েটার দু ফোঁটা চোখের জলের

মধ্যে আমার সমস্ত সৌরজগৎ নীহারিকায় মিলিয়ে যায়। ঐ একটি মানুষের জন্য I would like to break and remake your God.

চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে হে।

২

চার হাজার বৎসরের জীর্ণ কঙ্কাল তোমরা। শান্তি ছাড়া বাঁচতে পার না। Convenience is your fetish. গালে চড় খেয়ে হজম কর, পাছে উত্তর দিলে শান্তি ভঙ্গ হয়! দেশের অর্ধেক মানুষকে আসন বাসনের মত ব্যবহার কর, এবং দিন রাত প্রার্থনা কর তারা যেন মুখ ফুটে কিছু না বলে। বললে শান্তিভঙ্গ হবে যে! I hate your শান্তি। I want a few সন্দীপs যারা ওদের শক্ত মুঠোয় তোমাদের শান্তির জগদ্দল গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবে।—By the way, here is a culpable homicide. I mean, the slaughter of সন্দীপ by রবীন্দ্রনাথ। নিখিলেশ বলে, 'আমি সন্দীপকে শ্রদ্ধা করি।' নিখিলেশ was a fool,—or a hypocrite, রবিবাবুর সন্দীপ মোটেই শ্রদ্ধেয় নয়। His সন্দীপ is cramped, crippled, curious. He is neither flesh nor fowl.

I want my সন্দীপs without the shackles of a showman. আমি সেই সন্দীপের কামনা করি, যে প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে জানে, প্রবলভাবে গ্রহণ করতে জানে। বিশ্বকে যে জয় করবে বাহুর বলে, বাক্যের বলে, মনের বলে;—কোন ছলে নয়, কোন কৌশলে নয়, কোন ফিকির-ফন্দীর আড়ালে আবড়ালে থেকে নয়। বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে যে সম্মুখ যুদ্ধে এগিয়ে আসবে; এবং যার দীপ্ত কটাক্ষের তেজে—

'Like a burning scroll
Will heaven and earth together roll'

শান্তি! your epics have been written by blockheads. বেচারাদের যদি একটু imagination থাকতো দেখতে পেত যে নরকের একমাত্র উপাদান হচ্চে শান্তি। এই rolling rumbling universe এর প্রতি অণুপরমাণু যখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপচে, তখন নরকে বাসিন্দারা আছে একেবারে নিস্পন্দ। বিশ্বের বুক ফেটে তপ্ত রক্ত উছলে পড়চে। তারা অপলক নেত্রে দাঁড়িয়ে দেখবে। হাতটি পর্যন্ত নাড়তে পাবে না। এর কাছে তোমার hell fire is a mere ফুলঝুরি।

একটা ছোট্ট গল্প বলি ঃ—একদিন বাইরের ঘরে ব'সে আছি। একটা ১২/১৪ বছরের ছেলে এসে বললে, 'বাবু, চাকর রাখবেন?' বেশ ভদ্র চেহারা। দেখলে intelligent ব'লে মনে হয়। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় চাকির করতিস?' সে বললে 'এক জায়গায় করতুম। তারা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'কেন?'

'তাদের আর দরকার নেই।'

'তোর আছে কে?'

'বাড়িতে মা আছে।'

কেমন দয়া হ'ল আমি আর খবরাখবরি না ক'রে তখনি তাকে engage কর্‌লুম। He was a very good servant. The best I ever had. কিন্তু টিকলো না।

একদিন ঠাকুর এসে বললে, 'বাবু, ও লোকটা মুসলমান। ও রান্নাঘরে ঢুকতে চায় না।' আমি ছোকরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম। 'কিরে, তুই মুসলমান?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে রান্নাঘরে ঢুকতে চাস না কেন? কি জাত তুই?'

প্রথমটা বলতে চায় না। কাতরভাবে তাকিয়ে থাকে। শেষটা স্বীকার করলে, 'আমরা

দাস।'

'নমঃশূদ্র?'

'হাঁ।'

সে যে অতি নীচ জাত সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। যে পবিত্র পাকশালায় আমার গোঁজেল ভোজপুরী মহারাজ তাঁর পবিত্র দাদ চুলকান, সেখানে যে তার প্রবেশাধিকার নেই, এটাও তার মুখস্থ হয়ে গেছে। শাস্তির আয়োজনে কোথাও কোন ত্রুটি নেই। এত বড় আয়োজন আমিই বা পণ্ড করি কেন? তাকে আর এক দণ্ড ঘরে রাখলে ঘরে বাহিরে কোথাও শান্তি থাকবে না। কাজেই তৎক্ষণাৎ তাকে বিদায় দিলুম।

—হ্যাঁ গো তাড়িয়ে দিলুম।

বেচারা কোন অপরাধ করে নি।—সত্যকথা বলা ছাড়া। সে না করুক, তার বাপ দাদা কেউ জল ঘোলা করেছে অতএব দণ্ড দিলুম।

—শোন, শোন! এখনও বাকী আছে;— the climax.

অকারণে, অকস্মাৎ এত বড় দণ্ডটা দিলুম। সে কিন্তু এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করলো না। What do you think of that? আমি বললুম, 'যা।' সেও সুড় সুড় করে চ'লে গেল। একবার ফিরে চাইল না। মাইনের টাকাটা পর্যন্ত চাইতে সাহস করলো না।

তারপর।—সে যাবে কোথায়? যেখানে যাবে সেখান থেকেই তাড়া খাবে। পরের বাড়ি সিঁধকাটা ছাড়া তার আর অন্য উপায় নেই!—Do you know,—your country is the largest manufacturing centre for crooks—

—Will you just keep quiet for a moment?

আমি বলচি বেশ্যা আর বদমাইস তৈরী করবার মত এমন কল আর কেউ কোন দেশে আবিষ্কার করে নি।

—রেখে দাও তোমার statistics! We live surrounded by rogues unhanged. তাদের সকলের পরিচয় তোমার Census Reportএ দাও না।

একটা গল্প শোন। তখন আমি ছেলেমানুষ। ব্যাপারটা তখন ভাল বুঝি নি। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি। আমাদের পাশের বাড়িতে এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে খানিকটা শুনেছি। বাকীটা নিজে দেখিছি। ব্যাপারটা এই!—

ভদ্রলোক একদিন সমাজ থেকে বেরুচ্ছেন। ফটকের কাছে এসে দেখলেন একজন স্ত্রীলোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসচে। তিনি একটু দাঁড়ালেন। স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছেই এলো। এসে বল্লে, 'আমি ভ্রষ্টা। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বড় বিপদে পড়েছি। আমার একটি মেয়ে আছে। তাকে হাসপাতালে রেখে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি বৃদ্ধ, আপনি ধার্মিক। তাই সাহস ক'রে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন। নিদেন দু' একদিনের জন্য।—'

—হাঁ গো, ভ্রষ্টা। একেবারে ভ্রষ্টা। অবাক্ কাণ্ড! একটা মানুষ সৎপথভ্রষ্ট হয়েছে! শুনেছ এমন কথা? Stone her to death, man, stone her to death!

দুঃখের বিষয় তোমরা তখন সেখানে ছিলে না। যে বৃদ্ধের কাছে সে আশ্রয় ভিক্ষা করছিল তিনি নিজে হয়ত জীবনে অনেক পাপ ক'রে থাকবেন। তাই রাগ না হয়ে তাঁর মনে হঠাৎ sympathy এসে হাজির হ'ল। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই মেয়েটিকে বাসায় নিয়ে এসে তুললেন। বাসায় এসে কিন্তু দেখলেন কাজটা ভাল হয় নি। তাঁর বাড়িতে একজনও স্ত্রীলোক ছিল না। এমন জায়গায় একজন যুবতীকে তিনি স্থান দেন কি ক'রে? লোকে বল্‌বে কি?

ভদ্রলোক বিপন্ন হ'য়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করলেন। কিন্তু এই ধর্মপ্রাণ দেশের একটি প্রাণীও একরাত্রের জন্য ঐ পাপকে প্রশ্রয় দিতে চাইল না।

বৃদ্ধের দুরবস্থা দেখে মেয়েটিও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। কোন রকম ক'রে দুদিন সে বাড়িতে কাটিয়েছিল। এ দুদিন সে ক্রমাগত চিঠি লিখেছে। এ চিঠিগুলো সে কোন্ শূন্যে পাঠিয়েছিল কে জানে? কেউ তাক নিতে এলো না। সে নিজেই চ'লে গেল।

—না। হাতে পয়সাকড়ি ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। She went out with the only capital she had,— youth. এর কিছুদিন বাদে একদিন স্কুলে যাবার পথে একটা দোকানে খাতা কিনতে গিয়ে দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি show caseএর সামনে উবু হয়ে ব'সে দোকানদারের সঙ্গে আলাপ করচে। দোকানদারটি যুবা। তাঁর রসাভাষকোমল মুখখানা দেখে পায়েস ভেজান পাটি সাপ্টা পিঠের কথা মনে প'ড়ে গেল।

এর পরে আর একদিনের কথা। ঐ মেয়ে দামী পোশাক পরিচ্ছদ প'রে একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেল।

—কোথা গেল? কোথায় গেল আবার? তোমরা সব সতীত্বের পাণ্ডারা যেখানে রাত কাটাও, সেইখানে।

—I beg your pardon! তোমাকে ও দলে ফেলতে পারি না। কারণ, আমি ডাক্তার নই। তুমিও আমার patient নও।—ওর স্বামী!—হাঁ, খবর পেয়েছি। He is an engineer in Imperial service.

—কি বললে? এমন স্বামীকে, ত্যাগ ক'রে—আচ্ছা, এমন স্বামী তোমরা টের পাও কি ক'রে? তোমরা কথায় কথায় বল, 'আহা! এমন স্ত্রীকে ত্যাগ করলে!' 'এমন স্বামীকে ছেড়ে গেল।' তোমরা কি ক'রে বোঝ বল দিকি? কাউকে ত বলতে শুনিনি কখনো, 'আহা। এমন patent leatherএর জুতো। তবু পায়ে দিলে না।' পায়ে দিচ্চে না দেখলেই বুঝতে পারি, জুতোটা বোধ হয় পায়ে হয় না।

—আমার patent leatherএর জুতো ছিল। কৈ, চামড়ার কথা ত একদিনের জন্যেও মনে পড়ে না। I was concerned with its grip and it was sickening!—স্ত্রীর কথা ভাবছি।

—যে কোন একটা loop ধ'রে টান দিলে, the whole tangle is disturbed, আমার married lifeএর কথা বলতে গেলে আরও গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়। আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।—কাজেই লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না।

এই হ'ল আমাদের দেশ। এখানে, যে সবচেয়ে মূর্খ, সেই হয় গুরুমহাশয় , যে সংস্কৃত অক্ষর চেনে না, সেই সকলকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনায়; যে কখনো একটা রুগী দেখে নি সে হয় ডাক্তার।

যাক্,—বিদ্যা না থাকলেও বাবা শ্রদ্ধা কম পান নি। তবে শ্রদ্ধায় পেট ভরে না। শুধু খাটুনি বাড়ে। যথাসাধ্য কম খেয়ে প'রে আমরা ক'টি ভাইবোন মানুষ হয়েছিলুম। আমাদের জন্য বাবার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি বলতেন, 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।' এরকম একজন থাকলে বেশ হত। Unfortunately, হঠাৎ যেদিন কয়েকখানা দেনো ছাতা, গামছা, আর কাপড়ের সম্বল রেখে তিনি মহাপ্রয়াণ কল্লেন, সেদিন দেখা গেল তাঁর এই পরম dependable মহাজনটি একেবারে ফেরার! আহার দেনেওয়ালা কোই নেই হ্যায়!

এক হাতে শালগ্রাম, আর এক হাতে মায়ের হাত ধ'রে আমি আমাদের এক যজমানের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।—জ্বলন্ত জাহাজ থেকে পালিয়ে ঝাঁপ দিলুম অকূল সমুদ্রে।

আমার ভগিনীদের গতি বাবা ক'রে গিছলেন। অর্থাৎ, তাদের ফেলে দিয়েছিলেন, জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে যেখানে হোক্। Don't want to talk about them.

সে বছর আমি entrance পরীক্ষা দোবো। বড় হয়েছি। কাজেই আমি তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াবার ভার নিলুম। আর মা ছিলেন সম্পর্কে মাসী। মাসী, please note,—

দাসী নয়। দাসী হ'লে আর এক রকম চেহারা হ'ত।

একটা পোড়ো গোয়ালঘরে আমাদের থাকতে দিয়েছিল।

—Excuse me. Beggers are choosers. ভিখারীকে একটা পয়সা দিয়ে, তারপর গালে চড় মেরে সেটা কেড়ে নিলে he has every right to ressent it—তাছাড়া আমরা ত ব'সে খাইনি। যথেষ্ট খাটিয়ে নিয়েছে।

সমস্তদিন ছেলে পড়িয়ে, রাত্রে একটু নিজের কাজ করবো, সে সময় দিত না। 'এটা কর্,' 'ওটা কর্,' এই রকম হাজার ফরমাসের মধ্যে একেবারে নিশ্ছিদ্রভাবে আটকে রাখতো। এক এক দিন সহ্য হ'ত না। বইটই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদতাম।

মার কি করে দিন কাটিত, জানি না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাও হ'ত খুব কম। দেখা করবার চেষ্টাও করতুম না।

এক ঘরে থাকতুম বটে। কিন্তু আমি ঘুমোবার পর কখন যে তিনি এসে শুতেন, আমি ওঠবার আগে কখন যে বেরিয়ে যেতেন, জানি না। তবে তিনি যে বেঁচে আছেন, তার প্রমাণ পেতুম ঘরের কোণে থালা-চাপা পান্তাভাতের গাদা দেখে। Fool of a woman! সমস্ত দিনের drudgeryর পরিবর্তে একবেলা একমুঠো কদন্ন খেতে পেত। তারির থেকে ভাগ রেখে দিত তার big bodied ছেলেটার জন্যে। ইচ্ছা করতো, সব টান মেরে ফেলে দিই! কিন্তু এমনি ক্ষুধার জ্বালা যে সামলাতে পারতুম না। গপ গপ ক'রে সেইগুলো গিলতুম।—আচ্ছা, এ কি রকম বেঁধে মারা বল ত? ঘাড়ে কয়েকটা ছেলে চাপিয়ে দেবে, অথচ তাদের পোষণ করবার উপায় রাখবে না;—হাতে পায়ে শেকল বেঁধে রাখবে, পাছে খেটে খায়। এদিকে এক পয়সার সংস্থান রেখে যাবে না!

—হাঁ, মাতৃস্নেহ নিয়ে এবার কবিত্ব আরম্ভ হবে, আমি জানি। ওটা তোমাদের খুব মুখস্থ আছে। ছেলেবেলা থেকে অনেক Essay লিখেছ। মুখস্থ আছে ব'লেই বুঝতে পার না, যে সন্তানের জন্য আত্মহারা হওয়া একটা পশুবৃত্তি। সকল জানোয়ারই ঐ রকম ক'রে থাকে। ওটা instinctive, ওটা mechanical ওর মধ্যে বাহাদুরীর কিছু নেই। সন্তানের ভালর জন্য যে এই instinct দমন করতে পাবে, সংযত হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে, তার মধ্যে তবু মনুষ্যত্ব আছে। কলেরাগ্রস্ত সন্তানের সেবায় যে মা নিজের safetyর দিকে না তাকায়, হাত ধুতে ভুলে যায়, তাকে দেখে তোমরা গদ গদ হয়ে পড়। আমি বলি, ওটা স্নেহ নয়। ওর নাম বর্বরতা।

Entranceএ Scholarship পেলুম! ভাবলুম এই degree establishment থেকে পালাই। কিন্তু রাক্ষুসী কিছুতেই আমাকে ছাড়লো না। নিজেও গেল না। আমাকেও যেতে দিল না। কাজেই দাঁতে দাঁত চেপে আরও দুবছর সেখানে কাটাতে হ'ল। তার পর স্কুলমাস্টারী নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মাকে বললুম, 'মা, তুমিও চল আমার সঙ্গে।' তিনি বললেন, 'না বাবা, তুই যা। আমি গেলে এদের বড় কষ্ট হবে।'

আমি অনেক বোঝালুম। কিন্তু বুঝবে কে? জুজুর ভয়ে যে লোক কোণ নিয়েছে তাকে কি যুক্তি দিয়ে বাইরে বার করা যায়? তাঁর যে মনে হচ্ছিল, আমার সঙ্গে গেলেই কৃতজ্ঞতা জুজুর গায়ে আঁচড় লাগবে, ধর্ম জুজুর গোসা হবে, পরলোক জুজু মুখ ভার করবে।

একাই চ'লে গেলুম, বিদেশে। তারপর একদিন wire পেলুম, আমার 'benefactor-দের self-sold বাঁদিটি আর ইহলোকে নেই। Died, or was kicked out of existence, I don't know. And I don't care to know. She is rightly served! Rightly served!

৩

—ওরে,—তামাক দিয়ে যা।

ধনীদরিদ্রে জাতিভেদ আছে। কিন্তু স্ত্রীপুরুষে ত জাতিভেদ নেই। যে বাড়িতে অন্ত্যজের মত বাস করতুম, সেই বাড়িরই একজনের হৃদয় জয় করিছিলুম,—যৌবনের আভিজাত্যে।—সে ছিল আমার ছাত্রী।

—হাঁ, novelএর মতই,—hackneyed, যাই হোক, আমি কোন active part নিই নি। আমার অত সাহসও ছিল না। It was she who made love to me. আমার মন্দ লাগতো না।—Quinine mixtureএর সঙ্গে একটু syrup,—নাই বা তাতে ঢাকা পড়লো the outstanding bitterness, যা পেলুম তাই বা ছাড়ি কেন? একটু বেশী বয়স হ'লে বুঝেসুঝে কাজ করতে পারতুম। কিন্তু তখন? In the rashness of youth I swallowed the bait and got stuck. একটু যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে সেটা প্রথম সন্দেহ করলুম যখন মা জিদ ধ'রে বসলেন ওকে বে' করবার জন্যে।

কি সর্বনাশ! বে' করবার কথা ত কখনো ভাবি নি। She was a perfect animal, and I liked her. তাই বে' করা। বল কি? কাবুলিওয়ালার জুতো জোড়ার তারিফ করিছি ব'লে সে তার দুর্গন্ধ জোব্বা শুদ্ধ আমাকে জাপটে ধরবে।

কিন্তু মা'র সঙ্গে argue করাও ত আর এক মুস্কিল! যে বোঝে—তার সঙ্গে তর্ক করা যায়। মূর্খের সঙ্গে কথা কইবে কে?

—কান্নাকাটি? না। তাঁকে কান্নাকাটি করতে দেখি নি বড়। তবে, তাঁকে যখনি দেখতুম, মনে হত যেন তাঁর জ্বর হয়েছে, যেন একটার জায়গায় দুটো sentence বলতে গেলে তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে পড়বে।—

আমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করলাম। পালালাম বটে। কিন্তু শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে মনে হ'ল মার অশৌচ পর্যন্তও বুঝি অপেক্ষা করা চলে না;—তার পূর্বেই ছুটে গিয়ে বে' ক'রে আসতে হয়। কিন্তু সংসারে টাকা আছে, ডাক্তার আছে, ধর্ম আছে, ভগবান আছে। ফাঁড়া কেটে গেল।

—হাঁ গো, ছেলে হয়েছিল। এও আবার বাংলা ক'রে বলতে হবে না কি?—ছেলেটা আছে কোথায়?—স্বর্গে।—Owner ম'রে গেলে স্ত্রীকে তার সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে চাও, ছেলের owner খুঁজে না পেলে তখনি তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দাও,—তোমরা ত বেওয়ারীশ property কিছু প'ড়ে থাকতে দাও না। কোন্ মানুষের বাঁচা উচিত, না উচিত সেটা ঠিক ক'রে দেবার একমাত্র কর্তা হচ্ছ তুমি, তোমার খুড়ো, জাঠশ্বশুর, আর নাতজামাই। তোমরাই হচ্চ ভগবানের খাশ-তালুকের বরকন্দাজ।

পেটের ছেলেটাকে খুন করা হ'ল, অতি সঙ্গোপনে। কিন্তু সে যে এসেছিল তার চিহ্ন রেখে গেল প্রসূতির সর্বাঙ্গে।

Ultimately I had to marry her. ভিখারীর ছেলে একদিন বর সেজে এসে রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে গেল। তারপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরণা করতে লাগল।

—Miserable!

—Love? বল কি হে? Love না থাকলে এমন দুর্গতি হয়? She had a fatal love. কি খাই, কি করি, কোথায় থাকি সব খুঁটিনাটির হিসাব নেবে; রাত্রে ব'সে পড়চি, ধাঁ ক'রে এসে বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেবে; পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইচি,—লোক পাঠিয়ে খেতে ডাকবে ;—'যাচ্চি' বললে শুনবে না। কোথায় থিয়েটার দেখতে একটু রাত হয়েছে। এসে দেখি জেগে ব'সে আছে, জানালার ধারে। কোথায় এক drop whiskey খেয়েছি,—অমনি চুল ছেঁড়া, মাথা কোটা,—রক্তারক্তি ব্যাপার। অসহ্য!—আমি বলি, দেখ আমি তোমার পুতুল নই। আমি মানুষ। তুমি ছাড়া আরও অনেক interest

আমার আছে। আমায় অমন ক'রে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখবার চেষ্টা কোরো না। কিন্তু— কিছু ফল হ'ল না। শেষকালে আর পারলুম না। পুঁটলি বেঁধে চালান ক'রে দিলুম বাপের বাড়িতে।

—না, আর দেখা শুনা করিনি। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দিতুম,—বাস।

—হাঁ, মৃত্যুর আগে একবার দেখা হয়েছিল। And, I cut a most sorry figure. আমাকে বলে, 'তোমার পা দুটি দাও।—আমি বুকে ক'রে মরবো।' See preposterous idea!—কত বোঝাশুম। ঈশ্বর, আত্মা, ইহকাল, পরকাল ছাই ভস্ম, মাথামুণ্ডু। But she was insistent. She caressed the feet with which I kicked her! Just think of it! The damnedest idolatry you can conceive of!

—চোখে জল এসে পড়েছে?—বাঃ!—I wonder how you worship foolishness, how you worship weakness. আমি যখন ঐ ঘটনার কথা ভাবি I feel my blood boiling with a head-hunter spirit. মানুষের ক্ষুধিত আত্মাকে যারা এমন ক'রে breadএর বদলে brickbat দিয়ে গেছে, তাদের একজনকেও আমি ক্ষমা করতে চাই না।

—সাত্ত্বিকতা। But idolatry is never সাত্ত্বিক। ইহকালে বা পরকালে সস্তায় বাজীমাৎ করবার আশায় লোকে idolatry করে। It is the most selfish thing in the world.—

—And she was inordinately selfish. জীবনে আমাকে জ্বালিয়ে গেছে; মরবার পরেও রেহাই দেয় নি। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যেন আর বিবাহ না করি।

—প্রতিজ্ঞা পালন না করলেই পারতুম?

—তুমি মনে কর সেই প্রতিজ্ঞার বশেই এতদিন অবিবাহিত রয়েছি? You are mistaken. আর বিবাহ করি নি,—because I hate woman,—because I didn't want to go through another ordeal.

—প্রতিজ্ঞা করেছিলুম কেন? তাছাড়া করবো কি? তুমি হ'লে কি করতে? তর্ক করতে?—কোন্ একটা অশান্ত শিশুকে তুষ্ট করবার জন্য কবে বলেছিলুম চাঁদ ধ'রে এনে দেবো, তাই আজ চাঁদ ধরতে ছুটবো?—

দেখ, তোমরা কথা কও, gramophoneএর মত।—No volition, no variation কবে মুখস্থ ক'রে রেখেছ, প্রতিজ্ঞা পালন করতে হয়। তা-ই আজও আউড়ে চলেছ। প্রতিজ্ঞা পালন করাই যে অন্যায় হ'তে পারে একথা আর তোমাদের মনে আসে না। মায়ের কাছেও ত প্রতিজ্ঞা করিছিলুম, 'যদি কখনও টাকা সঞ্চয় করি ত শ্মশানঘাট বাঁধিয়ে দোবো।'

—ঐ একটা ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আজ অনেক টাকা হয়েছে। একটার জায়গায় দশটা শ্মশানঘাট বাঁধাতে পারি। কিন্তু আজ যদি প্রতিজ্ঞা পালন করতে ছুটি,— don't you think it would be criminal?—To rob living people for the comforts of the dead?

—মায়ের শেষ ইচ্ছা?—ও শেষ ইচ্ছার বিশেষ কোন importance নেই। সব ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা হ'তে পারে। তা ব'লে সকলের সব ইচ্ছা পূর্ণ করা চলে না। বিবেচনা ক'রে কাজ করতে হয়। আমার শেষ ইচ্ছা ত তিনি পূর্ণ করেন নি। অনেক সাধাসাধি করিছিলুম, আমার সঙ্গে যাবার জন্য। But she was adamant.—Living peopleএরই বা কি করিছি?—কিচ্ছু করি নি। Living people খুঁজে পাচ্ছি না।—দিন কতক মাস্টারী করতুম জান! সেই সময়কার এক ছাত্রের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হয়েছিল। সে তখন এক হাঁসপাতালের House-Surgeon. জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছ?'

সে বললে, 'আমাদের আব থাকা! একটা responsible work দেয় না। কেবল dress কর, আর bandage কর!'

—আমি বললাম, 'Dressing-টাই ভাল ক'রে ক'রে যাও। একেবারে ডগায় চড়বার জন্য ব্যস্ত হও কেন? 'Whatever thy hand findeth to do, do it with all thy might.'

সে বললে, 'Sir, ওটা ত copy-book maxim. সকলকে বলতেই শুনি। কাউকে করতে দেখিনি।'

ভেবে দেখলাম, সে ঠিকই বলেছে। অমন কাজ ত কেউ করে না। And, no wonder! এই সমস্ত বাংলাদেশে একজন নাপিত নেই, যে চুল ছাঁটতে জানে; একটা দরজী নেই যে গায়ের মাপে জামা তৈরী করে, একটা ধোপা নেই যে ইস্ত্রী করতে পারে, একটা Historyর professor নেই যে Jugo Slaviaর খবর রাখে, একটা business নেই যা liquidition যাবার জন্য মুখিয়ে নেই।

—শ্রদ্ধা? না, শ্রদ্ধা আমার কারুর ওপর নেই। যে দেশে কর্মের উপাদান চিৎকার, আর ধর্মের উপাদান গিরিমাটি, যে দেশে অনুপ্রাসের নাম কবিত্ব আর কবিত্বের নাম বিজ্ঞান, হেমচন্দ্র যে দেশের কবি আর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কাব্য, বিদ্যাসাগর যে দেশে দয়ার সাগর এবং রামমোহন রায় একখানা ছবি, যে দেশে রবীন্দ্র-জগদীশ are applauded simply because they are not appreciated,—সে দেশের কিছুর ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই। I hate every thing! Every thing! Every thing!

আজকাল প্রায় শুনতে পাই, 'খদ্দরের loin cloth পর, আর অতীতে ফিরে যাও।'—আরে, যাবি কোথায়? অতীত কিছু আছে? জ্ঞানে, কর্মে, বীর্যে, পৌরুষে, কোথায় তোমরা কৃতিত্ব দেখিয়েছ? তোমাদের অতীত ত উমিচাঁদ, ভারতচন্দ্র, আর লক্ষ্মণসেন। তোমাদের গর্বের মধ্যে আছে এক ধর্ম, যার জন্য কোন সাধনা করতে হয় না, কোন পুরুষকারের দরকার হয় না, যা depends on the length of the টিকি and কচুগাঁটার মত টিকি আপনি গজায়।—ওহে, আমার ঐ টাকাটা দেশের Sanitationএর জন্য দিলে হয় হে!—Say for the prevention of Cholera,—Cholera বলতে আমার মনে পড়ে গেল, আমার বাবা Choleraয় মারা গিছলেন।—সবটা আমার বেশ মনে পড়চে, সকাল থেকেই রোগ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি কাউকে কিছু বলেন নি, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে ছিলুম। যখন বাড়িতে ফিরলাম, তখন তাঁর অবস্থা বেশ খারাপ। তবু, আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে বসলেন। একবার বললেন, 'বাবা এসেছিস'—বলতে বলতে খুব এক ঝলক বমি ক'রে প'ড়ে গেলেন। তারপর তাড়াতাড়ি ডান হাতের আঙুলে পৈতে জড়িয়ে, দু হাত এক ক'রে কপালে ঠেকাবার চেষ্টা করলেন। হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে আধা পথে উঠে এলিয়ে পড়লো।

—ও পুণ্য-টুন্য বুঝি না। নিষ্ঠা বলতে পার। হ্যাঁ, নিষ্ঠা বলতে পার।—তা নিষ্ঠা তাঁর ছিল। Whatever foolish ideas he might have had, he was honest, he was steadfast—রোজ ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতেন। তারপর খুব ভুল সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে বাড়ি ফিরতেন। প্রত্যহ তিন চার ঘন্টা ধ'রে পূজা করতেন,—in the most ridiculous language, before a most ridiculous deity; কিন্তু সেই কাজ তিনি ক'রে গেছেন মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। একবেলা আহার করতেন, কোন লোভ দেখিয়ে কেউ তাঁর এ ব্রত ভঙ্গ করতে পারেনি। রাস্তায় চলবার সময় লালা পর্যন্ত গিলতেন না, পাছে ধর্ম নষ্ট হয়। বল কি?—একাহারে, অনাহারে দিন কাটিয়েছেন। তবু ত টাকার জন্য তাঁর জাত খোয়ান নি। তাঁর পিতৃ পিতামহরাও এই রকম দরিদ্র ছিলেন। অথচ রাণী ভবানী যেদিন কাশীতে বড় বড় বাড়ি ক'রে ব্রাহ্মণদের দান করতে চাইলেন, এই বাংলা দেশের একটি ব্রাহ্মণও হাত বাড়ায় নি—to accept her bounty. Look at the strength, man, look at the strength!

—I beg your pardon! I am getting excited.—কেমন খেই হারিয়ে ফেলচি। কি বলতে যাচ্ছিলুম? হ্যাঁ—Cholera.

—মনে হচ্ছিল, যদি proper precaution নিতে জানতেন, তাহ'লে আমার বাবা হয়ত আরও কিছুকাল বাঁচতে পারতেন।

—কিন্তু বাঁচবার কি দরকার?

জীবনের যা কর্তব্য ব'লে জানতেন তা নিখুঁত ভাবে পালন ক'রে, তাঁর ভগবানের কাছে শেষ আবেদন জানিয়ে, পুত্রের সঙ্গে শেষ দেখা করে, তিনি চ'লে গেছেন। Wasn't he supremely happy? আমি আর তাঁর কি সুখ বাড়াতে পারতুম? He would not have cared for my preventive measures. তিনি বলতেন, 'জগৎটাকে ছেঁড়া চটির মত ফেলে দিয়ে চ'লে যাব।'

—ছেঁড়া চটির মতই ফেলে দিয়ে গেছেন। ছেঁড়া চটির আবার মেরামত কি হে?—গুলিয়ে ফেলচি।—I am not consistent tonight.—It is that mother of mine! That mother of mine! She has killed me.

'আমাকে একেবারে চুষে খেয়েছে। আমার মেরুমজ্জায় আর কিছু রেখে যায় নি। innate দুর্বলতায় মাঝে মাঝে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। সেদিন দেখলুম ক'টা জোয়ান ছেলে একটা বুড়ীকে তীরস্থ করতে নিয়ে যাচ্ছে। Shrivelled up old lady! মাথায় সিঁদুরের ছাপ, চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি পরান।—আমার কিন্তু দেখেই মনে হ'ল কি সুন্দর এই মুখখানি!—And, I felt so childish! রাস্তার মাঝখানে,—বললে বিশ্বাস করবে না হে,—কেঁদেই ফেললুম!—না, ভাই, আজ আর কোন কথা নেই।—হ্যাঁ,—ঐ শ্মশানঘাট বাঁধবার একটা estimate দিও!—Good night!

ভাদ্র ১৩৩৬

ব্যঙ্গ-কৌতুক

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত ও হরিপদ রায় চিত্রিত



সাম্য

কাজেই স্ত্রীরা ফেল্‌লো ছেঁটে ঘাড়ের রোঁয়া,
দু'নাক দিয়ে ছাড়্‌লো চুরুট-বিড়ির ধোঁয়া,—

Histologyর পাতায় না কি মিল্‌লো প্রমাণ,
বর্ত্তমানের Womanরা সব Manএর সমান।
কাজেই স্ত্রীরা ফেল্‌লো ছেঁটে ঘাড়ের রোঁয়া,
দু'নাক দিয়ে ছাড়্‌লো চুরুট-বিড়ির ধোঁয়া,
ভোট কুড়ালো, ফুঁড়্‌লো কলেজ,
তেল পুড়ালো টুঁড়্‌লো Knowledge,
লিখ্‌লো নভেল, লিখ্‌লো নভেল,—লিখ্‌লো নভেল।
চেনাই কঠিন নর কি নারী, আস্‌লি না ভেল্‌।
দাসীর মতন পরের বাসন মাজ্‌লো না আর,
পরের ছেলের মন ভোলাতে সাজ্‌লো না আর।
পোশাক তাদের হাঁটুর নীচেয় নাম্‌লো নাকো,
হাতার বিলোপ কাঁধার কাছেই থাম্‌লো নাকো,



পল্‌কা জুতোয় ইঞ্চিতিনেক heel, কি বাহার।

flesh-colour-এর সিল্ক্‌ মোজায়
হাল্‌কা তাদের দিল্‌কে বোঝায়,
পল্‌কা জুতোয় ইঞ্চিতিনেক heel, কি বাহার!
মরদগুলোর সঙ্গেতে গরমিল কি বা আর?
Busএর ভিড়ে লোকের ঠেলায় দুল্‌লো তারা,
Full houseএর জান্‌লা ধ'রে ঝুল্‌লো তারা,
মার্কেটেতে হাঁফিয়ে ছুটে, ঘাম ছুটিয়ে
মর্‌জি মাফিক কর্‌লো Shopping কাম চুটিয়ে,—



মার্কেটেতে হাঁফিয়ে ছুটে, ঘাম ছুটিয়ে—

কিন্‌লো বেবাক্‌ কাচ-পেয়ালা।
রঙীন পুতুল, পুঁতির মালা,
পাখীর পালক, শ্যালের লেজ আর ফুলের আরক,
স্ত্রী-পুরুষে রৈল না আর চুলের ফারক।

ত্রি-মহিমা

অমূল্যকৃষ্ণ রায়

সর্বব্যাপী বিরাট তিনের কথা কেহ একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

প্রথমেই দেখুন দ্রব্য কি প্রকার। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিভুবনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-রূপ ত্রিকালে দ্রব্য চিরদিন তিন প্রকারই রহিয়াছে ও থাকিবে—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। তিনটি আয়তনে (Three Dimensions-এ) তাহার পরিমাণ বুঝিতে হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন না—বৈজ্ঞানিকেরা এই কথা বলেন। আর পারিবেনই বা কি করিয়া? প্রণব ওঙ্কারের ওঁ-ই তো অ + উ + ম মিলিয়া ত্র্যক্ষর হইয়াছে; নারায়ণ স্বয়ং ত্রিভঙ্গ।

"কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন" পাটনির নিকট এই ব্যঙ্গোক্তি করিবার সময় দেবী ভগবতী ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, শিবের কপালে এই আগুন না জ্বলিলে তাঁহার নিজের কপালই পুড়িত। এই তৃতীয় নেত্র যাহাদের নাই, তাহারাই মদনের দাসানুদাস।

দেবাদিদেব হরিও এই তিনের জন্য জর্জরিত হইয়াছিলেন। পৌরাণিক উপাখ্যানটি এই। —হরির তিন স্ত্রী ছিলেন—লক্ষ্মী (ওরফে পদ্মা) গঙ্গা ও সরস্বতী। একদিন হরি রসাবিষ্ট হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া তির্যক হাসিলে সরস্বতী অত্যন্ত মান করেন এবং গঙ্গার কেশাকর্ষণপূর্বক কটূক্তি করেন। হরি বেগতিক বুঝিয়া পলায়ন করেন। লক্ষ্মী মধ্যস্থ হইতে চেষ্টা করিলে সরস্বতী তাঁহাকে বৃক্ষদেহ প্রাপ্ত হইতে অভিসম্পাত দেন। গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন, যেখানে পাপীরা থাকে সেইখানে তুমি নদী হইয়া থাকিবে। সরস্বতীও গঙ্গাকে অভিশাপ দিলেন, পাপীদের আবাসে তুমিও নদীরূপ গ্রহণ করিবে। (বলা বাহুল্য পাপীদের আবাস ও পাপীগণ যথাক্রমে ভারতভূমি ও ভারতবাসী) 'পরিস্থিতি' ক্রমশ জটিল ও গুরুতর হইতেছে দেখিয়া হরি পুনরায় আবির্ভূত হইলেন এবং আক্ষেপোক্তি করিলেন ঃ—

"তিস্রো ভার্যাস্ত্রি শালাশ্চ ত্রয়ো ভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ ন হ্যেতি মঙ্গলপ্রদাঃ।।"

অর্থাৎ তিনটি পত্নী, তিনটি গৃহ, তিনটি ভৃত্য ও তিনটি বন্ধু থাকা মঙ্গলপ্রদ নহে। ইহা বেদ-বিরুদ্ধ।

ধর্মসাহিত্যে ও অর্চনায় তিনটি সংস্কৃত কথার সমাবেশের প্রভাব যে কত বেশি, তাহা আমরা আবহমানকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছি, যথা—"শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্", "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্", "রসো বৈ সঃ", "ওঁ তৎ সৎ" ইত্যাদি। এরূপ বহু আছে।

পালি ভাষায় বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা গ্রন্থাকারে তিনটি "পিটকে" (অর্থাৎ ঝুড়িতে) রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম-পুস্তকের নাম "ত্রিপিটক"। বুদ্ধের সার বাণী তিনটি—অহিংসা প্রেম ও মৈত্রী। জন্ম মৃত্যু বিবাহ তিনটিই মানুষের কর্তৃত্বের বাহিরে বলিয়া মানুষের বিশ্বাস।

ত্র্যহস্পর্শের (বা তিনটি তিথির সংযোগ) জন্য নিষিদ্ধ যাত্রা অতিক্রম করিয়া যদি তীর্থে বাহির হইয়া পড়িতে পারেন, তবে সেখানে ত্রিরাত্রি বাসের ব্যবস্থা আছে। প্রথম রাত্রি রেলগাড়ির বা অন্য যানের ঝাঁকানি-জনিত শরীরের বেদনা সারাইতে কাটিয়া যায়; দ্বিতীয় রাত্রি কাটে ঠাকুর-দেবতা দেখিবার জন্য সমস্ত দিন হাঁটাহাঁটিতে পদযুগলে যে ব্যথা হয় তাহার ঔষধস্বরূপ নিদ্রার প্রলেপ দিতে; তৃতীয় রাত্রি, অন্তত সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, অন্যত্র যাইবার প্রোগ্রাম আলোচনা করিতে ও বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধিতে বা ডেরাডাণ্ডা

তুলিতে কাটে। অতএব, দেখিতেছেন যে ত্রিরাত্রি বাসের প্রয়োজন তীর্থে কত বেশি।

এই তো গেল তীর্থের কথা। তীর্থ করা মহা পুণ্য। ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু পাপ তো সকলেই করেন। কুবৃত্তে কো ন পণ্ডিতঃ। জানেন কি যে পাপও তিন প্রকার—মহাপাতক অতিপাতক ও উপপাতক। ইহা শুনিয়া যদি মনে পরিতাপ হয় আর তিনকুলে যদি কেহ না থাকে, তবে ত্রিকূটপর্বতচারী কোনও ত্রিকালদর্শী সাধুর নিকট গিয়া বলিবেন, প্রভো, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের মধ্যে আমার মধ্যে শেষোক্তটিই অতি প্রবল। তমোনাশ করিয়া দাও, দয়াময়! আমার ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন দুঃখ হরণ কর। ত্রিদণ্ডের মধ্যে বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড বা কায়দণ্ড যাহাই দিবে, তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইব।

বলিবেন, ইহা পারিব না। আমরা গৃহী, তিনকুলে সকলেই বর্তমান এবং বর্তমান অবস্থায় ত্রিকূট পর্বতেও যাইতে পারিব না। বেশ। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পড়ুন। ত্রয়ী (অর্থাৎ তিন বেদ—সাম, ঋক্ ও যজু। ঋগ্বেদ-অনুবাদক উইলসন সাহেব ও অন্যান্য পণ্ডিতদেব মতে অথর্ব বেদ নহে) মুখে থাকিত বলিয়া পূর্বে ব্রাহ্মণের নাম ত্রয়ীমুখ ছিল। এখন মুখে থাকা তো দূরের কথা, গৃহেও একখানা বেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অথচ ত্রিবেদী তেওয়ারী ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান রাহিয়াই গিয়াছে। বিষয়, ধন ও আভিজাত্য এই ত্রিমদে কলির ব্রাহ্মণ মত্ত ; ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকও অনেকে করেন না।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখিবেন তিনটি ডাকিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন শেক্‌স্‌পীয়ার। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ Cuckoo-কে তিনবার স্বাগত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বহু। ভাব-ভাষা-ছন্দ কাব্যের প্রধান তিনটি উপাদান ছাড়িয়া সরসীলাল সরকার মহাশয় 'রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা' করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া স্থানীয় উদাহরণ লউন—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দের "ত্রয়ী" নাটিকা ও "বনফুলে"র "ত্রি" নামক তিন লাইনের কবিতাবলী। ত্রিপদী ছন্দের কথা তো সকলেই জানেন।

প্রাথমিক রং তিনটি—লাল, সবুজ ও বেগুনি। Union Jack ও কংগ্রেসী জাতীয় পতাকাতে তিনটি করিয়া রং আছে। ত্রিবর্ণের পতাকা আরও আছে বা ছিল—United States, France, Germany, Russia, Italy, Austria-Hungary, Netherland, Belgium, Norway, Rumania, Bulgaria, Servia, Brazil ও Chile-র।

গ্রীক "ট্রাইস"(TREIS) ; ল্যাটিন "ট্রেস" (TRES) ; জার্মান "ত্রাই" (TRI) ; ইংরেজী "থ্রি", সংস্কৃত "ত্রি" ও আমাদের "তিন"—সবই এক। Romain Triumvirate এখন এদেশে হইয়াছে—কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মোস্লেম লীগ।

মুসলমান স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবার সময় তিনবার বলে—তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম। নতুবা পত্নীত্যাগে আইনের খোঁচা একটু থাকিয়া যায়। নিলাম শেষ হয় তৃতীয় বার হাতুড়ি ঠুকিবার পর। তিন বৎসরের পর বহু স্বত্ব ও অধিকার তামাদি দ্বারা বারিত হইয়া যায়।

সমাজেও দেখুন স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক অথবা প্রেমিকা লইয়া Eternal Triangle-এর সৃষ্টি হয়। এই চিরন্তন ত্রিভুজের আকর্ষণে নর-নারী এ-ভুজে ও-ভুজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে কবে কাহার ভুজে আবদ্ধ হইবে তাহা ত্রৈরাশিক নিয়মেও জানা যায় না। বলা বাহুল্য, এই ত্রিকোণ-শক্তিতে তৃতীয়-প্রকৃতির (অর্থাৎ ক্লীবের) কোন স্থান নাই। সকলকেই 'ঘরে-বাইরের' সন্দীপ হইতে হইবে।

সমাজে থাকিতে গেলে খাওয়াইতেও হয়। অনেকে শুধু খাইতেই জানেন, খাওয়াইতে জানেন না। পোলাওয়ের আক্‌নির জলে ত্রিজাতক (অর্থাৎ জৈত্রী, এলাচ ও তেজপাতা) সিদ্ধ করিলে সেই পোলাও খাইয়া ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, যে জাতিই হউক না কেন, পরিতুষ্ট হয়। তবে বেশি পোলাও খাইলে কণ্ঠ ও উদরের মাংসে সঙ্কোচজনিত ত্রিবলী

রেখাত্রয় অতিশয় পরিস্ফুট হইবে, মেদাধিক্য হইবে, পীড়া হইবে। তখন ঔষধ খাইতে হইবে। আজকাল বাজারে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া শক্ত; সুতরাং হোমিওপ্যাথিক ঔষধই খাইতে হইবে। দেখিবেন মহাত্মা হানিম্যানও তিনকে ছাড়েন নাই। ঔষধের তৃতীয় ডাইলিউশনে রোগ সারিবে, কিন্তু দ্বিতীয় বা চতুর্থ ডাইলিউশনে হয় কিছু হইবে না, না হয় হিতে বিপরীত হইবে; বাত-পিত্ত-কফ ত্রিদোষ বাড়িয়া যাইবে, তখন হোমিওপ্যাথিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কবিরাজীত্রিকটু—শুঁঠ-পিপুল-মরিচ অথবা ত্রিফলা—হরীতকী আমলকী-বহেড়া, ঘৃত-মধু-শর্করা এই ত্রিমধুর সহিত মাড়িয়া খাইতে হইবে। অসুস্থ অবস্থায় অনেকে নিশিডাক শুনেন। গভীর রাত্রে নাম ধরিয়া কেহ যদি তিনবার ডাকে তিনবারের একবারও সাড়া দিবেন না, চতুর্থ ডাকের পর সাড়া দিবেন। যাঁহারা তন্ত্রের বা spiritualism-এর A.B.C. পর্যন্ত জানেন না, তাঁহারাই এই কথায় হাসিবেন। প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষা পাস করিলেই যে পার্থিব অপার্থিব সব কিছু জানিয়া ফেলিবেন—ইহা মনে করিবেন না।

খেলাধূলাতেও তিনের প্রভাব কম নহে। One-Two-Three বলিলে এবং তিন বলিবার পর ছেলেমেয়েরা দৌড়ায়। জিতিলে থ্রি-চিয়ার্স দেয়। ফ্লাস নামক তাসের জুয়াতে তিনটি একপ্রকার তাস পাওয়াই Trio বা চূড়ান্ত জিত। ঘোড়দৌড়ে প্রথম তিনটি ঘোড়ার টিকিট কিনিতে না পারিলে টাকা জলে গেল। রেলগাড়িতেও পূর্বে ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড—এই তিনটি ক্লাস ছিল। অসচ্ছল অবস্থায় মানী ব্যক্তিদের জন্যই (অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য) মধ্যম শ্রেণীর সৃষ্টি পরে হইয়াছিল মাত্র।

উদারা-মুদারা-তারা এই তিন সপ্তকে ওড়ব, খাড়ব, ও সম্পূর্ণ এই তিন প্রকার রাগ-রাগিণী সুর-তাল-লয় সংযোগে শুরু হয়, কিন্তু সারা হয় সাধারণত ত্রিতালের তেহাইতে।

তিন সত্যি, তে-কাঠা, তেকোনা, তে-পায়া, তে-মাথা, তে-মোহানা আপনারা সকলেই জানেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে একটা কথা শুনিবেন, আজকাল ত্রিপান্তর মাঠের ত্রিসীমানাতেও যাইবেন না। A.R.P.-র নির্দেশ।

ত্রিমূর্তির কল্পনা হিন্দু ও খ্রীষ্ট উভয় ধর্মেই আছে। হিন্দুমতে কালী, তারা ও ত্রিপুরা—এই তিন দেবী ত্রিশক্তি। বাইবেলের মতে ভগবানের তিন রূপ—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। হিন্দুমতে জগৎ-পালন কাজটা দেবগণ ভাগ করিয়া লইয়াছেন। সৃষ্টি ও স্থিতির জন্য দুই জনের আপিস দরকার। মহেশ্বরের আপিস শ্মশানেই। সম্প্রতি তাঁহার কাজ খুব বাড়িয়াছে। তাঁহার ডিপার্টমেন্টেও আবার তিনটা সেকশন—খণ্ডপ্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ই এখন প্রবল।*

মাঘ ১৩৪৯

তামাক ও বড়-তামাক

পরশুরাম

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই, যে মানুষ নেশা করিতে শিখিয়াছে, জন্তু শেখে নাই। বিড়াল দুধ মাছ খায়, অভাবে পড়িলে হাঁড়ি খায়, ঔষধার্থে ঘাস খায়, কিন্তু তাকে তামাকের পাতা বা গাঁজার জটা চিবাইতে কেউ দেখে নাই। মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, ঘর-সংসার পাতে, জীবন-ধারণের জন্য যা-কিছু আবশ্যক সমস্তই সাধ্যমত সংগ্রহ করে, কিন্তু এতেই তার তৃপ্তি হয় না—সে একটু নেশাও চায়। অবশ্য, গম্ভীর-প্রকৃতি হিসাবী লোকের কথা আলাদা। তাঁদের কাছে নেশা মাত্রই অনাবশ্যক; কারণ, তাতে দেহের পুষ্টি হয় না, জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে অপকারই হয়। তথাপি বহু লোক কোনো অজ্ঞাত অভাব মিটাইবার জন্য নেশার শরণাপন্ন হয়।

নেশা বহু প্রকার, যথা তামাক গাঁজা মদ সঙ্গীত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি। সকলগুলির চর্চার স্থান এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় নাই, সুতরাং তামাক ও গাঁজা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দুক জুটিয়াছে। তামাক খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়, বুদ্ধি জড় হয়, হৃৎপিণ্ড দূষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? জগতের আবাল-বৃদ্ধ তামাকের সেবক, বনিতারাও হইয়া উঠিতেছেন। তামাকের বিরুদ্ধে যে-সব ভীষণ অভিযোগ শোনা যায়, তামাক-খোর তার খণ্ডনের কোনো প্রয়াসই করে না, শুধু একটু হাসে ও নির্বিকার-চিত্তে টানে। কিন্তু তাদের অন্তরে যে জবাব অস্ফুট হইয়া আছে, আমরা তার কতকটা আন্দাজ করিতে পারি।—মশায়, তামাক জিনিসটা স্বাস্থ্যের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যই কি সব চেয়ে বড়? একটু না হয় ক্ষুধা কমিল, চেহারায় পাক ধরিল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিল—কিন্তু আনন্দটা কি কিছুই নয়? মোটের উপর লাভটাই আমাদের বেশি। লোকসানের মাত্রা যদি বেশি হইত, তবে আপনিই আমরা ছাড়িয়া দিতাম, উপদেশের অপেক্ষা রাখিতাম না। আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে, ভদ্র-সমাজে কেউ আমাদের অবজ্ঞা করে না। হাঁ, কোনো কোনো অর্বাচীনের তামাক খাইলে মাথা ঘোরে তা মানি; কিন্তু দু-এক জনের দুর্বলতার জন্য আমরা এত লোক কেন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব?

এই সময় গঞ্জিকাসেবীর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা গেল—ভায়া, আমরাও আছি। আমাদের তরফেও কিছু বল।

তামাক-খোর ধমক দিয়া বলেন—দূর হ লক্ষ্মীছাড়া গেঁজেল! তোদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

গাঁজা-খোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—সে কি দাদা? তোমাতে আমাতে ত কেবল মাত্রার তফাৎ। তুমি খাও তামাক, আমি খাই বড়-তামাক। তোমরা সৌখিন বড়লোক, তাই বিস্তর আড়ম্বর,—রুপার ফরসি, জরিদার সটকা, সোনার সিগারেট-কেস, কলের চকমকি। আমরা গরীব, তাই তুচ্ছ সরঞ্জামের বড়-বড় নাম রাখিয়াই সখ মিটাই। গাঁজা কাটিবার ছুরিকে বলি রতন-কাটারি, কাঠের পিঁড়িকে বলি প্রেম-তক্তি, ধোঁয়া ছাঁকিবার ভিজা ন্যাতাকে বলি জামিয়ার, গাঁজা ডলিবার সময় মন্ত্র বলি—বোম্ শঙ্কর কঙ্কড় কি ভোলা! আমাদের নেশার আয়োজনেই কত কাব্য-রস,—তোমরা ত পরের প্রস্তুত জিনিস টানিয়াই খালাস। আর, আনন্দের কথা যদি ধর, তবে তোমরা বহু পশ্চাতে। ভুরিতানন্দ জানো? আমরা তাই

উপভোগ করি। স্বাস্থ্য? তার জবাব ত তোমরা নিজেরাই দিয়াছ। আমরা স্বাস্থ্যের উপর একটু বেশি অত্যাচার করি বটে, কিন্তু আনন্দটি কেমন? না হয় গলাটা একটু কর্কশ হইল, চোখ একটু লাল হইল, চেহারাটা একটু চোয়াড়ে হইল, কিন্তু মোটের উপর শরীর মন ঠিকই আছে।

হিসাবী সমাজ-হিতৈষী দুইতরফের কথা শুনিয়া বলিলেন—তোমাদের বচসা মিটানো বড়ই শক্ত কাজ। আমি বলি কি—তোমরা দু-দলই বদ অভ্যাস ত্যাগ কর। সরবৎ খাও, ভাল ভাল জিনিস খাও—যাতে গায়ে গত্তি লাগে, যথা লুচি-মণ্ডা। প্রকৃত আনন্দ তাতেই আছে।

তামাক-খোর বলিলেন—সরবৎ খুব স্নিগ্ধ, লুচি-মণ্ডাও খুব পুষ্টিকর, সুবিধা পাইলেই আমরা তা খাই। কিন্তু এ সব জিনিসে আত্মা তৃপ্ত হয় না, আড্ডা জমে না। কিঞ্চিৎ নেশার চর্চা না করিলে মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময় অসম্ভব। তামাক অবশ্য চাই, এইটিই নিরীহ প্রকাশ্য নেশা, আর সব নেশা অপ্রকাশ্য।

গাঁজা-খোর বলিলেন—ঠিক কথা। নেশা চাই বই কি, কিন্তু গাঁজাই পরাকাষ্ঠা। তোমাদের পাঁচ জনের উৎসাহ পাইলেই আমরা ভদ্র সমাজে চালাইয়া দিতে পারি।

সমাজ-হিতৈষী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—তাই ত, বড় মুস্কিলের কথা। দেখিতেছি তোমরা কেউ-ই ধোঁয়া না টানিলে বাঁচিবে না। আচ্ছা, অক্সিজেন শুঁকিলে চলে না?

তামাক-খোর গাঁজা-খোর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সমস্বরে কহিলেন—আজ্ঞে, ওটা অন্তিম কালে, হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছু সাকার সুগন্ধি সুস্বাদ মনোহারী ধোঁয়ার ফরমাস করুন।

হিতৈষী নাচার হইয়া বলিলেন—তবে ঐ তামাক অবধি বরাদ্দ রহিল। তার উপর আর উঠিও না, ঐখানেই গণ্ডি টানিলাম।

গাঁজা-খোর অট্টহাস্যে বলিলেন—খুব বুদ্ধি আপনার! নেশার তত্ত্ব আপনি কিছুই বোঝেন না। ঐ তামাকই ত একটু একটু করিয়া বেমালুম ভাবে গাঁজায় পরিণত হইয়াছে—তামাক-তামা-তাজা-গাঁজা। 'মৌচাক'এর শিশু পাঠকরাও এই তত্ত্ব জানে। কোথায় গণ্ডি টানিবেন?

সমাজ-হিতৈষী মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন—তবে মর তোমরা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা। দিন কতক যাক, তারপর বুঝিব কার পরমায়ু কত কাল।

পৌষ ১৩৩৪

সাহিত্য-সংস্কার

পরশুরাম

সব দিকে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়াছে, মিস মেয়ো অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, স্টেট্‌স্‌ম্যান বর্জন ও ইংলিশম্যানের অর্জন জোরে চলিতেছে, রিফর্ম কমিশনও নিশ্চয় বয়কট হইবে। কিন্তু আসল কাজই বাকি রহিয়াছে,—খুড়ার গঙ্গা-যাত্রা।

সজ্ঞানে তীরস্থ করাব উপযোগী খুড়া পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু বিস্তর লেখক আছেন, ছোট বড় মাঝারি,—তাঁদের দুরস্ত করাই এখন মস্ত কাজ। লেখকগণের নিজের চরিত্র সংশোধনেব কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার চরিত্র, তারা কি বলে কি করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়।

গীতায় ভগবান একটি খাঁটি কথা বলিয়া গেছেন—কিং কর্ম কিং অকর্মেতি কবয়োতপাত্র মোহিতাঃ—অর্থাৎ, কি কর্ম আব কি অকর্ম সে বিষয়ে কবিদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই কাণ্ড-জ্ঞানের অভাবে যে সব অনর্থ ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে তার প্রতিকার আবশ্যক। আমাদের প্রথম কর্তব্য—বড় বড় লেখকগণ যা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্তব্য—ভবিষ্যতে যাঁরা লিখিবেন তাঁদের জন্য একটা আদর্শ-নির্দেশ।

ছোটো-খাটো লেখকগণ ধর্তব্য নন, কারণ তাঁদের লেখা কালক্রমে আপনিই মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁরা সম্রাট, তাঁদের লেখা আবশ্যক মত সংস্কাব করা অবশ্য কর্তব্য। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা দূরে থাক তাঁর গানের সুরেও কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চান না। যদি সত্য হয় তবে দুঃখের বিষয়। স্টিফেনসন প্রথমে যে রেলগাড়ির এঞ্জিন সৃষ্টি কবেন তার চিম্‌নি ছিল চার হাত, হেলিয়া দুলিয়া কোনো গতিকে গজেন্দ্রগমনে ঘন্টায় পাঁচ-দশ মাইল চলিত। আর এখনকার পঞ্জাব বম্বে মেলের এঞ্জিন দেখ, কি পরিবর্তন। কিন্তু স্টিফেনসনের মর্যাদা কিছুই কমে নাই। যদি ববীন্দ্রনাথের বাউলের সুর ওস্তাদ পরম্পরায় সংস্কৃত হইয়া বাগেশ্রী-চৌতালে পরিণত হয়, তবে তাঁর ক্ষুণ্ণ হওয়া অনুচিত, কারণ ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। যদি কোন দক্ষ ব্যক্তি গোরার উন্নত সংস্করণে পরেশ-বাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে পানুবাবুর বিবাহ দেয়, তবে দেখিতে শুনিতে ভালই হয়। অধিকন্তু, যদি বেল-লাইনের উপরেই সানাই বাজাইয়া মোটর চালানো যায়, অর্থাৎ নরেশচন্দ্রের কমলের সঙ্গে যদি শরৎচন্দ্রেব কিরণময়ীর শুভবিবাহ সংঘটিত হয় এবং তদুপলক্ষে যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চকারভর্তি সাহেব সঙ্গীত রচনা করেন, তবে মস্ত একটা সামাজিক সমস্যাব সমাধান হইয়া যায়। এই উপায়ে প্রবীণ নবীন সমস্ত বড় বড় লেখকদের রচনা অদল বদল করিয়া ছাঁটিয়া তালি দিয়া নির্দোষ চিরস্থায়ী সাহিত্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

আমাদেব দ্বিতীয় কর্তব্য—ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ নির্দেশ। এই আদর্শ এমন হওয়া চাই যাতে আর্ট ও সমাজ দুই-ই বজায় থাকে।

আর্ট কি? এক কথায় বলা যাইতে পাবে—যা ভাল লাগে তাই আর্টের অঙ্গ বা রস-বস্তু, এবং তা ভদ্র-জনের মুখরোচক করিয়া পরিবেশন কবাই আর্ট। অবশ্য একই বস্তু সকলের ভাল না লাগিতে পারে, অতএব আর্টের সৃষ্টি ও উপভোগ কতকটা ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন জিনিস অনেক আছে যা অনেকেরই ভাল লাগে কেবল মাত্রার তারতম্য লইয়াই বিবাদ।

সকলেই বলে—দুধ অতি উপাদেয় বস্তু, কিন্তু কেউ ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া খায়, কেউ একটু-আধটু খায়। পেঁয়াজের দুর্গন্ধ প্রসিদ্ধ, অথচ মাত্রা-ভেদে ভদ্র-অভদ্র অনেকেরই রুচিকর। অতএব দুধ ও পেঁয়াজ দুই অপরিহার্য রসবস্তু। তথাপি, সমাজ মনে করে—দুধ যত খাওয়া যায় ততই বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু পেঁয়াজ বেশি মাত্রায় বিকট। তাই আমরা গতানুগতিক ভাবে দুধ-খোরকে বলি সাত্ত্বিক, পেঁয়াজ-খোরকে বলি নেড়ে। ইহা অন্ধ সমাজের কথা, আমাদের অন্তরের কথা নয়। দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রীতির কথা শুনিতে আমাদের বেশ ভাল লাগে তা অবশ্য মানি; কিন্তু কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, খুনোখুনি ব্যভিচার, নরমাংস নারীমাংস—এ সকলও উপযুক্ত অনুপানের সহিত কম উপভোগ্য নয়।

সর্বভুক্‌ পাঠক হাঁ করিয়া আছে, ওস্তাদ রসস্রষ্টা কাহাকেও বঞ্চিত করিতে, কিছুই বাদ দিতে পারেন না। তিনি শান্ত করুণ রসের স্রোত বহাইবেন, আবার ষড়রিপুর বিচিত্র খেলা দেখাইয়াও তাক্‌ লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিবেন কোন্‌ উপায়ে? পূর্বাচার্যগণ তাহা দেখাইয়া গেছেন। ভারতচন্দ্র পায়সান্ন পরিবেশনের সঙ্গে কালীনামের গরম মশলা দিয়া সুঁট্‌কী মাছ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগে তাহা চলিবে না, কারণ উক্ত মাছের নূতনত্ব নাই, কালীনামেরও আর তেমন হজম করাইবার ক্ষমতা নাই। মনীষী রেনল্ড্‌স্‌ ও তাঁর ভারতীয় শিষ্যগণ উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁরা যথাসাধ্য আর্টের কেরামতি করিয়া অবশেষে দেখাইয়াছেন ধর্মের জয়, অধর্মের নয়। ইহাই নিন্দুকের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। এখন আর্টের সীমা আরো বর্ধিত হইয়াছে, প্রাচীন লেখকগণ যা স্বপ্নেও ভাবেন নাই এমন নব নব রসবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে,—আলকাতারা হইতে স্যাকারিন্‌, বানরের অঙ্গে নব যৌবনের গ্রন্থি, ছাগলের মনের গোপন কোণে উদ্দাম প্রেমের আদি-ধারা। কিছুই বাদ দিবার দরকার নাই, যা কিছু ব্যাপার হইয়া থাকে বা ঘটিতে পারে তা-ই আর্টের গণ্ডীতে পড়ে। কিন্তু শেষ পরীক্ষা চাই। যতই ইচ্ছা নরক মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধার কর, কিন্তু উপসংহারে সমস্ত পাপাত্মার নাক কাটিয়া দাও।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব, কিন্তু প্লট মনে আসিতেছে না। পরের প্লট যে আত্মসাৎ করিব তার যো নাই,—আজকালকার ছোকরারা অতি চালাক, রুশিয়া হইতে চুরি করিলেও ধরিয়া ফেলিবে। এতএব ঋণ স্বীকার করিয়াই চন্দ্রশেখর হইতে দু-একটি চরিত্র লইব। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে মন্দ আঁকেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্তটা বেশী হইয়াছে,—আজকাল অত না হইলেও চলে। কিন্তু আধুনিক আর্টের ব্যাপ্তি না জানায় প্রতাপকে তিনি একবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রতাপের চরিত্র আমূল সংশোধিত করিয়া কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি।—

প্রতাপ রায় মরে নাই। ঘা সারিবামাত্র সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আসিয়া হাঁকিল—ভট্‌চায, ও ভট্‌চায।

চন্দ্রশেখর নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিয়া বলিলেন—কে ও, প্রতাপ যে। বেশ সেরেচো বাবা?

প্রতাপ একটি তাড়ি-রঙের ধুতির উপর তাড়ির ভাঁড়ের রঙের মেরজাই পরিয়া আসিয়াছে। তার চোখ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টলিতে টলিতে বলিল—শৈবলিনীকে ডেকে দিন।

চন্দ্রশেখর মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—নাই বা দেখা কর্‌লে।

—দেখা কর্‌তে আমি আসিনি, একেবারে নিয়ে যেতে এসেচি। ডাকুন শীগ্‌গির।

—সে কি প্রতাপ? তিনি যে কুল-বধূ।

—হলেনই বা, এক কুল ছেড়ে অন্য কুলে যাবেন, আমি ত আর লরেন্স ফস্টর নই। সব ঠিক করেচি, তোকি খাঁ প্রস্তুত, আজই শৈবলিনীকে মোছলমান বানিয়ে দেবে,—তারপর আপনাকে তাল্লাক, আমার সঙ্গে নিকে। আমার নাম এখন আফ্‌তাব খাঁ। ভয় নেই ঠাকুর,

জাত যাবে না, কালই আবার রামানন্দ স্বামীকে ধ'রে দুজনে শুদ্ধি নিয়ে নেব।

চন্দ্রশেখর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তুমি কি জাল-প্রতাপ?

প্রতাপ বজ্র-নিনাদে বলিল—আমি জাল! মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাহার সম্পত্তি তুমি ভোগ করিতে চাও? এক বৃন্তে দুটি ফুল, কে ছিঁড়িয়াছিল? (মূল গ্রন্থ দেখ) ভণ্ড জ্যোতিষি, শৈবলিনীর অন্তরের কথা বিবাহের পূর্বে গণিয়া দেখ নাই?

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে কহিলেন—খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে বাবা। স্ত্রী-চরিত্র ত জ্যোতিষে গণা যায় না। এই কলিকালে যে বিবাহের পূর্বে প্রেম হ'তে পারে তা জানতুমই না। যেতে দাও বাবা, যেতে দাও,—যা হবার হ'য়ে গেছে। বেচারী এখন শান্তিতে আছে, সংসারধর্ম করচে, পুরানো কথা সব ভুলেচে। আহা, আর তাকে উদ্ব্যস্ত কোরো না।

প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিল—এই বিদ্যে নিয়ে তুমি পণ্ডিতী কর? যে অন্তরে অন্তরে আমারই, তাকে তুমি কোন্ অধিকারে আট্‌কে রাখ্‌বে? বল ব্রাহ্মণ, বল বল। যে আমার শৈশব-সঙ্গিনী, সে আজু কাঁহা মেরী হৃদয়কী-ঈ ঈ—(স্টার থিয়েটার দেখ)।

চন্দ্রশেখর ভীত হইয়া বলিলেন—একটু ঠাণ্ডা হও বাবা। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি।—পাপের স্পর্শ হ'তে কেউ রক্ষা পায় না, শৈবলিনীও ছেলেবেলায় পাপে পড়েছিলেন—

—অ্যাঁ! পূর্বরাগ পাপ?

—সর্বত্র পাপ নয় বাবা। কিন্তু যেখানে স্বাধীন বিবাহ চলিত নেই, সেখানে পূর্বরাগের ফলে পরে শান্তিভঙ্গ হ'তে পারে সেজন্যই পাপ।

—তবে পাপিয়সীকে ছেড়ে দাও না ঠাকুর।

—খাপ্পা হয়ো না বাবা। পাপ হ'লই বা—ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি,—অমন একটু আধটু পাপ আমরা সবাই ক'রে থাকি। কিন্তু সেটা নির্মূল করাও যায়। শৈবলিনী মন্ত্রলাভ করেচেন, যে মন্ত্রবলে চিরপ্রবাহিত নদী অনাখাদে চালানো যায়—(মূল গ্রন্থ দেখ)

—বুঝেচি, বুঝেচি, বুজরুকি ক'রে তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে চান! ও চল্‌বে না ঠাকুর, তুমি তাকে আট্‌কাবার কে? আমার শৈবলিনীকে চাই, এক্ষুনি এক্ষুনি। উচাটন মন যারে ধরিবারে ধায়, তারে কেন-ক্যানও-কেন নাহি পায়! (স্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন—ক্যানও নাহি পায় তা আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। রামচরণ অ রামচরণ—

রামচরণ এখন ভট্‌চায-বাড়িতেই কাজ করে। সাড়া দিল—আজ্ঞে।

—ওরে নিয়ে আয় ত আমার ছড়িটা, সেই বেতের লিক্‌লিকে ছড়ি। বাঁশের লাঠিটা নয়, বুঝেচিস্?

প্রতাপ বলিল, ছড়ি কি হবে, ভট্‌চায?

—তোমায় লাগাব। দু-এক ঘা খেলেই বুদ্ধি সাফ হ'য়ে যাবে। রামচরণ, জল্‌দি—

প্রতাপ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ, মার্‌বে? প্রতাপ রায়ের গায়ে হাত! তবে রে পাজি, শুয়ার—

—অ রামচরণ, বেতের ছড়িতে হবে না রে, বাঁশের লাঠিটাই আন্—

প্রতাপ সদর্পে পলায়ন করিল। আর্ট ও সমাজধর্ম দু-ই বজায় রহিল, অথচ লাঠি ভাঙিল না।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

হিঞ্জলী-দর্শন

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১) রাত্রিকালে মেদিনীপুর জেলার হিঞ্জলীক্ষেত্রে তত্রত্য বন্দীফৌজের সহিত আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের গবর্ণমেন্টই জয়লাভ করিয়াছেন। বিপক্ষ পক্ষে ২ জন হত ও ২০ জন আহত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল যুদ্ধের পূর্বে ভারপ্রাপ্ত সহকারী সেনাপতি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিপক্ষ বন্দীফৌজের সকলেই armed, অর্থাৎ হস্তযুক্ত ছিল। তদুপরি তাহাদের মধ্যে অনেকে মশারী টাঙাইবার ভীষণ কাষ্ঠশলাকা, ইষ্টকখণ্ড, সোডার বোতল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ-কৌশলও অতি-চাতুর্যের সহিত আরব্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা প্রথমে কোথায় আক্রমণ করিতে যাইতেছিল তাহা আজ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। গবর্ণমেন্ট সৈন্যবাহিনীর হস্তে বন্দুক ও সঙ্গীন ছাড়া কিছুই ছিল না! তথাপি বিপক্ষদল যে অল্প সময়ের মধ্যে পরাভূত হইয়াছিল ইহাতে আমাদের গবর্ণমেন্ট-বাহিনীর অদ্ভুত বীরত্ব ও রণচাতুর্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় হইতে বড়লাটের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিপক্ষ দল যে মশারী টাঙাইবার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল ইহাতে অনুমিত হয় তাহারা প্রথমে ব্রিটিশ-সিংহের শক্তির পরিমাণ স্থির করিতে না পারিয়া মশকদূরকরণোপযোগী ব্যবস্থা সঙ্গে আনিয়াছিল। এ পক্ষের গুলিবর্ষণে তাহাদের সে ভুল স্বল্প ক্ষণের মধ্যেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। গুলিবর্ষণের পূর্বে বিপক্ষ পক্ষ সুতীক্ষ্ণ গালিবর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাতে গবর্ণমেন্ট ফৌজের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

জয়লাভের পর আমাদের গবর্ণমেন্ট বন্দীদের প্রতি যথারীতি সদয় ব্যবহারই করিতেছেন। প্রভাত হইবার পরেই আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে; এমন কি, একজনকে ছাড়া আর কাহাকেও disarm বা নির্হস্ত করা হয় নাই। তাহারা খাইতে চাহিলে খাদ্যদ্রব্য দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহারা খাইতে চাহিতেছে না। তবে সেজন্য আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কারণ উক্ত রাত্রিতে তাহারা যে পরিমাণ গুলি ভক্ষণ করিয়াছে তাহার নেশা কতদিনে কাটিবে কে জানে?

কতিপয় ছিদ্রান্বেষী স্বার্থপর রাজবিদ্বেষী ব্যক্তি রটনা করিতেছে যে, এ যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেন্ট পরাজিত হইয়াছে। আমরা আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার পত্রে জানিয়াছি যে, উহা সত্য নহে। আমাদের সংবাদদাতা স্বয়ং সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের ন্যায় রাজভক্ত প্রজার মহা আনন্দিত হইবারই কথা, আমরা যেন উক্ত ছিদ্রান্বেষীদের রটনা বিশ্বাস না করি।

সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বলেন যে, হিঞ্জলীর যুদ্ধ একটা সাধারণ যুদ্ধই নহে। ইহা ভাগবদ্‌গীতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় একটা দার্শনিক ব্যাপার। হিঞ্জলী-দর্শনের মূল সূত্রগুলি তিনি আমাদের পাঠাইয়াছেন, তাহার ভাষ্য তিনি পরে প্রচার করিবেন। সত্যাশ্রয়ী বলেন :—

রাজা কহিলেন—হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন—হে সামন্ত! সামন্ত কহিলেন—হে

নগরপাল! নগরপাল কহিলেন—হে কনিষ্ঠবল! অর্থাৎ রাজা কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল! হিঞ্জলীক্ষেত্রে পরস্পর যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া মৎপক্ষীয় ও বিপক্ষপক্ষীয় চমূগণ কি ভাবে কার্য করিয়াছিলেন তাহা তুমি বর্ণনা কর।

কনিষ্ঠবল কহিলেন,—হে নগরপাল! নগরপাল কহিলেন, হে সামন্ত! সামন্ত কহিলেন, হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন, হে রাজন্! অর্থাৎ কনিষ্ঠবল কহিলেন, হে রাজন্! আমি যাহা দেখিয়াছি ও যাহা দেখি নাই তাহা সমস্তই বর্ণনা করিব। আপনার অবগতির জন্য সত্য বলিব, প্রিয় বলিব—কদাচ অপ্রিয় সত্য বলিব না, কারণ তাহা শাস্ত্রের নিষেধ।

হে রাজন্, কনিষ্ঠবল হইতে মন্ত্রী পর্যন্ত, মুদী হইতে জমিদার পর্যন্ত, সর্ববিধ দেশীয় জনগণের আপনিই ভগবৎনির্দিষ্ট ভাগ্য-বিধাতা! আপনার সুশাসনে বিশৃঙ্খল দেশীয় প্রজাগণ যখন ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ প্রধূমিত হইতে লাগিল। ইহা আপনি অবগত আছেন।

প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষ প্রশমিত করিবার জন্য আপনি এক হস্তে আইন ও অপর হস্তে শৃঙ্খলা লইয়া যখন নির্বিচারে সব্যসাচীর ন্যায় শাসনকার্য আরম্ভ করিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্রও আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন, ঋষিগণের ইহাই অভিমত।

রাজার কর্তব্য শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, ইহা আপনি সম্যক অবগত ছিলেন, এবং এ বিষয়ে আপনার ত্রুটিও কোনদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। কালপ্রভাবে অথবা আইন-শৃঙ্খলার গুণে দেশের জনসাধারণ যখন ক্রমে ক্রমে দুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন হইতে আপনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, ইহাও ঋষিমুখে শ্রুত হইয়াছি। যে-দুষ্টবুদ্ধি জনগণ শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল মনে করে, আইনকে বে-আইন বলে, তাহাদিগকে দুষ্ট বলা ছাড়া গত্যন্তর কি? যে রাজা তাহাদিগকে দমন না করেন তাঁহার রাজধর্মই বা কোথায় থাকে?

শাস্ত্রকর্তা আদিপিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশ মতই আপনি দুষ্টের দমন করিতে যতই বদ্ধপরিকর হইলেন ততই দুষ্টের দল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার উপর বা আপনার কি হাত ছিল?

এমনই করিয়া কালপ্রভাবে যখন দেশীয় প্রজাসাধারণ অধিকাংশ দুষ্ট পর্যায়ে পড়িল, এমন কি খদিরখাদকবৃন্দকেও যখন সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিতে লাগিল তখনই আপনার মনে শিষ্টপালনরূপ রাজধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবার আশঙ্কা সঞ্জাত হইল। সেই সময় হইতে আপনি দেখিতে লাগিলেন ক্রমবর্ধমান দুষ্ট দলের দমনসঙ্গী কনিষ্ঠবল ভিন্ন প্রকৃত শিষ্ট আর কোথায়? বাধ্য হইয়া রাজধর্মের নির্দেশানুসারে আপনাকে কনিষ্ঠবলপালন বা শিষ্টপালন করিতে হইতেছে।

হে মহাভাগ, হিঞ্জলী-ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহা ঐ শিষ্টের সহিত দুষ্টের যুদ্ধ। কার্যক্ষেত্রে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, একথা আপনি কিরূপে বিস্মৃত হইবেন যে, আপনারই রাজধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানদণ্ডে যাহারা দুষ্টের প্রতিনিধি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, হিঞ্জলীতে তাহাদেরই বসবাস! আর আপনারই রাজধর্মের প্রয়োজনে দুষ্টদমনকারী কনিষ্ঠবলরূপী অবশিষ্ট শিষ্টের দল তাহাদিগকে আর একদফা দমন করিয়াছে ইহাতেই বা বিস্মিত হইবার কি আছে? হিঞ্জলীর বন্দীগণ যে চিরদুষ্ট ইহার স্বতঃসিদ্ধতা তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না! উপস্থিত ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া আপনি যদি জানিতে পারেন যে কনিষ্ঠবলও দুষ্ট, তবে, হে রাজন্, আপনি চতুর্দিকে দুষ্টবেষ্টিত হইয়া আপনার শিষ্টপালনরূপ রাজধর্মের প্রয়োগ করিবেন কোথায়? রাজধর্মের অপালনে যে প্রত্যবায় ঘটিবে তাহা হইতেই বা আপনি কিসে মুক্তি লাভ করিবেন? কাঁটাতারবেষ্টিত এ বন্দীশালে আছে কেবল বন্দী ও প্রহরী। দুষ্ট বলিয়াই বন্দীরা বন্দী, আর শিষ্ট বলিয়াই প্রহরীরা প্রহরী। প্রহরীগণকেও আপনি যদি দুষ্ট প্রমাণিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে এই বন্দীশালে যে আপনি নির্বান্ধব হইবেন। অতএব রাজ্যের উদার প্রয়োজনবশে ধরিয়া লউন, হিঞ্জলী-ক্ষেত্রে

দুষ্টেরাই দুষ্টামি করিয়াছিল তাই শিষ্টেরা তাহাদের যথাবিহিত দমন করিয়াছে।

রাজা কহিলেন, হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন, হে সামন্ত! সামন্ত কহিলেন, হে নগরপাল! নগরপাল কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল! অর্থাৎ রাজা কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল, রাজধর্মের পরম পারদর্শী তুমিই আমার চরম বন্ধু, অতএব তুমি শিষ্ট। আমি তোমায় শেষ পর্যন্ত পালন করিব। দুষ্টের দমনে তুমি আমার চিরসহায় থাকিও, দেখিও পরমপবিত্র রাজধর্ম পালন হইতে আমি যেন ভ্রষ্ট না হই!

আশ্বিন ১৩৩৮

তরুণের লজ্জা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রবীণের কাছ থেকে তিরস্কার পাওয়া তরুণের এক রকম গা-সহা হয়ে গিয়েছিল,—কি জীবনের ক্ষেত্রে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে। তরুণ চিরদিনই জানে বুড়োদের স্বভাবই ওই। যতক্ষণ আপৎ কাল উপস্থিত না হচ্চে ততক্ষণ বৃদ্ধের কথায় কান দেওয়ার নীতি এই অতিবৃদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রেও লেখে না। বৃদ্ধের সঙ্গে তর্কে সময় নষ্ট না কোরে, নিজের মতে নিজের কাজ কোরে চলাই সব দেশে তরুণরা চিরকাল স্বধর্ম ব'লে মেনে নিয়েচে। বুড়ো পাহাড়ের বুক চিরে, তার জড়ত্বের সমস্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন কোরে, তরুণ নির্ঝরকে বা'র হ'তে হ'লে চাই—প্রত্যেক জলকণার একান্ত আগ্রহ, আর তাদের একমুখী সংহত সাধনা। পাথরের সঙ্গে তর্ক করা যেমন অনাবশ্যক, তার সহানুভূতি বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করাও তেমনি নিরর্থক।

বরং বৃদ্ধ পাথরের এই বাধাই তরুণের শক্তি বাড়ায়। বৃষ্টির অবারিত ধারা পাথরের বাধার চাপে শক্তি সঞ্চয় কোরে উৎসারিত হয়,—নির্ঝরের, ইতিহাসই তাই। এই বাধা আছে ব'লেই বোঝা যায় কে নির্ঝর, কে পল্বল। তরুণ সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত জীবন্ত নির্ঝরের প্রতিরূপ হ'লে প্রবীণ পাথরের দিক থেকে স্বাভাবিক বাধাকেই সে কল্যাণকর ব'লে মনে করতে পারে।

কিন্তু আজ তরুণ যখন প্রবীণের বাধাকে নিজের অন্তরস্থ শক্তির সাহায্যে কেবল মাত্র কার্যের দ্বারাই অতিক্রম করবার চেষ্টা না কোরে তার সহানুভূতিপূর্ণ ওকালতীর আশ্রয় গ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়েচে, আর প্রবীণের দল থেকেও যখন কেহ কেহ সেই তরুণ নির্ঝরের যাত্রাপথে শাবল কোদাল গাঁইতি হাতে আগে আগে তার পথ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়েছেন, তখন তরুণদের ভাববার সময় এসেচে। বাধা প্রবল হ'য়ে নির্ঝর যদি লোপ পায় তাও তত কষ্টের বিষয় হবে না; কিন্তু কোদাল গাঁইতির সাহায্যে কিছু দিনের জন্য 'কাটিগঙ্গা' নামে টিকে যাওয়ার মধ্যে যে গভীরতর লজ্জা আছে সেইটে উপলব্ধি করতে হবে।

আরও লজ্জার কথা হ'ল এই,—ঠিক যে যুগে বাংলার তরুণের ললাট কলঙ্কমসীলিপ্ত, আধুনিক ইতিহাসের যে সময়টিতে বাংলার তরুণের তীব্রতম ব্যর্থতা দিকে দিকে অঙ্কিত, যখন বাংলার জন কয়েক গত-যুগের তরুণের উদ্ধার-ভার মধ্যে নাগপুরের তরুণদের উপর ন্যস্ত করতে হয়েছিল,—ঠিক সেই সময় তরুণের এই জয়ঢক্কা বাজান হচ্চে। আজ বাংলার তরুণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে,—জীবনের ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন পথ কেটে বা'র হ'বার সাধনা নানা দিকে ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই সে এক মাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে কালি-কলমের সাহায্যে তার তরুণত্ব সপ্রমাণ করতে বাধ্য হয়েচে। চীনের তরুণ, তুরস্কের তরুণ, জীবনযাত্রায় তাদের পিছিয়ে ফেলে জয়োল্লাস করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গেল। তরুণ কবি নজরুলের তরুণত্ব যে আজ নবীন তুরস্কের অভিযান-গীতি সম্পর্কে মৌন হয়ে প্রবীণ পারস্যের যৌন-গজলে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল এর জন্য বাংলার সমস্ত তরুণ দায়ী। কর্মের সংগ্রামে তরুণ চারিদিক থেকে হঠে এসেচে, সেই বিফলতার ছায়া আজকের-সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে যে নূতনত্ব প্রকাশ করচে, তাকে একটা অসামান্য সাফল্যের অগ্রদূত ব'লে নিঃসঙ্কোচে প্রচার করা মর্মান্তিক পরিহাস। শ্রাবণের 'কালি-কলমে' পড়ছিলাম,—

"প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ মনের যে 'দুরন্ত আশা' দেশকে জানিয়েছিলেন, আজ তরুণের মধ্য দিয়ে সেই আশা পূর্ণ হ'তে চলেছে।" সে দুরন্ত আশা কি, তাঁরই কবিতার অংশ উদ্ধৃত ক'রে দেখান হ'য়েচে।—

নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে,
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

নৈতিক জগতে খাঁটি সত্যের সর্বপ্রধান অপমান—তার মামলা উঠলে স্বপক্ষে পাকা পাকা উকীল দাঁড় করানো। তরুণের উকীলের মুখ দিয়ে যে সব দম্ভের কথা আজকাল আত্মপ্রকাশ করচে তার লজ্জা বড় গভীর। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে দুরন্ত আশাকে কাব্যে মূর্তি দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, আজকের তরুণের মধ্য দিয়ে সেই আশা সত্যই কি পূর্ণ হ'তে চলেছে! রবীন্দ্রনাথ এখন প্রবীণ; তাঁর এখনকার কথা তরুণরা প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার করচেন না, করা ঠিক স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু তিনি তাঁর তরুণ মনের 'দুরন্ত আশায়' এই তারুণ্যের যে মাপকাঠি রেখে গিয়েছেন তাই থেকে উদ্ধৃত করচি,—যেটা শ্রাবণের কালি-কলমের উদ্ধৃত অংশে বাদ দেওয়া হয়েচে।

"কিসের এত অহঙ্কার? দম্ভ নাহি সাজে।
বরং থাকো মৌন হ'য়ে সসঙ্কোচ লাজে!
অত্যাচারে মত্তপারা কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হ'য়ে রক্তধারা ফুটে কি দেহমাঝে!
অহর্নিশি হেলার হাসি, তীব্র অপমান,
মর্মতল বিদ্ধ করি' বজ্রসম বাজে।"

আজ বাংলার তরুণদল বুকে হাত রেখে বলুক, এই মাপকাঠিতে মাপ্‌লে তাদের পরিচয় কোন্ অঙ্কে স্থান পাবে! তরুণ অত্যাচারের সহস্র দুয়ারে ঘা মেরে দেখেছে;—সে সব দুয়ার ভাঙ্গা যখন শক্তিতে কুলায় নি, তখনই সে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজের ভাঙাদুয়ারের উপর নূতন আঘাত করচে, বিদেশের অনুকরণে ধনিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকের পক্ষ নিয়ে দুচার কথা মাসিকের পৃষ্ঠায় জোর কোরে বলতে শুরু করচে,—তরুণ সাহিত্যের ইহাই ইতিহাস। এর নাম যদি চল্লিশ বৎসর পূর্বের তরুণ রবীন্দ্রনাথের দুরন্ত আশা আজকের তরুণের মধ্যে পূর্ণতালাভ করচে এই হয়, তবে রবীন্দ্রের ভাষায় পুনঃ পুনঃ নিজেদের সাবধান করবার সময় এসেছে—

"কিসের এত অহঙ্কার? দম্ভ নাহি সাজে।"

হায় বাংলার তরুণ! তোমারই মুখের পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বিদেশী সিগারেটের ধূমে কুণ্ডলায়িত হয়ে পশ্চিম আকাশে ফুল ফোটাচ্চে! যে জীবনের সাধনায় বিফল, সে সাহিত্যে আশাতীত সফলতা লাভ করচে, একি সত্য হ'তে পারে? ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড কোনো দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে জীবনের নব নব তরুণ অনুভূতি ও বিচিত্র প্রকাশকে ত বাধা দেয় নি। কিন্তু তোমার ভাষা পর্যন্ত যে ক্রমে ভাঙ্গা শিরদাঁড়ার কুচো হাড়ের মত এলোমেলো ছড়িয়ে পড়চে, সেকি শুধুই ভাবের আতিশয্যে না জীবনের বিফলতায়! আরও আশঙ্কার কথা এই, তোমার সব ত্রুটি তারুণ্যের আড়ালে ঢেকে রাখ্‌বার জন্য প্রবীণ বন্ধুর অভাব হবে না। কিন্তু এই বন্ধুত্বও কি একান্তই স্নেহ প্রসূত? প্রবীণে প্রবীণে যে সব মনোমালিন্য বহুদিন থেকে সঞ্চিত হ'য়েছিল, তোমাকে আশ্রয় কোরে, সাহিত্যের আদর্শ-বিচারের অছিলায়, সেই সব লুকানো অগ্নি তোমারি তোমামোদের ইন্ধন পেয়ে আজ দীপ্তিমান হয়ে উঠছে না, সে বিষয়ে কি নিঃসন্দেহ হয়েছ?

নূতন ব'লেই সাহিত্যের মধ্যে কোন জিনিস স্থায়ী হয় না। সাহিত্যিক মাত্রেরই একান্ত বাসনা নূতন কথা নূতন ভাবে বলা। সাহিত্যের ইতিহাসে তরুণের এই প্রচেষ্টার সাফল্যের উদাহরণও যেমন আছে, তার বিফলতার নিদর্শনও প্রচুর। এ যুগের তরুণ সাহিত্যের মধ্যে সাধারণ হিসাবে নিশ্চয়ই ভালও আছে মন্দও আছে। কিন্তু এখনও এমন মহৎ কিছু দেখা যায় নি যাতে দম্ভ করা যায়। এই সাহিত্যের সর্বত্রই নূতন কিছু বল্‌বার চেষ্টা যতটা পরিস্ফুট, জীবনের মধ্যে সেই নূতনের গূঢ় অথচ প্রত্যক্ষ অনুভূতি তেমন জীবন্ত নয়। ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টিই সমাজ। যে সমস্যা সমাজে আজও প্রকট নয় জীবনে তা সত্য না হ'তে পারে, আর সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়ত বিলেতের আমদানী বায়স্কোপের মতই অসার্থক। গত যুগের যে কয়টি তরুণ সাহিত্যে আজ মহারথী হয়েছেন, তাঁরা কেবল নূতন বলবার দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন ব'লেই বড় হন নি, একথা বলাই বাহুল্য। তরুণের স্বপক্ষে পুনঃ পুনঃ সে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করার মধ্যে না আছে যুক্তি, না আছে শালীনতা। সমাজ ও রুচিকে আঘাত দিলেও সাহিত্য হ'তে পারে—এ কথা সত্য; কিন্তু তাদের আঘাত দিলেই সাহিত্য হয় না—একথা ততোধিক সত্য। বাঁড়ুয্যের পো'র সঙ্গে মুখুজ্যের ঝির পূর্বরাগ ঘটিয়ে গতযুগে যাঁরা তখনকার সমাজে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ খ্যাতনামা হয়েছেন,—এই লোভে, নূতন কথা বলবার ঝোঁকে যদি সাহিত্যের আসরে মাসতুতো ভাইএ পিসতুতো বোনে বেশ সুকৌশলে পূর্বরাগ ঘটাই, তাহ'লে সেটাও সাহিত্যপদবাচ্য হ'তে হবে এমন কোন কথা নেই, সমাজের কথা ছেড়ে দিলেও এরকম ব্যাপার জীবনের অনুভূতির দিক থেকে তো এমন গভীর সত্য বা তথ্য না, যাতে সে কথা নিয়ে কোন রুচিবায়ুগ্রস্ত মাসতুতো বড়-ভাই যদি দুটো চড়া কথাই শুনিয়ে দ্যায়, তবে তার সঙ্গে সমান উত্তর করতেই হবে! আর সাহিত্যে ফ্রয়েডের তত্ত্বের দোহাই শুনলে মনে পড়ে—গত যুগে আর একদল তরুণ রাষ্ট্রবিপ্লবকে পুষ্ট করবার জন্য, হয়ত সরল বিশ্বাসেই, গীতাধর্মের সাহায্যে গ্রহণ করেছিলেন!

রুচি অরুচির প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে দেখি কবিগুরুর 'চিত্রাঙ্গদা'র নজীর দেখান হয়েচে। চিত্রাঙ্গদার যে এত প্রতিপত্তি, সে কি ঐ 'গতরজনীর অসহ্য পুলকে'র একান্ত সঙ্কটময় পথে পরম কৌশলময় বর্ণনাটির জন্যই! তার মধ্যে এমন অনেক জিনিস পাওয়া গেল যাতে ঐ স্থানটা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই তাকে ফেলা গেল না। তার অভ্যন্তরে এমন শক্তি সংহত ও প্রকাশিত যে সে সবলে রুচি অরুচির সমস্ত বাধা ভেদ কোরে সকল সমালোচনার উপরে কমলের মত ফুটে উঠল। হয়ত তার গায়ে কাঁটা আছে, খুঁজলে তার পর্ণপুটে হয়ত পঙ্কের চিহ্নও কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কাঁটা আছে ব'লেই, পাঁক ফুঁড়ে জন্মেছে ব'লেই তো তার মহত্ত্ব নয়। বর্তমানের 'হয়ত শেয়াকুল' যদি কাঁটার নজীর দেখিয়ে ভবিষ্যতের 'হয়ত কমল'ত্ব প্রাপ্তির দাবী নিজে ও নিজের উকীলের মুখ দিয়ে সাড়ম্বরে প্রচার করতে আরম্ভ করে, তবে তা বড় লজ্জাকর! পূর্বের একযুগের কবিরা যে ভেবেছিলেন বিদ্যাসুন্দরের স্থান-বিশেষের নূতনত্বের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের প্রকৃত শক্তি অন্ততঃ আংশিক ভাবেও লুকান আছে, তার প্রমাণ আমরা অনেক পুরাতন পুস্তকে পাই। কিন্তু সে সব কবির কাব্য আজ কোথায়? এমন ভুল চিরদিন হয়েচে, আজও হ'তে পারে। কারও কারও কাছে আজ যা সাহিত্যের 'শেয়াকুল' ব'লেই মনে হচ্চে, কাল যদি তাই কমল প্রমাণিত হয়, খুবই আনন্দের কথা। আশা করি, কামনা করি, তাই হোক্। কিন্তু, সে যদি কালের দরবারে চিরদিনের জন্য শেয়াকুল ব'লেই প্রতিপন্ন হয়, অথচ কমলের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের আগ্রহে তারই নজীর দেখিয়ে কতকগুলো কাঁটার দম্ভ নিজের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রেখে যায়, তবে সেটা কত বড় লজ্জার কথা! আজকের তরুণ সাহিত্যিকদের যাঁরা এই সম্ভাবনার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের সহানুভূতি থেকে তরুণ সাহিত্যের মুক্তি কামনা করি।

পৌষ ১৩৩৪

নব-রুবাইয়ত্

চামার খায়-আম

(এক)

ঘাট থেকে হাটে চুব্‌ড়ী মাথায়
যেও না, সজনি, যেয়ো না!
মিশি দিয়ে দাঁতে শুধু মুখে সখি,
দোক্তা ও চুন খেও না!
তুমি যে আমার কবিতার বঁধু
বয়স-কালের চাক-ভাঙা মধু!—
মৎস্যগন্ধা প্রেয়সী আমার
যেথা সেথা তুমি ধেয়ো না!
ঘাট থেকে হাটে চুব্‌ড়ী মাথায়
যেয়ো না সজনি যেয়ো না।

বিকালে বসিয়া তোমারি দাওয়ায়
ছোট কলিকায় ফুঁ দিয়া,
ভুঞ্জিব তব রস-আলাপন,
মাঝে মাঝে শুধু হুঁ দিয়া।
তার পর যবে ও মোর বিরাজী,
ঢেলে দেবে ভাঁড়ে তালের সিরাজী,
কোঁৎ কোঁৎ কোঁৎ ঢক্ ঢক্ ঢক্
পিইব নয়ন মুদিয়া—
তুমিই তখন এই পরাণের
উনুন ধরাবে ফুঁ দিয়া।

বড় ভালবাসি সুঁট্‌কি-মাছ আর
পান্তা-ভাতের পোলাও,
নোনা-ইলিসের চাটনির চাট্
বোলাও, পিয়ারী, বোলাও!
ফাঁদি-নথ আর মাকড়ীর ছাঁদে
হৃদয় আমার ডুকুরিয়া কাঁদে,
ভির্মি যে যাই, কুলকুচো কালে
গাল দুটি যবে ফোলাও।
তবু ভালোবাসি তোমার হাতের
সুঁট্‌কি মাছের পোলাও।

ওই খাঁদা নাকে নাক-ছাবি পরে'
কেড়ে নিলে মোর মনটি,
তারি লাগি মুই জাত খোয়ালেম
বদল করিনু কণ্ঠি!
ওর কাছে কোথা লাগে 'কালো তিল',-
তাই গানে মোর এত ভালো মিল,
নাকেরি পীরিত—তাই নাকী সুরে
ভরে তুলি সারা বনটি,
মরি মরি! ওই নাকছাবি তোর
কেড়ে নেয় মোর মনটি!

আর নাহি ভয়, কহিনু নিচয়
যৌবন মোর জেগেছে,
সেই সনাতন সুরের মাতন
শিরদাঁড়াটায় লেগেছে।
পশু-মানুষের সহজ তন্ত্র
হবে আজি মোর সাধন মন্ত্র
পেত্নী-দেবতা ভর করিয়াছে,
ভগবান-ভূত ভেগেছে!
আর নাহি ভয়, কহিনু নিচয়
যৌবন যে গো জেগেছে!

চাহি না আঙুর—শুধু চানাচুর,
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান্ দুই,—
ঘল্‌ঘসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ বেল যুঁই।
লোকে বলে গানে আঁশ্‌টে গন্ধ,
বোঝে না আমার এমন ছন্দ!—
আর কিছু দিন ইহারি ক্ষুধায়
নাড়ী যে করিবে চুঁই চুঁই।
চাবে না আঙুর, চাবে চানাচুর
চিংড়ির চপ খান দুই।

এস তবে এস, সাঁজালের ধোঁয়া
দেয় বুঝি ওই গোয়ালে,
কলসীর রস ভাঁড়ে ঢেলে দাও—
খাল ধরে বুঝি চোয়ালে!
প্রেমনদে মোর এসেছে জোয়ার,
ওগো এসো আর কোরো না খোয়ার--
ভাঁটা পড়ে যাবে, নেশা যে ফুরাবে
এই রাতটুকু পোয়ালে—
সাঁজ হয়ে গেছে, সাঁজালের ধোঁয়া
দেয় বুঝি ওই গোয়ালে!

টেক্সট্-বুক সাহিত্য

দিবাকর শর্মা

গ্রন্থ-পরিচয়

আদর্শ মক্তব প্রাইমার—দ্বিতীয় ভাগ। মৌলবী মেনহাজ উদ্দীন খাঁ কর্তৃক প্রণীত ও ১০৮ নং ইস্‌লামীয়া কলেজ স্কোয়ার আসমান্ লাইব্রেরী হইতে শেখ ওমর কর্তৃক প্রকাশিত ও সদাশয় সরকার বাহাদুর কর্তৃক কলিকাতার গেজেটে (তারিখ কেতাবের মলাটে লিখা আছে) মোছলমান বালকগণের মক্তবে পাঠের জন্য নির্ধারিত। মূল্য চৌদ্দ পয়সা।

টেক্সট্-বুক সাহিত্য এতকাল হিন্দুদিগের একচেটিয়া ছিল, এখন মোছলমানরাও, এ ক্ষেত্রে দাগা বুলাইতেছেন—বড় খুশীর বিষয়। এই কেতাবখানি বড় উচ্চ জ্ঞান-পূর্ণ বালক-পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। খাঁ ছাহেবের এ বহি মোছলমানী বাঙ্গালী সাহিত্যের গৌরব। আশা করি মোছলমান গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ মৌলবী ছাহেবের মত মক্তবপাঠ্য বহি লিখিয়া স্বজাতিস্থ শিশুগণের শিক্ষার পথ আলোকিত করিয়া দিবেন।

গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় না দিয়া কয়েকটি শিক্ষা তুলিয়া দিতেছি—পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে শুধু মক্তব নহে হিন্দুদিগের পাঠশালায়ও এরূপ কেতাব পড়ান বিশেষ দরকার। কারণ ভাল বহি আজকাল বাজারে বড় কম।

১ নং শিক্ষা

রাজা রাণী

উপরে যে তছ্‌বীর দেখিতেছ উহা কাঁহাদের জান?

আমাদের রাজারাণীর। উঁহাদের বাড়ি লণ্ডন নামক দেশে। উঁহারা আমাদের শাসন করেন। উঁহাদের শাসনে আমরা খুব খোস্‌হালে আছি।

মোছলমানদের উপর রাজারাণীর বড় রহমৎ। রাজারাণীর জাতির নাম ইংরেজ।

মোছলমানদের সুবিধার কারণ ওঁহারা দিল্লীতে রাজধানী করিয়াছেন। সেখানে আগে মোছলমানগণের বাদ্‌শাহী ছিল। সে কারণ ঢাকাতেও বড় শহরের পত্তন করিয়াছেন। ঢাকাতে অনেক বড় ধনী আছেন। মোছলমানদের আদর যাহাতে বজায় থাকে সে কারণ ঢাকায় উহাদের জন্য বড় বড় এমারত গড়াইয়া ইংরেজীনবীশ বড় বড় আলেমগণের দ্বারা এছ্‌লামীগণকে সরা-শরিয়ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

ইংরেজগণ মোছলমানকে বড় পেয়ার করেন। তাঁহাদের বাড়ির কাছে মোছলমান ছাড়া অন্য কোনও জাতির লোক নওকরী পায় না। তাঁহাদের ফজলে আজকাল চৌকিদারী দারোগাগিরি প্রভৃতি বড় বড় কাজও মোছলমানগণের দখলে আসিতেছে।

পরম মঙ্গলকারী আল্লাহ্ তালা ইংরেজ জাতির মঙ্গল করুন।

(এইখানে একটা ফার্সী বয়েৎ ছিল, সেটা বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া উঠাইয়া দিলাম। শ্রীদিবাকর।)

২ নং শিক্ষা

গরু জাতি

গরু জাতি বড় উপকারী। আমাদের মত ইহাদের দুই পা নহে, চারি পা ও একটা করিয়া লেঙ্গুড় আছে। ইহারা লেজ দিয়া মাছি তাড়ায় ও শিং দিয়া দুষমণকে গুঁতায়। স্ত্রী গরুকে গাই ও পুরুষ গরুকে ষাঁড় বলা হয়।

কৃষক গরুর দ্বারা জমিন্ আবাদ করে, সে কারণ ফসল পয়দা হয়। সেই ফসল খাইয়া আমরা বাঁচি। সুতরাং দেখিতেছ গরু জাতি বড় উপকারী। আমরা গরু জাতির দুধ খাই, তাহাদের চামড়ায় জুতা পরি, এই সব নানা উপকারের জন্য মোছলমানেরা কাজে পরবে গো-জবেহ্ করিয়া থাকেন। এছলাম ধর্মে গরু পবিত্র, হালাল।

(এইখানে আরব, মিশর, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, ওয়াজরিস্তান প্রভৃতি দেশের গো জাতির বর্ণনা আছে। বর্ণনার অতি বিস্তৃতি জন্য সে অংশ আমি উদ্ধৃত করিলাম না। শ্রীদিবাকর)

৮ নং শিক্ষা

প্রভাত কাল

রজনী হইল শেষ, হইল ফজর।
আস্‌মানে উঠিল রবি করহ নজর।।
মস্‌জেদে মস্‌জেদে শুন উঠিছে আজান।
মোসাফির লোক করে খোদা গুণ গান।।
শেখদের মোরগেরা দিতেছে আওয়াজ।
করিম আর হবিবর পড়িছে নমাজ।।
মীরদের বাগিচায় গুলাব ফুটিল।
ছুরত দেখিতে তার শিশুরা জুটিল।।
ওঠ সব শিশুগণ বিভুনাম লও।
অজু শেষ ক'রে সবে মক্তবেতে যাও।।

এইরূপ আরও অনেক মধুর কবিতা আছে। পুস্তক পাঠ করিলে বালকেরা আরব তুরস্ক প্রভৃতি দেশের অনেক খবর জানিতে পারিবে। আশা করি হিন্দুমোছলমান সকলেই একখানি করিয়া খরিদ করিবেন।

মওলবী আলী আহাম্মদ মজ্‌লিস্

সবিনয় নিবেদন—

সম্পাদক মহাশয়, আপনি মৌলবীসাহেবের লেখা ছাপিয়াছেন দেখিয়া তিনি বড় খুশী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে হিন্দুরা যে তাঁহাদের লেখা ছাপেন এ কথা তিনি জানিতেন না। তিনি শীঘ্রই প্রচার করিবেন যে হিন্দুরা যেরূপ অহঙ্কারী ও পক্ষপাতী বলিয়া মুসলমানগণের বিশ্বাস তাহা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি আরো খানকয়েক কেতাবের সমালোচনা লিখিতেছেন তাহাও আমাকে জানাইয়াছেন।
ইতি

নিবেদক
শ্রী দিবাকর শর্মা

১ম বর্ষ/পৌষ ২৬/১৩৩১



ত্রিলোচন কবিরাজ

দিবাকর শর্মা

আর কোনও শব্দ কানে আসিতেছিল না, শুধু পায়ের খড়ম জোড়ার সঙ্গে ফুটপাথ ঘর্ষণের ফলে অবিশ্রাম নানা ছন্দে খটাস্ খটাস্ ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাই শুনিতে শুনিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতেছিলাম, সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতেছিল, সকালে 'জেন্টস্ রেস্তোরাঁ ডিল্যুক্স'-এ এক পয়সার এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিন দিনকার বাসি রুটির একখানা পোড়া টোস্ট খাইয়াছিলাম, ক্রমাগত তাহারই ঢেকুর উঠিতেছিল। সমস্ত দিন বাড়ি ফিরিব না সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় দিন কাটাইব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। পরিচিত দুই একটি বন্ধুর বাড়ি কাছেই ছিল, যাইতে পারিতাম, কিন্তু মনে মনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের উপরই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাহারও কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। দুই একটি ঝি বাজার লইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ আঁচলের চাবির গোছা দিয়া মৃদু অথচ সতর্ক আঘাতও করিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলাম না। প্রতি মুহূর্তেই মন উত্তরোত্তর সংসারে বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত জগৎটাই যদি কেওড়াতলা অথবা কাশীমিত্রের ঘাট হইয়া যাইত তাহাতেও কোনও আপত্তি ছিল না।

সহসা পথের ধারের একটি ঘরের মধ্যে পুরুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা দিয়া দেখি অনেকগুলি লোক কেহ সরবে কাঁদিতেছে কেহ রুমালে চোখ মুছিতেছে।

কেহ মরিয়াছে মনে হইল, কিন্তু বাড়ির সম্মুখে খাট দেখিলাম না ; উপরে চাহিলাম— দেখিলাম বাড়িখানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সাইনবোর্ড, সোনালি অক্ষরে লেখা 'প্রেমার্তি হরণ ঔষধালয়', তাহারই নীচে লেখা শ্রীত্রিলোচন কবিরাজ। ঔষধালয় ও কবিরাজ উভয়কেই নূতন মনে হইল, কাজেই কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝিলাম ভুল করিয়াছি, কবিরাজ এবং ঔষধালয় কোনটিই নূতন নহে, যেহেতু সাইন বোর্ডের সোনালি অক্ষরে কালো দাগ পড়িয়াছে এবং সদরের যে ঘরে রুদ্যমান জনগণকে দেখিলাম তাহারই পাশে একটা বড় হল-ঘর, তাহার আসবাব-পত্রও অতি পুরাতন এবং ফরাসের একশ'-একটি স্থানে কালি এবং তেলের দাগ : ক্যাশ বক্সের সম্মুখে যে লোকটি বসিয়াছিলেন তিনিও অতি প্রাচীন। বুঝিলাম এইটি কবিরাজ মহাশয়ের ডিস্‌পেনসারী। ক্যাশ বাক্সরক্ষক ভদ্রলোকটি আমাকে আগ্রহের সঙ্গে দেখিতেছিলেন, সহসা ডাকিলেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন!'

ভিতরে ঢুকিয়া ফরাসে বসিলাম। দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আকারের মদনভস্মের অয়েল পেন্টিং ছিল, সেইখানি দেখিতেছি এমন সময় ভদ্রলোকটি কহিলেন, 'জানেন তো বাড়িতে ব্যবস্থা নিলে দর্শনী আট টাকা!' কহিলাম, 'কিসের দর্শনী?'

'কবরেজ মশায়ের। ব্যাধি অবশ্য আপনার তিনদিনেই নির্মূল হবে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, 'এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছেন বুঝি! ব্যাধি আমার নেই।'

বৃদ্ধ কহিলেন, 'অবশ্য আছে। এই ব্যাধি নেই এমন পুরুষ এবং নারী জগতে নেই মশাই, রাজা রাজড়া থেকে—'

কথা সমাপ্ত হইতে দিলাম না, বিদ্রূপ করিয়া কহিলাম, 'আপনি অন্তর্যামী দেখছি!'

বৃদ্ধ নির্বিকার ভাবে কহিলেন, 'প্রায়। এই তেষট্টি বচ্ছর বয়স হ'ল মশাই, আঠার বছর থেকে কবরেজ মশায়ের কম্পাউণ্ডারী কচ্ছি। প্রত্যহ গড়পড়তায় তিন শ' রুগীকে ওষুধ দেই। বর্ষা আর বসন্তে এই রুগী হয় দুনো। ত্রিশটি ছেলে মোড়ক বেঁধে অবকাশ পায় না। নিজে দেখছি তো কবরেজ মশায়ের ওষুধ নৈলে কারো চলে না। আর আপনি কি না—'

একটু সম্ভ্রম হইল, কহিলাম, 'কি ব্যাধির কথা বলছেন জানলে—' বৃদ্ধ কহিলেন 'সাইনবোর্ড দেখেন নি? যাবতীয় প্রণয়-ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা এখানে ওষুধ এবং মুষ্টিযোগ সহযোগে করা হয়। দর্শনী আট টাকা, ওষুধ বিনামূল্যে। এর চেয়ে সুবিধে পাবেন না কোথাও? প্রণয়-ঘটিত অনেক প্রকার ব্যাধির নাম ও তাহার বহুবিধ পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বড় বড় মাসিক ও সংবাদপত্রে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছি, এ পর্যন্ত তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ,—বৃদ্ধ কহিলেন, ভাবছেন? ভাবছেন বুঝি কোনও ব্যাধি নেই আপনার। কবরেজ মশায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হ'লেই বুঝতে পারবেন ব্যাধি আছে কি-না? আপনার আর বয়েস কি মশাই, আমি শ্রীবলরাম রসনিধি, পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীকে নিমতলার ঘাটে পার ক'রেছি, এই তেষট্টি বছর বয়েস, এখনও আমাকে মাঝে মাঝে কবরেজ মশায়ের কাছে ব্যবস্থা নিতে হয়।' প্রতিবাদ করিলাম না, কিন্তু মনে হইল হয়তো ব্যাধি আমারও কোথাও আছে। গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসা অবধি মাথাটা টন্ টন্ করিতেছিল, ভাবিলাম হয়তো একটা প্রণয়ঘটিত কোনও ব্যাধি হইবে, কিছু জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় রসনিধি মহাশয় সসম্ভ্রমে কহিলেন, 'ওই কবরেজ মশাই আসছেন।' পরক্ষণেই হুঁকা হাতে ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, মাথার সম্মুখের দিকে চুলের উৎপাত নাই। পিছনে কয়েক গুচ্ছ শুভ্র কেশ, তাহাতে একটি ধুতুরী ফুল। কবিরাজ মহাশয়ের ললাটে একটি যাত্রার দলের মহাদেবের ধরণে ললাটনেত্র আঁকা, তাহার মধ্যে একটি রক্তচন্দনের অক্ষিতারকা। ফরাসে বসিয়াই কবিরাজ মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কেন জানি না, আমি চোখ বুজিলাম। কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, 'ভয় নাই, আরোগ্য হবে।' পরে হুঁকায় টান দিয়া

কহিলেন, 'রোগীগণকে উপস্থিত কর—' মাধাই—'কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া গুটিকয়েক অল্প বয়সের শিক্ষার্থী ডিসপেনসারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া রোগীদের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। আমি ফরাস ছাড়িয়া একটি টুলের উপর গিয়া বসিয়া সতৃষ্ণনেত্রে রোগীদের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রোগীদের ঘর হইতে নানারূপ গুঞ্জন দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট স্ফুট রোদন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়া রোগীরা আসিতে শুরু করিল। একি! প্রায় যে সকলেই আমার পরিচিত। রসনিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছি মিথ্যা নহে। রাজনৈতিক নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিক পত্র সম্পাদক পর্যন্ত সর্ববিধ ব্যক্তিই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে, সকলেই কাঁদিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের বালক পর্যন্ত রোগ দেখাইতে আসিয়াছে। একটা প্রশ্ন মনে জাগিল, উঠিয়া রসনিধি মহাশয়ের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন, 'হ্যাঁ মেয়েরাও আছেন তবে তাঁরা দোতলায়। এঁদের ব্যবস্থার পর তাঁদের ব্যবস্থা হবে।'

কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, 'অগ্রে অল্প বয়স্কগণকে উপস্থিত কর।' এক সঙ্গে পাঁচ সাতটি স্কুলের ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া ফরাসে বসিল। কবিরাজ মহাশয় গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'পরীক্ষায় ফেল করিয়াছ?'

সকলেই সমস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

কবিরাজ মহাশয় আর কিছু জিজ্ঞাসা কবিলেন না। রসনিধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'প্রাতে মোহমুদ্গর গুড়িকা একমাত্রা, পথ্য উপবাস।' ব্যবস্থাপত্র লইয়া ছেলে কয়টি দর্শনী দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এইবার বয়স্ক রোগীরা আসিতে শুরু করিলেন। প্রথমে যিনি আসিলেন তাঁহাকে চিনিতাম না। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পেশা কি?' ভদ্রলোক কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিলেন, 'পত্রিকা সম্পাদক।'

'হুঁ! কবিতা ছাপা হয়?'

'আজ্ঞে তাতেই তো—'

'হুঁ! লেখিকার কাছে পত্রলিখন কার্য করা হইয়াছে?'

'আজ্ঞে। তাঁর জবাব পেয়েই তো—' বলিয়াই ভদ্রলোক আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি কবিরাজ মহাশয়ের অভ্রান্ত নির্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম! কবিরাজ মহাশয় হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন, তাহার পর কহিলেন, 'ব্যবস্থা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অশ্রুভৈরব বটি, মধ্যাহ্নে স্বপ্নপ্রণয়ান্তক', তাহার পর রোগীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'পত্রিকা সম্পাদন ত্যাগ কর।'

এই সময় ক্ষীণ একটি আর্তনাদ শুনিলাম, পরক্ষণেই মাধাই আসিয়া জানাইল যে, দ্বিতলে একটি রোগিণীর মূর্ছা হইতেছে। ত্রিলোচন কবিরাজ উঠিলেন এবং একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে টিপিতে টিপিতে দ্বিতলে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে আমি রসনিধি মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া কহিলাম, 'যদি কিছু মনে না করেন—' রসনিধি কহিলেন, 'আদৌ মনে কর্ব না, প্রশ্ন করুন।'

ত্রিলোচন কবিরাজের জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ হইতেছিল, 'কহিলাম, কবিরাজ মশায়কে অনেক দিন থেকেই জানেন আপনি। তাঁর সম্বন্ধে—' রসনিধি কহিলেন, 'ত্রিলোচন কবরেজের কথা জানেন না আপনি? আচ্ছা সংক্ষেপে শুনুন তবে, পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কবরেজ মশায় পড়তেন সিদ্ধান্তকৌমুদী আমরা পড়তাম মুগ্ধবোধ। অকস্মাৎ একদিন গ্রামের রজকনন্দিনী ধৈর্যময়ী ত্রিলোচন কবরেজের নামে অভিযোগ করল

যে, তিনি তার অঙ্গ স্পর্শ করেছেন। অধ্যাপক মশায় চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচন কবরেজ সেই থেকে সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে দেখলেন যে, জগতে প্রেমব্যাধিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তখন জীবহিতের জন্য এই ব্যাধির ওষুধ খুঁজতে তিনি গেলেন হিমালয়। সেখানে সিদ্ধবাবা মদনমথনজীর নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁর প্রেমব্যাধি আরাম করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি লোকহিত সাধনের জন্য গুরুদত্ত ওষুধ পত্তর নিয়ে সংসারে আসেন এবং এই ডিসপেনসারী খোলেন। তাঁর ছাত্রেরা কেউ বিবাহ কর্তে পারে না ; তবে আমার পৈতৃক বৃত্তি বলিয়া আমার সম্বন্ধে তাঁর অন্য ব্যবস্থা ছিল। তা তাঁর কৃপাতেই হোক আর ভাগ্যবলেই হোক পাঁচ পাঁচটার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। গুরু হে তুমিই সত্য।' বলিয়া রসনিধি হাতযোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আবার আসিয়া ফরাসে বসিলেন। এইবার আমিও ভক্তিভরে কবিরাজ মহাশয়ের পদধূলি লইলাম। কবিরাজ মহাশয় মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রোগীরা তখনও কাঁদিতেছিল। ত্রিলোচন কবিরাজ হাঁকিলেন, চুপ! ক্রন্দনধ্বনি থামিয়া গেল, শুধু ফোঁস-ফোঁসানি শোনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় রোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে একটা রঙ্গীন পাঞ্জাবি, চোখ কাঁদিয়া কাঁদিযা লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ। ফরাসে বসিয়াই ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজের খোলা নসাদানী হইতে খানিকটা নস্য ফরাসে উড়িয়া পড়িল, কবিরাজ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর রোগীব নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, 'রোগের বিবরণ বর্ণনা কর।'

কেমন করিয়া পাশের বাড়ির ছাদে শাড়ি শুকাইতে দেখিযা তাঁহার রোগের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনিদ্রা অরুচি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে গত সন্ধ্যায় শাড়ির অধিকারিণী তাঁহার মাথার ছাত হইতে একঝুড়ি তরকারীর খোসা ফেলিয়া দেওয়াতে অনেকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতা বচনা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার অন্যতম। এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া পকেট হইতে একটি কলার খোসা কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রোগী পুনরায় কহিলেন, 'তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রেখেছি আমি—খোসা নয়, এ ফুল।' কবিরাজ মহাশয় তাঁহার হাত হইতে খোসা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পব সেটা ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'হুঁ! জঞ্জাল প্রক্ষেপকারিণীর বয়স কত?' রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ষোল—ষোল! sweet—'

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিয়া কহিলেন, 'চুপ? ব্যবস্থা—কিশোরীকালানল প্রাতে; সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসারি ঘৃত, বুকে মালিশ। যাও দক্ষিণের বাতায়নে একটি স্থূল যবনিকা প্রলম্বিত কর গে।'

ইহার পর ক্রমাগত রোগীরা আসিতে লাগিলেন; একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম যে, সকলেই অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে রোগের গূঢ় নিদান উদ্ঘাটন করিতেছেন। লজ্জার লেশমাত্র কাহারও নাই। বৃদ্ধ অনুকূল চক্রবর্তীকে চিনিতাম। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি সম্প্রতি বিশ্বম্ভর পাকড়াশীর প্রৌঢ়া পত্নীকে দেখিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং এদিকে পাকড়াশী মহাশয় অনুকূলবাবুব চতুর্থ পক্ষেব সহধর্মিণীকে কাশীবাস করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—সঙ্কল্পের ফলে তাঁহার অরুচি মাথাঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়াছে। উভয়ের রোগের এই পারিবারিক গোপন নিদানের কথা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখেই বর্ণনা করিয়া গেলেন, বলিতে বাধিল না। দেখিয়া ত্রিলোচন কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল।

রোগী ক্রমাগত আসিতেছে, ব্যবস্থা লইতেছে, বিরাম নাই। এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিল

দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঝড়ের মত একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!'

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বাস্তবিকার অন্যতম সদস্য রাতুল। সহসা রাতুল রাহা হরিকুমারের স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব শহরে আসিলেন কি করিয়া? ঘর সুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যে সকল রোগীরা ক্ষণকাল পূর্বেও ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন তাঁহারাও নবাগত রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৌতূহলে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজ রাতুল রাহার দিকে একবার চাহিলেন—তাহার পর উঠিয়া আলমারী হইতে বেল কাঠের স্টেথস্কোপটি বাহির করিয়া রাতুল রাহার বুকে লাগাইলেন, রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ব্যথা! ব্যথা! বুক আর নেই—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কবরেজ মশাই।'

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিলেন, রোগী চুপ করিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, 'হুঁ! রোগ জটিল।'

রাতুল রাহা হতাশ হইয়া কহিলেন, 'সারবে কি? না ফাঁদে বদ্ধ হয়ে—'

ত্রিলোচন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'ভয় নাই। অবস্থা বল।'

রোগী কহিলেন, 'অবস্থা নেই আর। হৃদয়ের নাভিশ্বাস উঠেছে।'

ত্রিলোচন কবিরাজ চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, 'হুঁ। বল।'

রাতুল রাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'প্রেম আমার বুকে নীড় বেঁধেছিল—সেই ছোট বেলা থেকে। সেই নীড়ে হাজারো প্রেমপাখি ডিম ফুটে বেরিয়েছে। তারা জগৎ ঘুরে সবাই এখন হৃদয়-খাঁচায় আসতে চায়। কিন্তু ঠাঁই নাই,—ঠাঁই নাই!' বলিয়া রাতুল রাহা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'স্পষ্ট করে বল।'

রাতুল রাহা যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে একাদিক্রমে উনিশটি কুমারীকে তিনি প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে নিবেদিতাগণে অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা সন্ধান পাইয়া রাহা মহাশয়কে 'বাস্তবিকা' হইতে কুমারীগণের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন ; ফলে তাঁহার ইহলৌকিক জনক জননী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক বলিতেছেন যে রাহা মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এক বৎসরে একান্নটি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা পাইয়াছিলেন। শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটা আসন্ন সুতহিবুক যোগের সন্ধান করিতেছেন। ত্রিলোচন কবিরাজ খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, 'রোগ জটিল। রীতিমত চিকিৎসা আবশ্যক। তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যবস্থা বলিতে লাগিলেন, 'প্রাতে বৃহৎ প্রেমাঙ্কুশ-লৌহ পূর্ণমাত্রা ও পুরোহিত। নিসূদন রস-অর্ধবটি; মধ্যাহ্নে বিবাহ বিদ্রাবণ রস ও সন্ধ্যায় ঘটকাশনি ও খট্রাঙ্গাবলেহ। পথ্য প্রথম তিন দিবস লঙ্ঘন পরে অবস্থা মত।' ব্যবস্থা মত ঔষধ লইয়া যখন রাহা মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন হরিকুমারের বর্তমান সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে আমিও উঠিলাম। ত্রিলোচন কবিরাজ পিছন হইতে ডাকিলেন, 'অপেক্ষা কর।' ফিরিলাম, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, 'তোমাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।' বসিয়া রহিলাম। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রোগী বিদায় হইয়া গেল। তখন ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, 'তোমাকে এই প্রথম দেখিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মমতার সঞ্চার হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি এই ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেখিলে তো বিদ্বান বুদ্ধিমান খ্যাতিমান ধনী দরিদ্র কেহই এই নিদারুণ প্রেমব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

আমি যদি তোমাদের শহরে চিকিৎসালয় খুলিয়া না বসিতাম তাহা হইলে কি হইত তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। প্রথম যৌবনে এই ব্যাধি আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, গুরু দীক্ষা লইয়া উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তোমাদের নূতন নূতন

খানকয়েক উপন্যাস ও কবিতার বই পড়িয়া আবার দুই একটি উপসর্গ দেখা দিতেছে। কাজেই গ্রন্থপাঠ একরূপ বর্জন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বে এই দারুণ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ বলিয়াই বোধ হয় এত শীঘ্র রোগগ্রস্ত হও। পূর্বে যেখানে কণ্ঠাশ্লেষ ব্যতীত রোগোৎপত্তি হইত না সেখানে এখন একটি কটাক্ষই দেখিতেছি—আবার স্কুল কলেজ এবং নব্য সাহিত্যিক-সঙ্ঘে শাড়ির আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্যন্ত রোগবীজাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভবত পদশব্দ শুনিয়াই তোমরা মূর্ছা যাইবে।

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলাম। পকেটে পয়সা না থাকিলে এখনও গৃহিণীর আসিবার শব্দ শুনিলে মূর্ছার উপক্রম হয়, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, 'তুমি অদ্য যাও। তুমি রোগগ্রস্ত হও নাই, সুখের কথা কিন্তু এ ব্যাধিসঙ্কুল নগরে যেখানে মেয়ে স্কুলের গাড়ি হইতে বায়স্কোপের ছবি পর্যন্ত এই দারুণ রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে, সেখানে রোগগ্রস্ত হইতে বেশী সময় লাগে না। সাবধানের বিনাশ নাই, কাজেই প্রতিষেধক মদনমর্দন বটি ও কটাক্ষারি অঞ্জন লইয়া যাও। সপ্তাহে একটি করিয়া বড়ি শীতল জল সহ সেবন করিবে ও প্রত্যহ চক্ষে কটাক্ষারি অঞ্জন একবার করিয়া লাগাইবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, রোগিণীরা অপেক্ষা করিতেছেন।' আমি প্রণাম করিলাম। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া প্রথমেই দ্রুতপদে কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল অনুপানে ত্রিলোচন কবিরাজের একটি বটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজন সংক্রামক সর্বপ্রকার চিন্তা তিরোহিত হইল, গৃহিণীর কথাও ভুলিয়া গেলাম। মনে হইতে লাগিল জগতে আমি একাকী—আমার কেহ নাই, কেহ নাই, কেহ নাই।"

সম্মুখে দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতে লাগিলেন।*

* এই রচনা প্রেসে দিবার পরই আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাদের বুড়া কম্পোজিটার হইতে আরম্ভ করিয়া দপ্তরীর নয় বৎসরের ছেলেটি পর্যন্ত ত্রিলোচন কবিরাজের ঠিকানা জানিবার জন্য বার বার করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। এমন কি প্রসিদ্ধ মুষ্টিবীর অবলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্র তাত্ত্বিক বৈকুণ্ঠ চাটুয্যে, কেলটিকসভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক বারিদবরণ চৌধুরী, সংবাদপত্র সেবক ঔপন্যাসিক উৎফুল্ল দত্ত, প্রসিদ্ধ পাঁচালী-গায়ক স্বর্ণবণিককুলতিলক ভবভূত লাহা পর্যন্ত পত্র লিখিলেন। রচনায় ঠিকানা না থাকাতে—অবস্থা বুঝিয়া আমরা শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্মার নিকট পত্র লিখি। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—

"গৃহিণী কর্তৃক তাড়িত হইয়া সমস্ত জগতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি হইতে বাহির হই। শেষে ক্লান্ত হইয়া গয়লামাসীর খোলার ঘরের বারান্দায় চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়ি। নিদ্রিত অবস্থায় ত্রিলোচন কবিরাজকে স্বপ্নে দেখি এবং বাড়িতে ফিরিয়াই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলি। রচনাটি তাহাই। তবে ভরসা আছে স্বপ্ন ফলিবে—যেহেতু ত্রয়োদশীর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছি এই কথা বলিয়া আপনার বন্ধুদিগকে ভরসা দিবেন। ইতিমধ্যে পারিবারিক তাড়নার ফলে যদি পুনরায় স্বপ্ন দেখি তবে ত্রিলোচন কবিরাজকে তাঁহার পার্থিব ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা করিব। ইতি—শ্রী দিবাকর শর্মা।"

সম্পাদক, শঃ. চিঃ.

আশ্বিন ১৩৩৮

তারিখ-ই-বাঙ্গালা

দিবাকর শর্মা

বন্ধুবর আলী আহাম্মাদ মজলিসের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় ইতিপূর্বেও পাইয়াছি, সম্প্রতি তিনি একটি নূতন পরিচয় দিয়াছেন। বন্ধুবর ইতিহাস চর্চা করিয়া থাকেন তাহা জানিতাম না; কিন্তু গতকল্য তিনি সংশোধনের জন্য আমার কাছে তাঁহার রচিত একখানি ইতিহাস বহির পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছেন, পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি এবং ততোধিক চমৎকৃত হইয়াছি তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দেখিয়া। বহিখানির মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "কেতাবখানি ১৮৪৬ হিজরীতে (অর্থাৎ পাঁচশত বৎসর পর) মুলুক বাঙ্গলার মক্তবগুলিতে পড়ান হইবে।"

আমি সংশোধন কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না, যেহেতু ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বন্ধুবরের মত আমার নাই; তথাপি, বর্তমান কালের পাঠকগণকে ভবিষ্যতের রস আস্বাদন করাইবার জন্য প্রথম কয়েকখানি পাতা বাঙ্গালা প্রণালীতে (যেহেতু বহিখানি ফারসীর মত ডান দিক হইতে লেখা) নকল করিয়া পাঠাইলাম।

বহিখানির নাম "তারিখ-ই-বাঙ্গালা।"

নিবেদক—শ্রী দিবাকর শর্মা।

"তারিখ-ই-বাঙ্গালা"

(কেতাব ছুরু)

"এই যে নকসা দেখিতেছ ইহার নাম **বাঙ্গালা মুলুক**। এই দেশের উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে সমন্দর পূর্বে আছাম ও পশ্চিমে বিহার শরিফ। সেকালে এই দেশে হিন্দু নামে এক জাতি বসতি করিত; তাহারা বোত্‌পরস্তি করিত; ইঁট পাথরের মুরত গড়িয়া তাহাকে ছেজ্‌দা করিত। আজ সহর কলিকাতা যেখানে তোমাদের দেশের বাদ্‌শাহ বাস করেন সেইখানে তাহাদের এক বোত ছিল তাহার নাম কালী। আজ যেখানে বাঁটু জুতাওয়ালার মছজেদ দেখিতে পাইতেছ সেইখানে ঐ বোতের ঘর ছিল।

ঐ হিন্দু জাতির অনেক গুণ ছিল; তাহারা এলেম শিক্ষা করিত, ফেরিঙ্গি লফ্‌জে চেল্লাইতে পারিত, খবরের কাগজ লেখিতে পারিত। তখন মুলুকের বাদশাহ ছিল ফেরিঙ্গি। হিন্দুরা ফেরিঙ্গি বাদ্‌শাহের বড় বড় নওকরী করিত। ফেরিঙ্গির আগে মোছলমান দেশের মালিক ছিল; হিন্দুকে নওকরী করিতে দেখিয়া বাদ্‌শাহের জাত মোছলমান খাপ্পা হইয়া উঠিল। মোছলমানের ছরিফ আদমীরা ভাবিৎ হইয়া উঠিলেন। এই কালে আল্লাহ্ মোছলমানকে দোয়া করিলেন। ফেরিঙ্গি ছরকার হুকুম করিলেন যে মুলুকের আদমী সব আপন আপন লোগ ঠিক করিয়া মুলুক বাঙ্গালার মজলিসে পাঠাইবে, হিন্দুর তরফ হইতে আলাহিদা, মোছলমানের তরফ হইতে আলাহিদা লোগ যাইবে, এহা মোছলমানের পক্ষে খোদায়াতালার নেয়ামতের মাফিক হইল। তখন হিন্দুদের সঙ্গে ফেরিঙ্গি ছরকারের বনিবনাও ছিল না; মজলিসে ছরকারকে জব্দ করিবার কারণ একদল হিন্দু মোছলমানের সঙ্গে দোস্তি করিল, মোছলমানের সকল বাহানায় রাজী হইল। এদিকে মোছলমানের আলেমগণ ফতোয়া জাহের করিলেন যে হিন্দুর বাজানা শুনিলে মমিন মোছলমানের গোনা হয় ও তাহার বিবি তালাক হইয়া যায় আর হিন্দুর বিবিকে জোর করিয়া নেকাহ করিলে ও তাহার বোতের মাথা ভাঙ্গিলে মোছলমানের ছোয়াব হয় ও বেহেস্তে পরীরা তাহার এন্‌তেজার করিয়া থাকে;

ছরিফ ও আলেম মোছলমানগণের এই ফতোয়া মাফিক গাঁও মুলুকে তখন মোছলমানেরা হিন্দুর সাথ জেহাদ ছুরু করিল। আন্ধার রাতে হিন্দুর বিবিকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হিন্দুর দেওরের দরগা ভাঙ্গিয়া অনেক মোছলমান গাজী হইল। মোছলমানের গোস্‌সা হইবে বলিয়া মজলিসের হিন্দু 'ওম্‌রা'রা কিছু কহিল না। এই কালে ফেরিঙ্গি ছরকারও মজলিসে হিন্দুর সাথ লড়াই করিবার কারণ মোছলমানের সাথ আপস করিলেন। এই দোতরফা গজবে পড়িয়া গাঁওয়ালী হিন্দুরা দলে দলে সহর মুলুকে আসিতে ছুরু করিল। গাঁওমুলুকে মোছলমান মালিক হইল। দুইচারিজন নজীব হিন্দু তখনও গাঁও ছাড়িল না। তাহাদিগকে শাএস্তা করিবার কারণ মোছলমান আলেমলোগ এক ফন্দী করিলেন।

হিন্দুর মধ্যে দুই জাতি ছিল, রেইস ও রাজীল। মোছলমানগণ গাঁওয়ে রাজীল হিন্দুর পক্ষ লইলেন। রাজীল হিন্দুর মধ্যে একদল লোক ছিল তাহাদের নাম নমঃশূদ্র। মোছলমানেরা তাহাদিগকে ডরাইত! এই রাজীল হিন্দুরা মোছলমান মৌলবীর শল্লাতে ছরিফ হিন্দুর জমিন্ আবাদ করা ছাড়িয়া দিল; তাহাদের মধ্যে এলেমদার যে দুই একজন লোক ছিল তাহারা ওকালতি পেশা কবিত; ছরিফ হিন্দুদের জব্দ করিতে পারিলে পেশাতে তাহাদের সুবিস্তা হইবে বলিয়া সভা জমায়েৎ করিয়া তাহারাও এই কাজে সায় দিল। এইবার নজীব হিন্দুর বদ্‌হালের এক শেষ হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া গাঁওমুলুক একেবারে ছাড়িয়া দিল; গাঁওয়ে গাজী মোছলমানের কামের জেকের জবাব দেনেওয়ালা হিন্দু থাকিল না; তখন হোশিয়ার মোছলমান রাজীল হিন্দুর ঘাড় মটকাইতে লাগিল, তাঁহারা হএরাণ হইয়া জমিন্ ঘরবাড়ি চাষ আবাদ ছাড়িয়া পলাইয়া সহরে আসিতে লাগিল; বাঙ্গালায় গাঁওমুলুকে এইভাবে মোছলমান লড়াই ফতে করিয়া দখল পুরা করিল।"

মজলিস মিঞার তারিখ-ই-বাঙ্গালার প্রথম অধ্যায় এইখানে শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাণ্ড, তাহাতে বিস্তর ঐতিহাসিক তথ্য আছে, তাড়াতাড়িতে নকল করিয়া পাঠাইতে পারিলাম না। ইতি শ্রী দিবাকর।

আশ্বিন ১৩৩৪

গেঁড়াতলা সাহিত্য

দিবাকর শর্মা

গ্রন্থ সমালোচনা

দশ গুলাব। পয়ারে রচিত কবিতার কেতাব! বড় ভাল বহি। ইহাতে দশটি মন মাতান কেচ্ছা আছে। অনেক ভাল ভাল উপদেশও আছে। কেতাবের লিখক মুন্সী আবদাছ্ ছোব্‌হান; খরিদা সূত্রে দখলিকার বদরুদ্দীন শেখ প্রকাশক। ঠিকানা ৬৫নং গেঁড়াতলা লেন, কলিকাতা। সর্বত্র পাওয়া যায়। সমালোচনা লিখিবার আগে পাঠকগণের জন্য পহেলা কেচ্ছা তুলিয়া দিলাম।

শ্রীশ্রীহককনাম

পয়ার

পহেলা করিনু সুরু রহিমের নামে।
যিনি বিনে কেহ নাই আছ্‌মান জমিনে*
আরস কোরস আর বেহেস্ত আফ্‌তাব।
জার নুরে হইল পয়দা দোজখ মহাতাব*
করে বড় দয়া আল্লা বান্দার উপর।
রহিম রহমান নাম এ কারণ তার*
যত কিছু চিজ আছে এ দোন জাহান।
তার নুরে হইল পয়দা আলম তামাম*
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন যায় বৃথা।
আজ্‌রালে পাক্‌ড়ালে ভাই তখন যাবে কোথা*
আল্লা নবি বল ভাইরে জাত নেকজাত।

ত্রিপদী

কহি থোড়া বছারত আর গেনোদার বাত*
আকবার গঞ্জের গ্রামে মুখুন্দ মুরালি নামে
ব্রামণ মৌলবী তথা ছিল।
ওাজ আর নছিহতে পয়সা পাইত কোনো মতে
এইরূপে দিন গোজারিল*
তাহার আওরাৎ ছিল দেখিতে ছুবত ভাল
গেনোদা তাহার নাম ছিল।
মরিলে প্রাণের পতি বিধবা হইয়া ছতী
আঁখের পানিতে ভাসাইল*

(এইস্থানে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী হিন্দু বিধবার দুঃখের কাহিনী আছে। অত্যধিক করুণ রসাত্মক বলিয়া মৌলবী সাহেবের আপত্তি সত্ত্বেও উহা বাদ দিলাম। ইতি শ্রীদিবাকর।)

* * *

এই মত মুখুন্দের বিবীর দিন কাটে।
ভাত আর আনাজখানা গোস্ত নাহি মোটে*
দিনে হাত্তা খায়ে ফেরে ছাএর করিয়া।
রাতেতে কাঁদেন বিবী ঘরেতে বসিয়া*

এক রোজ ফজরেতে বিবী নাস্তা খায়।
পথ দিয়া বছারত চৌকিদার যায়*
চৌকিদার দেখে বিবীর আসক হইল।
তুরিত উঠিয়া তার হাত ধরে টানিল*
মহব্বতে বছারতে চেটাইতে বসাইয়া।
কয় বিবী নয়নের মণি কর দয়া*
কহে তবে বছারত খোসালিত মন।
তুমি যে কাফের হও আমি মোছলমান*
এস্‌কের তীর জদি বিঁধে থাকে জান।
নবির কলেমা পড়ে হও মোছলমান*
তবে বিবী নাস্তা খাইল হইয়া দেলগির।
তারপর সড়কেতে হইল বাহির*
নিলাম্বরি পড়ে বিবী আগে আগে যায়।
শানাই শিরিঙ্গা কত তেনার পাছে যায়*
গেনোদা আর বছারত মস্‌জেদে উঠিল।
সতেক আলেম মোল্লা আসিয়া জুটিল*
নবির কলেমা পড়ে হইল মোছলমানী।
বছারতের হইল বিবী মুখুন্দের গিরিণি*
আল্লা আল্লা কয় সবে হইয়া বড় খুসী।
বছারতের খানার জন্য দিল এক খাসী*
সাঁঝ হইলে গেল বিবী বছারের মকান।
পোলাও কাবাব কোর্মা খায়ে খোস্‌জান*
বছারতে দিল নবাব জাগীর এনাম।
বছারত গেনোদার কেচ্ছা হইল তামাম*

(আমার মনে হয় গেনোদা = জ্ঞানদা, ব্রামণ মৌলবী = ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মুখুন্দ মুরালি = মুকুন্দ মুরারি। অনুমান সত্য কিনা জানি না। শ্রীদিবাকর)

এইক্ষণে পাঠকেরা দেখিলেন কেমন মনমহিনী কবিতা! আমি এইরূপ একশত পাঁচিশখানা কেচ্ছার বহি পাইয়াছি। এবং পড়িয়া বুঝিতেছি যে এইসকল কেতাব মোছলমান সমাজের বহুৎ উপকার করিতেছে; কারণ এইসব বহি বাজারে এত চলন না হইলে মফঃস্বলের অশিক্ষিত মোছলমান ভাইগণ হিন্দু স্ত্রীলোকের দুঃখ ঘুচাইতে এমন দল বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন না। মোছলমান এলেমদার ভাইগণের উচিত এইসব কেচ্ছার বহির ইংরাজী তর্জমা করা; যাহাতে ইস্কুলে ইহার প্রচলন হইতে পারে।

মওলবী আলি আহাম্মাদ মজলিস্

নিবেদন—

মৌলবী সাহেবের অনুমান যথার্থ। আমি মাঝে মাঝে যখন দুপুর বেলায় গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাই, তখন দেখি মাঠের মাঝে বুড়া বটতলায় রাখাল কৃষাণদের বৈঠক বসিয়াছে। এইরূপ কেচ্ছার বহি একজন সুর করিয়া পড়িতেছে আর জন পাঁচিশ শ্রোতা তাহাকে ঘিরিয়া পরম আনন্দে কাহিনী উপভোগ করিতেছে। এতগুলি লোকের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারজন শ্রোতারও যদি এই কেচ্ছা শুনিয়া সমাজের সেবার জন্য আগ্রহ হয় তবে কত বড় আশার কথা! ইতি—

শ্রীদিবাকর শর্মা

সাহিত্য-বিভ্রাট

শ্রী বররুচি

সাহিত্যের ইভলিউশনে আমরা এক ধাপ্ উঠেছি কি এক ধাপ নেমে গেছি; তাই নিয়ে আজকাল সাময়িক সাহিত্যে একটা তুমুল আন্দোলনের ঝড় উঠেছে। ডারউইন্-পন্থীরা হতাশভাবে বলছেন যে, আমরা একেবারে আমাদের পূর্ব পশুত্বের পদবীতে ফিরে চলেছি, কিন্তু প্রগতিবাদীরা এ কথা কিছুতেই স্বীকার করেন না।

এই আন্দোলনের ফলে সাহিত্য-সরস্বতী অতিষ্ঠ হয়েছেন কিনা জানি না; তবে সাহিত্যের বড় সম্রাট্, ছোট সম্রাট্, সুবাদার, তালুক্দার প্রভৃতি সকলেরই আসন যে বিচলিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রতিষ্ঠিত প্রতিপত্তির উপর দাঁড়িয়ে পূর্বপক্ষ হাহাকার ক'রে বলছেন—সর্বনাশ হ'ল, সুকুমার সাহিত্য গেল! তরুণদলের বিপক্ষে অভিযোগের বিষয় অনেক, কিন্তু প্রধান আক্ষেপ এই যে, তারা সাহিত্যকে মানসিক উর্ধ্বলোক থেকে দৈহিক কামলোকে নিয়ে চলেছে। বর্তমান সাহিত্য যে শুধু আলস্যজাত, এবং স্বল্পবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞানের ফল, তা নয়, এর মধ্যে যে আদর্শহীন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং কুৎসিত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট হয়েছে।

উত্তর পক্ষ আত্মরক্ষার জন্য বলছেন—তোমরা যে গতযুগের সাহিত্যের জের টেনে এসেছ, তাতে এখন আর জোয়ারের টান নেই, ভাঁটা শুরু হয়েছে; তাই আমরা ভাবের ও ভাষার নূতন উৎস খুলে দিয়েছি। হয়ত এ স্রোত একটু আবিল, কিন্তু ইহা অবাধ স্বাধীনতার মুক্তধারা। সাহিত্যের সীমানা নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ নাই, সকলেরই সব বিষয়ে কথা কইবার অধিকার আছে। কুৎসিত-অকুৎসিতের তর্ক খাটে না। কতগুলি পচা নজীর ও মামুলী শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়ে জীবনটাকে খর্ব করা কাজের কথা নয়। এই তরুণদের অভিযান যদি বৃদ্ধ পাণ্ডাদের ভাল না লাগে, তাঁদের জন্য পিঁজ্‌রেপোল তো খোলাই রয়েছে।

সাহিত্যের বড় সম্রাট্ দুঃখিত হয়ে বললেন—আহা, তোমরা ছেলেমানুষের দল, সাহিত্যধর্ম জিনিসটাই বুঝলে না। বস্তুরস ও কাব্যরস—এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সজিনা-ফুলে বস্তুরস আছে, কিন্তু কাব্যরস নেই। দেহধর্মটা সাহিত্যধর্ম নয়। বিষয়বুদ্ধিটা একটু খাটো ক'রে সাহিত্যবুদ্ধির culture করো।

এই কথা শুনে উকিল-ঔপন্যাসিক ব্যাঘ্রবিক্রমে হুহুঙ্কার ক'রে defence তরফ থেকে আরজি পেশ করলেন—হে সাহিত্যসম্রাট, আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাই ব'লে আপনার obiter dicta মেনে নেওয়া চলে না। আপনি যে সাহিত্যধর্মের ব্যাখ্যা করলেন তার নজীর কোথায় এবং সাহিত্যের কোন্ ধারায় সেটা define করা হয়েছে? আপনার ডিক্রি আপীলে টিকবে না।

কিন্তু হায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের আদালতে জজ কোথা, যে আপীল চলবে, সকলেই যে জুরী। তবুও কোনো কবি-সমালোচক পূর্বপক্ষের সুদীর্ঘ সওয়াল জবাব দিয়ে বললেন—তোমাদের আছে শুধু সনাতন জ্যাঠামি ও অধুনাতন ন্যাকামি। এই পুঁজি নিয়ে শিব গড়া যায় না, বাঁদর গড়া যায়। শুকদেব মাতৃগর্ভে ব'সে বেদগান করেছিলেন, কিন্তু তোমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই প্রাক্তনবিদ্যার ফলে অথবা ফ্রয়েড-কথিত complex রূপ সংস্কারের জোরে উর্বশী মেনকা রম্ভার যে স্তব জুড়ে দিয়েছ, তাতে আর কারো উপকার না হোক, অনেক ছাপাখানার

খোরাক্ জুটছে। কালিদাস নিশ্চয়ই ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন তা নইলে অশিক্ষিতপটুত্বের ধারণাটা কোথায় পেলেন?

ইতিমধ্যে সাহিত্যের ছোট সম্রাট্ একবার "সিংহে"র মুখে প'ড়ে এতদিন সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু একটি দুষ্ট ছোকরা নাকি সম্প্রতি তাঁর পূর্বমত উদ্ধৃত ক'রে তাঁকে উকিল-ঔপন্যাসিকরূপ ব্যাঘ্রের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তবুও তিনি ভক্তবৎসল; এহেন বিপত্তিমুখেও তিনি বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে আসরে নেমে বরাভয় কর বিস্তার ক'রে বললেন—হে তরুণদল, মা ভৈঃ, আমি আছি। তোমরা লিখে যাও। এখন তোমাদের কেউ চিনবে না, কিন্তু "কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।" চুম্বন ও আলিঙ্গন সম্বন্ধে, ঘটিরাম ডিপুটির মতো আমার কোনো প্রেজুডিস্ নেই; তবে ওটা আলগোছেই ভাল। তোমরা চুম্বন মুদ্রিত কোরো, কিন্তু প্রকাশিত কোরো না। আর, দাদাঠাকুরের যদি বুড়াবয়সে ভীমরতি হয়ে থাকে, সেটা আপশোষের কথা বটে। তা হোক, তোমরা তো আছ—আমার সাহিত্যিক প্রৌঢ় জীবনের সম্বল। সজিনাফুল দাদাঠাকুরের কবিতায় চলতে না পারে, আমার উপন্যাসে আলবৎ চলবে।

কোন কবি আত্মশক্তিতে নির্ভর ক'রে উচ্ছ্বাসের ভরে ব'লে উঠলেন—হে ছোট সম্রাট্, কথাগুলো ভাল হ'ল না; তব একবার তোমার পায়ের ধুলোটা দাও!

উত্তরাপথের অধ্যাপক 'উত্তরা'য় উত্তর করলেন—যদিও আমার রুস্ বান্ধবী নেই, তবু বেকনের মত আমার সর্বশাস্ত্রে অধিকার আছে ব'লে, রুস্-সাহিত্যটা আমার বেশ পড়া আছে। এবং তাই থেকে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি যে, এ পর্যন্ত যা সাহিত্য ব'লে বাহবা পেয়েছে তাহা সাহিত্যই নয়। তাতে দরিদ্রনারায়ণের ক্রন্দন নেই; কর্মের গান ও ঘর্মের ঘ্রাণ নেই; মুটে মজুর কুমোর কামারের 'খোসাওঠা' মুখের বর্ণনা নেই; এ বন্দরে মাস্তুলভাঙ্গা পাল-ছেঁড়া হালখসা জাহাজ ভিড় করে না;—এক কথায়, এই সাহিত্য একেবারে শুকনো, চিম্‌সে, ছাতাধরা, লজগজে পচা। Twentieth centuryতে একে কোনোমতে মেনে নেওয়া যায় না। অতএব হে তরুণদল, তোমাদের ভাষা খোঁড়া ও ভাব নুলো হ'লেও নয়া বাঙ্গালার ফাটা ফুসফুসের কাহিনীর পক্ষে এই হচ্চে ধারালো ভাষা।

এই আন্দোলনের মধ্যে একটা মজার কথা এই যে, বড় সম্রাট্ থেকে ছোট সম্রাট্ পর্যন্ত সকলেই আক্ষেপ করেছেন—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। যদি সকলেই এই বচন আওড়ান, তবে অরসিক তো সবাই, রসিক জনটি কে ঠিক বোঝা গেল না।

আমরা সবাই মিলে সাহিত্যের জাতবিচার করতে ব'সে গেছি; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে কোনটা অভিজাত, কোনটা ব্রাত্য আর কোনটা পতিত তাব কিছুই ধারণা হ'ল না। এই নবপণ্ডিতদের বিচার অনেকটা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বিচারের মতো লাগছে; চুলচেরা তর্ক, তত্ত্ববিচার, গালিগালাজ—কিছুরই অভাব নেই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কাকেও এক-ঘরে করতে পারা গেল না। সোরগোল ক'রে আসরটা জমেছে বটে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন যে, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াটা অজাযুদ্ধেই শোভা পায়—মানুষে করে না।

বর্তমান সাহিত্যকে নিন্দা করা যেমন সহজ, প্রশংসা করাও তেমনি কঠিন। দলাদলি অথবা ভাল লাগা ও না-লাগার কথা ছেড়ে দিলেও, বর্তমান জিনিসটা আমাদের এত পরিচিত যে সেইটাই সবচেয়ে অপরিচিত। অতীতের সালতামামি করা কঠিন নয়, কিন্তু বর্তমানের হিসাবনিকাশ তো এখনো চোকেনি, সুতরাং জমা খরচটা সম্পূর্ণরূপে খতিয়ে দেখা যায় না।

অতি-আধুনিক লেখকেরা এখনো ডিপ্লোমা পাননি, পরীক্ষা হয়নি, মূল্য নির্ধারণের সময় আসেনি,—অনেকের undergraduate অবস্থাও পার হয়নি,—সুতরাং বর্তমান বহুভাষী ও বহুরূপী সাহিত্যটাকে নিজের রুচি অথবা রসবোধ দিয়ে যাচাই ক'রে নিতে হয়।

কিন্তু যে সাহিত্যের মধ্যে সত্যিকার প্রেরণা আছে, তাব একটি গুণ এই যে, সেই প্রেরণা পাঠকের চিত্তেও সংক্রামিত হয়। যদি লেখকের কল্পনা ও অনুভূতি পাঠককে তদ্ভাবে ভাবিত

না করে, তবে সে রচনা মিথ্যা,—লেখকের প্রাণে সত্যিকার প্রেরণা জাগেনি, তিনি শুধু পুঁথিপড়া তত্ত্ব, বা ধার-করা মতবাদ আপনার ব'লে চালাচ্ছেন। এর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নেই, অনাসৃষ্টির অহঙ্কার আছে।

শিক্ষার গুণে আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রবৃত্তি জন্মেছে বটে, কিন্তু শিক্ষার দোষে সাহিত্যসৃষ্টির শক্তি আসেনি। যাঁরা শিক্ষাটাকে একেবারেই বাদ দিতে চান, তাঁদের ছেড়ে দিলে, আমরা দেখতে পাই যে, কতকগুলি শিক্ষালব্ধ abstraction নিয়েই আমাদের সাহিত্যিক কারবার। কিন্তু যে জিনিসের সঙ্গে দেহ-প্রাণের যোগ নেই, তাকে শুধু নেশার ভিতর দিয়ে জাগিয়ে রাখা দরকার হয়।

বিদেশী ভাব-কল্পনার উত্তাপে আমরা সাহিত্যে যৌনতত্ত্ব ও মুটে-মজুর আমদানী করেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এর মধ্যে কি সত্যসত্যই আন্তরিক অনুভূতি আছে, না এটা পরের মুখে ঝাল খাওয়া মাত্র। যৌনতত্ত্বটা কিছু নূতন নয়; কিন্তু তত্ত্ব জিনিসটা সাহিত্য নয়, একথা ভুললে চলবে না। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর স্বরূপ, এর মধ্যে প্রপঞ্চ নাই, রূপ নাই, রস নাই। সাহিত্য ক'রে গড়তে হ'লে, একে জীবনের ভিতর দিয়ে আনতে হবে। শুধু ক্ষুদ্র লালসার আক্ষেপ যৌনতত্ত্ব নয়; শুধু "শৃঙ্গারের-হিয়া" "রমণীরমণ" "কামকন্টক ব্রণ" লিখলেই চলবে না।

উদাহরণের অভাব নেই ব'লেই উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ঘুমন্ত মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সৃষ্টি-উন্মত্ত সন্তানের মনে পূর্বজন্মের প্রিয়ার স্মৃতি জেগে উঠল—এই কথা নাকি কোন তরুণ লেখক গল্পের মধ্যে লিখেছেন ; ভক্তের দল নাকি বাহবা দিয়ে বলেছেন,—কি চমৎকার। Ædipus complexএর কি অপূর্ব ব্যঞ্জনা! এর উপর টীকা করা বাহুল্য। ফ্রয়েড যদি জানতেন যে, বাঙ্গালী সাহিত্যিকদল তাঁর মতবাদের কিরূপ সদ্ব্যবহার করছেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

এইটি আমাদের মস্ত ভুল যে, শুধু মুখস্থ-করা একরাশ ভাব সংগ্রহ ক'রে উপন্যাস বা কাব্য রচনা করতে বসেছি। পরের দেখা বা পরের পাওয়া তত্ত্বকে যারা শুধু কল্পনায় ও চিন্তায় জেনেছে এবং সেই জানাকে পাওয়া ব'লে ধ'রে নিয়েছে, তাদের রচনায় ভাব অর্থবাণ, শব্দ মূর্তিমান হয় না। তার মধ্যে মনের সৌখীনতা আছে বটে, কিন্তু প্রাণের অনুভূতি নাই।

আজকালকার সাহিত্যে realismএর দিকে একটা ঝোঁক হয়েছে, একথা সত্য ও আশাপ্রদ। গত যুগের সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ ভাবপন্থী। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম উত্তেজনায়, বাস্তবকে ছেড়ে না দিয়েও, আমরা বাস্তব থেকে অবাস্তবে স্বপ্নপ্রয়াণ করেছিলুম। বর্তমান সাহিত্যে অবাস্তব থেকে বাস্তবের দিকে ফিরে আসবার লক্ষণ দেখা যাচ্চে। কিন্তু এ realism যতদিন প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধ না হয়, ততদিন একে সত্য ব'লে চালানো বিড়ম্বনামাত্র। আর্ট তো দূরে থাকুক, জীবনকে আমরা এখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখিনি। বর্তমান সাহিত্য, জীবনকে অস্বীকার না করতে পারে, কিন্তু জীবনকে যথেষ্ট কুণ্ঠিত ও অপমানিত করেছে।

দর্শনের ন্যায় সাহিত্যেও প্রস্থানভেদ বা মার্গভেদ আছে, কিন্তু সঙ্গীতের মত সাহিত্য যে একটা শিল্পকলা, এ কথা ভুলে গেলে অপমার্গে প্রস্থান করাই সহজ হয়ে যাবে। মনের আনন্দে গান গাইলেই সঙ্গীত হয় না; মনের আবেগে লিখে গেলেই সাহিত্য হয় না। নূতন experiment করবার অধিকার আমাদের আছে; কিন্তু experimentএর অর্থ পরীক্ষা, সৃষ্টি নয়। বিদেশের সমাজদ্রোহ, মিথুনসমস্যা অথবা মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি নিয়ে সাহিত্যের কাঠামো গড়া মন্দ exercise নয়, কিন্তু ইহা রচনার বিলাসিতামাত্র।

অবাধ স্বাধীনতা কথাটাও মন্দ নয়, কিন্তু একে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর করলে চলবে না। প্রাণের মধ্যে যদি উদ্দাম শক্তি থাকে, তবে আত্মপ্রকাশের জন্য আর্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করা অশোভনীয় নয়। কিন্তু বিদ্রোহের জন্যই বিদ্রোহ করা আর 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে যাত্রার

আসরে নেমে বীররস জমানো—প্রায় একই কথা। যাঁদের দেশের সঙ্গে পরিচয় নেই, জাতির সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নেই, জীবনটাকে একবার যাঁদের ভাল ক'রে দেখবার অবকাশ হয়নি, তাঁদের কালাপাহাড়ী ঢংটা নিস্তেজ হৃদয়ের কাল্পনিক উত্তেজনাসুখ মাত্র।

ইংরাজী সাহিত্যে এই অবাধ স্বাধীনতার ফলাফল দেখেও আমরা শিখতে পারিনি। একদিকে যেমন প্রতিভাশালী লেখকের হাতে এই স্বাধীনতা অপূর্ব বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য লাভ করেছে, তেমনি সাধারণ লেখকের রচনায় ইহা অসংযত ও শিথিল স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়েছে। এই আর্টহীন অযত্নপ্রসূত ইংরাজী journalistic styleএর কল্যাণে আমাদের সাধারণ রচনারীতিতেও অসংযম ও শৈথিল্যের অভাব নেই।

তরুণদল বলবেন—এ সব কথা তো আমরাও জানি। সৌন্দর্যতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরাও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করতে পারি। সত্য কথা, কিন্তু শুধু জানলেই হবে না, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে হবে। যদি এ কথা তাঁরা সত্যসত্যই বোঝেন, তবে কেন তাঁদের রচনা আমাদের মর্মস্পর্শ করতে পারে না? তাঁদের হৃদয়ভাণ্ডে অগ্নি-আবেগ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের অর্ঘ্য অকিঞ্চিৎকর ভস্মাবশেষ মাত্র।

চেঁচিয়ে না বললে কেউ শোনে না, তাই গলাবাজির বহরটা বেড়েছে, কিন্তু যদি বলবার কিছু না থাকে, তবে শুধু চেঁচিয়ে বা অনর্থক পথের ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি?

লাভ কি, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে যে অস্বাস্থ্যকর বেনো জল বেড়ে যাচ্ছে সেটা যখন নেমে যাবে, তখন কি তার তলায় আমরা পলিমাটির স্তর দেখতে পাব? যুগে যুগে অনাচার ও স্বেচ্ছাচারের ভিতর দিয়েই সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে; এ যুগেও কি তাই হবে?

যাঁরা সাহিত্যের সর্বনাশ হ'ল ব'লে আক্ষেপ করছেন, তাঁদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যা কিছু লেখা হচ্ছে তার সবই যে টিকবে এমন কিছু নয়। ক্ষীণজীবী সাহিত্য অমর হ'তে পারে না। Many are called, but few are chosen. হয়তো দুএকটি এরণ্ডকে সাহিত্যের নবীন পাণ্ডারা সিঁদুর মাখিয়ে বটবৃক্ষ ব'লে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন; কিন্তু গতযুগের ও বিশ্বসাহিত্যের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, সে এরণ্ড এরণ্ডই থেকে যাবে, সাহিত্যদ্রুম ব'লে গ্রাহ্য হবে না। যখন মনের কলের নূতন উত্তেজনার দম ফুরিয়ে যাবে এবং যখন গলাবাজি করলেও কেউ শুনবে না, তখন এই amateurish গোলমাল আপনাআপনি থেমে যাবে। মণি ফেলে কাচের জৌলুষে মানুষ চিরকাল মুগ্ধ থাকতে পারে না, সুতরাং ভয়ের যে বিশেষ কারণ আছে তা বোধ হয় না।

আধুনিক অজস্র অপক্ক বা অকালপক্ক রচনার মধ্যে যে একটা আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা দেখতে পাওয়া যাচ্চে, সেইটুকুই আশার কথা। বাঙ্গালী জাতির হৃদয়-মনের সমস্ত শক্তিই যে নিঃশেষ হয়ে গেছে, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। এ পর্যন্ত সাহিত্যে এই শক্তি আংশিক ভাবে ব্যক্ত হয়েছে; সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশই আমাদের সাধনার বিষয়। এ সকল অনাচার বা স্বেচ্ছাচার সত্য নয়, মিথ্যা; কিন্তু এই মিথ্যার ভিতর দিয়ে বোধ হয় সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষা হচ্চে। তাতে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে, ভাবের অন্তরে কতটা সত্য আছে, তা নির্ধারিত হয়ে যাবে। আমাদের সাহিত্য এখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু এই গ'ড়ে তোলবার চেষ্টার মুখে যে-সকল বিঘ্নবিপত্তি রয়েছে, তা চিরকাল থাকবে, এবং তা' না থাকলে এ গঠন-কার্য সুসম্পন্ন হবে না।

এইটুকু ভরসার কথা যে, আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করি বা না করি, ভাবী সাহিত্য-স্রষ্টার জন্য সোরগোল ক'রে আসর জমিয়ে সকলকে সজাগ ক'রে রাখছি।

কার্তিক ১৩৩৪

মাইকেলবধ-কাব্য

সজনীকান্ত দাস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত্যন্ত হতভাগ্য ছিলেন এবং তিনি নিতান্ত অকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কালে বাংলা কবিতার এমন ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, কান্তিচন্দ্র, নজরুল, বিনয়কুমার, দিলীপকুমার, সুধীন্দ্রনাথ, সমর ও হীরালাল প্রভৃতি ছন্দবিদেরা তাঁহার পরবর্তীকালে জন্মিয়া 'ফ্লারিশ' করিয়াছেন এবং হরপ্রসাদ, নগেন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র, বসন্তরঞ্জন,ফাদার হস্টেন ও সুনীতিকুমারের পুরাতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার ফলভোগ করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হয় নাই—অর্থাৎ বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপুরাণ, পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকা, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, ময়নামতীর গান, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত ভাষা ও ছন্দের রূপ তিনি দেখেন নাই। ক্ষিতিমোহনবাবুর দৌলতে মীরা-দাদুর হিন্দী দোঁহার রূপও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। তিনি স্বয়ং আবাল্য ইংরেজী ফরাসী লাতিন শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দরুন তৎকালে প্রচলিত টপ্পা, কবি, হাফ্-আখড়াই, পাঁচালী, রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতিরও সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ভার্জিল, দান্তে, মিল্টনের ব্লাঙ্কভার্সের অনুকরণে বাংলায় তৎকালে বহুলপ্রচলিত পয়ার ভাঙিয়া সেই যে এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে হাত পাকাইয়াছিলেন---সেই একঘেয়ে ছন্দই তাঁহার কাল হইয়াছিল। আজিকার দিনে সুতরাং তিনি অচল। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ চল করিবার জন্য আমরা বহুপূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে একবার তাঁহার 'মেঘনাদবধে'র গোড়ার কয়েকটি পংক্তির আধুনিক নানা ছন্দে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও 'উদয়ন' পত্রিকায় মাইকেলের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া চল্‌তি ছন্দে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইয়া মাইকেলের বিপুল সম্ভাবনা বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চল্‌তিরূপে কিছু দোষ ছিল, আমরা 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার ভ্রমসংশোধন করি।

তাহার পর আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে; সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাইকেলের 'মেঘনাদবধের'র প্রথম কয়েকটি পংক্তিকে পুরাতন ও আধুনিক কয়েকটি ছন্দে রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করেন। তাঁহার নির্দেশমত আমরা চর্যাপদ হইতে শুরু করিয়া কালানুক্রমিক আধুনিক গদ্য-কবিতা পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবিদের ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া এই ছন্দ-প্রকরণ প্রস্তুত করিয়াছি। পরিশিষ্টে প্রকাশিত ঋগ্বেদ হইতে জয়দেব পর্যন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এই পংক্তিগুলির রূপান্তর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন কবির প্রথানুযায়ী মাইকেলের ভনিতাও দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের দিক দিয়া এই ছন্দ-প্রকরণটিকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্য ইতিপূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর ও তাহার আমাদের কৃত সংশোধনও এই সঙ্গে প্রথমেই প্রকাশ করা হইল।

মাইকেলের মূল (১৮৬১ খ্রীঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?

'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত অনুবাদ (১৯২৯ খ্রীঃ)

(১)

সমুখ আহবে
প'ড়ে আহা, যবে
সেরা বীর ভবে
বীরবাহু সে,
ধরণীর কোলে
ত্যজি দেহ-খোলে
প্রাণ তার চ'লে
গেল বেঁহুসে

(২)

নেহাৎ অকালে
যমের মহালে;
কোন্ সে ছাওয়ালে
রক্ষঃপতি,
রাঘবের অরি
কহ বাগীশ্বরী,
ভেজে পুনঃ কারি
সেনা-সারথী?

চল্‌তি ছন্দে—রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৪ খ্রীঃ)

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে শেষে গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবন কাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের শত্রু যিনি, রক্ষকুলের নিধি?

রবীন্দ্রনাথের চল্‌তি ছন্দে আমাদের সংশোধন (১৯৩৪ খ্রীঃ)

লড়াই যখন ফতে হ'ল বীরবাহু বীর যখন
কেরামতি দেখিয়ে অনেক তুলল পটল, আহা,
জোয়ান বয়স না ফুরতেই। কও দুগ্‌গার বেটি,
গুড়ের মতন জবান তোমার, সেপাই-মোড়ল ক'রে
কোন্ বীরকে করতে লড়াই পাঠিয়ে দিল তখন
রঘুয়াদের সেই দুষমন্, মানুষ-খেকোর রাজা?

লুইপাদ প্রভৃতি : চর্যাপদ (আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ)

বিরবাহু বীরা
জখণ মঈলা।
রাবণ মণ্ডল
সঅল[১] ভাগীলা।।
অমিঅ-বঅণি দেই[২]
পুছমো তোরেঁ।

পুণু দলবই[3] করি আহব ঘোরেঁ।।
(জমঘর জৈহণ[4]) কাহক মেলীলা[5]।
নিশাচর রাআ[6] রাবণ কোপীলা[7]।।
এহ সঅল[1] কথা বোল বাঅ-দেঈ[8]।
জা রস গোড়জণ পিউ,[9]—মহু[10] কহেই।

বড়ু চণ্ডীদাসঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (আনুমানিক ১৪০০ খ্রীঃ)
[স্বরান্ত করিয়া পড়িতে হইবে]

সমুখ সমর মাঝ বীরচূড়ামণী।
বীরবাহু বীর জবেঁ পড়িল মেদনী।।
আমিআঁ-মিশাইল বোল বোল দেবী বাণী।
আন কোণ জন আনি সেনাপতি মাণী।।
রণ-ছলে যেহ্ন রাজা রাঘবের ডরেঁ।
রাবণ পাঠাইল তাক সমণের ঘরেঁ।।
বড়ায়ি নাহিঁক এথাঁ, তোহ্মা পুছোঁ, বাণী।
গা-ই-ল মাই-কেল মধু মারী-পুতা[11] মাণী।।

চণ্ডীদাস ঃ পদাবলী (আনুমানিক ১৩০০—১৯৩০ খ্রীঃ)

সই কিবা সে কঠিন পরিণাম।
নিদারুণ রণমাঝে অকালে মরিল গো,
বীরবাহু বলধাম।
না জানিয়ে কত মধু ও বীণায় আছে গো
বীণাপাণি শুনাও মধুর
সেনার নায়ক করি ভেজিল কাহারে গো
রণস্থলে রাঘবারি শূর।।
জানিবারে চাই মনে জানা নাহি যায় গো
তুমি মাতা কহহ উপায়।
কহে মধু মাইকল যেহ্ন ঝুনা নারিকল
মাকড়ের হাথেতে শোভায়।।

বিদ্যাপতি ঃ পদাবলী (আনুমানিক ১৪০০ - ১৬৫০ খ্রীঃ)

ভারতি, বহুত মিনতি করি তোয়।
অমিয় বচন তুয়া শুনইতে কাতর
দয়া জানি শুনাওবি মোয়।।
ঘোর সমর মাঝ বীরবাহু পড়ওল

১ সকল। ২ দেবী। ৩ দলপতি, দলুই, সর্দার, সেনাপতি। ৪ যেন, যেমন। ৫ বিদায় দিল, পাঠাইল। ৬ রাজা। ৭ কোপযুক্ত। ৮ বাক্ দেবী, সরস্বতী। ৯ পান করুক। ১০ মধু=মধুসূদন। ১১ মারীপুতা=মারিয়া বা মেরীর পুত্র যীশু

অকালে গেলা যমপাশে।
পুন সেনাপতি করি কাহে ভেজল রণে
রাবণরাজ হুতাশে।।
ভনে মধুসূদন শেষ সমনভয়
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
পাপীক পাপভার আপন শিরে ধরাওসি
(জিসু) তারণ ভার তোহারা।।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (আনুমানিক ১৪৩০ খ্রীঃ)
(পরিষৎ-প্রকাশিত ১৫৮০ খ্রীঃ পুথির পাঠানুযায়ী)

বাণেতে জর্জর করি যত বানরগণে।
অবশেষে বীরবাহু মরিল আপনে।।
বীণাপাণি বব মাগ্রি তুয়াকার ঠাঞি।
কহ এবে কি করিল রাবণ গোসাঞি।।
রণ জিনিয়া বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
ত্রাস পাইয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ।।
রাবণ ভাবে পাঠাই এবে কোন ছাওয়ালেরে।
যে যায় সে যায় আর ঘরেতে না ফেরে।।
দত্ত মধুসূদনের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায়্যা দিল একটি শিকলি।।

বড়াই পণ্ডিত ঃ শূন্যপুরাণ (আনুমানিক ১৪৫০-১৫৫০ খ্রীঃ)

আচম্বিতি যুদ্ধথলে বীরবাহু পড়ে।
ধুম্রকুমার সভি দেখে অকালে সে মরে।।
বানরের পয়দল করে হুলাহুলি।
নাহি রেক[১] নাহি চিন্ পায়ে উড়ে ধূলি।।
আপুনি জানিহ সভি তুহ্মি মা ভারতী।
কি করিল পাটসালে[২] রাক্ষসের পতি।।
কাহারে পাঠায় পুন লাএক করিআ।
মোহর সুনিতে আশ কহ বিবরিআ।।
শ্রীখ্রীষ্ট চরণারবিন্দ করিআ পনতি।
শ্রীজুত মাইকেল কঅ সুন রে ভারতী।।

গোবিন্দদাস ঃ পদাবলী (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীঃ)

ঘোর আহব মাঝ যবহুঁ আচম্বিত পড়ল বীরবাহু বীর।
মরকট দল মাঝ উঠল জয়ধ্বনি রাবণ ভেল অথির।।
বাণী বীণাপাণি বোলহ মধুর বোল শ্রবণহি শুনইতে আশ।
কোন বীরবরে করি সেনানায়ক ভেজল রাঘবত্রাস।।

১ রেক=রেখা। ২ পাটসালে=রাজপাটের সভায়, রাজসভায়।

ও যুগ করপদ থলকমল জিনি হামে না জানই কছু আন।
পন্থহুঁ দুখ তৃণ করি না গণনু শ্রীমধুসূদন পরমাণ।।

ভবানীদাস, আবদুল সুকুর প্রভৃতি ঃ মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী, গোপীচাঁদ
(১৫০০-১৮০০ খ্রীঃ)

'না যাইও, না যাইও বীর, না যাইও লোকান্তর।
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম পুত্র শীতল মন্দির ঘর।।'
মরিল বীরবাহু বীর রাজা দশানন।
বীরবাহুর মাতা কান্দে—'নাই প্রাণের ধন।।
দশগৃহের মাও গো রবে পুত্র লইয়া কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে।।'
শুনিয়া চীক্কর দিয়া উঠিল রাবণ রাজা।
'সাজ সাজ সেনাপতি মানুষে দিমু সাজা।।
খাইবে না খাইবে নরে ফালাবে মারিয়া।
শিখর কাটীলে গাছ আপনে যাই পইড়্যা।।'
কচুপাতার জল যেন করে টলমল।
সরস্বতী পূর্বকথা তুমি কও সকল।।
গুপীচাঁদ ময়নামতী বন্দি মধু বলে।
প্রদীপ নিভিলে বাপু কি করিব তেলে।।

মীরা, দাদূ, কবীর প্রভৃতি ঃ কবীর বাণী (১৫০০-১৯৩০ খ্রীঃ)

কোই রাম কোই রাবণ বখানৈ
কোঁই কহে আদেস।
রাম ভারী নিপুন কসাঈ
(গেলা) বীরবাহু যমদেশ।।
বীণা অনহত বাজোঁ গগনে
সুধ কোঈ ন বতারে।
বীণাপাণী বাণী অব কহ
রাবণ ভেজঈ কারে।।
জলন্ধর কুম্ভ জলৈ বিচ ধরিয়া,
বাহর ভীতর সোই।
সূদন কহে নাম কহনকো নাহীঁ
দুজা ধোখা হোই।।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ চণ্ডীমঙ্গল (আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ে বীরবাহু বীরবরে
হা কান্দ কান্দনে সবে কান্দে।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান
রাবণ উঠিয়া বুক বান্ধে।।
নমস্ত নমস্ত বাণী কৃপা কর নারায়ণী

বিষুণ্ডপ্রিয়া পূজ পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে উর দেবি এ আসরে
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে।।
মিনতি শুন গো শুন সেনাপতি করি পুন
ভেজে কারে শমন সকাশে।
দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল সূদন কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ চৈতন্য চরিতামৃত (১৬১০ খ্রীঃ)

বীরবাহু বীর সেহি বৈষ্ণবঅবতার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র জানে সে আচার।।
গুপ্তভাবে অবৈষ্ণব রাক্ষস-গৃহে রয়।
প্রভুর বাণেতে তার মোহ-মুক্তি হয়।।
বহিরঙ্গবুদ্ধ্যে মোরা কিছুই না জানি।
কৃষ্ণপ্রেম পীয়াও মোরে তুমি বীণাপাণি।।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তারে কয়।
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি কামে রাবণের ক্ষয়।।
বাসনার গলৎকুষ্ঠ কীড়াময় অঙ্গে।
সমর প্রসঙ্গে সেহি মাতে প্রভুর সঙ্গে।।
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনী।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানী।।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
শ্রীরাম চরিতামৃত কহে মধুদাস।।

কাশীরামদাস ঃ মহাভারত (আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি।
বীরবাহু যমপুরে গেলেন যখনি
কহ দেবী বীণাপাণি অমৃতভাষিণী
রক্ষঃকুলনিধি সেই রাঘবারি যিনি।।
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে।
পাঠাইল রণস্থলে অরিকুলবধে।।
মেঘনাদবধ কথা অমৃত সমান।
শ্রীমধুসূদন কহে শুনে পুণ্যবান।।

সৈয়েদ আলাওয়াল শাহ মরহুম ঃ পদ্মাবতী (আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীঃ)

ধূমে অন্ধকার কেহ কারে নাহি দেখে।
সহস্র সহস্র পড়ে আইসে লাখে লাখে।
দুই দিকে উথলায় সংগ্রামতরঙ্গ।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ কেহ না দেয় ভঙ্গ।
ঝাঁকে ঝাঁকে শরবৃষ্টি এড়িকে অন্তরে

শরশয্যা হই শেষে বীরবাহু পড়ে।।
কও গো মা সরস্বতী তুমি করতার।
করিলে আঁধার মাঝে আলোক সঞ্চার।।
রাবণ আদেশে কেবা হাতে লৈল সৈনা।
বানরে করিতে বধ হৈল অগ্রগণ্য।।
কহে কবি মাইকেলে পুস্তক উপমা।
সমাপ্ত জমকছন্দ বাগ অনুপমা।।

মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাউঁ ঃ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (১৭৪৩ খ্রীঃ)

(১)

হে মাতা বাণী
দেবতা নির্মল,
দেবী দুর্গার উদরের
সিদ্ধি-ধর্ম ফল।
হে মাতা বাণী।
বীরবাহু বীর
মরিল অকালে,
তোমাকে শুধাই,

(২)

শুনাও ছাওয়ালে।
হে মাতা বাণী।
সেনাপতি কারে
করিল রাবণ,
মধুর ভাষাতে
কহ বিবরণ।
হে মাতা বাণী।

ভারতচন্দ্র ঃ বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী (১৭৫০ খ্রীঃ)

১। অকালে পড়িয়া সমুখ রণে।
বীরবাহু বীর মরে যখনে।।
হরষে নাচিল বানরভূতে।
বাপারে কহিতে ভগ্নদূতে।।
নয়নে অঝোর ঝরিল পানি।
বীণাপাণি কহ অমিয়বাণী।।
কাহারে করিয়া সেনার পতি।
পাঠায় রাবণ অথিরমতি।।
বড়ব পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।।
দেখে শুনে কয় মধুসূদন।
এমন জানিলে লিখিত কোন।।

২। রাঘব হানিল মরণবাণ,
বীরবাহু ভূমে পড়ে সটান,
অকালে যমের বাড়িতে পান
চরম বরণমালিকা।
কি হল তখন কহ ভাবতী,
মধুর বচন শুনিতে মতি,
কাহারে পাঠাল লঙ্কাপতি,
ফুরাতে জীবনতালিকা

রামরাবণের সমরগীতা,
কারো লাগে মিঠা কাহারো তিতা,
শ্রীমধু রচিল ফুলকবিতা,
কবিতা রসের শালিকা।।

৩। সম্মুখ সমরে পড়ি অকস্মাৎ গেল মরি
যবে বীরচূড়ামণি বীরবাহু অকালে।
কহ দেবী বীণাপাণি অমিয় মধুর বাণী
আরো ছিল রাবণের কত দুখ কপালে।।
কারে সেনাপতি পদে বরি ভেজে অরি বধে
আপনার দোষে আহা বংশশুদ্ধ মজালে।।
শ্রীমধুসূদন কয় অতি ছন্দ ভাল নয়
কবিরা ছন্দের জালে দেশটাকে ঠকালে।।

রামপ্রসাদ ঃ শ্যামাসঙ্গীত (১৭৫০ খ্রীঃ)

রসনায় কালী কালী বলে,
বীরবাহু বীর গেল চলে।
অকালেতে মরল পুড়ে কালীভীষণ রণানলে।।
কালী বলে কও মা বাণী,
শুনতে মাতাল আমার প্রাণী,
সেনাপতি কায় বা করে রাবণ ভাসে নয়ন জলে।।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে।
আমি মাতাল হয়ে তোমায় খেয়ে ডুবব কালী রসাতলে।।
সূদন বলে দোটানাতে পড়ে জীবন যায় বিফলে।।

হরু ঠাকুর, রাম বসু, গোজলা গুঁই প্রভৃতি ঃ কবি, দাঁড়াকবি,
হাফ-আখড়াই প্রভৃতি (১৭৫০-১৮৫০ খ্রীঃ)

মহড়া। ও সখি রে,
সোনার লঙ্কাবিহারী বীরবাহু আমার এলো না।
রামের বাণে ধূলায় লুটায় প্রাণ
সখি, মায়ের প্রাণ ধৈরজ না মানে,
প্রবোধি কেমনে তা বল না।
তেহাবাণ। বীণাপাণি বল মা কথা, করিস নে আর ছলনা!
চিতেন। না ভেবে গিয়েছে রণে শেষ হয়েছে রামের বাণে
ওগো বনমালীর হাতে কালী, মিলবে কোথায় তুলনা।
অন্তরা। এই সব চুলোচুলি, দলাদলি ঢলানি লঙ্কায়,
রাবণ ক্ষেপে আগুন করবে রে খুন কাটবে হাতে কার মাথায়।
পরচিতেন। হনু ল্যাজের গ্যাদায় হুমরে বেড়ায়
লড়াই যেন উড়ে মেড়ায়
লঙ্কাকাণ্ড উপলক্ষ দক্ষ দুপক্ষই সমান যায়।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ঃ টপ্পা সঙ্গীত (১৮০০ খ্রীঃ)

তারে ভুলিব কেমনে।
অকালে মরিল বীরবাহু সে কালরণে।।
তোমার ও রূপ বাণী ভক্তি তুলি করে টানি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।।
কহ মা অমৃতস্বর কি করিল অতঃপর
রাক্ষস কুলের নিধি রাঘবারি সে রাবণে।।
নানান দেশে নানান ভাষা সব লাগে গো ভাসা-ভাসা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা আশা না পূরয়ে মনে।।

রামমোহন রায় ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮৩০ খ্রীঃ)

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কয় কিন্তু বীরবাহু নিরুত্তর।।
পড়িতে সম্মুখ রণে, রাক্ষসপতি রাবণে
কাহারে পাঠাবে পুনঃ ভাবিয়া কাতর।।
গৃহে হায় হায় শব্দ, ভয়েতে রাক্ষস স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর।।
ভাব সেই নিরঞ্জনে, নাহিক ভীতি মরণে
চিত্ত সত্য পরাৎপর সত্যেতে নির্ভর।।

দাশরথি রায় ঃ পাঁচালী (১৮৫০ খ্রীঃ)

রাক্ষসে আর মানুষে এ কি লড়াই বাক্ষসে।
যেমন শুক শারী আর শালিকে, চাকরে আর মালিকে।
ডোঙ্গা আর শুলুকে একখানি গাঁ আর মুলুকে।।
শ্রীরামের শরাসনে বীরবাহু সমবাসনে
শয়ন করিয়ে দেখে রামে।
পাইল নির্বাণ পথ, আরোহণ পুষ্পকরথ,
হয়ে বীর যায় গোলোক-ধামে।।
শুনিয়া রাবণ কহে এ দেহে আর কত সহে
অগ্নি বহে দহে জুড়াইব কোন্ দহে
এ পরাণ আর নাহে আপনি আমি যাব হে।
শুনে শুকায় সবার কায় কয় না কথা শঙ্কায়,
মৃত্যুভয় অপেক্ষায় বেশী।
কহ বাণী বীণাপাণি আমার চক্ষে পানি বক্ষে আনি
কারে পাঠায় রাবণ শেষাশেষি।।
পাঁচালীতে মধু বলে, পড়ে গেছি কুলুপ কলে
তেলে জলে পিরীত সে কোন কালে।
করলেম কি, হল কি রঙ্গ, আমায় নিয়ে করবে ব্যঙ্গ,
নিজের নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ, হবে বঙ্গে সাঁইত্রিশ সালে।
যেমন গুটিপোকায় গুটি করে আপনার বুদ্ধে আপনি মরে

মাকড়সা যেমন বন্দী আপন জালে।।

কাঙ্গাল ফকীর, ফিকিরচাঁদ, মদন প্রভৃতি ঃ বাউল (১৮৫০-১৯২০ খ্রীঃ)

দ্যাখো ভাই জলের বুদ্বুদ কিবা অদ্ভুত দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজ কেউ বাদশা হয়ে দোস্ত লয়ে রঙমহলে মারছে ঠ্যালা।।
কাল আবার সব হারায়ে ফকীর হয়ে সার করেছে গাছের তলা।।
রাবণ রাজার কি কাল হল একে একে সব মরিল।
বীরবাহু সে মরল শেষে এখনও তার বিহানবেলা।।
সাঁইয়ের দয়া পায় নি রাবণ আয়না ধরে দেখে নি মন,
এখনও সে যতন করে মাঝ দরিয়ায় ভাসায় ভেলা।।
সেই কাহিনী কও ভারতী কাঙাল ফকীর মধুর মতি,
রাজনারায়ণ বাপ যে তাহার জাহ্নবী মা যশোর জেলা।।

অজ্ঞাত ঃ ভাটিয়াল (১৮৫০-১৯৩৭ খ্রীঃ)

ওগো বন্ধু, আমার মন কেন উদাসী হইতে চায়।
এগো ডাক শোনে না বীরবাহু গো সাতসাগরে চইলে যায়।।
এগো চোখা চোখা রামের বাণে
নদীর পরাণ সাগর টানে;
এগো ভাটি সোঁতে ভাটার গড়ান,
জৈবন-জোয়ার তান না পায়।।
বাণী, তুমি দাও মন্ত্রণা,
রাবণ-রাজার কি যন্ত্রণা,
সমুদ্দুরে কায় বা ঠ্যালে
শীতল বাতাস লাগায় গায়।।

ঈশ্বর গুপ্ত ঃ নীলকর, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি (১৮৫০ খ্রীঃ)

কোথা রইলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা,
কাঁদে তোমার প্রজা খাস
তোমার ভারতকন্যার তলায় লঙ্কা তার ঘটে কি সর্বনাশ।
কালসর্প রামের বাণ বীরবাহু সে বীরের প্রাণ
অকালেতে এসে মা গো টপ করে যে করলে গ্রাস
মোদের সংমা শোন বীণাপাণি,
জেগেও লেখার দানা পানি,
অধম সন্তানের মাগো পূরাও অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
হয় লঙ্কায় উলট-পালট
আর কিসে মা রক্ষা হবে,
মল বীরবাহু যে বিশভুজে

আর কারে বা পাঠায় তবে।
যারেই পাঠাক হুট্ করে সে চুরুট ফুঁকে হবে ফাঁস।

রঙ্গলাল ঃ পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী প্রভৃতি (১৮৫৮ খ্রীঃ)

ঠুকে তাল আঁখি লাল কি করাল মূর্ত্তি।
মহাকায় সিংহ প্রায় যেন পায় স্ফূর্ত্তি
চলে যায় পদ ধায় বসুধায় কম্প।
কভু ধায় ঠায় ঠায় মেরে যায় ঝম্ফ।।
লুটপুট দেয় ছুট মরকুট ত্রস্তে
হত-আয়ু বীরবাহু রাম-রাহু হস্তে।।

কোথা বাণী সরস্বতী সুধাস্বরূপিনী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী।।
তুয়াপদ সরসিজ পরিহরি আমি।
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী।।
তুমি বল তার পর রাবণ কি করে।
সেনাপতি করে যত তত তত মরে।।

* *

জ্বলি উঠে রাবণের হৃদয়-নিলয় হে হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে বিলম্ব কি সয়।।
চল চল চল সবে, সমব-সমাজ হে, সমর-সমাজ।
রাখহ সোনার লঙ্কা, রাক্ষসের কাজ হে, রাক্ষসের কাজ।।
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।।

দীনবন্ধু ঃ 'রাত পোহাল ফরসা হল' প্রভৃতি কবিতা (১৮৬০ খ্রীঃ)

সাম্‌নে যুঝে বীরবাহু যে হলেন কুপোকাৎ।
থাক্‌তে আয়ু পরাণ-বায়ু উধাও অকস্মাৎ।।
কও ভারতী শুন্‌তে মতি মিষ্ট অতি বাণী।
পাঠায় রণে কোন্ সে জনে সৈনাপতি মানি।।
রাবণ রাজা কঠিন সাজা দিতে রঘুর নাথে।
পাপ-সমরে আপনি মরে ফল যে হাতে হাতে।।

মাইকেল [আত্মহত্যা] ঃ ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১ খ্রীঃ)

কেন এত লীলা করিস, স্বজনি!
একটু পালা—
তাই নিয়ে তুই দিবস রজনী
গাঁথিস মালা!
আর কি পাইবে বীরবাহু ধনে

রক্ষঃবালা?
কাহারে বরিবে রাবণ এবার
বল মা বাণী—
মধুর কাহিনী শুনাও বীণায়
পরশ হানি।
কবি মধু ভণে, বিনে ও চরণে
কিছু না জানি।

মাইকেল [আত্মহত্যা] বঙ্গভূমির প্রতি (১৮৬২ খ্রীঃ)

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
চটুল ছন্দের সাধ,
ঘটাবে কি পরমাদ—
বধিতে চাহিছে প্রাণ, কাব্য মেঘনাদ-বধে!
লঙ্কায় দৈবের বশে
জীবতারা যেই খসে,
বীরবাহু দেহ হতে পড়ে চিরামৃত হ্রদে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে—
জেনেও রাবণশূরী মত্ত অহঙ্কার-মদে।
সেনাপতি কোন্ জনে
পাঠাল আবার রণে,
বল মাতা বীণাপাণি, ভারতি, বাণী-বরদে।
অনেকে আসিবে যাবে,
তোমার প্রসাদ পাবে,
মধুহীন করো না গো তব মন কোকনদে

গোবিন্দচন্দ্র রায় ঃ যমুনালহরী (১৮৭০?)

সুবর্ণ লঙ্কায় বেড়িয়া সদা
বহে সুন্দর গভীর সাগর ও!
পড়িত জলে নীলে স্বর্ণ সৌধ-ছবি
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।
সেই জল বুদ্বুদ সহ কত বীর
যুঝিল ঘোর, লয় পাইল ও।
বীরবাহু সেও মরিল শেষে
বাণী বীণাপাণি ভারতী ও।
কত তুমি জাননী রাবণ রাজা
কি করিল তারো পরে ও।
যে সব কাহিনী নিঠুর মহাকালে
ঢাকিল লূতাজালে ও।

শেষে ঢাকা গিয়ে   রমণা মাঠে
দেখাব কেরামতি আমরা ও!

হেমচন্দ্র ঃ কবিতাবলী (১৮৭০ খ্রীঃ)

'আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি'
চেয়ে দেখ কাঁদে রাক্ষস-মণ্ডলী—'
বানরকটক শোনে কুতূহলী
বীরবাহু তবু ঘুমায়ে রয়।
'বাজ রে সিঙ্গা বাজ এই রবে'—
আর কি লঙ্কায় সেই দিন হবে?
সমগ্র জগৎ জাগে কলরবে
বীরবাহু শুধু ঘুমায়ে রয়।
'কল অযোধ্যায়' উঠে চীৎকার,
সুদূর পশ্চিমে ছাড়িয়া গান্ধার—
এ বঙ্গে সারদা নাহি কি রে আর,
থাকিলে, জননী, কোথায় তুমি?
হেথা, চণ্ড আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে
ঠঠঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশান-ভূমিতে চলে।
চলে কপাল ধধধ ধঃ কার মাথা এটা হিহিহি হুঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া ধিমি।
ছিন্ন হইল বীরবাহু   চন্দ্রে গরাসিল রাহু
দশানন বিবস বদন—
বল মাতা বীণাপাণি   কারে সেনাপতি মানি
তারো পরে চালাইল রণ।
'রে বেটা রে বেটা' বলি কাঁদিল না মহাবলী
ভীমমূর্তি রুদ্রমূর্তি লুটাল না সে ভূমে—
কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে?

নবীনচন্দ্র ঃ পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫ খ্রীঃ)

অযোধ্যার রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া বণস্থল
কাঁপায়ে সাগর জল
কাঁপাইয়া স্বর্ণলঙ্কা উঠিল সে ধ্বনি।
পড়িল সে বীরবাহু কটক ভিতরে
বানরের বাচ্ছাগণ
করিলেক আস্ফালন
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

'দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে দাঁড়া রে রাক্ষস!'
নূতন কে সেনাপতি
পেয়ে রাজ-অনুমতি
গর্জিল. গর্জনে কাঁপে শূন্য দিগ্‌দেশ।
'কি আশ্চর্য!' 'একি!' কাণ্ড বীণাপাণি, মধুভাণ্ড
এমন করিয়া ভাঙে হাটের মাঝার?
'প্রিয় হেন্‌রিয়েটা আমার!'

সুরেন্দ্রনাথ ঃ মহিলা (১৮৭৫ খ্রীঃ)

রণাঙ্গনে বীরবাহু অকাল পতন—
করে সিংহনাদ রামদাস,
সারদে! চরণারুণে! চিতশতদল
বিকাশি' আসিয়া কর বাস;—
কি করিল রাঘবারি
শুনিতে উৎসুক ভারি—
হৃদিযন্ত্র কর মা তন্ত্রিত
গীতোচিত কণ্ঠহীনে কিঙ্কর কুণ্ঠিত।
* *
হে কবি-কল্পনা-মায়া, সত্যের সোনাল ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতি!
দেখালে অনেক খেল তুমি ক্রীড়াবতী!
এস দেবি! আর বার
খুলিয়াছি কারবার,
চরণ ছোঁয়ায়ে যাও সতি!
সধবার একাদশী, তুমি যার গতি!

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঃ স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫ খ্রীঃ)

রাম যার সাক্ষাৎ শমন-দূত,
অকালে পড়িল রণে সেই বীর রাবণের সুত।
মাথা' কাটা পড়ে
তবু নড়ে চড়ে
কবন্ধ হইয়া লড়ে—একি অদ্ভুত!
* *
বীরবাহুকে
দিতেই ঠুকে
বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা
নব-বানারে
হল্লা করে

রাক্ষসদলে দেয় যে হানা।

*   *   *

হনুরা পাকাপাকা
ঝাপটি তরু-শাখা
পাড়িয়া ঝাঁকা ঝাঁকা
ফল যে খায়।
কভু-বা বন-বিড়াল
বাহিয়া-উঠি ডাল
লয়ো লুটের মাল
বনে পলায়।

*   *   *

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে অযুত নীড়!
জননী বীণাপাণি, নাহি জানি কোথায় রও,
রাবণ করিল কি ঠকি ঠকি আমায় কও!

বিহারীলাল ঃ **বঙ্গসুন্দরী**, সারদামঙ্গল প্রভৃতি (১৮৭৬ খ্রীঃ)

রাবণের হু হু করে মন,
বীরবাহু ক'রে মহারণ,
অকালে যমের দেশে
হায় সে পড়িল শেষে,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন।

*   *   *

'বল গো মা বাণী বরদা সুন্দরী
কমল-আসনা স্বরগ-জলে,
সেনাপতি পদে কোন বীরে বরি
রাবণ পাঠায় বানরদলে।

*   *   *

তুমি আন মত্তদশা,
খালিপেটে কাবা চষা,
আঁধারে খদ্যোৎ যেন ধিকি ধিকি
জ্বলে,
খাবি খায় ক্ষীণ প্রাণ,
তবু শুনি সুরতান
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ-
মণ্ডলে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বন্দে মাতরম্ (১৮৮২ খ্রীঃ)

বন্দে মাতরম্।
শতদলবাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
লঙ্কাকাণ্ডে বীরবাহু পতিতম্
ভগ্নদূত রাবণেরে কথিতম্
পুত্রে কহ মাতা কাহিনী অতীতম্
কাহিনী ত্রেতা দ্বাপরম্।
দশাননকণ্ঠহাঁউমাউনিনাদকরালে,
কোন্ সেনাপতি ভুজে দানিল খরকরবালে,
ভারতি, তুমি মা দেহ বলে।

বন্দ বীণাধারিণীং দুর্গতিতারিণীম্
ছন্দসৎকারিণীং মাতরম্।
কলমে তুমি মা শক্তি,
লিখে যাই পাঁক্তি পাঁক্তি,
গড়ি তব হাড়িকাঠ মন্দিরে মন্দিরে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস ঃ শ্মশান নিশান প্রভৃতি (১৮৮৪-১৮৯৪ খ্রীঃ)

পড়িল রাক্ষস যত দীঘল দীঘল,
পড়িল বানর কত অস্থিমাংস সহ—
অন্তিম-হিক্কায় লঙ্কা করে টলমল,
বীরবাহু আয়ুঃশেষ, কঠিন কলহ।
বীণাপাণি, ছাড় বীণা, বাজাও বিষাণ,
তুলিয়া চিতার ছাই রাবণে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব বৃথা অভিমান।
প্রমদারে ভুলি ডাকি সারদা তোমারে,
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই ওঠ চল ঘরে যাই—
দেখি গে পাঠায় রণে রাবণ কাহারে।
উলঙ্গ রমণী ভেবে চোখে আসে ঘুম,
চিতায় উঠিবে মঠ, কাঁদিবে অনেক শঠ,
কে আর তোমারে ভাল বাসিবে কুঙ্কুম?

কামিনী রায় ঃ আলো ও ছায়া (১৮৮৯ খ্রীঃ)

বীরবাহু মহারণে ডালি দিলে এ জীবন,
সেনাপতি করি কারে পাঠাইল দশানন;
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি তার,
সে কাহিনী বল্ বাণী, মা আমার, মা আমার।

আঁধারের কীটাণুরা দুদণ্ডেই লয় পায়,
ভাবিয়া না পায় কেহ কেন আসে কোথা যায়,
আলোকের শিশু মোরা রণাঙ্গন এ সংসার—
ছায়া তাই নামে চোখে, মা আমার, মা আমার।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ঃ আলিবাবা (১৮৯৭ খ্রীঃ)

ছিছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তা বড়া গুষ্টি এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল;
একঠো একঠো মরতা তব্ বি কম্‌তা নাহি পাল।।
মর গিয়া বীরবাহু লেড়কা জোয়ান,
জরু চোরি বাপ কিয়াথা বেটাকো যায় জান।

কহো ভারতী
কিস্‌কো কিয়া দল্‌পতি—
রাবণ-রাজা বনা খাজা একদম বেচাল;
রামলছুমন জীতা রহো, উন্‌কা নাজেহাল।

অজ্ঞাত ঃ গম্ভীরা (১৯০০-১৯৩৭ খ্রীঃ) *

শিব সাম্‌লা তোর বুঢ়া এঁড়্যা।
ওযে রাক্ষসে আজ সাবড়্যা দিছে
হনুগ্যালাকে করছে বেঁড়্যা।
তোর এঁড়্যার গুণ হে শিব, কাছে এস্যা শুন্‌,
শিঙের টিঁসে বীরবাহুকে কর্যা দিলে খুন,
তখন দেখ্‌লে লোকে রামচন্দর
তীরের খোঁচায় দিলে মের্যা।

তোর বেটিকে বোল্‌ হে যেন মোরে করে ভর,
জুৎ কর্যা গান ধরবো আমি—দেয় যেন এই বর,
ফের করতে লঢ়াই আবার কাকে
রাবণ রাজা পাঠায় তেড়্যা।
রামের মাগ্‌ কর্যা গাপ্‌, করলো যে পাপ—
মধু বলে যাবই ফের্যা।।

রবীন্দ্রনাথ ঃ মরণ (১৯০০ খ্রীঃ)

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
দিলে বীরবাহু-চোখে ঘুমঘোর,
রণে প্রাণ করি অপহরণ।
বাণী! ধীরে এসে তুমি দাও দোল,
মোর অবশ বক্ষ শোণিতে,
আমি তুলিব কাব্য-কলরোল
তব সুমধুর বীণাধ্বনিতে।
গাব রাবণ কাহারে দিল কোল,
রণে কে করিল অবতরণ—
মোর মাথা নত করে তুমি দাও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

* শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত।

গিরিশচন্দ্র ঃ পাণ্ডব গৌরব (১৯০০ খ্রীঃ)

নারায়ণ—নারায়ণ!
বীরবাহু আয়ু না ফুরাতে
হল রাহুগত;
শমন-সদনে রণে প্রেরণ করেন নারায়ণ।
অকারণ জানকীহরণ
করিয়া রাবণ—
আপনি ডাকিয়া আনে আপন মরণ।
কহ বাণী বীণাপাণি, মিনতি আমার;
সেনাধ্যক্ষ কারে মানি অতঃপর রাজা দশানন
কৈল মহারণ।
নারায়ণ, নারায়ণ!

রজনী সেন ঃ বাণী, কল্যাণী (১৯০৮ খ্রীঃ)

সেথা আমি কি গাহিব গান?
রাম-কার্মুক বাণ লাগে কার মুখে
ভাগে বীরবাহু-জান।
এস সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা
বাণী শুভ্র কমলাসীনা;—
রোধি' নয়নজলপ্রবাহ
রাঘবারি মহাপ্রাণ—
ভেজে পুনরপি কাহারে সমরে
তুলিব তাহারই তান।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ ভারতবর্ষ (১৯১২ খ্রীঃ)

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে পুচ্ছকে স্বর্ণলঙ্কা,
কে জানিত বল তোমার রাবণ হইবে দেবতা-মানব-শঙ্কা!
রাবণাত্মজ বীর বীরবাহু অকালে যখন ফুঁকিল শিঙ্গা,
মর্কট লাগে কর্বুর পিছে ধ্বাঙেক্ষর পিছে যেমন ফিঙ্গা।
কহ বাগদেবী পুনঃ দশানন বাজাল কেমনে সমর-ডঙ্কা,
সেনাধ্যক্ষ করিল কাহারে রাখিতে আপন স্বর্ণলঙ্কা।

যতীন বাগচী ঃ রেখা, নাগকেশর (১৯১২-১৯১৭ খ্রীঃ)

আজ সোনার লঙ্কা রোদন-জুয়ারে
অকূলে ভাসিয়া যায়—
আর 'ফুল চাই—চাই কেয়াফুল'-হাঁকে
প্রেমিক ফিরে না চায়!

ওই রামের নিঠুর শরে,
ওই বীরবাহু ভূমে পড়ে,
ওই রাবণ তাহারও পরে
কাল-সমরে পাঠাবে কায়—
মোরে মধুর কাহিনী শোনাবি বীণায়
বীণাপাণি, নেমে আয়।
তোরে শিরীষ ফুলের পাপ্‌ড়ি খসায়ে
পরাগ করিব দান,
তোরে রজনী-গন্ধা-গেলাস ভরিয়া
অমিয়া করাব পান।
হোথা রাক্ষস-বধূ কাঁদে,
জলে নয়ন তাহার ধাঁধে;
হাত রাখি ননদীর কাঁধে
বলে, ঠাকুরঝি, তারে আন্‌!
শুনে সাগরের ডাক ছুটে বাহিরায়
দয়িতের আহ্বান?

অক্ষয় বড়াল ঃ এষা (১৯১২ খ্রীঃ)

মৃত্যু!—প্রতি—দিবস ঘটনা
মরণে তবু কি কেহ মরে?
সবাই মরিবে সবারই মরেছে—
রণে বীরবাহু পড়ে।
শিথিল শরীর, হিম পদ-কর,
আনাভি নিঃশ্বাস কঠোর ঘর্ঘর—
আকাশ চিরিয়া ক্রন্দন ওঠে
লঙ্কার ঘরে ঘরে।
দেখিছে রাবণ—ফেনিল সাগর
তীরে ফেন-রেখা সরে,
ইতি নেতি ভাবি, ভাবি ইহ-পর—
সেনাপতি কারে করে।
অতীত সে কথা জানিতে বাসনা
তুমি কহ দেবী পদ্ম-আসনা,
কামনার ধূমে ক্ষুব্ধ আত্মা
ছুটিছে লোকান্তরে।
ও পদ পরশে শ্মশানচুল্লী
ফুল্ল সে কোকনদ;
মরণে ভীষণ ভাবি না ক সতি,
হোক মাইকেল বধ!

দেবেন সেন ঃ অশোকগুচ্ছ (১৯১২ খ্রীঃ)

ঝমর ঝমাৎ ঝম, ঝমর ঝমাৎ ঝম, থেমে গেল মল!
ভাসি নয়নের নীরে উঠিছে পড়িছে ফিরে
পতি পাশে ধেয়ে আসে রাগিণী তরল!
নিদারুণ পুত্রশোকে বিহ্বলা জননী ওকে
চিত্রাঙ্গদা ভুলিয়াছে গান্ধর্বীর ছল।
রাবণে গ্রাসিছে রাহু মরিয়াছে বীরবাহু
বল্ মাগো বীণাপাণি, বল্ তুই বল্—
ঝমর ঝমাৎ ঝম ঝমর ঝমাৎ ঝম
শোকের সাগরে শব্দ ডুবেছে সকল?
মল বলে, "আমি যার অভাগিনী, পুত্র তার
নিষ্ঠুর রামের শরে হয়েছে বিকল।"
কে আর যাইবে রণে সঁপি দিতে প্রাণধনে,
লঙ্কায় উৎসব-গতি সহসা নিশ্চল;
ভ্রমর না গুঞ্জরিছে কোকিল না ঝঙ্কারিছে
লঙ্কা ছেড়ে বীণাপাণি, চল চল চল—
ঝমর ঝমাৎ ঝম, ঝমর ঝমাৎ ঝম, বাজে যেথা মল!

সত্যেন্দ্রনাথ ঃ ঝর্ণা (১৯১৩ খ্রীঃ)

(১)

লঙ্কা! লঙ্কা! সুন্দরী লঙ্কা!
মিত্রের আশ্রয় শত্রুর শঙ্কা!
অঞ্চল সিঞ্চিছে চঞ্চল সিন্ধু,
তরঙ্গ-ললাটে সুস্থির বিন্দু,
সমুদ্র-শম্ভুর ভালে শশী বঙ্কা,
লঙ্কা
হলে রাম-অস্ত্রে বীরবাহু ঠাণ্ডা,
বাগ্‌দেবী বল কোন্ রাক্ষসে পাণ্ডা

(২)

করতঃ রাক্ষস-রাজ স্বহস্তে
প্রেরি' প্রারম্ভে অন্তিমে পস্তে—
কিষ্কিন্ধ্যাদলে শব্দিত ডঙ্কা,
লঙ্কা!
কর্চ্ছি যে অজস্র ইয়ার্কি ছন্দে,
নির্ঝর ঝুর্‌ঝুর কভু মেঘমন্দ্রে;
কাব্যের নামে দিই দুর্দম ধাপ্পা,
ভগবতী ভারতী নাহি হও খাপ্পা—
মিলে না ছন্দ-মিলে টাকাসিকেটঙ্কা—
লঙ্কা!

চন্দ্রকুমার দে? ঃ পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯১৩-১৯২৬ খ্রীঃ)

অকালে মরিল বন্ধু, মইরা হইল ভূত।
সুন্দর বীরবাহু বন্ধু রাবণ রাজার পুত।।
রাবণ রাজার নারী শুনিয়া ধীরে ধীরে বলে।
আগে আমি যাইবাম মইর‍্যা মুরতেক না দেখিলে।।
তোমার পাপে সোয়ামী আমি অইবাম দেশান্তরি।
বিশ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিবাম দড়ি।।
তুমি নওরে বনের পাংখী ব্রহ্মার বেটী বাণী।

কি জানি পন্থেতে তোমার সকল জানাজানি।।
সেই জাননে কওরে মাইয়া রাবণ কি করিল।
কাহারে সরদার করি তানি ফিইরা হানা দিল।।
হেন্দুর শাস্ত্র মহাশাস্ত্র এই কতা কি খাটি।
বেবাক ঋণ শুইজা গেল দিয়া এন্দুর মাটি।।

ছেক ছোনাভান, আমীর সাধু ইত্যাদি ঃ কেচ্ছা ছাহিত্য
(১৯১৩-১৯৩৭ খ্রীঃ)

ঢাক ঢোল দগরেতেরে জান ঘন মারে কাটি।
ছিঙ্গা বিবোলের ছব্দেরে কাম্পে বসুমাটি।।
বীরবাহু রাবণের ছাওয়াল আসে ছিপাই লইয়া।
যুদ্ধের ময়দানে মরে রামের ছিকার হইয়া।।
হিন্দু লোকের মাইয়া পীর সুন ছুরচ্ছতী।
কেচ্ছা ক্যান শুনবার হিচ্ছা তোমার বাপ যে উপপতি।
বীরবাহুর কি সাদী ছিল বউ বিধ্‌বা হইয়া।
কাহার ছাতে ঘর করিল একটা নিকা লইয়া।।
কি করিল বাদছা রাবণ লড়ায়ে কেটা যায়।
ছোন্দর ছোন্দর হুরী পরী তোমার মাথা খায়।।

কুমুদরঞ্জন ঃ তরী হেথা বাঁধব নাকো (১৯১৪ খ্রীঃ) *

মাঝি,
তরী হেথা বাঁধ্‌বো নাকো আজ্‌কে সাঁঝে।
ভিড়িয়ো নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে।।
ঐখানে ঐ মাঠের কাছে
নর-বানরে যেথায় নাচে,
বিজয়-নাচন দেখে তাদের, রাবণ-বুকে বড়ই বাজে।।
ঐ মাঠের ঐ মাঝখানেতে বীরবাহু যে যুদ্ধে গিয়া,
ম'রে গেল রামের বাণটি রোমশ তাহার বক্ষে নিয়া,
মিঠে সুরে বল্‌তো মাঝি
রাবণ কা'রে পাঠায় আজি,
আহা, বাছার মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধ্‌বো নাকো আজ্‌কে সাঁঝে।।

প্রমথ চৌধুরী ঃ খেয়ালের জন্ম (১৯১৪ খ্রীঃ)

রাবণ ছিলেন রাজা পরম খেয়ালী,
মহা মাংসলোভী বেটা জাতেতে রাক্ষস।
স্বর্গের অপ্সরা তার রাত্তিরে দেয়ালী

* শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত

মোদ্দা কথা, লোকটার বড় অপযশ!
রামের সীতাকে শেষে করিল সে চুরি,
চাপিয়া ধরিতে চাহে পেতে বুক দশ—

বোয়েসেন, অর্থাৎ হাত দিয়ে কুড়ি—
চারিয়ারী কথা থাক্, রাম যুদ্ধ করে
লইয়া মর্কটে যত, আরে না না, থুড়ি,

অর্থাৎ লইয়া যত কিষ্কিন্ধ্যা-বানরে।
সেই যুদ্ধে বীরবাহু মহাবীর মৈল,
সে কাহিনী সরস্বতী, খাস তব বরে
লিখিতে বাসনা, পরে রাবণ কি কৈল,
বোয়েসেন—লিখিতেছি Terza Rima ছন্দে,
কারণ বোঝে না কেহ, বোঝে শুধু তৈল।

করুণানিধান ঃ রেবা, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি (১৯১৪ খ্রীঃ)

ভো মহার্ণব নীল-ভৈরব
উত্তাল লীলাভঙ্গে,
রাত্রিন্দিব মঙ্গল গাহ
ওঙ্কার ধ্বনি সঙ্গে।

* * *

সম্মুখ সমরে পড়ে বীরবাহু বরকান্তি
লঙ্কার গৌরব,
অস্ত রক্ষঃবিভাবসু, সহসা সমুদ্ররোল
সমাধি-নীরব!
শ্বেতভুজা সারদার দেউল দুয়ারে একা
মত্ত আছি গানে,
প্রণষ্ট বিভব তরে তবু খেদ-অশ্রু ঝরে
বিধৌত শ্মশানে—
শোনে না বধির-মতি থামে না সমর-গতি
রাবণ-বিধানে।

* * *

কাঁপছে বুকে সুদূর যুগের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি,
স্মৃতির কোকিল গাইছে মিঠে তান্;
কমলাফুলি ঘোম্‌টা খুলি দে মা মাথায় পার ধূলি,
চারু চিকণ রুচির ছুটুক বান।
পাত্-পেয়ালায় রঙ-ফোয়ারা—পরাগকেশর ফুলদলে
লো দুলালী, গল্‌ছে হরষ-ননী,
তোর মরকত-রতন বিথার বিচিত্র ওই শাদ্বলে
কে যায় থুয়ে কাহার চোখের মণি।
মা তুই মেয়ে, আগ্ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে র'বি দ্বারদেশে,
মঞ্জুশ্লোকে গাইব আমি গান—

উন্মথিয়া অতল-অতীর মর্ত্যমানস নীর শেষে
নিঙড়ে করি রঙীন হিয়া দান;
পরসাদের পূর্ণিমা আর মনের মণিকর্ণিকায়
চরণ-মধু, দ্বিরেফ করি পান।

কালিদাস ঃ পর্ণপুট (১৯১৪ খ্রীঃ) *

স্পন্দ-বিনা বন্ধ নাড়ী সন্ধ্যাঘন অন্ধকার
রণে আহুত বীরবাহু তো রাহু যে রামচন্দ্র তার।
বেচারা আজি বেঘোরে মরে,
চলিয়া গেল যমের ঘরে,
ক্রন্দনেতে অন্ধ আঁখি শোকে নিকষা-নন্দনার।
হে বীণাপাণি বল তো আসি
কীচক-বনে বাজাব বাঁশি,
বল মা সুধাকণ্ঠে বাণী নাচায়ে কটি-চন্দ্রহার।
ভাসিছে পিতা নয়ন-জলে,
শ্বসিছে বসি নমেরু-তলে,
শ্রাবণ সম প্লাবন, নাহি রাবণ-চিতে রন্ধ্র আর।
আবার বলে যাইতে রণে
সেনানায়ক সে কোন্ জনে,
নীবার শিরে দিবার আগে দিল বিজয়ানন্দহার।
স্পন্দ বিনা বন্ধ নাড়ী সন্ধ্যাঘন অন্ধকার।

কান্তি ঘোষ ঃ রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম (১৯১৮ খ্রীঃ)

রণশালাতে বীরবাহু শেষ প্রাণ-পেয়ালায় দেয় চুমুক,
হাঁক্‌ছে রাবণ চালাও লড়াই আফ্‌শোষে কার ফাট্‌ছে বুক।
লে আও সাকী-সরস্বতী, কাব্যসুরা দ্রাক্ষারস—
শুধ্‌রে দিনু কান্তিবাবুর ফর্মে ছিল একটু চুক।

রবীন্দ্রনাথ ঃ বলাকা (১৯১৯ খ্রীঃ)

এ কথা জান কি তুমি লঙ্কার ঈশ্বর দশানন,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনজন,
শুধু রয় অন্তর-বেদনা,
বস্তু যাহা উবে যায় টিকে থাকে কাব্যের সান্ত্বনা;
মরিয়াছে মমতাজ, ও তাজমহলও হবে ধূলি,
বলাকার শ্লোকচ্ছন্দে মানুষের অন্তরাত্মা নিত্যকাল
উঠিবে আকুলি।

* শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত।

বীরবাহু মরিল অকালে,
তুমি দিলে জয়টীকা অন্য এক সেনাপতি ভালে;
সেও থাকিবে না—
পুরুষ শুধিবে জানি যুগে যুগে প্রকৃতির দেনা।
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে বাণীরূপে শব্দব্রহ্ম বিরাজে অব্যয়—
রহে অমলিন;
সে বাণীপ্রসাদ লভি আমি কবি আত্মপরিচয়
রেখে যেতে চাই চিরদিন।—
তুমি হে নিমিত্ত মাত্র, ছন্দ মোরে দিতেছে অভয়।

নজরুল ইসলাম ঃ বিদ্রোহী (১৯১৯ খ্রীঃ)

বল বাণী
আজি কাতর মম প্রাণী।
রণ- অঙ্গনে যবে বীরবাহু-লভে মুক্তি জীবন দানি'।
বল বাণী—
ক্রোধে রাক্ষসরাজ দশানন জ্বলে,
সেনাধ্যক্ষ কে সে রণে চলে;
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন আরশ্ ছেদিয়া
মধুসূদনের লেখনীতে ধরা পড়ে সেই আফ্‌শানি;
বিংশ শতকে বঙ্গে প্রচার সেই ছন্দের পঞ্চাশো কপ্‌চানি!
বল বাণী।

যতীন সেনগুপ্ত ঃ ঘুমের ঘোরে ইত্যাদি (১৯২৩ খ্রীঃ)

এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা
মরিল যুদ্ধে বীরবাহু বীর তারো পরে আছে কথা।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।
রণভূমি নিঃঝুম
বীরের নয়নে নামিয়া আসিল মরণ-গভীর ঘুম!
তুমি বীণাপাণি, জানি হে বন্ধু, অনেক করেছ লীলা—
প্লীহারে করেছ যকৃৎ বন্ধু, যকৃতে করেছ পিলা;
হয়ত বলিতে পারিবে রাবণ কি করিল তারো পর—
সেনাপতি করি পাঠাল কাহারে রাখিতে আপন ঘর।
নারিবে বলিতে তবুও বন্ধু, বলিতেছি কানে কানে—
হাতুড়ি পেটার পূর্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে।
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে,
ইয়ার্কি তব মিছে—
রাত্রির পরে দিবস বন্ধু, দিন রাত্রির পিছে।

মোহিতলাল ঃ বিস্মরণী (১৯২৬ খ্রীঃ)

নভোনীল বেদনায়! গূঢ়রক্ত হরিত-শ্যামল!
ধূসর উদাস যেন পৃথিবীর পঞ্জর-পাষাণ!
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল—
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ!
বানরেরা চাহে লয়—রাক্ষসেরা মরণপাগল;—
সহস্র মৃত্যুর 'পরে উড়ে রাম-প্রণয়-নিশান—
সেই যজ্ঞে অবশেষে বীরবাহু-জীবনের মহা-অবসান!

ভাবনা-কুঞ্চিত ভাল, দশানন অচঞ্চল হিয়া—
ললাটের স্বেদ মুছি' নেহারিল স্তিমিতলোচন
নবহোত্রী চলিয়াছে—হে ভারতি, ছন্দে মোহনিয়া
মৃত্যুর অমৃতরূপ—মরজনে করাও শ্রবণ!
বিস্মরণী রীতি তার স্বপন-পসরা তাই নিয়া
আত্মঘাতী যুগে যুগে! সুন্দরের করে আরাধন
সনাতনী প্রকৃতির পয়োধর-সুধাবিষে—জীবন মরণ!

এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে ঃ বুঝ লোক যে জান সন্ধান
(১৯২০-৩৭ খ্রীঃ)

১। কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে: *
কাঁপিল বীরবাহু যে মরণের সেই রণনে।।
বাঁদরে চ্যাচায় আবার,
সাগরে লাগল জোয়ার,
জোয়ারের জল ভরিল বাবণের দুই নয়নে।।
(কোরাস্)
জননী গো লহ তুলে বক্ষে
লঙ্কার বাণী দেহ তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণতলে
কিঙ্কর মেলি খাতাখানি গো।

রাবণ একাকী, রাণীও একাকী, নিদ্ নাহি আঁখিপাতে,
সমরে মাদল, হিয়াতে মাদল, মাদল-বাদল রাতে।
পিছনে আর না চেয়ে,
রাবণের আদেশ পেয়ে,
কে আবার নবীন শাখী ছুটে যায় যুঝ্তে রণে।।
(কোরাস্)
জননী গো লহ তুলে বক্ষে
লঙ্কার বাণী দেহ তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণতলে
কিঙ্কর মেলি খাতাখানি গো!

*শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত।

২।　　টলমল টলমল পদভরে, বীরবাহু পড়ে সমরে।
উল্লাসি' শাখাবাসী শাখাতে দোলে,
ঘন রণ-হুঙ্কারে রাবণ ফোলে,
ঘন তূর্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশীষ ঐন্য * সৈন্য বরে।।
রুমুঝুমু রুমুঝুম্ নূপর-পায়ে
ফুটাও মুকুল রাঙা চরণ ঘায়ে,
ওগো বিদেশী বাণী, বন-উদাসী বাণী,
মোরে চোখ ইসারায়
ডাক হে মনোহরে!
কেউ ভোলে-না-ভোলে মন করলে চুরি,
শেষে শঠতায় হানে বিষের ছুরি—
ঝিমে' ভোমরা-পাখা জলে চলে বলাকা,
হোথা বদনা গাড়ু শুধু কাজিয়া করে—
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে।
টলমল টলমল পদভরে..........

৩। ধায়　　কন্দরলীন বীরবাহু-প্রাণ দীপঙ্করায় খুঁজিতে,
ধায়　　ব্যোম-ইঙ্গিত-প্রসাদে উর্ধ্বে, মৌলিমন্ত্র বুঝিতে;—
গেল　　মরিয়া
(বীরবাহু বীর ম'রে যে গেল;
শুধু　　মরিল না সেই তরুণ-দিশারী, সারা লঙ্কায় মেরে যে গেল;
প্রতি　　কঙ্কর-কাঁটা রূপান্তরিতে শ্যামলিমা-ঝোরা ঝরে যে গেল।)
গেল　　মরিয়া—বিন্দু সিন্দু যোগেই লভে সে দীপ্র সত্তা,
বাণী　　বাগ্বাদিনীর দুলাল, আমার সাধনা অপ্রমত্তা।
(তুমি　　এস গো,
স্বপি'　　কম্প্রি' মন্দ্রি' 'চ্ছলি' নিশ্চুপে সীমা-সম্পুটে এস গো।)
বাণী!　　অহংলাঞ্ছী করুণা, তব করি শুভ্রতা ভিক্ষা
বল　　রাম-শরাঘাতে ভঙ্গাত্মজ রাবণ কি লভে শিক্ষা।
দিল　　পুনঃ রণাম্বু গহীনে ঝম্প বিত্তগরবী রক্ষঃ,
কারে　　অগ্রে রাখিয়া, সুরেলা ছন্দ 'ত্তরিবে মেলিয়া পক্ষ।

৪।　　মহাসাগরের নামহীন কূলে
অধুনা কাণ্ডী বন্দরটিতে ভাই,
আজ সেথা যত চাঙা জাহাজের ভীড়।
সেখানে ত্রেতায় ঘাল হ'ল যারা
শ্রীরামের বাণে কাটা গেল যত শির,
আর যাহাদের হাত পা ভাঙিল
হনুর গদায় ভাই,
একজন তার এই বীরবাহু বীর।

* ঐন্য - অন্য

কুলহীন তুমি বীণাপাণি মাগো
বহুঘাটে জল খেয়ে,
সেক্সপীয়রেব গুঁতো গিলে আর
দান্তের তাড়া পেয়ে—
যত হায়রাণ লবেজান কবি
বরখাস্ত্ হয়ে ভাই—
সিনেমায় বনে পীর।
খোঁচা খেয়ে খেয়ে কলমের হুলে—
মোর কাছে তুমি এস গো জননী ভাই,
বল কারে নেতা রাবণ করিল স্থির।

৫। তুমি এখানে এখনই চলে আসবে মেয়ে,
নয়, আসবে কখন?
শত গহন-স্বপন দুই নয়ন বেয়ে
কেন নামে অকারণ?
আমি রয়েছি সরস্বতী তোমায় চেয়ে,
ওই পড়ল যে বীরবাহু হুমড়ি খেয়ে,
কালো মৃত্যু নামল তার আকাশ ছেয়ে,
রাঙা গালের 'পরে
কালো চুলের মতন।
তুমি জেনে এস করলে কি রাবণ পরে,
মেয়ে আসবে যখন।

মেয়ে নাম ধরে ডেকে আধ-অন্ধকারে
আমি বলব, 'বাণী',
আর বসাব তোমায় মোর বুকের ধারে
ইজি- চেয়ার টানি।
ঘরে জ্বলবে মোমের আলো এক কিনারে,
কটু- গন্ধ আঁধারে হব নির্দেনারে;
ববে মৈশুমি হাওয়া চুলগন্ধ-ভারে।
শেষে নরম ঘুমে
শোবে কে অভিমানী
রাণী, চমকে উঠবে জেগে হালকা চুমে
মুখে ঘোমটা টানি।

৬। বহুদিন তোরে ভুলেছিনু আজ হঠাৎ পড়েছে মনে,
বীরবাহু বীর তীর খেয়ে মরে রাম-রাবণের রণে।
এস বাণী বীণাপাণি,
পৃথিবী-পোকার পাখায় ঘুরিছে আকাশের চাকাখানি।
বল দেখি কোন্ সেনাপতি লভে রাবণের অনুলেহ,
ছেড়ে যাওয়া গেহে সুস্থ দেহেতে ফিরে আসে নাক' কেহ।
এই তো মৃত্যুবাণ—
ব্যাকরণহীন বেদনার কাছে মূক হয় অভিধান।

৭। ওপারে নগরীর হাজারো ঘরে থেমেছে কোলাহল, নিভেছে আলো।
মরেছে বীরবাহু অরির শরে, নয়নে কাল-ঘুম নেমেছে কালো।
প্রবল পিকেটিং সমুখে পিছে বানরে 'রাম জয়' হুঙ্কারিছে;
রামে ও বিভীষণে দেখিয়া একসনে রাবণ ভাবে মনে "মিলেছে ভালো।
প্রবল পশুবলে পিষিব সবে, জ্বলিছে রণানল, কে হবে হোতা?
দেশের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান, পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা?"*

৮। ফুকারিলো রণতূর্য; সমস্বরে গম্ভীর দুন্দুভি
উঠিলো বাঙ্ময় হয়ে; চমৎকৃত সুষিরে সুষিরে
ভরিলো বিপুল মন্দ্র; কম্পমান স্বর্গভূর্ভুবি—
গতাসু আলোর প্রেত ভ্রমীভ্রান্ত অনাত্মা দূষীরে;
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে বীরবাহু.
নিরস্ত্র বিবস্ত্র আত্মা ছুটে চলে জলদচ্চি পানে
নৈরাজ্যের নাভিশ্বাসে ঝঙ্কারিলো, 'আহু, আহু, আহু'।

বৈদেহী বিচিত্রা বাক্, শ্লথনীবি কম্প্র আত্মদানে
নৈকৈষেয় দুর্ধর্ষের অন্তর্ভৌম স্বর্গবিজিগীষা
আমারে জানাও—কার হাতে দিলো আগ্নেয়াদ্রি শিখা;
নিরুদ্দিষ্ট চক্রমণে জগদ্দল ব্যাজজীবী ভীষা—
কেলিপরায়ণ ধান্যে অনাদান্ত রোমাঞ্চন-লিখা।

৯। ভারত সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্য সাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক দ্বীপ ছিল একদিন—
নীলাভ নোনার বুকে
নির্জন নীলাভ দ্বীপ—
লঙ্কা তার নাম।

আর এক প্রাসাদ ছিল,
আর ছিল নারী—
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
মচকা ফুলের পাপড়ির মত লাল দেহ
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
শূয়ারের মাংস হয়ে যায়—
চড়ুয়ের ডিমের মত শক্ত-ঠাণ্ডা—কড়কড।

ছিল রাবণ, আর ছিল বীরবাহু।
বীরবাহু ঘাই-হরিণ,
রামচন্দ্র চিতাবাঘিনী—

---
*স্বরচিত।

সারারাত চিতা-বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
খল খল অন্ধকার ভোরে
বীরবাহু বাদামী হরিণ
চিতা-বাঘিনীর কামড়ে ঘুরে পড়ল ঘাসের উপরে
শিশির-ভেজা ঘাস।
হ'ল দেহের রঙ ঘাস-ফড়িঙের দেহের মত কোমল-নীল
রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মত।

অনেক কমলা-রঙের রোদ উঠল
অনেক কমলা রঙের রোদ
অনেক কাকাতুয়া আর পায়রা উড়ল—
ধানসিঁড়ি নদী, জলসিঁড়ি ক্ষেত
সাইবাবলার ঝাড়, আর জামহিজলের বন
দুপুরের জলপিপি
অজস্র ঘাই-হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
চারিদিকে পিরামিড কাফনের ঘ্রাণ
আর নাটোরের বনলতা সেন
নাচিতেছে টারানটেলা।

তারপর মেঘের দুপুর—
তারোপরে হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের
নরম শরীর;
সিন্ধুসারস আর সিন্ধুশকুন—
হিজল বনের মত কালো
পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান।
অন্ধকারের হিমকুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে
তুমি এস সরস্বতী।
শিশির-ভেজা গল্প করে বলে দাও
রাবণ কাকে যুদ্ধে পাঠাল এর পর।

১০। শোন শোন শোন ব্রতচারী,
'জ্ঞা—শ্র—স—ঐ—আ—ই—আ'—
ইষ্ট-আভাষণ-আরাবে 'জ-সৌ-বা' হুঙ্কারি।

দোর্দণ্ড বীরবিক্রম জাত বাঙালী,
যুগে যুগে নেচে যায় রায়েবেঁশে ঢালী।
স্বভূমি-ছন্দপ্রধারায় নাচেন মহাপালক
অধিনেতা-প্রবর্ত্তকজী নাচেন এঁটে কাছা-কোঁচা তাঁরই।

নৃত্যালি কৃত্যালি আর বীরালি ক্রীড়ালি,
শাশ্বত-বাঙ্গালী-প্ররক্ষণ-পরিচেষ্টা খালি।

সংকৃষ্টি সংসৃতি মানা পণ প্রনিয়ম—
কর পঞ্চব্রত উরশীলন সংনিয়ম জারি।

লঙ্কায় বীরবাহুজী পড়ে রামজীর শরে
যুদ্ধ-অভিপ্রদর্শনকথা শোন অতঃপরে—
সংসৃতি মূলক গৌরবময় ছন্দপ্রধারাবলী
স্মরণেতে হবে তোমাদের উপকার ভারী।

খোদাতালা হে, ভগবান হে, বাণী বীণাপাণি,
বল কারে রাবণজী শ্রেষ্ঠ পদকিকা দানি'
করল উস্তাদ-আলা, পাঠাল সৈন্য জমায়েতে—
জুতাছাড়া নৃত্য তাই রাবণজী যান হারি।
সে বিষয়ে শ্রীহনুজী শ্রেষ্ঠ ব্রতচারী।

১১। ক'বোতল টানিলে মদ লঙ্কাকাণ্ডম্ যায় গো লেখা?
বাল্মীকি! ব'লে যাও আজ যুবক বাঙলার চাইতা শেখা।
রামে রাবণে লড়াই জবর বীরবাহু হয় বিল্‌কুল সাবাড়,
কাব্যের এসব স্রেফ ধাপ্পাবাজি—লাভ ক্ষতি নাই কারো বাবার!
এ নিয়ে একদিন করেছ গুলজার তোমার ইয়ারদলের বৈঠক,
কিন্তু মোদ্দা কথাটা কি সেইটে জানা এখন আবশ্যক।
মরদের বাচ্ছা রাবণ, দিয়ে রাক্ষুসে গোঁফে চাড়া,
তুড়ি দিতে দিতে দশবিশ সেনাপতি করলে একতাড়ায় খাড়া।
আসল কথা এও নয়—সরস্বতীর হেকমতে চালিয়ে কলম,
বত্রিশ হাজার বিরানব্বই লাইন লেখা সোভি অলম!
আসল কথা নয়া বাংলার যুগই এখন চলছে বর্তমান জগতে,
আমি প্রবল নাইনটিন ফাইভ, অর্থনীতির খেয়াল মতে
গড়ে তুলছি ইমারৎ আর সোজা চালাচ্ছি পয়জার—
বাপের বেটা কেউ থাকে তো বলুক, কে পেয়াদা কে সরকার।

১২। 'ছোট্ ঠাকুরপো, ছোট্ ঠাকুরপো,' প্রমীলা বউ ওই কাঁদে,
সান্ত্বনা দেয় ইন্দ্রজিতে হাত রেখে তার দুই কাঁধে—
'যুদ্ধে আমি নেবই প্রিয়ে বীরবাহুর এই মৃত্যু-শোধ!'
চম্‌কে উঠে কয় প্রমীলা—কষ্টে ক'রে অশ্রুরোধ,
'থামো, থামো, খাওসে চল, শক্ত হবে শিক্-কাবাব—
পোড়া যুদ্ধ থামান বাবা, বুঝতে নারি কি তাঁর ভাব।
সোনার ছিল লঙ্কাপুরী ঢুক্‌ল এসে কাল-শমন,
কখন্ ভাঙে কপাল যে কার, একটুও নয় শান্ত মন!
এই তো ছিল ঠাকুরপো আর ছুট্‌কি দুজন লেপ্‌টিয়ে,
ঝট্‌কা মেরে কোথায় কে যে ফেল্‌লে নিয়ে একটিরে।
আমার কেমন ভয় করে গো, চল কোথাও পালিয়ে যাই—
থাক্‌ব দুজন মনের সুখে, রাজত্ব না হোক্ গে ছাই!
চাইনে আমার গয়না-শাড়ি—জর্জেট বা ভয়েল ক্রেপ্,

কাঁচুলী না থাক্ গে এমনি পারব রাখতে বুকের 'শেপ'।
খোঁচা খোঁচা হোক গে দাড়ি, গালে কিচ্ছু বাজবে না,
ঘামের গন্ধ চাপতে চাই না অটো-ডি-রোজ খস্ হেনা।
চলো, চলো, কি সর্বনাশ! ঠাকুর আস্‌চেন এই দিকেই,
আমার মাথা খেতে বোধ হয়; তাঁর মত মোর দশটি নেই!'

১৩। শৃণ্বন্তু (sic) বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—
ধূসর মহানগরীর চিৎপুরে ভিড়
রিক্সায় চীনে গণিকা
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গণোরিয়া আর সিফিলিস
ধূসর নিওসাল্‌ভার্সান
শ্রমিক আন্দোলন আর বেকার সমস্যা
ধূসর ক্যালকাটা কর্পোরেশন আর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চেৎলা ব্রিজের উপরে লম্পট-গুষ্টির পদধ্বনি
ধূসর হক্-মিনিস্ট্রি, নলিনীরঞ্জন সরকার
এ সব কিছুই নয়।
নাহি জানে কেউ
রক্তে মোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে বিষণ্ণ নাবিকের গান
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু
ভারত মহাসমুদ্রে লঙ্কাদ্বীপ
রাবণেব পুত্র বীরবাহু, রামের হাতে তার অপঘাত মৃত্যু
হে সরস্বতী
নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী
অন্ধকারে শুনতে পাও রাবণের বুকে বিবর্ণ পদক্ষেপ
বুকে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা
অন্য সেনাপতিকে পাঠায় সে যুদ্ধে
এ কথায়ও নয়।
আসল কথা, সুদুর আকাশে চিলের ডাক
আর মালতী রায়ের নরম উষ্ণ শরীর
স্বপ্নে দেখি তার ধূসর পাহাড়
শুঁকি রুমালে ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ
হে বিরাট নদী।
ধূসর।

*　　*　　*

কিন্তু সমর সেনের পরেও আছে অগ্রগতির হীরালাল
সমুদ্র বিশাল।
বিরাট রোলার যেনো—
রোলার—রোলার—

রোলার গড়িয়ে যায়—
অবিরাম—
অবিশ্রাম—
লঙ্কা—
বীরবাহু—
রাম—
সরস্বতী—
রাবণ।
চুপ্ চুপ্ চুপ্
মদ খাওয়াতে পার বন্ধু,
ধেনো?

পরিশিষ্ট

গায়ত্রী	অগ্নিগোলা পুরো নিয়ে ভাগ্যে স্ব-ভূম-মৃত্তিকা। কোথা রং দগ্ধ নায়ক।। ঋক্ ১।। অগ্নিকুণ্ডে যে ভস্ম সমৃদ্ধো বীরবাহু যবে; ক' দেবী এর পরে কে।। ঋক্ ২।। অগ্নি সারথি বজ্রবৎ কোন বীর দিকে দিকে। বরিলে রাঘবারি যে।। ঋক্ ৩।।
অনুষ্টপ	যবে গেলা মৃত্যুধামে বীরচূড়ামণীন্দ্র সে অকালে সম্মুখী যুদ্ধে লড়ায়ে মারিতে ফতে। বলো গো বাঙ্ময়ী মাতা সেনাধ্যক্ষ-পদে বরি পুনঃ পাঠাইলা যুদ্ধে কোন বীরে রাঘবারি?
তোটক	পড়ি সম্মুখ আহব-মাঝ যবে হত বীর বলী, কহ দেবি! তবে করি নায়ক রাবণ কোন জনে পুনরায় পরে দিল ঠেলি রণে?
ভুজঙ্গপ্রয়াত	যবে বীরচূড়া পড়ে যুদ্ধকালে কৃতান্তের গেহে চলে সে অকালে। সুধাভাষিণী গো বলো কোন বীরে দিলে প্রেরি লঙ্কেশ সদ্যঃ শরীরে?
পজ্ঝটিকা	বীরবাহু করি সম্মুখযুদ্ধ চলে যমালয় শ্বাসনিরুদ্ধ 'কালে কহ গো মাতঃ কারে সৈনাপত্যে পুন বরিবারে করিলা পুনরপি আজ্ঞা জারি রক্ষঃকুলনিধি রঘুনাথারি?

মন্দাক্রান্তা	যুদ্ধক্ষেত্রে বরিল মরণে বীর সে বীরবাহু শূরীচূড়ামণি পড়ি যবে আত্মদানে অকালে। ওগো মাতা অমৃতবচনা দেহ সন্ধান দাসে কারে রক্ষঃকুলনিধি পুনঃ নায়কত্বে নিয়োগে?
পঞ্চচামর	বিরাট যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে বিলুপ্ত বীরবাহু সে অকাল-মৃত্যু-মন্দিরে ত্বরা প্রবেশিলা যবে প্রকাশ দেবি ভারতী রণে পুনশ্চ প্রেরণে দশাস্য কোন নায়কে নিদেশ তার দানিলা?
শার্দূল- বিক্রীড়িত	বীরেন্দ্রাস্পদ বীরবাহু পড়িয়া গেলা অকালে যবে মারামারি ফলে যমের ভবনে বৈরী-বলে-কৌশলে। হে মাতঃ কহ কোন নন্দন পুনর্যুদ্ধে চলে সাহসে আদেশে যব রাঘবারি সহসা চালাইতে সে চমূ?
শিখরিণী	পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত অস্ত্রের বিঁধনে চলে সে লঙ্কেশাত্মজ শমনগেহের সদনে বলো মাতা বাণী রণকুশল কারে বরণিয়া পুনঃ পাঠালা যে ত্বরিত-গতি লঙ্কেশ সমরে।
মালিনী	সমুখ-সমর মাঝে বীর সে বীরবাহু শমন-ভবন-পানে গেল যে গো অকালে। বলহ জননি কারে শ্রেষ্ঠ সেনার পোস্টে পুনরপি রণমাঝে প্রেরিলা তার বাবা।।
বসন্ততিলক	শেষে বিরাটসমরে পড়ি বীরবাহু গেলা কৃতান্ত-ভবনে চলিয়া অকালে। হে ভারতী কহ রণে পুনরায় ভেজে কারে অরাতি হননে প্রভু রাঘবারি?
শশিকলা	দশরথ-সুত-শর-অপহৃত সমরে দশমুখ-সুত পড়ি গত যম-কবলে। অমিয়-বচনময়ি! কহ করি করুণা— যখন হুকুম দিল পুন দশবদনে, নর-মরকট-বধ পণ করি ছুটিয়া চলিল অশনি-গতি রণ-দুরমদ কে?
মত্তময়ূর	বাণে বাণে বিদ্ধ হয়ে জীবন গেলা যুদ্ধক্ষেত্রে পাতিত যে বীর অকালে। হে মাতা বাণী কহ মোরে পুন যুদ্ধে পাঠালা কারে ধরিয়া রাঘব-বৈরী?

ইন্দ্রবজ্রা — লঙ্কেশ সন্তান যবে অকালে
তেয়াগিলা তার পরাণ বায়ু
হে দেবি বোলোত পুনশ্চ যুদ্ধে
আবার কাহার ফুরাল আয়ু?

উপেন্দ্রবজ্রা — সুতীক্ষ্ণ-বাণে ইহলোক-লীলা
ফুরাইলে যে পড়ি বীরবাহু
সুভাষি বাণী কহ কোন বীরে
নিয়োগি যুদ্ধে দিল রাঘবারি।

গীতিকা — পড়ি বীরবাহু রণে যবে চলিলা সটান যমালয়ে
পরতাপ-উন্মদ রোল উত্থিত বেদনাময় বাসরে।
কহ দেবি! ভারতি! কোন বীরবরে রণে পুন ভেজিলা
সুত-শোক-বিহ্বল চিত্তচঞ্চল নৈকষেয় মহামতি?

জয়দেবী — সমুখসমরপতনাগত অপহৃত প্রস্থিত কৃতান্তভবনে
নন্দনমরণদশা যব পশিল দশাননবিংশশ্রবণে।
কহ গো মাতঃ অমৃতসুভাষিণি! কাহারে পুন বরিয়া
রক্ষঃকুলনিধি করিলা প্রেরণ রণ-সেনাপতি করিয়া।
কে বা হারে কে বা মারে ভাবি কি ফল এ দ্বন্দ্বে
হেনরিয়েট্টা-বঁধু মধুসূদন ভণয়ে রচনানন্দে।।

মৃগী — ণরেন্দ সরেহ — মইন্দ করেহ
যমের ঘরেত — সুবীর মরেত
বখাণ অ মাত — পুণশ্চ পপাত
রণে অ পরে স — মবেত সরেস
সুণায় ক রাব — ণ প্রের ণ ভাব
মণে ধ রি কোণ — জণেক বিকোণ।

ভাদ্র ১৩৪৪

বুড়োদের বিয়ে

কথা—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
চিত্র—নন্দলাল বসু

পূজার পার্বণী

রমাপতি সেন আসি কহিলেন বুড়োদের সভা মাঝ,
"ভুলে গিয়ে চুলো সব ছোঁড়াগুলো অকাজের করে কাজ।
বুড়োদের বিয়ে তারা তাই নিয়ে বিরোধের পেটে ডঙ্কা,
আমাদের আর বিয়ে করা ভার, অন্তরে জাগে শঙ্কা।"
এতেক শুনিয়া কহিল রুষিয়া বৃদ্ধ মাধব বোস,
"যুবর বেলায় ক্ষতি নাহি হায়, বুড়োদেরি যত দোষ!
লিকলিকে 'বডি' টেনে টেনে 'টডি' ঘোষেদের হারাধন
চিমসে চামড়া শুকনো আমড়া রোগে হৃত যৌবন।
নেশা দিন রাত, উঁচু তার দাঁত, কয়লার মত রং
চরসে গাঁজায় কল্কে সাজায়, বিদকুটে এক সং।
হবে তারো বিয়ে, হের তাই নিয়ে মেতেছে যুবকদল
বিয়ের আসরে বধূর বাসরে বাজাবে গানের কল।"

দাঁড়ালেন উঠি সঙ্কোচ টুটি মাস্টার মধু পাল,
কহিলেন হেসে একটুকু কেসে দাড়ি নাড়ি একগাল,
"রূপগুণধর যুবকপ্রবর এমন বহুত আছে—
রোগের তালিকা, দেহের থালিকা ভরা তাহাদের কাছে।
এঁরা সব যুব—সমাজের শুভ সাধন করেন নিত্য,
রোগে রোগে কাবু এইসব বাবু দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
ইঁহাদেরি তরে আছে ঘরে ঘরে যুবতী-রতন সস্তা
আরো রহে ঠিক টাকা ঝিকমিক সাজানো পণের বস্তা।"



ডাগর-নয়ন গোপরঞ্জন বয়স বছর ষাট,
কলপিত চুল যেন বিলকুল যুবকের মত ঠাট,
পরণেতে ধুতি নিউ-কাট জুতি, রেশমী কামিজ গায়,
ক্লিন-সেভ গাল, পানে ঠোঁট লাল, উঠিয়া কহিল "হায়,
এদেরি জন্যে বাপের কন্যে, এরাই করিবে বিয়ে!
ভয়ানক কথা শুনি পাই ব্যথা, অবিচার নহে কি এ?
দেহ বলহীন, রহে নিশি দিন ব্যাধির ভাবনে রত,
হেথা সেথা গিয়ে খায় কিনে নিয়ে পেটেন্ট বটিকা কত।
পাস করি বি.এ., দেখ পথে গিয়ে, যুবকের দল যত
চাকুরির তরে ঘুরে ঘুরে মরে—নিরাশায় হয়ে হত।
ইহাদের ঘরে বউগুলো মরে ষষ্ঠির কৃপা পেয়ে,
বছরে বছরে ছেলে বাড়ে ঘরে, মরে শেষে নাহি খেয়ে।
তারপর ধীরে মরণের তীরে অকালে এঁরাই যান,
বিধবার তরে রাখি যান ঘরে ছোট ছোট সন্তান।
তবু এঁরা চল্, বয়স চপল,—বিচারের এই রীতি,

বুড়োদেরি ভয়, শুন মহাশয় সমাজের খাসা নীতি!
হেন পতি বরি মরণেতে মরি হায়রে ভাগ্যহত—
ঘরে ঘরে রোজ রাখ কি সে খোঁজ বিধবা যুবতী কত?
এর প্রতিকার নাহি দরকার, দরকার শুধু রোজ
বুড়োদের নিয়ে হাততালি দিয়ে হুজুগের করা খোঁজ।"
চোখ ঠারি খাসা রসে ভরা ভাষা, কহিলেন মধু গুঁই,
"এইবার তবে শোন বসি সবে বক্তৃতা করি মুই।
পণ দিয়ে মোরা পরি প্রেম-ডোরা, হেমরূপা যৌতুকে
খুশি করি তাকে বিয়ে করি যাকে, টাকামাখা কৌতুকে



নবীনা বউকে ধরি রাখি বুকে বছর পাঁচ কি চার,
তারপর ছাড়ি দেই ওগো পাড়ি মর্ত্যলোকের পার।
তখনো প্রেয়সী থাকেন সরসই যুবতী বিধবা, যদি
পুন কেহ চায়, তারি লাগি হায়, পথ চেয়ে নিরবধি।
বিধবার বিয়ে,-তাহারি লাগিয়ে আমরাই পথ কাটি,
সেই পথে যায় স্বস্বাধীনতায় শতেক যুবতী হাঁটি।
মরিতে মোদের দেরি নাহি ঢের, ক্ষণিকের প্রেমরঙ্গ,

এরি লাগি কেন হৈচৈ হেন জুড়িয়া বিপুল বঙ্গ?"
ঠাকুরদা বুড়ো হারাণের খুড়ো বলিলেন বসি দূরে,
"দেখ নি ছোঁড়ারা কোকিলের পারা পথে শিস দেয় ঘুরে
যুবদের দল নহে হীনবল, বলবান আছে ঢের,
হাটে ঘাটে বাটে ময়দান মাঠে যাও পাবে তাহা টের।
বিয়ে করা দোষ, বলে নরু ঘোষ, মুহুরী বাবুর ছেলে,
তাই বাছাধন করিলেন পণ সেরা রূপসীও পেলে।
যাবে যথাতথা নিয়ে স্বাধীনতা, ঘুরিবে দুনিয়াময়,
বন্ধন মাঝে ধরা দিবে না যে ; বিবাহ—কভুও নয়।
করিবে না বিয়ে, দেখ মজা কি এ! বিয়েতেও দিবে বাধা!
বল দেখি রায়, এ কেমন দায়—কেমন গোলকধাঁধা!
এঁদেরি জন্যে অনেক কন্যে বাপেদের হয় বোঝা,
অবশেষে তাই, গতি আর নাই, দোজবরে বর খোঁজা।"
"রাতি হ'ল ঢের সভা হবে ফের মজলিস কর শেষ,
বুড়োদের বিয়ে খামকা এ নিয়ে ভাবিয়া মরিছে দেশ।"
এত বলি মতি চলে দ্রুতগতি হস্তে লইয়া লাঠি,
ইনি হরিজন নহে অভাজন, মজলিসি বটে খাঁটি।

আশ্বিন ১৩৪৫

যোগাযোগ!

[ভাবে ছন্দে ও মিলে এটি একটি আদর্শ কবিতা]

শিবরাম চক্রবর্তী

কণ্ঠে যদি গান না আসে
চক্ষে আমার কান্না আসে!
বধূ যদি মান না করে
ধোঁয়ার ছলে রান্নাঘরে—

চোখের জলের টান না পেলে
দেশের বুকে বান না আসে!
সেই বানেতে চান্ না করে
মাঠে যদি ধান না ধরে'—

দিনে খেতে পান্ না স্বামী
রাত্রে ঘরে যান্ না স্বামী,
কেমন করে' অঙ্গে বধূর
তবে জহর পান্না আসে!

১ম বর্ষ / ভাদ্র ১৪ / ১৩৩১

গৌরবে স্বল্পবচন

শার্দূল দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী চিত্রিত
সজনীকান্ত দাস লিখিত

[আমাদের চিত্র-বিভাগের নূতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত শার্দূল মহাশয় শুধু চিত্র-সমালোচনা পাঠাইয়াই সন্তুষ্ট নন, তাঁহার দৃঢ় পেশীবহুল হাতের কাজের কিছু নমুনাও তিনি প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন এবং শাসাইয়াছেন, বন্যার ধারার মত তাঁহার হাতের কাজ আসিতেই থাকিবে, যতক্ষণ না আমরা "তিষ্ঠ" বলি। ইতিমধ্যেই আমরা তাঁহার অনেকগুলি, কার্টুন বলিব না, চিত্রবাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য। বাণ বলিলাম এইজন্য যে, কোনও কোনও লক্ষ্যে এগুলির আঘাত লাগিবার আশঙ্কা আছে। এজাতীয় নৃশংসতায় আমরা অভ্যস্ত এবং আমাদের পাঠকেরাও অনভ্যস্ত নহেন। সুতরাং শার্দূল মহাশয়কে আমরা সাদরে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত করিয়াছি। বর্তমান সংখ্যায় তাঁহার একটি চলচ্চিত্র প্রকাশ করিতেছি—চিত্রটি তিন দৃশ্যে সমাপ্ত। পর্যাপ্ত পরিচয় এই চিত্রগুলির মধ্যেই আছে তথাপি আমরা এগুলিকে আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ ছন্দকণ্ডূয়নের লোভ সামলাইতে পারিলাম না।]

প্রভু এসেছেন অনেক দিনের পরে,
পাদ্যঅর্ঘ্যে পূজিয়াছে যজমান—
গৃহস্থ সবে মিলেছে ঠাকুর-ঘরে,
কৃপাময় গুরু সাক্ষাৎ ভগবান।
জপমালা হাতে প্রভু আড়চোখে চায়,
কৃপার পাত্রে খুঁজিয়া লওয়াই বিধি—
নিমীলিত আঁখি, কি তাতে আসিয়া যায়,
অন্ধ কি খুঁজে পায় নাকো হারানিধি!
ভাবে থলথল সে বিপুল মেদভার
তৈরি যাদের হবি ও গব্য পিয়ে—
ভক্তিতে তারা দেখে না, বারম্বার
আঁখিবাণ কোন্ লক্ষ্যে ঠেকিছে গিয়ে।

প্রথম দৃশ্য - আবির্ভাব



দ্বিতীয় দৃশ্য - সাধনা



প্রতীক্ষা

একে একে সবে বিদায় দিলেন গুরু,
ভক্তিমতীরে মন্ত্র দিবেন আজি—
মন্ত্রের স্থলে মন্ত্রণা হ'ল শুরু,
আশায় শিহরে বক্ষের রোমরাজি

* *

তৃতীয় দৃশ্য সিদ্ধি



দক্ষিণা

ভক্ত দরশ মাগি
হিয়া গাঢ় অনুরাগী,
কপাটে রাখিয়া কর
নয় দশ পর পর
অধীর বুকের মাঝে
কোন্ কুঞ্জে রাধা সাজে,
সহে না সহে না ত্বরা
শ্রীমতী কি দিবে ধরা

ত্রিযামা যামিনী জাগি
তবু হায় হায় রে—
প্রভু করে বার ঘর
রাত বেজে যায় রে!
কাহার মুরলী বাজে
পথপানে চায় রে—
ঘুমায় নিখিল ধরা,
এসে পায় পায় রে!

ওরে তোরা কি জানিস কেউ,
লাগে বাঘের পিছনে ফেউ,
আর নদীর পাগল ঢেউ
(কেন) সাগরে আত্মহারা;
জল দক্ষিণ মুখে ছুটে,

গুরু- দক্ষিণা তাই জুটে—
দই নেপো খায় চেটে পুটে
(ওরা) ভাঁড় ব'য়ে ব'য়ে সারা!
ওরে তোরা কি গো বুঝিবি না,
গাছ বাঁচে না শিকড় বিনা,
তার টানিলেই বাজে বীণা—
(এসব) শুনে নে গুরুর কাছে,
বৃথা সংসারে জাল বোনা,
হেথা গুরুই নিখাদ সোনা—
তাঁর কৃপাতেই দেখা-শোনা
(ভিজা) বিড়ালে এবং মাছে।

ভাদ্র ১৩৪৭

উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভা

হলধর ভড়

আজ প্রায় তিন মাস হইল মামা বাত সারাইবার জন্য আমার বাসায় আসিয়াছেন। মামার বাত সারিয়া গিয়াছে, এখন প্রত্যহ দুপুর বেলায় স্টীমারে চাঁদপাল ঘাট হইতে রাজগঞ্জ অবধি ভ্রমণ করেন। লোকের সহিত আলাপ করিবার মামার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি কাহারও সহিত আলাপের সূত্রপাত করেন না, একেবারে রজ্জুপাত করিয়া বসেন। প্রত্যহ যাত্রিবৃন্দ ও স্টীমারের খালাসীরা অবাক্ হইয়া চীন, বর্মা, মেসোপটেমিয়া ও ইজিপ্টে তাঁহার ডাক্তারীর গল্প শোনে।

সেদিন মামার সহিত স্টীমারে বেড়াইতেছি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটী হইতে একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুসলমান স্টীমারে উঠিলেন। মাথায় তৈলসিক্ত ফেজ, এক হাতে একটি কাপড়ে জড়ান বাঁশের লাঠি ও অন্য হস্তে একটি শাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। রং অমাবস্যা distill করা, ইলেকট্রিক লাইটের কাছে যাইলে হয় bulb ফাটিয়া যায়, নয়, তার fuse হইয়া যায়। শ্রোতার অভাবে এতক্ষণ মামার গল্প বন্ধ ছিল, মুসলমানটিকে সাদরে নিজের পাশে বসাইয়া একটি বিড়ি দিলেন। মিঞা সাহেব ব্যাগ হইতে হাতপাখা বাহির করিয়া দাড়ীতে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "বিসমিল্লা, কি গরম!"

মামা—হাঁ, সামান্য গরম পড়েছে বটে, তবে বোগ্‌দাদের তুলনায় এ কিছুই নয়।

মিঞা—আপনি বোগ্‌দাদ গ্যাছলেন না কি?

মা—আমি ধনপতি বসু, পৃথিবীর কোন্ জায়গায় যাই নাই তাই জিজ্ঞাসা করুন। চীন থেকে মিশর অবধি কোন দেশ আমার বাকী নাই।

মি—বোগ্‌দাদে কি খুব গরম?

মা—গরম তা আর বলতে? সেবার তিনটে উট আমার চোখের সামনে হার্টফেল হয়ে মরে গেল। আবার মরে পড়ে রইল আমার তাঁবুর সামনে। তখন ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে, ঘন্টায় ২৫/৩০টা হাত পা মাথা amputate কর্ছি, উটগুলোকে যে টাইগ্রিসে ফেলে দেব সে সময় নাই। দু দিন বাদে হাঁসপাতাল থেকে বেরুবার সময় পেলুম। বেরিয়ে দেখি উটগুলো পচে তিন দিন দিনযামিন্যৌসায়ংপ্রাতঃ রৌদ্র লেগে একেবারে আমসত্ত্বের মতন হয়ে গেছে।

মি—বলেন কি? হাড্ডি ভি শুকিয়ে গেল?

মা—একদম বিলকুল শুকিয়ে খেংরাকাটী বানিয়ে গেল।

মি—কি তাজ্জব বাত!

মা—এ আর তাজ্জব কি? নানকিনে এর সাড়ে তিন গুণ গরম। তখন চীনদেশে ডাক্তারী করি। বুদ্ধদেবের Wisdom tooth উদ্গম উপলক্ষে আমাদের ২১ দিন ছুটি। সঙ্গে একটি চীনে হাবসী চাকর নিয়ে চীনের পাঁচীল দেখতে বেরুলুম। গিয়ে দেখি চীনারা কাঁচা পাঁপরে জলের ছিটে দিয়ে পাঁচীলের ওপর রাখছে আর খানিক বাদেই পাঁপর মুচ্‌মুচে ভাজা হয়ে উঠছে।

মি—বিসমিল্লা, এমন কাণ্ড ত কখনও শুনি নি।

মা—শুনবেন কোত্থেকে? আগে ত আর ধনপতি বোসের দেখা পান্ নি। 'আমি চীনুময় ভারত' বলে একখানা বই লিখছি, তাতে এই সব কথা থাকবে। গরমে পাঁচীলের

পাথরগুলো ফটাফট্ ফাটছিল তার এক টুকরো ছিটকে লেগে হাবসীটা মরে গেল।

মি—একদম মরে গেল?

মা—একদম আপাদমস্তক মরে গেল। একেবারে চীনের পাঁচীলে মরে বুদ্ধলোক-প্রাপ্তি। চীন দেশে প্রতি বৎসর পাঁচীলের কাছে ৩৭ হাজার লোক গরমে গলে মারা যায়, এই জন্যেই ত ওরা রেগে দেশটাকে Republic করে ফেল্লে।

মি—কি বিশ্রী মুল্লুক! আপনি বহু জায়গায় টুঁড়েছেন দেখছি। লোকগুলো কি পাঁচীলের ধারেই পচে, না, তাদের কলসীতে পুরে গোর দেওয়া হয়?

মা—পচেও না, গোরও দেওয়া হয় না। গরমে গলে শিলাজতু হয়ে হিমালয়ের গা বেয়ে তিব্বতে এসে পড়ে আর কবিরাজরা তাই কুড়িয়ে নিয়ে ওষুধ করেন। এ শিলাজতু কলকাতায়—কুমারটুলীর বনেদী কবিরাজদের ও হরিণবাড়ি লেনের সেরা সেরা হাকিমদের কাছে পাওয়া যায়। বোগদাদের গিদ্ধড়খানাচকের এক কানা হাকিমের কাছেও কিছু দেখেছিলুম। যাক্ অনেক কথা হল, শালিমারে এসে পড়েছি দেখছি, আসুন আর একটি বিড়ি নিন, আমিও একটু তামাক খেয়ে নিই।

Attache case-এর ভিতর হইতে মামা একটি ছোট হুঁকা বাহির করিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "তাইত মিঞা সাহেব, এতক্ষণ আলাপ হল, আপনার নাম জানা হল না। আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

মি—আমার নাম গাজী বিটকেল-উদ্দীন, ঢাকা জিলার মক্তব হতে বাংলা বাত improve করবার জন্য কলকাতায় এসেছি।

মা—আহাহা, আপনিও বাতে ভোগেন না কি? ও অতি সাংঘাতিক ব্যায়রাম; আমি ওতে তিন মাস শয্যাগত ছিলুম, কিছুতেই সারে না। শেষে কলকাতায় আমার এই ভাগনের বাসায় থেকে ডাক্তার প্রাণহরণ ফিস্‌নবীশের চিকিৎসায় একটু ভাল আছি। তিনি আমাকে সকালে বিকালে ট্রামে, দুপুরে স্টীমারে, সন্ধ্যার সময় রিক্‌সায় ও রাত্রে বাসে বেড়াতে বলেছেন। আপনার বাত কোথায়? হাতে, পায়ে, না শিরদাঁড়ায়?

মি—আমি বাংলা বাতের কথা বলছি, হাত পায়ের বাত নয়?

মা—হাঁ, আমিও তাই বলছি। রাস্তায় অনেক ভিখারী দেখা যায়, বেশ স্যাণ্ডো করা চেহারা অথচ হাতে লাঠি নিয়ে একপা খোঁড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, "রামজীর কৃপায় পায়ে বাত হয়েছে, একটি পয়সা দিন।" এ বাত হিন্দুস্থানী বাত, মেড়ো ছাড়া আর কোনও জাতের এ বাত হয় না। আমি ও বাতের কথা বলছি না। আমার একেবারে বাংলাদেশের শ্রীপাট শান্তিপুরের গেঁটে বাত, একদিন কেরাসিন তেল মালিস কর্তে ভুলে গ্যাছেন কি জয়েনে মর্‌চে ধরে গ্যাছে। আপনার যদি সামান্য বাত হয় ত * * * কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হতে বাঘের চর্বি কিনে মালিস কর্বেন, বেশ উপকার হবে।

মি—আপনি মোটেই সম্‌জাচ্ছেন না, এ সে বাত নয়।

মা—গেঁটেবাত নয়, তবে কি কট্‌কটে বাত? তার ভাবনা কি? কালো ভাল্লুকের নখ কোমরে লাল সুতো দিয়ে বেঁধে রাখলেই সেরে যাবে, তবে দেখবেন ভাল্লুকটির যেন একটিও সাদা লোম না থাকে।

মি—আরে মশাই, আপনার যে কিছুই মালুম হয় না, আমি ওসব বাতের কথা বলছি না।

মা—তবে কি আপনার আমবাত? ওর কথা তুলবেন না। আমবাতের মোটেই respectability নাই, ওটা বাতকুলকলঙ্ক।

মি—আরে মশাই, আমি বাত ব্যায়রামের কথা বলছি না, আমার বাত বাংলা বাত, যাকে আপনারা বলেন, ব্যাঙ্গলী লিংগুয়েজ। হিঁদুদের হাতে পড়ে বাংলা বাত একদম পয়মাল হয়ে গ্যাছে। আমি এই বাংলা লিংগুয়েজে উর্দু ও আরবী বাত ঢুকিয়ে এমন একটি চীজ বানাব যে দুনিয়া সুদ্ধ লোক অবাক হয়ে যাবে।

মা—সাবাস মিঞা, সাবাস! এ অতি উত্তম কথা বলেছেন। বাংলা ভাষায় বাত ধরিয়ে দিতে পাল্লে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়। আমার যখন বাত প্রায় সেরে এসেছিল তখন দিন কয়েক দেশবন্ধু পার্কে বেড়াতে যেতুম, কিন্তু কংগ্রেসওলাদের অত্যাচারে আমাকে বেড়ান বন্ধ কর্তে হয়েছিল; রোজ রোজ মিটিং আর বক্তৃতা, কান ঝালাপালা, tympanum ফাটাফাটি, শেষে পুলিসের লাঠালাঠি। একবার ভাষাতে বাত ধরলে lecture আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। বাছাধনেরা বুকে flag এঁটে বক্তৃতা দিতে এসে হাঁ করে থাকবেন, ভাষার বাত হয়েছে, কিছুতেই কথা বেরোয় না। Political agitation একেবারে stopped. British Government এতদিন কামান, বন্দুক, বেয়নেটে যা করতে পারেনি আপনি একলা তা করে ফেলবেন। এ যেন ঠিক হনুমানের এক লাফে সমুদ্র-লঙ্ঘন। আপনার আশীর্বাদে আমরা আবার নিশ্চিন্তমনে পার্কে বেড়াতে পাব।

মি—আঃ কি আবোল-তাবোল বলছেন মশাই? আপনার মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে।

মা—না মিঞা সাহেব, ধনপতি বোসের মাথা একেবারে খাঁটি অভয় আশ্রমের চরকার সূতোয় বানান, ছিট প্রবেশ করলেই tresspass. যাহ'ক আপনার planটা খুব ভাল, এতে পার্কে ডেঁপো ছেলেগুলোর বক্তৃতা বন্ধ হবে, বাড়িতে মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হবে, এমন কি কাউকে সামনাসামনি গালাগালি দেওয়া চলবে না, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্রের মত খবরের কাগজের মারফৎ ভগবানের কাছে বিপক্ষের সুমতি প্রার্থনা করতে হবে।

মি—না, না আপনি কিছু সমজাচ্ছেন না। আমরা চাই আপনাদের বাংলা ভাষায় শতকরা ৫৫টি উর্দু ও পারশী কথা ঢোকাতে, তা হ'লে সকলেই বাংলা বুঝতে পারবে। আপনাদের হাতে পড়ে সংস্কৃতের ঠেলায় বাংলা language একেবারে জাহান্নমে গেছে, আমরা ওর উদ্ধার কর্তে চাই। এবার বুঝলেন ত?

মা—ঠিক বুঝলুম না, জাহান্নমের latitude, longitude ত আমার জানা নাই। আর নেহাৎই যদি ভাষাটা জাহান্নমে গিয়ে থাকে তাহ'লে ওকে উদ্ধার করতে হ'লে আপনাদেরও ততদূর যেতে হবে।

মি—আলবৎ যাব। এই দেখুন না, আপনারা মিছামিছি নিরীহ মুছলমানদের হয়রান করবার জন্যে তালব্য ছ, মূর্ধণ্য ছ, দন্ত্য ছ— তিনটা ছ রেখেছেন, এর বদলে একটা ছ রাখলে কি ক্ষতি?

মা—ঠিক বলেছেন মিঞা সাহেব, ওটা একটা মস্ত বেয়াকুবী, চীনারা যাকে বলে 'ইংসান্'। আমার একবার বস্‌রায় থাকতে বড় ইলিশ মাছ খাবার ইচ্ছা হয়েছিল। ভাবলুম শ্বশুর মহাশয়কে লিখে দি; তিনি গোটা কুড়ি ইলিশ মাছ Air-mailএ করে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু ইলিশ মাছ কোন্ শ দিয়ে বানান করতে হবে ঠিক না হওয়ায় আমার আর চিঠি লেখা ঘটে উঠল না।

মি—হাঁ, এইবারে বুঝুন, এসব হুজ্জত আমরা তুলে দেব। তবে আপনাদের গোড়ায় কত বৎসর মৌলবী রাখতে হবে, তা না হ'লে সব বাত বুঝতে পার্বেন না। আমরা শতকরা ৫৫টি উর্দু কথা ও অক্ষর ঢোকাব, বাকী ৪৫টি সংস্কৃত থাকলেও থাকতে পারে। তখন দেখবেন বাতের কি চেহারা হয়।

মা—ও বাবা, আপনি ত সোজা লোক নন, একেবারে পাণিনি-ছালাদিন লিমিটেড! তা শতকরা ৪৫টি সংস্কৃত কথা রাখলে কি করে চলবে? গালাগালির কথাগুলো ত cent per cent depressed class-দের কাছ থেকে নিতে হবে। আর এ ভাষাকে বাংলা বলবেন কেন? একে বলুন উর্দোস্কৃত।

মি—ঠিক বলেছেন. আপনার মত বিচক্ষণ লোক আমি খুব কম দেখিছি। আজই দামাদুদ্দৌলা সাহেবকে আপনার কথা বলব।

মা—দামাদুদ্দৌলা সাহেব আবার কে?

মি—আরে দামাদুদ্দৌলার নাম শোনেন নি? তিনিই আমাকে খরচ দিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় আনিয়েছেন। তিনি একবার বল্লেই সব কেতাব এই ভাষায় লেখা হবে। চলুন, চাঁদপাল ঘাটে নেমে দুজনে তাঁর কাছে যাই।

বিটকেলউদ্দীনের কথায় মামার ভাষাচর্চার উৎসাহ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে একাকী বাড়ি যাইতে বলিয়া বিটকেলের সহিত দামাদুদ্দৌলার বাড়ি চলিলেন।

(২)

মামা আজকাল 'উর্দোস্কৃত' লইয়া বড় ব্যস্ত। বিটকেলউদ্দীন ভাষাচর্চার switch টিপিয়া দেওয়া অবধি মামার মাথায় অনবরত উর্দু হইতে সংস্কৃতে alternating current পাস করিতেছে। এরই মধ্যে উর্দোস্কৃতে দু' তিনখানি বই লিখিয়া ফেলিয়াছেন, দামাদুদ্দৌলা আশা দিয়াছেন ওগুলি শীঘ্রই স্কুলপাঠ্য হইবে। মামার কথাবার্তাও আজকাল উর্দুমিশ্রিত। খাইবার সময় প্রায়ই ঠাকুরকে বাবুর্চি বলিয়া ফেলেন। আমি প্রতিবাদ করিলে বলেন, "দেখ, যাহার রন্ধনে বাবুদের রুচি সেই হল বাবুর্চি, এটি অতি প্রাচীন উর্দোস্কৃত শব্দ, আদ্যপদলোপী কর্মধারয়।"

একদিন সন্ধ্যার সময় দেখি মামা অতি প্রফুল্ল মনে একটি Chinese কানেড়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে রিকসায় চাপিয়া আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "আজ আমার নূতন নামে পাঁচ শ' কার্ড ছাপিয়েছি।"

আমি—নূতন নাম কি মামা? নামও বদলালেন না কি?

মা—সব বদলাই নি, কেবল ধনপতি বসুর বদলে দৌলতখসম বসু করেছি।

আ—কি সর্বনাশ, করেছেন কি মামা, কেবল 'বসু'টুকু রেখেছেন? ওটুকুও বাদ দিলেন না কেন?

মা—বসুর বদলে বৈঠ্ঠ করব স্থির করেছিলাম, কিন্তু সেদিন রহিমুদ্দীন একখানা বই থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বিড়ি মুড়ে দিলে। বিড়ি বার করতে গিয়ে দেখি কাগজে লেখা রয়েছে "বুদ্ধদেব বসু প্রণীত।" আমি জীবনের অর্ধেক বর্মা চীন প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে কাটিয়েছি, বুদ্ধদেবের উপাধি ত্যাগ করলে আমার নেমকহারামী হবে, 'ভেস্তে' যেতে পারব না।

(৩)

আজ University Institute-এ উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভার প্রথম অধিবেশন হইবে। মামা সকাল হইতে বড়ই ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের Comparative Philology-র অধ্যাপক নীতিশোভন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যকৃতমূর্জী পিলে নামে এক মাদ্রাজী ও অবোধভাস্কর বাগচী নামে এক চীন-ভাষাবিদকে লইয়া উর্দোস্কৃতের বিরুদ্ধে দল পাকাইয়াছেন। ইহারা মিটিংয়ে আসিবেন শুনিয়া মামা চেনা অচেনা সকলকেই সভায় আসিয়া উর্দোস্কৃতের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করিতেছেন।

বেলা চারিটার সময় মিটিং আরম্ভ হইল। মামা ৫০।৬০ জন যুবক-যুবতী লইয়া আসিয়াছেন, আমাকেও সঙ্গে আসিতে হইয়াছে। সর্ববাদিসম্মতক্রমে দামাদুদ্দৌলা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ও কয়েকখানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন, "অনেক বড় বড় ছাহেব ছুবীর বেতরিবৎ নিবন্ধন আসিতে পারিবেন না বলিয়া পত্র দিয়াছেন। আপনারা জানিয়া খুষ্ট হইবেন যে উর্দোস্কৃতে সহানুভূতি জাহের করিবার জন্য বিশ্বমক্তবের একজন বাংলারুলেমা নিজের নাম বদলাইয়া দানেশমন্দ ছেন রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন, "উর্দোস্কৃত নূতন ভাষা নয়। বাংলাভাষায় পীরোত্তর, আইনজ্ঞ প্রভৃতি উর্দোস্কৃত শব্দ বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভ্রমানন্দবাবু একজন মুসলমান লেখক 'জলপথে'র পরিবর্তে 'পানিপথে লিখিয়াছেন বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, তিনি জানেন না যে বৈষ্ণবসাহিত্যে বহুদিন ধরিয়া পানি শব্দের ব্যবহার হইতেছে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে "আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।'

উর্দোস্কৃতে বলিতে হয় ভ্রমানন্দবাবু রামাজ্জ। ইহার পত্রে আরও অনেক ছারগর্ভ বাত আছে। এখন সভার কাম সুরু করা যাক। যকৃতমজী ও বাগচী ছাহেব compromiseএ রাজী আছেন, আপনারা উঁহাদের বাত গ্রাহ্য করেন কি না মালুম হইলে অন্য কাম্ করা যাবে।

যকৃতমজী বাংলা কিম্বা উর্দোস্কৃত কিছুই জানেন না। তিনি ইংরাজীতে যাহা বলিলেন তাহা হইতে বুঝা গেল যে বাংলার উচ্চারণ মাদ্রাজীদের ন্যায় না হইলে ক্ষিরেই বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরে ডুবিয়া South Poleএর সহিত আঁটিয়া যাইবে। তাঁহার পর একটি অল্পবয়স্ক বালক বক্তৃতা দিতে উঠিল। শুনিলাম ইনিই অবোধভাস্কর বাগচী, ইনি চীনভাষাবিশারদ, বহুদিন জ্যোৎস্নারাত্রে চীনের প্রাচীরের উপর Sun-Yat-Senএর সহিত Mah-jong খেলিয়াছেন। ইঁহার এরূপ চীনপ্রীতি যে প্রাতঃকালে চীনাবাড়ির জুতা দর্শন না করিয়া সিগারেট স্পর্শ করেন না।

ইনি মেয়েলী গলায় বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের উর্দোস্কৃত ভাষার সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমি চীনভাষাকে তাহার অপেক্ষা শ্রদ্ধা করি। আমার নিবেদন, বাংলা পুস্তকে যেমন উর্দোস্কৃতে লেখা হইবে, ইংরাজী পুস্তকও সেইরূপ চীনাবাজারের ইংরাজীতে লেখা হউক। দেখুন চীনারা হুয়েন সাংএর সময় হইতে বাংলা দেশে আমাদের জুতা supply করিয়া আসিতেছে। ইহা উহাদের Yellowman's Burden. অতি প্রাচীনকালে চীনারা আমাদের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন, এই জন্য বেদান্তে ভগবানকে 'চিন্ময়' অর্থাৎ a full-blooded Chinaman বলা হইয়াছে। আপনারা যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হন তাহা হইলে আমি বাগচীর পরিবর্তে 'সেরচী' উপাধি লইতে প্রস্তুত আছি।"

বাগচী 'সেরচী' উপাধি লইবেন শুনিয়া সভায় ঘন ঘন করতালি ও Sandal-তালি হইতে লাগিল। কিন্তু উহা মুসলমানদের মনঃপূত হইল না। এক হারুণ অল রসীদ প্রতিম বৃদ্ধ অঙ্গুলী সঞ্চালনে দাড়ী দশদিকে বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "হদিসে চীনাদের কোনও বাত নাই; উহারা শূয়ার খায়, উহাদের ভাষায় ইংরাজী লেখা হইলে তাহা হারামতুল্য হইবে।" এই কথায় সভায় মহাগণ্ডগোল হইতে লাগিল। দামাদুদ্দৌলার Casting Voteএ যকৃতমজী ও বাগচী উভয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। এখন প্রকৃত উর্দোস্কৃত-প্রচারিণী সভার কার্য আরম্ভ হইল। প্রথমে গাজী বিটকেলউদ্দীন উঠিয়া বলিলেন—

'ভাইছাব ও বহিনছাবীগণ, আজ মোদের কি সুরোজ। আমরা এতগুলি আদমী আদমিনী জাড়পীড়িত বকরা বকরীর ন্যায় একত্র হইয়াছি। টিকিওয়ালা মৌলবীদের হাতে পড়িয়া বাংলা ভাষার নাজেহালত্ব লাভ হইয়াছে, তবে সোবে হয় দৌলতখসম বসু ও সেরচী ছাহেবের মেহেরবাণীতে উহার পুনর্জান্ প্রাপ্তি হইবে। নজর করুন হিন্দু বাঙ্গালীরা কি পাজী! আমরা শতকরা ৫৫ জন হইলেও ওরা আমাদের বাত মোটেই পুছে না। একমাত্র বিনয়কুমার ছরকার ছাব, দুনিয়া, দৌলত,—পয়জার প্রভৃতি বাত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিঁদুয়ানীর চক্রে পড়িয়া তিনিও একখানি কেতাবের নাম "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" রাখিয়াছেন। কেন? উস্কোর বদলে "জরু, গরু ও মুল্লুক" নাম দিলে কি ক্ষতি হইত? আশা করি অভিনয়া সংস্করণে তিনি কেতাবখানির নাম বদলাইবেন। যদি না বদলান, দপ্তরীদের বলিয়া দিব, কেহই উঁহার কেতাব বাঁধিবে না, সকলে finger-strike করিয়া বসিয়া থাকিবে। এখন হইতে আমাদের যথামূরৎ উর্দু ও আরবী শব্দ চালাইতে হইবে। আমাদের জান থাকিতে বঙ্গবাতের অঙ্গ হইতে বিনয় ছাহেবের পয়জারের চিহ্ন লোপ পাইতে দিব না।"

বিটকেলউদ্দীন এই বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন দাড়ী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ও চতুর্দিকে সাবাস, সাবাস কেয়াবাৎ শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। তখন সভাপতির আদেশে হাজী ভীমরুল বেসামাল নামক একটি বাবরীকাটা চুলওয়ালা যুবক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইনি বলিলেন "বেরাদরগণ ও বেরাদারিণীগণা, বিটকেলউদ্দীন এতক্ষণ যা চিল্লালেন তা আপনাদের আলবাৎ কানে ঢুকিয়াছে। একবার হিন্দুদের বদমায়েসীত্ব নজর করুন, আজ হইতে আমরা জান্‌পনে উর্দোস্কৃতের চর্চা করিব। বড়ই আফশোষের বাত যে আজ বেহেস্তীয় দিলবাহার দাস মহাশয় এখানে হাজির নাই। তিনি জান্‌বস্ত থাকিলে কংগ্রেসকে দিয়া বাংলা বাতের মধ্যে শতকরা ৮০টি উর্দুবাত দিবার pact করিতেন। মরদসিংহ সার জল্‌দি-খোশ ছাড়া আর কারুর তাঁকে বাধা দিবার মত ছাতির জোর ছিল না। কিন্তু হায় দাস ছাব আজ ভেস্তে গিয়াছেন। তাঁহার কাম আমাদেরই করিতে হইবে। ইহাতে টেংরীপশ্চাৎ হইলে চলিবে না। আপনারা না করিলে আমি কখনও কসুরাপবাদগ্রস্ত হইব না। আমিও লেখার মধ্যে উর্দোস্কৃত ঢুকাইয়াছি। বিনয় ছরকারের কেরামতিতে বাংলার অঙ্গে পয়জার পড়িয়াছে আমিও উহাকে জিঞ্জির পরাইয়াছি। আমিই বা কম কিসে?"

হাজী ভীমরুল বেসামালের বক্তৃতা শেষ হইলে মামা দামাদুদ্দৌলাকে কানে কানে কি পরামর্শ দিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া দামাদুদ্দৌলা উঠিয়া বলিলেন, "দৌলতখছম ছাহেবের এক দোস্ত এই সভায় হাজির আছেন। ইনি একজন ভয়ানক এলেম্বান্ আদমী, এর মধ্যেই উর্দোস্কৃতের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহার কেতাবের কিছু নমুনা আপনাদের শুনান হইবে।"

দামাদুদ্দৌলার কথায় খদ্দরপরিহিত, শীর্ণকায়, মাথায় এরারুট মাখাইয়া "টেরীকাটা একটি যুবক দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, সভাখসম মহাশয় ও সমবেত সভাগণ! আমার পূর্বের নাম শিশিরকুমার দাস, তখন আমি বেকার সঙ্ঘের একজন মেম্বার ছিলাম। দৌলতখসম বাবুর নাম শুনিয়া একরোজ তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে কিছু সাহায্য দান করিয়া উর্দোস্কৃতের চর্চা করিতে বলিলেন। তাঁহার বাতানুসারে আমি বেকারসঙ্ঘের অফিসে যাইয়া উহার নাম 'সাদীকার সঙ্ঘ' রাখিবার প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু উহার মেম্বারগণ কেহই আমার বাত গ্রাহ্য করিল না, বরং বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে জন কয়েক বেয়াদব আমাকে বাউরা বলিয়া ভাগাইয়া দিল। তখন আমি দৌলতখসম বাবুর আস্তানায় আসিলাম ও শিশিরকুমার দাসের বদলে 'ওস্‌পোলা গোলাম' নাম লইলাম। তাঁহার সলামর্শে জল্‌দাজল্‌দি উর্দোস্কৃতে কেতাব বানাইতেও শুরু করিয়া দিলাম। বহুদ্রোজ আগে বিদ্যাসাগর নামে এক আদমী বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া দুখানি কেতাব বানাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে উর্দারবী বাত একদম নাই। তদোয়াস্তে, আমি কেতাব দুখানা উর্দোস্কৃতের কায়দানুযায়ী বানাইয়াছি ও উলেমাগণের পড়াইবার সুবিস্তার জন্য বহুৎ সলা বাত্‌লিয়াছি। আমার কেতাব এইরূপ হইবে ঃ—

রং মোলাকাৎ।

পহেলা বখরা।

ভেস্তে-যাত এলেমবহর কর্তৃক বানিত

ও

গোলাম্ ওস্পোলা চেক্‌নাই দ্বারা পরিবর্তিত।

বাংলা হরফ দুরকম, 'রং তরকারী' ও 'রং আওয়াজ'। 'রং তরকারী' পহেলা। উহার হরফগুলি গোড়া হইতে এই রকমে লিখা হয় ঁ, ঃ, ং ...। ইহাদিগকে 'নোক্তাচাঁদ', 'বিবেহেস্ত', 'গোবরাণু' ইত্যাদি বলিয়া পড়িতে হয়। পহেলা বখরা আগাগোড়া এই রকমে বানাইয়াছি। দোসরা বখরাও শুরু হইয়াছে। উহার গোড়াতে 'ঐক্য, বাত্য, বিসাদীক্য, জহরত্য' প্রভৃতি আচ্ছা আচ্ছা বাত লাগাইয়াছি। এই বখরা এখনও সারা হয় নাই তবে আপনাদের মেহেরবানী থাকিলে জল্‌দি ইহা লিখিয়া ফতেষ্ট হইব।"

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের এই নমুনা দেখিয়া সকলে খুব প্রশংসা করিলেন। চতুর্দিকে "বহুৎ আচ্ছা, সাবাস, কেরামৎ কেরামৎ" শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। মামা কেবল

"দৌলত্য, দৌলত্য" বলিয়া ভীষণ ভাবে চিৎকার করিতে লাগিলেন।

আর কেহ কিছু বলে না দেখিয়া মামা একটুকরা কাগজে কি লিখিয়া সভাপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দামাদুদ্দৌলা তাহা পড়িয়া বলিলেন, "বড়ই স্ফূর্তির বাত যে সংস্কৃত জানা একজন পণ্ডিত দৌলতখসম ছাহেবের সাথ এখানে আসিয়াছেন, তিনি এখন উর্দোস্কৃতের পক্ষে বলিবেন।"

তখন মামা ইসারা করিলে নামাবলী গায়ে এক ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাকে প্রত্যহ মামার নিকট আফিং দিয়া চা খাইতে দেখিয়াছি। দামাদুদ্দৌলার পাশে আসিয়া ইনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সভাপতি মহাশয় ও ভদ্রমহোদয়গণ। মদীয় নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র পূতিতুণ্ড ভট্টাচার্য শিরোমণি, আমি একজন গণ্ডহিন্দু, ইতর লোকে যাহাকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত না করিয়া আমি জলোস্পর্শ করি না। পূর্বে আমি কার্তিকচন্দ্র পরামাণিক্যের কাষ্টগোলকে কার্য করিতাম, সম্প্রতি ধনপতি বাবুর সাহায্যে একটি বিদ্যালয় উৎখোলন করিয়াছি। ধনপতি বাবু আমার পরম হিতাস্কাঙ্ক্ষী। একজন সংস্কৃতাজ্ঞ গণ্ডপণ্ডিত সাম্যর্থন করিলে আপনাদের কর্মের সৌকার্য হইবে শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি অদ্য এই সভায় আপনাদিগের সহিত সমবেত্র হইয়াছি। আমি বাংলা ও সংস্কৃত সম্যক্ অবগত আছি এবং মদীয় পাঠ্যশালয়ে ছাত্রগণকে ইংরেজী ফাষ্টোবুকের চিলের পাতা অবধি অধ্যাপনা করিয়া থাকি। প্রয়োজন হইলে বালকগণকে ড্রিল, মুদগরভঙ্গিকা ও কুস্তীও শিক্ষাদান করিতে পারি। অনেক দিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করিতে করিতে চট্টগ্রামের নাবিকগণের বাক্যালাপ পরিশ্রুতিগোচর হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হৃদয়োদগম্য না হওয়ায় কিছুতেই উহার মর্মানুদ্ধাবন করিতে পারি নাই। ইহা হইতে আমার মর্মান্তিক ধারণা হইয়াছে যে উর্দোস্কৃত ব্যতীত আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্বাহ অসম্ভব। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, মার্দৃশজনের বাক্যে আপনাদের কিছু গমনাগমন হইবে না। কিন্তু রামায়ণে লিখিত আছে যে, যখন রামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিতেছিলেন তখন হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি মহদ্বীরগণ উপস্থিত থাকিলেও জনৈক কাঠবেরালী তাঁহাকে একমুষ্টি বালুকা দিয়া সাহার্য্য করিয়াছিল। আমিও সেই প্রাচীনা কাষ্টমার্জারীর ন্যায় ধনপতি বাবুকে সাহার্য্য করিবার জন্য এস্থলে আগন্তুক হইয়াছি। আপনাদের যখন উর্দোস্কৃতে পুস্তক ছাপা হইবে তখন উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে আমি প্রাণোৎপাত করিয়া উহার proof প্রদর্শন করিব। আশা করি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাক্ আপনাদের মানস্পুটে অঙ্কিত থাকিবে এবং যথাসময়ে আমাকে উক্ত কার্যের ভারাস্পণ করিবেন।" এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় বসিয়া পড়িলেন; তাহার কথায় কেহ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না।

শিরোমণি মহাশয় বসিয়া পড়িলে পর দামাদুদ্দৌলা বলিলেন, "কলিকাতা দুনিয়ামক্তবের বাতচ্ছাস্ত্র-হুনহুর নীতিছোভন ছাহেব কিছু প্রতিবাদ করিতে চান্। এইবাব তাঁহাব বলিবাব পালা, আপনারা তাঁহার কথা শুনিবেন না।" নীতিশোভন বাবু প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া কোমরে তাঁহার যব-বালি-পরিচিত ময়লা লালপেড়ে সিল্কের চাদর বাঁধিয়া সকাল ৭টা হইতে Hunger-strike করিয়া Auto suggestionএ বরাহ অবতারের উপাসনা স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় বেলা ৩ টার পর হইতে তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, এখন সভাপতির কথায় চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া লাফাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,

"সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ, আমি উর্দোস্কৃতের একান্ত বিরোধী। হিন্দুর সনাতন ভাবধারা কখনও উর্দুতে প্রকাশ পাইতে পারে না। সংস্কৃতোৎপন্ন ভাষা ব্যতীত আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা সভ্যতা অসম্ভব। হিন্দুদের একটি নিজস্ব কাল্‌চার আছে। এই কাল্‌চার যুগযুগান্ত হইতে সংস্কৃতের সহিত বিজড়িত। আপনাদের ইহা নাই বলিয়া আপনারা ইহার মূল্য সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন না।"

যেই নীতিশোভন বাবু এই কথা বলিয়াছেন অমনি "তোবা, তোবা" বলিয়া ঢাকা হইতে

আগত একটি ওয়াল্‌রাসোরস্ক হিপোপটেমাস-স্কন্ধ মুসলমান যুবক লাঠিহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল

"আরে কত্তা, বস্ যান, থামা দ্যান, কাল্‌চার, কাল্‌চার করি চিল্লাইবেন না। কাল্‌চার বুঝি ক্যাবল হেঁদুগো আছে, মোছোলমানদের নাই? কেন, মোছলমানরা কি ম্যাঘনার জলে ভাইস্যা আইছে না কি? কাফের হেঁদুদের যদি কাল্-চার থাকে ত মোছলমানদের নিশ্চয়ই 'পরশু-পাঁচ' আছে। যদি না থাকে ত হাতী মিঞাকে বৈল্যা গভর্ণমেন্টের কান মল্যা আদায় কইরা লইমু।"

ইহার কথায় চতুর্দিকে তুমুল হাস্যধ্বনি উঠিল। সভাপতি বহুকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া রহিলেন। বিট্‌কেলউদ্দীন রাগিয়া লোকটিকে তাড়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পাছে গোল বাধে এই আশঙ্কায় মামা তাহাকে নিরস্ত করিলেন। শেষে দামাদুদ্দৌলা তাহাকে বহু চেষ্টায় বসাইয়া দিলেন, লোকটা বসিয়া আপন মনে গজরাইতে লাগিল। নীতিশোভন বাবুও বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন দৌলতখসম বসু ছাব কিছু বলিবেন, ইনি উর্দোস্কৃতে বহুৎ কেতাব বানাইয়াছেন তাহা হইতে কিছু কিছু পড়িবেন।" তখন মামা তাঁহার সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মজলিশখসম জবরাশয় ও ভদ্রাভদ্র মাজলিশ্যগণ, আমি ভদ্রাভদ্র বলিতেছি কারণ এ সভায় নীতিছোভন বাবুর মত অভদ্রাদ্‌মীও হাজির আছেন; হে জেনানাবৃন্দ, আপনারা নীতিছোভন বাবুর বাচস্রুবণ করিবেন না। উনি হিঁদুর সনাতন ভাবধারার কথা বলিয়াছেন কিন্তু সনাতনের যে দবিরখাস বলিয়া উর্দোস্কৃত নাম ছিল তাহা বলেন নাই। এই থেকেই আপনারা সমজাচ্ছেন উনি কি রকম সাংঘাতিক ধাপ্পাবাজ। উঁহার জানা উচিত যে উর্দুই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাত। উরস্ দুলাইয়া যাহা পড়া যায় তাহাকে উর্দু বলে। আপনাদের নিশ্চয়ই নজরুক্ত হইয়াছে যে আদ্‌মী শিশুগণ যখন নয়া পড়িতে শুরু করে তখন তাহারা ছাতি দুলাইয়া পড়িতে থাকে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে পহেলা সকলেই উর্দুতে পাঠ করে। আমরা মেহেরবানী করিয়া শতকরা ৪৫টি সংস্কৃতবাত রাখিতেছি। অনেকে শতকরা ৫০টি বাত সংস্কৃতে রাখিতে চান। কিন্তু তাহা হইতে পারে না—কারণ আমরা সংস্কৃতের সহিত compromise (কম্—প্রমিজ) করিতে চাই। সমান promise কিম্বা বেশী promise করিতে পারি না। বড়ই আফশোষের বাত যে দুনিয়া-ওজন্‌তী মুসলমানগণের নিকট হইতে বহুৎ আশরফী বাগাইয়াছে তথাপি আফতাবেন্দ্রের উর্দোস্কৃতের প্রতি নেক্‌নজর নাই। কিন্তু উহাতে আমাদের ডরান্বিত হইলে চলিবে না। এই বাতে যে আচ্ছা কেতাব বানান যাইতে পারে তাহা দেখাইবার ওয়াস্তে আমি রামায়ণখানি উর্দোস্কৃতে বানাইয়াছি! আমার বানিত কেচ্ছা হইতে কিছু পড়িয়া শুনাইব। আপনারা স্থির মেজাজিস্থ খাড়কর্ণ হইয়া শ্রবণ করুন। দ্যাখেন আমার হাতে বাংলা বাতের চেরাগ, কি রকম উর্দোস্কৃতের তৈলযোগে কাশ্মিরী দুম্বার ন্যায় পত্‌পত্ নিনাদে গগনসড়কে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।" এই বলিয়া মামা একতাড়া কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"সীতার সাথ রিস্তাদশ-ছাওয়াল রামের সাদী হইয়া গিয়াছে; কয়েকদিন খুব জবর খানাপিনা চলিয়াছে। হর রোজ বাইগুনের কোপ্তা ও ঠাণ্ডী পোলাও ভক্ষণে সকলের প্যাটে খিল ধরিতেছে। কেহই হাত হইতে বদ্‌না নামাইবার ফুরসদ্বন্ত হইতে পারিতেছে না। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও দুস্‌মনঘ্ন সকলেই হাজির। সীতামায়ির ললাটে সিন্দূর পানি-পানি করিতেছে। নবাবর্ষি জনক চারপায়োপবেশনে উজু করিতেছেন তাঁহার সামনে বশিষ্ঠ মৌলবী, দুনিয়াদোস্ত মোল্লা গৌ চুরী করিয়াছে বলিয়া নালিশের আরজী পেশ করিতেছেন। এমন সময় "হরিনাম হক্, হরিনাম হক্" বলিতে বলিতে নারদ মোল্লা আসিয়া হাজির, ইয়া আজানুলম্বিত নুর, হাতে অলাবুর বদ্‌না, মুখে স্ট্রাণ্ডরোডের বিড়ি। জনক তখনই তাঁহাকে

লুঙ্গিগর্দান হইয়া আ-জমীন সেলাম করিলেন। নারদ বলিলেন, "ভোঃ ভোঃ ওজুম্মান বাবা পাতশাহ, তিবৎ শরীব, সরীফ ত?" বাবা পাতশাহ বলিলেন, "হে মেহেরবানীময় মোল্লাসত্তম, পঞ্চ-মামদো নির্মিত শরীরের বাত পুছিয়া বান্দাধমকে কেন লাজ দিতেছেন? আপনি দামাদপ্রবর রামকে আশীর্বাত করুন। উহাকে যেন নেকাহিত জীবনে কোনও বালাই ভোগ করিতে না হয়। আজ আমার বহুৎ সুরোজ, তবমাফিক পরম বখরাবতের দর্শন প্যালাম্। আমি বুড্ডা বনিয়া গিয়াছি, বোখারা রাক্ষসী আমাকে গ্রাস করিয়া বৈঠিয়াছে। আশীর্বাত করুন, যেন আমার জান্ চেরাগ নিবিয়া গিয়া ভগবানের গোঁড়ে আস্তানা কায়েম করিতে পারে।" এই বাত শুনিয়া নারদ মোল্লা ফুকারিলেন "সওদাগর সওদাগর! আপনিই যথার্থ খোদাবিদ্। আপনার মধুর্বাতে আমার নূরে বাতাস লাগিল।" এই বলিয়া তিনি রামকে একটি হরিতকী নজর দিয়া বলিলেন, "হে রঘু-খসম কমল-চশম, মুস্কিল-ভঞ্জন, বিপদাসান্ সর্বমুরোদাবাদ ব্রহ্মাতালা তোমায় ভাল রাখুন।" রামজী পাকিটে হরিতকী রাখিতে গিয়া দেখেন যে পাকিটের গর্ত আছে, পাকিট নাই। এই দেখিয়া তিনি দিলোদুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেখুন, দরজীর কাণ্ড, মেরজাইটির জন্য বেটাকে নগদ ১৮ আনা কার্ষাপণ দিয়াছি তবু বেটা পকেট বানায় নাই।" বাবা পাতশাহ বলিলেন, "রাম তোমার মস্তকে মোটেই এলেম গজায়িত হয় নাই। দরজীকে কি কেহ বিশ্বাস করে? বৌধায়নের হদিসে আস্নাই গোঁসা প্রভৃতি ছয়টি রিপুর কথা লেখা আছে। এই রিপুদের কামকে 'রিপুকর্ম' বলে। দরজীরা হরদম রিপুকর্ম করে, উহাদের বিশ্বাস করিতে নাই।" তখন নারদ মোল্লা বলিলেন, "ভোঃ বাবা পাতশাহ, আসিবার সময় নয়া সড়কের ধারে টাঙ্গিরাম দরবেশের সাথ মোলাকাত হইল, টাঙ্গিরাম আপনার জ্যেষ্ঠদামাদের সাথ একহস্ত লড়িবেন বলিয়া আসিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ গোঁসান্বিত হইয়া বলিলেন "কি বোলতা, মোল্লাবর? কে টাঙ্গিবাম দরবেশ? হামি অমন একশোটা টাঙ্গিরামকে এক কলিকায় সেজে খানা পিনা করিতে পারি। সে আগে হামার সাথ লড়ুক, তার পর রামভেইয়ার সাথ লড়্বে।" নারদ বলিলেন, হে লছমন, তুমি অপরিণত-উমেরস্ক বালক মাত্র, তোমার মগজ বুদ্ধিষ্ঠ হইতে বহুৎ দেরি। তুমি টাঙ্গিরামকে চিন না। ও মোটা মোটা ছত্রীদের পোলা দেখলেই গাঁজা খাইবার পয়সা চায়, পয়সা না পাইলে জলদি গর্দান লয়। ও একটি ধাড়ী সয়তান, নিজের মাকে কোতাল করিয়াছে।" এই অপরূপ রামায়ণ শুনিতে শুনিতে হিন্দুদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। একজন শ্রোতা বলিল, "মশাই কি এখানে মস্করা কর্তে এসেছেন?" আর একজন বলিল "না, উনি দামাদুদ্দৌলার আস্কারাতে রসকরা বিলুচ্ছেন।" মামা এই কথায় একেবারে বাগে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, "কি বেটা জিন্ছাওয়াল, খোবীসদামোদ! আমায় বাধা দেওয়া! তোমার নাশ্লিতে পোকা পড়ুক। যদি আমার কথা না শুনবে তবে এখানে মরতে এসেছ কেন? যাও রাসমণির বাজারে কুমড়ো বেচো গে, দুপয়সা রোজগার হবে।"

মামার আস্ফালনে হাতাহাতির উপক্রম দেখিয়া দামাদুদ্দৌলা বলিলেন, "দৌলতখসম ছাব, আর আপনার রামায়ণের কাম নাই। আপনি যে poetry বানাইয়াছেন তা থেকে কিছু বাতলিয়ে দ্যান।" তখন মামা বলিলেন, "এ অতি সু-বাত, এবার একটু গজলপদী কবিতা শুনুন।" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—

দামাদুদ্দৌলা চিল্লায় সাজ্ সাজ।
হেঁদুর হাড্ডিতে ফেলবো বাজ্।।
বিটকেলউদ্দীন বোকা দুম্বা।
নাড়ছে হামেশা নূর লম্বা।।
বাংলা ভাষা হয়ে দেওয়ানা।
বুলছে দেখ দীন নয়না।।
দেখরে মোদের বাতমাতা।

পিঁধেছেন আজ ছেঁড়া কাঁথা।।
ওঁকে উর্দুর উর্দী পরাতে হবে।
তবে ত মায়ি বিবি বানাবে।।
আমি বসু দৌলতখসম।
বলছি লিয়ে কালীর কসম।।
বাঙ্গালীর বাত সহিদ হবে।
কিম্বা আমার জান্ যাবে।।
আমি জননীর হক ছাওয়াল।
পরাবো মাকে উটের ছাল।।
উর্দোস্কৃতে বাত কই।
আদমী মুই, দুম্বা নই।।

মামার poetry শুনিয়া শ্রোতারা "কেরামৎ কেরামৎ" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মামা সোৎসাহে বলিলেন, "এ কাম্ সব মেরা নিজস্ব, কেবল শেষের লাইনটি ডি. এল. রায়ের 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ'-এর উর্দোস্কৃত তর্জমা।"

মামার বক্তৃতা শেষ হইলে সকলে "হাতী মিঞাকী জয়, দৌলতখসম বসুকা জয়" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সভাপতিকে কেহ কিছু বলে না দেখিয়া মামা স্বয়ং তাঁহাকে Vote of thanks দিলেন ও চেঁচাইয়া বলিলেন, "সকলে বলুন জয় বাবা দামাদুদ্দৌলা মায়িকী ফতে!" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টুপি বাহির করিয়া পরিলেন। টুপিটি আর্ধেক গান্ধী ক্যাপ্ ও আর্ধেক ফেজ্; তাহার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা

"উর্দোস্কৃতে বাত কই!
আদমী মুই, দুম্বা নই।।"

সভা ভঙ্গ হইল। শ্রোতারা উৎসাহে মামাকে চ্যাংদোলা করিয়া রিক্‌সায় চাপাইয়া দিল, আমিও রিক্‌সার একধারে বসিলাম। রাত্রি তখন ৯টা। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রিক্‌সা যখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ব্রাহ্মমন্দিরের কাছ দিয়া যাইতেছে তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শুনিলাম কয়েকটি যুবক ব্রাহ্মসমাজের সিঁড়ির উপর বসিয়া গান গাহিতেছে—

"চিদাশ্ মানে হল পূর্ণ আস্‌নাই-চন্দ্রোদয় হে।"

আমি বলিলাম, "মামা এ কি কাণ্ড করলেন?"

মামা গম্ভীরভাবে বলিলেন—

"কালোস্মি ভাষাক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
বাংলা সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতোর্দুস্কৃতে ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যে স্ফুরিতা প্রত্যনীকেষু বাতাঃ"

অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

পুরাতন বনাম নূতন

অজ্ঞাত

পুরুলিয়ার জনৈক ভদ্রলোক নিম্নলিখিত দুইখানি পত্র 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রথমখানি পিতার, দ্বিতীয়খানি পুত্রের।

পিতা মানভূমবাসী, শুকলাল মাহাত নামক একজন কৃষিজীবী। পুত্র শ্রীমান গরাচাঁদ মাহাত, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। লেখাপড়া যত না হউক, আধুনিক তারুণ্য আয়ত্ত করিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। পিতা ও পুত্রের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান ছিল এবং এখনও আছে, যেহেতু খরচটা পিতার কাছ হইতে যায়।

বলা বাহুল্য শুকলাল মাহাতর অবস্থা মন্দ নহে। বার্ষিক কম পক্ষে দশ বার হাজার টাকা আয়। কিন্তু তাহার চালচলনে তাহা বুঝা যায় না। মানভূমের কৃষিজীবীদের দেখিয়া তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না।

"পিতার পত্র"

৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নিতাইহরি
স্মরণং

বিড়ালখেদা,
মানভূম।
গুরুবার, আশ্বিনের এগার দিন।

আশীর্বাদং বিশেষ পরে,

হাঁম্‌দের গাঁয়ের রোঘনাথ মাহাত কুকুরগড়া যাঁয়ে রঁহেন। কুকুরগড়ার জমীদারলে তুমার কুশলটী মাঙ্গে আনিয়ে রঁহেন। সাঁঝেরবেলি তুমার খতটী আল। হাঁম্‌দের গাঁয়ে দেবতা কৃপাবর্ষণটী নাই করেন, মেনেক কাল বেলাডুবিএ টুক্‌চা বার্ষিল। শুকা, গড়াবাদি, হাজাধান ইবছরে নাই হবেক। কুকুরগড়ার জমীদার খাজনার ত'রে লক্ ভেঁজিয়ে রহেন। বল্লি, নাই দিতে লার্‌ব। কুথালে পাব? লক্‌টায় মোকর্দমা করবেক্ বলিঁএ চাঁলিঁয়ে গেল্‌ছেন্।

তুমার বাপের আজও খাতে নাই, আর কালও নাই। হামি টাকা কড়ি কুথায় পাব? হাঁমি গরিব, হাঁমি চণ্ডাল। তুমি দিনাক লবাব হোছ। লেখিন্ ভাল হবেক্ নাই। হাঁম্‌দের গাঁয়ের চাঁমুখুড়া বিদ্বান্ লক্ বঠেন। উনারেই কাছে শুনে রহি যে তুমি পড়াশুনাটী নাই কর। কেনে কর নাই? বাবুছাদের হনুকরণটী কৈরহো না। মাথার ঘাম্‌টি টঁস্‌টঁসাই গির্‌ছে, লেখিন্ তুমি বুঝ নাই। হাঁমাদের উকীলছা কলকাতায় পড়ছেন। উনার দুকুড়ি দশ টাকায় হবেক্, আর তোমারেই কেনে নাই হবেক্? অত্‌না চালাকী নাই করিস। ভাল হবেক্ নাই, বলে দিছি। হামি তিন কুড়ি টাকার বেশী নাই দিতে লারব। হামার টাকা কুথায়? তুমার মায়ের হিচ্ছাতেই অথায় তুমাকে ভেজে রহি। আর বেশী নাই লিখব। হামার আর তুমার

মায়ের শ্রীচরণের ধূলা লিবে। রজ একটি খত দিবে। ইতি

শ্রীল শুকলাল মাহাত বাবু সিংমুড়া,

সাং, বিড়ালখেদা
পোঃ কুকুরগড়া
থানা পুরুলিয়া
জেলা মানভূম।

পুত্রের উত্তর

Hindu Hostel.
পয়লা অক্টোবর, ১৯২৯
রাত্রি এগারোটা

Governor,

তোমার চিঠি পেলুম। তোমার এরকম চিঠি একেবারেই expect কর্তে পারি নি। আমায় দু'একদিনের মধ্যে টাকা পাঠিও, নতুবা আমি বন্ধু ও বান্ধবীদের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। যদি তোমার টাকাই না ছিলো, আমাকে এখানে না পাঠালেই পার্তে! তোমার "উকীল ছা" বাধ্য হয়ে ৫০ টাকায় চালায়, কারণ সে তার বাপের মতই সেকেলে ভূত।

তোমায় warning দিচ্ছি, আমায় এমন ক'রে আর চিঠি দিও না। তোমার ঐ জমিদারী সেরেস্তার পচা বালি-কাগজের চিঠি যদি গীতিগন্ধ গাঙ্গুলী কিংবা মলয়হিল্লোল সেন দেখত তারা কি রকম idea পোষণ করত তা তুমি বুঝতে পারচ না বোধ হয়। বুঝবেই বা কোথা হ'তে? অজ পাড়াগেঁয়ে যাকে বলে।

গাঁয়ের "চামু খুড়াকে" ব'লো যে সে যদি আমার সম্বন্ধে কোনও কথা বলে, আমি তাকে জেলে দেবো।

আমার ষাট টাকার এক পয়সা কমে মাস চলতে পারে না। আমার সিনেমা খরচই দশ বারো টাকা, তারপর তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে মধ্যে Tea Party দিতে হয়, তারও একটা খরচ আছে ত!

তুমি আধুনিক সভ্যতার কিছুই জান না। দু'একটা cinema দেখলে কিছু শিখতে পার, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট খারাপ, চিরদিন লাঙ্গল ধরতেই গেল। Europeএ love কি রকম ভাবে কর্তে হয়, কোনখানে কি ভাবে কথা বলতে হয়, কোনখানে কি ভাবে দাঁড়াতে হয়, এগুলো শিখতে হ'লে তোমার "বিড়াল খেদায়" শেখা হয় না। তাছাড়া, আমরা তরুণ, আমাদের সাহিত্যের খোরাকের জন্যও ও-সব দরকার।

আরেক কথা, এখানকার Barrister Mr. Talapatra, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর কন্যা Darjeelingএ যাচ্ছেন—তাঁদের সঙ্গে আমার চেনা না থাকলেও শুনেছি তাঁরা আমাদের মাসিক পড়েন সুতরাং আমাকেও দার্জিলিং নিশ্চয় যেতে হ'বে। এজন্য কম্‌সে কম তিনশো টাকার দরকার। পত্র পাঠমাত্র টাকা পাঠাও, নতুবা যাক্।

আর কিছু লেখবার নেই। তোমাদের শ্রীচরণের ধুলো নিয়ে মাথায় জটা বেঁধে গেল। ওসব বাজে মামুলি কথা ছেড়ে দিয়ে কাজের কথা দুলাইন লিখলেই চলে। ইতি

Yours sinly
G. Mathew

ভাদ্র ১৩৩৬

প্রবীণ পুরোহিত

শ্রীসরেসচন্দ্র বেশ-লিখ্‌চ

নাচ চলিতে লাগিল। মন্দিরের প্রাঙ্গণতলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল নবীন কিশোরের দল, নূতন ভঙ্গীতে তাণ্ডব ছন্দে। মধ্যে থাকিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন দেবী মুগ্ধনেত্রে। দূরে দূরে কাতার দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল বিস্ময়ে ভয়ে মূক হাজার হাজার পূজার্থীর দল। উর্ধ্বে সোপানশীর্ষে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন প্রবীণ পুরোহিত, ব্যথিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেবীর পদতলে।

সহসা কোন্ গানের ফাঁকে দৃষ্টি পড়িল দেবীর, তরুণ পূজার্থীর হাতে উজ্জ্বল রংএর একটি বনফুলের উপর। তার পাপড়ির চারিপাশ কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়াছে কোন এক অজ্ঞাত গোপনচারী কীট। সকলের হাতেই সেই ফুলের নৈবেদ্য।

দেবী বলিলেন, "তরুণ, নৈবেদ্যের ফুল কীটে-কাটা কেন?"

তরুণ বলিলেন, "কীটে যে কাটে!"

"ক্ষুদ কুঁড়ায় এমন উগ্রগন্ধ কেন?"

"পচাইয়াছি।"

দেবী বিমনা হইলেন। যেখানে নবীন পূজার্থীর দল পুনরায় নৃত্য শুরু করিয়াছিল অবিরাম কান্নার গানহীন সুরে, নিরস্তালের নব তালে, দেবীর মন সেইখানে কি যেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না।

এমন সময়ে সমবেত তরুণ পূজার্থীর কণ্ঠে কণ্ঠে স্তব উঠিল—

"নারীং সরস্বতীং বন্দে বেদনাভিন্নমানসাং
নগ্নাঙ্গীং বায়সারূঢ়াং গূঢ়কামপ্রপীড়িতাম্।
মসীং দেহি লেখনীঞ্চ ভূরিশঃ কাগজস্তথা
লিখ্যন্তে তু ব্যথাজীর্ণাঃ সুমগ্নাশ্চিত্তকামনাঃ।।

"হে সরস্বতী, মানবকল্পনার সহস্র সোপানের পরপারে অলীক স্বর্গলোকের কৃত্রিম দেবীত্বপদবীকে পরিহার করিয়া আজ তুমি এই ধরণীর প্রাঙ্গণতলে নারীত্বের যথার্থ আসনগ্রহণ করিয়াছ, তোমাকে আমরা বন্দনা করি। নিখিল হৃদয়ের নিবিড় বেদনা তোমার চিত্তকে বিদীর্ণ করিয়াছে, তোমাকে বন্দনা করি। হে চিরন্তন নারী, নকল সভ্যতার যুগে যুগে সঞ্চিত ভারসন ঐশ্বর্যের ঝলমলে মণিমাণিক্য অলঙ্কাররাশি ও মিথ্যালজ্জার আবরণকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করিয়া আদিম মানবের মনোহর নগ্নতাকেই বরণ করিয়াছ, তোমাকে বন্দনা করি। মূঢ় সমাজে যাহা কিছু পতিত উৎক্ষিপ্ত, যে-সমস্তকে তুচ্ছ করিয়া কুৎসিত বলিয়া সে ত্যাগ করিয়াছে তাহারই অন্তরের তলে তলে যে-পাখী প্রতিনিয়ত জীবনরসের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে, তাহাতেই পুষ্ট বর্ধিত নন্দিত হইতেছে, মাটির নেশায় নন্দনকাননের কাম্য-লোককেও যে নগণ্য করিল, এই ধরণীর একান্ত আপনার ধন সেই দরদী পক্ষীরাজ বায়সকেই তোমার বাহন করিয়াছ, তোমাকে বারম্বার বন্দনা করি। লক্ষ্মীপতির দুয়োরাণী তুমি, উপেক্ষিতার অসহ বিরহজ্বালা বীণার মূর্ছনায় ভুলিতে চাহিয়াছিলে কিন্তু সে বীণা বাজিল কই? সে যে আজ শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে। তোমার হৃদয়ের বিরাট শূন্যতার সুযোগ্য অবসরে পঞ্চশরের গুপ্ত শর কখন যে তোমায় বিদ্ধ করিল, হে অলখভিন্নে, আমাদের ব্যথার পূর্ণাঞ্জলি গ্রহণ কর, তোমাকে আমরা বন্দনা করি। হে বাঙ্‌নারী, তোমার

ব্যথিত, কল্লোলিত হৃদয়ের মগ্নচৈতন্যে যে শত কামনা আজিও লীন রহিয়াছে, যাহা তুমিও জান না, ব্যক্ত করিতে পারিলে না, তাহারই অরুন্তুদ কাহিনী আজ কীর্তন করিবার বাসনা করিয়াছি, আমাদের কালি দাও, কলম দাও, অফুরন্ত কাগজ দাও।"

দেবী দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। বিকশিত পদ্মের মত সুকোমল আসন বিছাইয়াছিল যে প্রাঙ্গণ তাঁহার পদতলে, তাহাই বিঁধিতে লাগিল কাঁকরের মত তীক্ষ্ণ, কঠিন। কিসের যেন অজানা কোন ভয়ে বস্ত্রখানিকে সর্বাঙ্গে দৃঢ় সম্বরণ করিয়া ত্রস্তপদে চলিলেন দেবী হাজার সোপান বাহিয়া ঊর্ধ্বে যেখানে প্রবীণ পুরোহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন আনত মুখে।

দেবী ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরোহিত, আমার মন্দিরের দুয়ারে ইহারা কাহাকে চায়?"

ব্যথিত পুরোহিত বলিলেন, "নিজের অক্ষম হৃদয়ের নগ্ন বাসনাকে।"

নীচে কোলাহল উঠিল।

শতকণ্ঠে ধ্বনি জাগিল, "নামিয়া এস, নামিয়া এস হে নারী, নামিয়া এস জীর্ণ ব্যথিত হৃদয়ে, শীর্ণ বাহুর বন্ধনে, শুষ্ক-তপ্ত অধরের জ্বালায়। সকল অলঙ্কার সকল ভূষণ সকল বসনাবরণ দূরে ফেলিয়া এস নামিয়া চপল চরণে, লঘু নৃত্যে!"

স্তব্ধ হইল শত কণ্ঠ! প্রসারিত হইল শত বাহু আকুল আগ্রহে দেবীর উত্তরীয়ের প্রতি।

অসহ্য বিস্ময়ে ভ্রূবদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন দেবী নীচে প্রাঙ্গণের পানে। সে কঠিন দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিল, থামিয়া গেল অতুল কণ্ঠের বাণী, ভাঙিয়া গেল কত যুগের কত গভীর সাধনায় উদ্বোধিত প্রাণের প্রতিষ্ঠা। দেবী পাষাণ হইলেন।

নট নটীরা কেহ বা জানিল, কেহ বা জানিল না। নট-নায়ক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শুধু তেমনি মূক তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন প্রবীণ পুরোহিত। হাজার সোপানের নীচে প্রাঙ্গণের মধ্যে কিশোর পূজার্থীদের দল তখনও উন্মত্ত ছন্দে নাচিতেছে গাহিতেছে।

কার্তিক ১৩৩৪

সাহিত্য-বিকারের প্রতিকার

শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত পাঠক

বিগত মহাযুদ্ধে নানা নূতন সেনাবাহিনী গঠিত হয়; যথা, আকাশবাহিনী (Air force), ট্যাঙ্ক-পল্টন (Tank corps), রাসায়নিক যুদ্ধসেনা ইত্যাদি, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ তো ছিলই। প্রতি যুদ্ধেই ইহাদেরই কথা সকলে শুনিত এবং সম্মান বা সমাদরের প্রধান অংশ ইহাদের ভাগ্যেই জুটিত। কিন্তু যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত প্রধানতঃ পদাতিকের উপর দিয়াই যাইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জয় পরাজয়ের 'ম্যাও' ধরা, ইহারাই করিত। এই কারণে ইংলণ্ডে এই অনাদৃত কিন্তু অতি আবশ্যকীয় সেনাদল শেষ পর্যন্ত রাগে দুঃখে নিজেদের P. B. I. (Poor Bloody Infantry) নামকরণ করে।

বঙ্গীয় সাহিত্যের বর্তমান মসীযুদ্ধে অনেক ছত্রপতি রাজা-মহারাজা বড় সম্রাট ছোট সম্রাট লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু "ম্যাও ধরিতে" ও শেষ রক্ষা করিতে আছে পাঠকের দল। লেখক সেই অধম শ্রেণীর একজন, ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপবর্গের কেহ নয়। সুতরাং এই লেখা পড়িয়া বিজ্ঞের কোনই লাভ নাই, ইহা কেবল পাঠক-পঞ্চায়েতের সম্মুখে নিবেদন মাত্র।

বঙ্গ সাহিত্যে একটি নূতন দাঙ্গা চলিতেছে ইহা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। প্রথমে দেখিলে ইহা মার্কিন মুল্লুকের প্রচলিত বিজ্ঞাপন অভিযানের মত (Publicity Campaign) কিছু একটা ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত লেখকের নাম ধাম প্রচার করা ভিন্ন ইহার অন্য কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তাহা বোঝা কঠিন। তবে ইহা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কি লাভ হইতে পারে বলা যায় না এবং সেই কারণে মনে হয় যে হয়ত এই সকল লেখালেখির মধ্যে অন্য কিছু থাকিতে পারে। শরৎবাবুর উদ্দেশ্য যে রবীন্দ্রনাথের উপর "ঝাল ঝাড়া" সেটা খুবই সুস্পষ্ট। শোনা যায় পানিত্রাসের ছোট সম্রাট পাঠক সাধারণের উপর "পথের দাবী" নামক road tax জাতীয় শুল্ক জাহির করিয়াছিলেন যাহা বৃটিশ-রাজ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। এই লুপ্ত শুল্কের পুনরুদ্ধার ভার তিনি রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত হইলে রবীন্দ্রনাথ অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। ফলে ক্ষুদ্র সম্রাট তাঁহারই নভেলের নায়কের ন্যায় ডান হাতে বাঁ হাতে বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র অতি বিদ্বান, পরম পণ্ডিত, তিনি সমস্ত রেঙ্গুন পাবলিক লাইব্রেরী চষিয়া ফেলিয়াছেন—আমরা, পড়া তো দূরের কথা, তার নামই জানিতাম না। তিনি অর্থনীতির এরূপ ব্যতিক্রম সহ্য করিবেন না, ইহা তো স্বাভাবিক কিন্তু এই অর্থোদ্ধাররূপ মহান ব্রত দুর্বল রবীন্দ্রনাথের উপর না চাপাইয়া তাঁহার আত্মশক্তিতে নির্ভর করিলে হইত না কি?

রবীন্দ্র-বিপক্ষ দল বলিতেছেন যে রবীন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি সুস্বাদু গুরুপাক সেবনের ফলে বঙ্গসাহিত্য-দেহে বিকার উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং তাঁহারা বিবেচক রূপে তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই! এই সম্পর্কে Kallol-বিক্রেতাদিগকে একটা কথা বলা দরকার, আমেরিকার Calol কোম্পানী অতি ধনী, তাহারা Colourable imitationএর মোকদ্দমা না আনে ইহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন কি? অন্য একদল ত্রিফলার জলে হীরাকষসংযোগে কালী প্রস্তুত করিয়া কলম-অনুপানে প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের সে ভয় নাই।

নরেশচন্দ্র বলিতেছেন যে তিনি এই শ্রেণীর ওষধিবর্গের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ জয়পাল। একথা

জজে মানে। তাঁহার শাস্তি, গ্রামের কথা, বিপর্যয়, রক্তের ঋণ, ব্যবধান, পাপের ছাপ প্রভৃতি বটিকা প্রয়োগে ক্ষীণদেহ বঙ্গীয় পাঠক তো কোন্ ছার, মত্ত হস্তীযূথেরও বিবেচন সম্ভব।

সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের লক্ষ্ণৌ হইতে আর এক পক্ষ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করিয়াছেন। হায় রবীন্দ্র-প্রতিভা, শেষ পর্যন্ত মরণং গোমতীতীরে! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!

লক্ষ্ণৌ শহর অতি বিখ্যাত। সেখানকার "লক্ষ্ণৌয়া" নামক বচন (যাহার ঢাকাই সংস্করণের নাম "জলগাল্লি") উত্তরাখণ্ডে সুবিখ্যাত। সেখানে অলিগলিতে শাহজাদা নবাবজাদা ছড়াছড়ি যায়, সেখানে প্রত্যেক জীর্ণ ভগ্ন "দৌলতখানায়" কতশত "খানদানি"মেহেরবান তসরিফ-সরিফ রক্ষা করেন, কত সহস্র কদরদান ব্যক্তি সেখানে পথের ধূলায় "কদমরঞ্জা" ফরমাইস করেন। সেখানে বড়া ভাজা তৈল "ইত্র্" (আতর), বেগুন-পোড়া "কোফ্তা" ও দা'কাটা তামাক ইন্ডাম্বুলজাত তাম্রকূট নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

এহেন অপরূপ নগরে আমাদের "দানেশমন্দ" মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিরাজ করিতেছেন। যোগ্যং যোজ্যেন যোজয়েৎ। আচার্য রাধাকমলের পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিচয় দান করা আমা-হেন ব্যক্তির পক্ষে 'প্রাংশুলভ্যে ফলে' ইত্যাদি। সে প্রগাঢ় সর্বতোমুখী জ্ঞান প্রলয়পয়োধিজলেরই ন্যায় অতলস্পর্শী ও সর্বব্যাপী। সাহিত্য, ভাষা, অর্থনীতি, ইতিহাস, ললিতকলা, যেদিকে তিনি ফিরিয়াছেন সেদিকই নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

আবার ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপাধ্যায় দেব "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি।" তিনি বিচারে যেরূপ নির্মম, কঠোর, পরদুঃখে তেমনি কাতর। সর্বক্ষণ ও সকল বিষয়ে দরিদ্রের ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয়। বর্তমান সাহিত্য-মসীযুদ্ধ ব্যাপারেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। একদিকে তিনি নির্দয়ভাবে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির কীর্তিনাশ করিয়াছেন, অপরদিকে তিনি দরিদ্রবান্ধব সাহিত্যিকের ক্রন্দন শুনিয়া ফেলিয়াছেন! তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তিনি প্রবীণ সম্পাদক ও প্রখ্যাত-লেখক-নিপীড়িত "তরুণ" বিবেচকসম্প্রদায়ের সপক্ষে মসী ক্ষেপণ আরম্ভ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বিবেচক-মণ্ডলীর রক্ষা ও অভিনন্দন অর্থে 'হবিষা বিধেমঃ' কারণে তিনি যে সকল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছেন তাহার সারাংশ নীচে লিখিত হইল।

ক। পুরাকালে তিনি (আচার্য রাধাকমল) বলিয়াছিলেন সে জগতের যাবতীয় কথাসাহিত্যের মধ্যে একমাত্র রুশ-সাহিত্য পবিত্র ও অবিনশ্বর, কেননা তাহাতেই "আর্ট"ও সত্য আছে অন্য কিছুতে নাই। অন্য সকলের ধ্বংস-প্রাপ্তি দ্বারা ধরণী ভারমুক্ত হইবে মাত্র। অতএব কথা-সাহিত্যের সংজ্ঞা রুশ সাহিত্য বা তাহার অনুকরণ, কেননা "Nihil ultra."

Q. E. D.

খ। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকগণ তাঁহার কথা না শুনিয়া অলীক মায়াজাল রচনা করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহাদের "হুক্কা পানি" বন্ধ করিয়া, তাঁহাদিগকে বর্জন করাই বঙ্গসাহিত্যের বাঁচিবার একমাত্র উপায়। আচার্যদেবের পূর্ববর্তী মনীষিগণও বলিয়া গিয়াছেন "অসতো মা সদ্গময়।"

গ। বঙ্গীয় তরুণ বিবেচক-মণ্ডলীর সহিত "তুর্গনুভ" ও "হ্মসেনের" বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। ইঁহারা সকলেই সত্যের উপর আসীন। দুঃখের বিষয় বিবেচক-সম্প্রদায় "সত্যং ব্রূয়াৎ" হিসাবে যতটা শক্তি দেখাইয়াছেন "প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" বিষয়ে ততটা এখনো করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যখন তাঁহারা উভয় কার্যে সমান সক্ষম হইবেন তখন তাঁহাদের প্রতিভার দীপ্তিতে চরাচর আলোকিত হইবে এবং রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি সূর্যের আলোকে নিষ্প্রভ খদ্যোতের মত দৃষ্টির অগোচর হইবেন। উপাধ্যায়দের একনিষ্ঠভাবে সেদিনের আবাহনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এই প্রবন্ধের লেখকের উদ্দেশ্য এই তিনটি সারসূত্রের একটু আলোচনা। আশা করি

উপাধ্যায় দেব নিজগুণে এই ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।

ক। রুশসাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের (অর্থাৎ লেখকের) জ্ঞান অনুবাদ হইতে মাত্র, সুতরাং তাহা জগৎশ্রেষ্ঠ কিনা বিচার করা অপেক্ষা আচার্যদেবের "রায়" গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। যদি তাই হয় তাহা হইলে অন্য সকল সাহিত্য বর্জন করা ভিন্ন অন্য পন্থা আর কি আছে? বিশেষে পূর্বকালে, আচার্যদেবের তুলনায় অপরিজ্ঞাত, অনেক মহাজ্ঞানী ব্যক্তিই এইরূপ বিচার করিয়া গিয়াছেন, যথা খলিফা ওমর, যিনি আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকালয় পোড়াইয়াছিলেন, খোরাসানের শাসনকর্তা আবদুল্লা যিনি অসংখ্য পারস্যদেশের পুস্তকাবলী ধ্বংস করেন, কর্‌টেজ যিনি প্রাচীন মেক্সিকোর সাহিত্য নির্মূল করেন, পোপ সপ্তম গ্রেগরী যিনি প্যালাটাইন এপোলোর পুস্তকাগার অগ্নিতে সমর্পণ করেন, ইত্যাদি। আগেই বলিয়াছি আচার্যদেব কোমল-হৃদয়, তাই তিনি কেবলমাত্র বর্জন করিতে বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন নহিলে কথাসরিৎসাগর হইতে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী পর্যন্ত সমস্তই অগ্নিতে আহুতি দিতে হইত।

খ। রবীন্দ্রনাথের অপরাধ অমার্জনীয়। আচার্যদেবের ঘোষণার পর তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে যখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে রুশ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই তখন তাঁহার পক্ষে মৌলিক কিছু লেখার চেষ্টা করা বাতুলতা। তাঁহার উচিত ছিল যে ঐ ঘোষণা শুনিবামাত্র লেখনী শিকায় তুলিয়া রাখিয়া রুশ ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যুগব্যাপী অধ্যয়নের পর সেই রত্নরাজির স্বল্পমূল্য-অনুকরণে বাজার ছাইয়া ফেলা। তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার লেখনী প্রসূত মিথ্যা ইন্দ্রজাল-বন্ধনে কাতর হইত না এবং আচার্যদেবকেও 'ক্ষুধিত পাষাণ' নামক মিথ্যা গল্পের পাগলা মুসলমানের মত "সব্‌ ঝুটা হ্যায়" বলিয়া ছুটাছুটি করিতে হইত না।

গ। বিবেচকবর্গের লেখা পাঠ করিলে আচার্যদেবের প্রশংসার কারণ বুঝা যায়। ম্লেচ্ছেরা দুইটি প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে। Truth is naked এবং Truth is irresistible। তরুণ ও বৃদ্ধ বিবেচকসম্প্রদায়ের লেখার প্রত্যেক ছত্রে উদ্দাম উলঙ্গভাব প্রকট হইয়া আছে। যদি বলেন তাহা "সত্য" কিনা, তাহা হইলে লজিক যাহাই বলুক, ইহা বলিতেই হইবে যে যদি যাহা সত্য তাহা নগ্নকায় হয় তাহা হইলে যাহা নির্লজ্জ বীভৎস ভাবে উলঙ্গ তাহা সত্য হইতে বাধ্য। কেন না যখন তাহাতে সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই তখন তাহা সত্য না হইলে তাহার আর থাকে কি? তাহার অস্তিত্ব লোপ হইলে ক্ষতি কি বলিলে বলিব—রে দুর্বৃত্ত দুরাচার পামর, পরম জ্ঞানী রুশভাষায় সুপণ্ডিত, ক্রন্দলজি-বিজ্ঞানের আবিষ্কারক অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বাণী কি তবে নিষ্ফল হইবে?"

"Truth is irresistible," ইহাও ইঁহাদের সম্পর্কে ঠিক। ইঁহাদের লেখা বিবাহভোজের পরদিনের ডাস্টবিনস্থিত মৎস-ধ্বংসাবশেষের ঘ্রাণ অপেক্ষাও তীব্র ও বিষম, শিরোপরি মুদ্গারাঘাত অপেক্ষাও প্রচণ্ড, Tartar emetic অপেক্ষাও irresistible। সুতরাং ইহা সত্য না হইয়া যায় না।

তারপর "তুর্গনুভ"। কলিকাতা গণ্ডগ্রামের দেশী-বিলাতি কোন পুস্তক-বিক্রেতার কাছেই উক্ত মহাপুরুষের গ্রন্থাবলী পাওয়া গেল না। অবশ্য আমরা ইংরাজী অনুবাদ খুঁজিয়াছিলাম, হইতে পারে যে তাহা ঐ ভাষায় অনূদিত হয় নাই; যদি তাহাই হয় তবে তো সর্বনাশ, সামান্য ইংরাজী, ফরাসী, ও গৌড়ীয়ভাষায় আমাদের কাজ চালাইতে হয়, আমাদের তো অধ্যাপক মহাশয়ের ন্যায় অসংখ্য ভাষার অধিকার নাই।

যাহা হউক তুর্গনুভ অভাবে টুর্গেনেভ নামক লেখকের কয়েকটি পুস্তকের তর্জমা পড়া গেল। আগেই অনেকবার পড়িয়াছি। কিন্তু দুধের আশ কি ঘোলে মেটে? পড়িয়া মনে হইল যে Anatole Franceএর "Red Lily" বা "Thais", Romain Rollandর "Jean Christophe" এমন কি রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" বা "গোরা"ও যেন অনেক ভাল। এবং ইহাও যেন মনে হইল যে টুর্গেনেভের সহিত বিবেচক-বাহিনীর বিশেষ মিল নাই। তাঁহারা রুশলেখক অপেক্ষা বহুগুণ তীব্র ও উলঙ্গ, টুর্গেনেভ যেন সম্ভরণ-উদ্যতা আধুনিক

পাশ্চাত্য মহিলা, ইঁহারা যেন নৃত্যপরায়ণ নাগা সন্ন্যাসী। সুতরাং উপাধ্যায় মহাশয় তুর্গনুভ পাঠের উপায় না দেখাইলে রক্ষা নাই।

যাহা হউক যে-লক্ষ্ণৌ নগরে একদিন নবাব আসফউদ্দৌলা শৃগালের শীত-নিবারণের জন্য লক্ষাধিক শাল দান করিয়াছিলেন, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিরেচকবৃন্দের নগ্নদেহ আর্টরূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া সেই বিখ্যাত নগরীর মুখরক্ষা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। লক্ষ্ণৌয়ের কোনও নবাব ইঁটের তাজমহল নির্মাণ করেন। আজিও তাহা দেখিয়া দর্শকেরা বিদ্রূপ করিয়া থাকে তাহাতে উক্ত সৌধ-নির্মাতার আত্মা নিশ্চয়ই ক্লেশ পায়। অধ্যাপক মহাশয়ের জ্ঞানবাপী মধ্যে দু'চার কলস স্থাপত্যবিদ্যাও থাকিতে পারে। অতএব, হে ভট্ট মুখ্য উপাধ্যায়, তুমি তোমার জ্ঞানের প্রভাবে ইহা প্রমাণিত করিয়া দাও যে ঐ ইষ্টকনির্মিত তাজমহল মর্মর নির্মিত তাজমহল অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে বেহস্তে নবাবের অশরীরী আত্মা পুলকিত হইবে, রবিবাবুর "তাজমহল" কবিতা নিষ্ফল হইবে এবং সাহিত্যসেবীগণ দৃঢ়ভাবে বলিতে পারিবে, "সুখাদ্য হইতে আমাদিগকে বিরেচকে লইয়া যাও।"

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

প্রসঙ্গ-কথা

বলাহক নন্দী

গোড়াতেই একটা বড় রকমের ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ ভুলের যথেষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। শরৎ বাবু, নরেশ বাবু প্রমুখ রথীগণও যে-তর্কে যোগ দিয়াছেন, সে তর্কের বিষয় গুরুতর একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারা লইয়া যে সশব্দ আলোচনা ও উগ্র বচসা চলিতেছে তাহা পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম যে বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের বিপ্লবের অভিযান শুরু হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর Ploiade-এর কবিরা, অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর Romantic কবিরা, ফরাসী সাহিত্যে যে পরিবর্তন আনিয়াছিলেন সে রকম কিছু না হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের Symbolist movement-এর মত একটা কিছু ত নিশ্চয়ই হইবে। ভাবিয়াছিলাম এবারে বাঙ্গালী Rene Doumic ও বাঙ্গালী Remy de Gourmontর বিচার শুনিয়া মন তৃপ্ত হইবে, বাঙ্গালী Mallarme, Verlaineর লেখার সহিতও পরিচয় হইবে। হায় আশা! তর্কে তর্কে মাসিক, সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় আলোকের চেয়ে বেশী উত্তাপ জমিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কালি-কলম ও কল্লোলের বৃহৎ ক্রাউন কোয়ার্টো পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে চক্ষু শ্রান্ত করিয়াও সে তর্কের বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। সত্য সত্যই কি এই দুই পত্রিকার পৃষ্ঠায় dynamite ছড়াইয়া আছে? আমার ত পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে ঘুম ও অনেক সময়েই হাসি মাত্র পাইয়াছে।

* * *

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একটি পরিচয় দিয়াছিলেন। আজকালকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত উদ্ধৃত করিতে যাওয়া বিপদ্‌জনক। এ দেশের 'স্কুল-বয়' সাহিত্যিকদের একটি কাগজ হইতে জানিতে পারিলাম যে, যে বয়সে Sainte Beuve, Matthew Arnold প্রমুখ মূর্খ সমালোচকেরা B-a বে, B-y বাই পড়িত সেই বয়সে তাঁহাদের Scott, Jane Austen, Dickens, Thackeray হজম হইয়া গিয়াছে। পরিণত বয়সে তাঁহারা এই শিশু-সাহিত্যের মধ্যে পড়িবার মত কিছু পান নাই। যাঁহারা প্রথমভাগ পড়িবার বয়সেই Dickens, Thackeray হজম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জননীর গর্ভে থাকিতেই বঙ্কিমচন্দ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিয়াছেন একথা মনে করা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের জঠরে অগ্নি-বৈশ্বানর বসিয়া নাই। আমাদের হজম করিবার ক্ষমতা নিতান্তই কম। সুতরাং আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধার সহিতই উদ্ধৃত করিব।

"সাহিত্যের বাজার দেখিলাম......আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম এ কিসের দোকান?

"বালকেরা বলিল, 'বাঙ্গালা সাহিত্য।'

" 'বেচিতেছে কে?'

" 'আমরাই বেচি। দুইএকজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পদ্মাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।'

" 'কিনিতেছে কে?'

" 'আমরাই।'

"বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।"

এ বর্ণনা কি এ যুগের পক্ষেও সত্য? প্রকাশ্যে হয়ত বলিব, "না, বালকেরা আজ বড় হইয়াছে, অপক্ক কদলীও পাকিয়া আসিয়াছে।" কিন্তু যদি কেহ বুকে হাত দিয়া বলিতে বলেন তবে তাঁহার কানে কানে বলিব, "হাঁ, আজও সত্য, কালও সত্য। সে বালকেরাও আর বড় হইল না, সে কদলীও আর পাকিল না। উভয়েই ইঁচড়ে পাকিয়া পচিয়া গিয়াছে।" কলা ইঁচড়ে পাকিয়াছে এই কথাটা হয়ত সোনার পাথরবাটীর মত অদ্ভুত শুনাইল। কিন্তু এযুগের বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে এর চেয়ে idiomatic বাংলা লিখিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

* * *

আমি নব্য লেখকদিগকে তাঁহাদের তরুণ বয়সের জন্য অবজ্ঞা করিতেছি একথা যেন কেহ মনে না করেন। আগুন, প্রতিভা ও সর্পশিশু বয়সের অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্য-প্রতিভার, বিশেষ করিয়া কবি-প্রতিভার বিকাশ যে কত অল্প বয়সে হইতে পারে তাহা আমরা Shelly, Victor Hugo ও শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টান্ত হইতেই জানিতে পারিয়াছি। তবে একথাটাও সত্য নয় যে যাঁহারাই অল্পবয়সে লেখেন তাঁহাদের সকলেই অলৌকিক প্রতিভাশালী। মোটামুটি ভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে যাঁহারা তরুণ বয়সে লিখিয়া থাকেন তাঁহারা হয় "জিনিয়াস্" নয় জ্যাঠা। Dickens, Thackeray সম্বন্ধে যে বড়াই উপরে উদ্ধৃত করিলাম তাহা হয়ত অনেকে এই জ্যাঠামির উদাহরণ বলিয়া ধরিবেন। তাহা কিন্তু ঠিক হইবে না। তরুণ লেখকদের সাধারণত পিতৃহত্যা করিবার একটা ঝোঁক থাকে। সেদিন একটা বিলাতী কাগজে পড়িতেছিলাম, "young writers eager for the blood of their fathers." অসভ্য জাতিদের মধ্যে বৃদ্ধ পিতামাতাকে খোঁচাইয়া মারিয়া ফেলিবার একটা প্রথা আছে। তরুণ লেখকদের পিতৃরক্তপিপাসা সেই প্রাচীন রীতিরই একটা "survival." আমি এই তরুণ লেখকদিগের প্রতিভার অকালবোধনের একটি ভাল দৃষ্টান্ত দিব। তাঁহাদের মধ্যে একজন একটি কবিতা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে এই চরণটি আছে—

"রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ-বর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষামাগে নিতি।"

পড়িয়া বাহবা না দিয়া পারিলাম না। বাংলা সাহিত্য দুরে থাকুক, ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও এক Casanova ব্যতীত আর কাহারও লেখায় ত এরূপ সুস্পষ্ট কথা শুনিতে পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া লেখক কে এবং তাঁহার অভিজ্ঞতাই বা কি এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। যাহা জানিলাম তাহাতে আরও আশ্চর্য, আরও মুগ্ধ হইলাম। তিনি নাকি অতি তরুণবয়স্ক যুবা—বলিতে গেলে বালকই। বাংলা দেশে যে সত্যই Don Juan গড়িয়া উঠিতেছে তাহার প্রমাণ এই প্রথম পাইলাম। এই মৃতপ্রায় জাতির না পাপে, না পুণ্যে কিছুতেই ত উদ্যম দেখি না। যদি তরুণ কবির এই স্বীকারোক্তি সত্য হয় তবে বাঙ্গালী অন্তত এক বিষয়ে উদ্যমশীল হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কথাটা কিন্তু সত্য বলিয়া এখনও আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় বালক-কবি পিতামাতা সমালোচক ইত্যাদি প্রস্তরীভূত জীবদিগকে ক্ষেপাইবার জন্য লাম্পট্যের একটা ভাণ করিতেছেন। যাহা হউক 'ফলেন পরিচীয়তে'। যদি এই শৃঙ্গারশতক কবির মনের খাঁটি কথা হয় তবে তিনি শীঘ্রই বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক লিখিবেন। তাহারি প্রতীক্ষায় রহিলাম।

* * *

বয়সের কথা বলিতে বলিতে বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্টতা মনে পড়িল। দুচারজন ব্যতীত বাঙ্গালী লেখকদের প্রায় সকলেরই বয়স ষোল হইতে ত্রিশের মধ্যে। ত্রিশের উপরে

যাঁহাদের বয়স তাঁহারা অর্থ কিম্বা পরমার্থ ভিন্ন আর কিছুতেই মন দিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্য under-graduateদের হাতে পড়িয়াছে, জীবনের under-graduate, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। যখন দেখি একদল বালক—যাহাদের অভিজ্ঞতা নাই, জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, মনের পরিণতি নাই, যাহারা সবুজ—সবুজপত্রের জয়-যাত্রী যৌবনের রাজ-টিকাধারী পুচ্ছ নাচান বীরদের মত সবুজ নয়,—ইংরেজীতে যাহাকে green অর্থাৎ কাঁচা-ডাঁশা বলে সেই সবুজ, যখন দেখি এই বালকের দল সাহিত্য, আর্ট, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্র-বিপ্লব লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে, তখন হঠাৎ ভয় হয় কখন বা ইহারা না জানিয়া, না বুঝিয়া, পরের মাথায় অযথা অথবা নিজের পায়েই কুড়াল মারিয়া বসে। আমাদের খুবই ভাগ্য বলিতে হইবে যে ইয়োরোপীয় বিপ্লববাদের বোমা বাঙ্গালী ছাত্রের হাতে পড়িয়া কালী-পূজার পট্‌কা হইয়া গিয়াছে। তাই এই সকল দুরন্ত অথচ দুর্বল শিশুর বিদ্রোহ, আস্ফালন ও যুদ্ধং দেহি রব ভয়ের কারণ না হইয়া হাসির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা দেশের বালক-বালিকারা যাঁহাকে "ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর", "ঝড়-কপোতী" অথবা এইরকমই একটা দুর্বোধ্য নামে বিদ্রোহের অবতার বলিয়া জ্ঞান করে তাঁহাকে, এবং তাঁহার যে কবিতাটিকে বিদ্রোহ-বাণীর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বলিয়া ধরিয়া লয় তাহাকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরি না কেন? বৃদ্ধ সমাজের জীবনে এই প্রথম, শেষ অথবা সর্বাপেক্ষা আতঙ্ক-জনক বিদ্রোহ নয়। 'আমি এটা, আমি সেটা, আমি জীবনের যত জীর্ণ, পরিত্যক্ত, জোড়াতালি দেওয়া জিনিস তাহারই ভগ্নাবশেষ। আমি ফাটা টর্পেডোর টুক্‌রা, আমি সাইক্লোন, আমি কৃষ্ণের বাঁশী, আমি অর্ফিয়ুসের বীণা, আমি চেঙ্গিজ, আমি বেদুইন্, আমি ভীম ভাসমান মাইন, আমি বিধবার দীর্ঘশ্বাস, আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী'—ভগবান্, ভগবান্, বিদ্রোহীর মন কেমন জানি না, কিন্তু এমন স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ, এমন ভীরু পদানত কেরাণীই বা কে আছে, যে ষোড়শী তরুণীর গালের গুল্‌বাগে, শুভ্র গ্রীবার উপর, সুকোমল বক্ষঃস্থলে দিনরাত লুটাপুটি খাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে? এ ত বিদ্রোহ নয়, এ যে আত্ম-সমর্পণ।

* * *

নব্য সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠ-পোষকেরা সর্বদাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে ইহারা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, অর্থ ও যশের অপেক্ষা না রাখিয়া কায়মনোবাক্যে বাণীর সেবায় নিরত। তাঁহাদের একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা আছে একথা স্বীকার করি। তাঁহারা বর্ত— যশের অপেক্ষা রাখিলেও, অর্থের খুব বেশী অপেক্ষা রাখিতেছেন না একথাটাও মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য পিতার অবর্তমানে অথবা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলে, অথবা চাকরি পাইলে তাঁহাদের এই একনিষ্ঠতা থাকিবে কিনা না এরকম একটা সন্দেহ উঠিতে পারে। কিন্তু সে পরের কথা পরে দেখা যাইবে। বর্তমানে তাঁহাদের সব দাবী মানিয়া লইলেও একটা প্রশ্ন থাকে। এই একনিষ্ঠ সেবা কি সত্য সত্যই সাহিত্য সেবা, না অন্য কোনও চিত্তবৃত্তির সেবা? এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সুতরাং একটি মাত্র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে। Psycho-analystরা বলেন "Art is wish fulfilment in the region of phantasy." এই যদি আর্টের প্রকৃত সংজ্ঞা হয় তবে নব্য সাহিত্যিকদের লেখাকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার উপায় নাই। "আমাদের মন-প্রাণ উৎসুক, বুভুক্ষু, উপবাসী হইয়া আছে। আমরা যাহাকে সম্মুখে পাই তাহারই পায়ে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করিয়া দিতে চাই—শুধু ব্লাউজ, পেটিকোট পরা কেহ হইলেই হইল। আমরা দেশী ও চীনা রেস্টুরেন্টে একটু স্ফূর্তি করিতে চাই। Johan Bojer, Knut Hamsun, Gorky অথবা Boccaccioর Decameronের unexpurgated edition কিনিবার জন্য দুই একটা টাকা চাই। আমাদের কামনা ত বেশী নয়। কিন্তু অত্যাচারী বিদেশী গভর্ণমেন্ট ও তাহার নিষ্ঠুর আইন, নিষ্ঠুর অভিভাবক, নিষ্ঠুর সমাজ আমাদের এই সামান্য বাসনার পথেও কি বিরাট বাধাই না তুলিয়াছে। বাসনাকে পদদলিত

করিলেই কি বাসনার শেষ হয়। বুদ্ধদেব! তুমি বলিয়াছিলে বাসনাকে নির্মূল কর, তাহা হইলেই শান্তি পাইবে। তুমি ত Freud পড় নাই, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া বাসনার যেন শেষ করিলাম কিন্তু বাসনা Complexএর শেষ কোথায়?" এই হইল তরুণ সাহিত্যকদের হাহাকারময়ী বাণী। তাহাদের নিষ্ফল কামনা, তাহাদের ব্যথা, তাহাদের নিরাশা, তাহাদের complexes তাহাদিগকে কল্প-নিশাচর করিয়া তুলিয়াছে। কেবল লম্বা রুক্ষ চুল রাখিয়া সে complex তৃপ্ত হইবার নহে। তাই কল্পনা-লোকে বাসনা চরিতার্থ করিবার এই সাহিত্যিক আয়োজন। সাহিত্য Fleurs du Mal—Flower of evil সন্দেহ নাই।

* * *

এই ত গেল নিরাশা-কাতর ব্যথাতুরদের দল। ইহাদের সম্বন্ধে আমার মত একটি aphorismএ ব্যক্ত করিব ঃ

"We give our respect to one whom melancholy has marked for her own. But a man who has allowed his leg to be caught in a sentimental trap and is limping through life for the benefit of his fellowmen is a ludicrous sight. Most of the sorrow of this world is of this brand."

ইঁহাদের ছাড়িয়া দিলে নব্য সাহিত্যকদের মধ্যে আর এক দল থাকেন, তাঁহারা সমস্যার বেসাতী করেন। সমস্যা নিজের ঘরের হউক কিম্বা পরের ঘরের হউক তাহাতে তাঁহাদের কিছু মাত্র আসিয়া যায় না। একটা হেঁয়ালি হইলেই হইল। ইউরোপ সম্প্রতি নানারূপ সামাজিক সমস্যায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সেই দুশ্চিন্তা দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ছাড়িয়া সাহিত্যেও সংক্রামিত হইয়াছে। এই ব্যাধির বীজ আমাদের দেশে অতি উর্বর ক্ষেত্র পাইয়াছে। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৌন্দর্য-চর্চা ও সৌন্দর্য-সৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, ব্রাহ্মকুমারী কি আচারে হিন্দু যুবককে বিবাহ করিবে, স্বামী বর্তমানে যে-স্ত্রীলোক স্বামীর বন্ধু অথবা নিজের দেবরকে ভালবাসে সে সতী কিনা, পরের জিনিস না বলিয়া লইলে এই উন্নতির যুগেও চুরি বলিয়া গণ্য হইবে কিনা, বারাঙ্গনারা মাতৃপদবাচ্যা কিনা, তাল পড়িয়া টিপ্ করে কি টিপ্ করিয়া পড়ে এই সকল গভীর ও জটিল সমস্যা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডা অতি স্বাভাবিক ও রুচিকর। বাংলা দেশ ন্যায়ের দেশ, আর্টের দেশ নয়। তাই যে কচ্‌কচি এতদিন তর্কশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা অতি সহজেই কবি ও ঔপন্যাসিকের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে।

* * *

মানিয়াই লইলাম সমস্যামূলক সাহিত্য উচ্চ অঙ্গের অথবা সনাতন সাহিত্য না হইলেও সাহিত্যের একটা সাময়িক রূপ। কিন্তু সমস্যামূলক সাহিত্য হিসাবেই এই নব্য সাহিত্যের মূল্য কতটুকু? যাঁহারা মানবজীবনের সকল সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাপূরণ করিয়া দিবার দাবী করেন তাঁহাদের কাছ হইতে জ্ঞান, যুক্তি ও গভীর চিন্তার পরিচয় পাইবার দাবী কি আমরাও করিতে পারি না? আশা করি এই কথাটা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এই সকল লেখকদের কাছ হইতে আমরা ইউরোপীয় সাম্যবাদীদের যুক্তি তর্কের সাত নকলে আসল খাস্তা, ক্ষীণ, অতিক্ষীণ প্রতিধ্বনি, ও তাঁহাদের নিজস্ব দুর্বল, ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই পাই নাই। ধার করা বিদেশী যুক্তি ও দেশী ভাবপ্রবণতা,—এই দুই ধারায় মিলিয়া এই অভিনব গণনীতির সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। গণতন্ত্র মোটা কথা বুঝে, সূক্ষ্ম কথা বুঝিতে চায় না বুঝিতে পারেও না। সুতরাং গণতন্ত্রের কাছে এই গণদর্শনের আদর হইবে ইহা মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু যাঁহারা গণোপাসক নহেন, যাঁহারা Taineর এই কথার সমর্থন করেন যে, "Ten Thousand ignorances do not constitute a wise man" তাঁহাদের কাছে এই নূতন সাহিত্যের বাণী ও ভঙ্গী কতকটা

হাস্যকর ও কতকটা অবোধ্য। নব্য সাহিত্যিকদের অকারণে বিদ্রোহ ও গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিবার বাতিক দেখিয়া মনে হয় ইহাদিগকে এক উৎকট Moral ও intellectual sadismএ পাইয়া বসিয়াছে। ইঁহাদের উপন্যাসে ও গল্পে নায়ক-নায়িকারা কেন যে হাসে, কেন যে কাঁদে, কেন যে এত ঝগড়া করে তাহা বুঝিবার জো নাই। অথচ হিস্টিরিয়া রোগীর মত ইহাদের হাসি, হাত-পা ছোঁড়া, কান্না, বিশেষ করিয়া কান্না লাগিয়াই আছে। বাংলা সাহিত্যে এই চোখের জলের বন্যার পারাপার দেখিতে পাইলাম না। চেরাপুঞ্জী নিকটে বলিয়া কি আমাদের মনের আকাশেও অবিরাম বর্ষা লাগিয়া আছে? এ প্রশ্নের উত্তর যিনি পারেন তিনি দিবেন। আমি আজিকার মত শেষ করিলাম। তরুণ-সঙ্ঘ কাঁদিতে থাকুন। বালানাম্ রোদনম্ বলং।

কার্তিক ১৩৩৪

জয়ন্তী

সজনীকান্ত দাস

মোরগ-লড়াই ভালই তো নয় বল্‌ছে যত বোষ্টমে,
বুনিয়াদের জমিদারী ঘুচ্‌বে এবার অষ্টমে;
প্রভু এবার প্রবুদ্ধ,
গণ্ডূষে খাও সমুদ্র—
সুখ করছে অষ্টপোয়া পড়্‌বে এবার কষ্টমে।

ওগো প্রভু, আজো সমান চল্‌ছে তোমার সৃজন তো,
ভুলেছ তদ্ধিত প্রত্যয়, ভুল্‌চ কেন নিজন্ত।
সকল ভাতি প্রতিভার
ভস্ম হ'ল চমৎকার,
ছাই ফুঁড়ে কি জ্বল্‌ছে আগুন করছ এত বীজন তো!

নিজেই পড়লে নিজের কলে এমনই ললাট-লিখন যে,
খোস্‌-খেয়ালে বল্‌ছ, 'পাহাড় ডিঙ'ও'—পঙ্গু ও খঞ্জে।
সাম্‌নে এল বাহাত্তর,
দেখ্‌ছি শুধু তাহার তোড়্‌,
ঘুচ্‌বে নাকো মনের কালি অহমিকার ও-স্পঞ্জে।

ধোঁয়া-জমাট মেঘ ঢেকেছে নিত্যকালের সূর্যকে,
ঢাক পেটানোর বহর দেখে চিত্তবীণার সুর ধোঁকে!
শূদ্র ক'রে মন্ত্র পাঠ
তুল্‌ল বুঝি পুরুৎ-পাট!
অনেক কাণ্ড করলে প্রভু, একটি কেবল 'হুঁ'র ঝোঁকে।

খাল কাটিয়া বান ঢোকালে সরস্বতীর অন্দরে,
এখন কেন নাক ঢাকিয়া হাঁক্‌ছ, 'লাগে গন্ধ রে!'
বয়স-ভুলে কর্‌লে কি,
টান্‌লে কোলে সব মেকি!
ভিড়্‌ল তোমার সোনার তরী হায়, বেনামী-বন্দরে!

আসল যাহা রবেই তাহা, হচ্ছ কেন ভয়ার্ত,
নাই রহিল ছন্দ-দোদুল, রইল তোমার পয়ার তো!
পাহাড়-প্রমাণ পাষাণ-ভার,
সব কি ধরে হীরার ধার?
চৌদ্দ আনা তাহার প্রভু জন্ম নিলই ক্ষয়ার্থ।

বুঝ্‌লে না কো তফাৎ আছে এ বিশ্বে আর ও বিশ্বে,
গণৎকারও বল্‌তে নারে কি আছে ছাই ভবিষ্যে!
যশের নেশা কম ক'রে
থেকেই দেখ দম ধ'রে—
কোপ্তা-পোলাও অনেক খেলে সার কর আজ হবিষ্যে।

মৃত্যু তোমায় জয় করিছে তাই হতেছে জয়ন্তী,
শকুনি চিল হুক্কাহুয়া জুট্‌ল এসে অগণ্‌তি!
হট্টগোলের মাঝখানে,
মন যে তোমার লাজ মানে,
এতই জানো, জানো না 'ঘর পায় না অতি-ঘরন্তী।'

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

জয়জয়ন্তী*

নলিনীকান্ত সরকার

ঘন ঘন ধনমপি নায়ক জয় হে জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
ইংলণ্ড-ফ্রান্স-সুইডেন-ইটালী-আরব-তুর্কী-কঙ্গো-
আল্পস্-ককেশস-দনিয়ুব-ভলগা-নাইল-মিসিসিপি-হংহো
তব ফরমাসে আসে বাংলা কবিতা চাে
পূরিল কৃষ্টির খাতা।
ঘন ঘন লাঙ্গল-দায়ক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে!

অহ অহ কত প্রোগ্রাম প্রচারিত অগুণিত অগণিত তাহা,
চিঠি-পোস্টারে অর্থ ফুঁকীকৃত সহস্র অযুত ত ডাহা!
পোয়া বারো হাতে আড়ি মার' তুমি তাতে
পাকা ঘুঁটি ঘর্ যাতা।
ঘন ঘন অক্ষ-বিছায়ক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

পতন-রবু্যদয়-দুর্গম-পন্থা চিন্তা কর তুমি থোড়া,
হে পয়সারথি, তব রথচক্রে শহর লহর্ সম জোড়া।
সদর-মফঃস্বল মাঝে তব হর্ণধ্বনি বাজে
ডাউন মিটার-হাতা।
ঘন ঘন রথ-'পরিধায়ক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে!

"শৈল"-"নীর"-"নৃপ"-"বিমলা"-নন্দিত পিরীত-চর্চিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব সুতীক্ষ্ণ ঈক্ষণ,—কি সুক্ষণে পশ' শেষে।
কণ্ঠে তেরেলেল্লা ফতে হইল তব কেল্লা
ট্রাই ট্রাই করি ঘ্রাতা!
ঘন ঘন লক্ষে জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

যাত্রী মাতিল শুধি প্রাক্তন ঋণ ঘৃত ছুঁড়ি হোমজ ভস্মে,
গাহে সুরঙ্গম-সুরঙ্গমা কত বিচিত্র দীর্ঘে হ্রস্বে।
কত তরুণারুণ-রাগে কলিকা স্ফুট-বর মাগে
লিপ্তিত কাগজ তা তা।
জয় জয় জয় হে বগলে-ধৃতরবি, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে!

'জয়ন্তী সংখ্যা' মাঘ ১৩৩৮

* মূলের প্রভাবে পড়িয়া দ্বিতীয় ও সপ্তবিংশ পঙ্‌ক্তিতে লঘু-গুরু-জ্ঞান থাকে নাই।

পরিচয়

পরিমল গোস্বামী

আমার পিসতুত শ্বশুরের ভাইয়ের ছোট শালার মেজ ছেলেটি পল্লীগ্রাম হইতে চাকুরির চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে কোন মেসে বা হোটেলে উঠিতে পারিত, কিন্তু একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কলিকাতায় থাকিতে অন্যত্র গিয়া উঠিলে, পাছে আমি অসন্তুষ্ট হই, এই আশঙ্কায় সে আমার বাসাতেই উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে সে কখনও কলিকাতায় আসে নাই, সুতরাং কয়েকদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া কিরূপে বাসে উঠিতে হয়, কিরূপে রাস্তা পার হইতে হয়, ইত্যাদি. শিক্ষা দিবার পর একখানা অল-সেকশন মাসিক টিকিট কিনিয়া দিলাম। সে উহা লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম, তাহার মাফঃস্বলিক জড়তা দূর হইয়াছে এবং বেশ স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার পথঘাট প্রভৃতি কেমন চিনিয়াছে, তাহা একটু পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করি। তাহাতে যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্র। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হইতে হাওড়ার পুল পর্যন্ত—ঐ অঞ্চলকে কি বলে?

উ। মাড়োয়ার নগর।

প্র। লালবাজার হইতে চৌরঙ্গী পর্যন্ত—ও স্থানটাকে কি বলে?

উ। চুচাংগঞ্জ।

প্র। ধর্মতলা হইতে এলগিন রোড পর্যন্ত?

উ। লণ্ডনতলা।

প্র। এলগিন রোড হইতে কালিঘাট পর্যন্ত?

উ। এর খানিকটা আয়ারপটি এবং বাকিটা খালসাপুর।

প্র। কালিঘাট হইতে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত যে প্রশস্ত পথ গিয়াছে উহার নাম কি?

উ। পার ভেনু অ্যাভেনিউ।

প্র। ওখান হইতে যে ছোট গলিটা লেকের দিকে গিয়াছে, উহার নাম?

উ। স্নব লেন।

প্র। আচ্ছা, ও অঞ্চলটা কর্পোরেশনের কোন ওয়ার্ডে, বলিতে পার?

উ। হাঁ, ওটা মর্গেজ ওয়ার্ড।

প্র। মধ্যবিত্ত বাঙালীদের ঝোঁক কোন দিকে বেশী?

উ। নিমতলা ঘাট স্ট্রীট এবং কেওড়াতলা ঘাট রোড।

উত্তর শুনিয়া মনে হইল, আত্মীয়টি ফুল মার্কস পাইবার উপযুক্ত।

পৌষ ১৩৪২

কামস্কাট্কীয় ছন্দ

ভাবকুমার প্রধান

আজকাল বাঙ্লা ভাষায় নানা ভাষা হইতে ছন্দের আদর্শ লওয়া হইতেছে, ইহাতে বাঙ্লার কাব্য সম্পদ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। নিজের ভাষাতেই ছন্দের আদর্শ রক্ষা করা অতীব দুরূহ; ভাষান্তরের আদর্শ রক্ষা করা কি ভয়ানক কঠিন তাহা এ কাজ যাঁহারা না করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বোঝান অসম্ভব। আমি কামস্কাট্কায় অবস্থান কালে সে দেশের ভাষা শিখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সে ভাষায় কয়েকটি অপূর্ব ছন্দ আছে। আমি কাম্স্কাট্কীয় ভাষার ছন্দের আদর্শটি এক লাইন দিয়া বাঙ্লা ভাষায় তদনুরূপ দুএকটি কবিতার নমুনা দিতেছি। কবিতাগুলি আমারই রচিত। এই কবিতাগুলি লেখার সময়ে আমার কামস্কাট্কীয় বন্ধু বিথলোতেলাচুংভিস্কী আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বাঙালী পাঠক পাঠিকারা হয়ত প্রথমটা দুই একটা কবিতার ছন্দ আয়ত্ত করিতে পারিবেন না; দুই একবার চেষ্টা করিয়া পড়িলেই কান ঠিক হইবে। কামস্কাট্কা সাইবীরিয়ার অন্তর্গত এবং লোপাট্কার সন্নিহিত হইলেও রাসিয়ান বা লোপাট্কীয়ান কোনো ভাষাই সেখানে ব্যবহৃত হয় না। হয়ত এই ধরণের ছন্দ বাঙ্লাভাষায় (আর্বী, ফারসী কিম্বা অন্যভাষার আদর্শে) দেখা গিয়াছে কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই ইহাদের সঙ্গে একটু বিভিন্নতা উপলব্ধি করিবেন।

১। আদর্শ (কামস্কাট্কীয়ান)

লুঙ উষ
তুল ফাই
দিং্ক্ শাক্
 মিক্লি
ঢুঙ্ শূষ
ঢুল মাই
হ্রিক্ বাক্
 পিক্লি

বাঙ্লা

এত ঢঙ
বল্ ভাই
কাছে কার
 শিখলি
সেজে সং
নেচে যাই
নাচে পার
 শিক্লি।

শৃঙ্খল

থাক্ ঢের

সাফ আছে
গলাটা
আছে বল*
প্রভু দের
পাছে পাছে
চলাটা।

কেহ যেন মনে না করেন যে এই নমুনাটিতে আমাদের জাতীয় দুরবস্থার বর্ণনা আছে।

২। শ্রোয না শ্রোয স্ত্রীম্ না শ্রোষ ট্রোষ না ট্রোষ দিঙ না সি।

ভালোরে ভাল এইত ভালো কালো ত কালো
তোর তা কি?
আছে যা আছে আমার আছে বাঁচে না বাঁচে
আমার স্ত্রী,
তোর তা কি?
বাসি কি বাসি ভাল না বাসি খাই কি না খাই
তাহার চুম্
ওরেরে ওরে বল্‌না ওরে নইলে যে কীল
মার্‌ব দুম!
হয়না ঘুম?

৩। লেভূর লোঙ পিক্ ট্রাক্।

ঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাস্
ফেল্‌ছে দীর্ঘ নিশ্বাস্
বউটা কর্‌ছে হাস্ ফাঁস্
ভুগছে বোধ হয় যক্ষ্মায়—
হেরম্ব সিং ডাক্তার
বত্রিশ টাকা ফিজ তার
যেতে বল্‌ছে বার্ বার্
কাশ্মীর কিম্বা মক্কায়।

৪। তিং ত্র্যাল ত্র্যাল।

শিং নেড়ে নেড়ে
তেড়ে এল বেড়ে
মোষটা
পালা ওরে পালা
যাক্ ছিঁড়ে বালা
পোষটা।

৫। হুন্ হোল্ হুন্ গ্রোল্ উনে লাফা ব্রিল্ সূর্ কুট্ ব্যাস্ক্ সো
দুন্ চোল্ দুন্ ঢোল্ ভুনে সাফা গ্রিল্ হূর ছুট্ ল্যাস্ক্ হ্রো।

* Strength

দূর ছাই দূর যাই দেশে থাকা ঠিক নয় দূর যাই রে
গুড় খাই গুড় নাই এসে টাকা নিক্ ছয় গুড় দ্যায় যে।
তা না হ'লে 'খানা' চলে যাব আমি গুড় আলা টাকা পান্ না
চা না হ'লে পা না চলে যাব থামি দূর কালা বোকা আন্ চা!

৬। বুঙোরোঁলা কান্স্ট্রাকা

পুণ্যস্রোতা জাহ্নবী
আপনি মশাই খান সবি?
খালাসিদের রান্না?
ঝিনিদহের গাঙ্গুলী
বল্‌চেন কথা মুখ তুলি
আমার পাচ্ছে কান্না!
গঙ্গার ওপর সব চলে
পার পাবেন কি এই ব'লে
এক ঘরে যে কর্‌ব,
কী আপনার নেই কেয়ার
মুর্‌গী যদি খান এবার
ঝাঁপিয়ে জলে মর্‌ব!

৭। কাম্স্কাট্‌কা—ফিলয়েন্ লাক্*

থাক্ প্রাণটা
বাঁচিয়েছ ভাই!
যাক্ কানটা
তাতে ক্ষতি নাই!
বক্তৃতাটি
জমেছিল বেশ
সব্বই মাটি
করে দিল শেষ।
সার জেন্ট্ রা
যেই এল তেড়ে
ভরা টেন্টটা
খালি হল বেড়ে।

* এটি কামস্কাটকার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবিতার প্রথম লাইন। কামস্কাটকার সঙ্গে ব্লাডিভোস্টকের যখন যুদ্ধ হয় (যে যুদ্ধে লোপাট্‌কা কামস্কাট্‌কার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল) বিখ্যাত কবি ওরল্যাং হো ঐ কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গান গাহিয়া শত শত কাম্স্কাট্‌কীয়ান অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। আমিও ঐ আদর্শে আমাদের জাতীয় কবিতাটি লিখিলাম। কোনো সুরবেত্তা উহাতে সুর সংযোগ করিলে জাতীয় যুদ্ধ স্থল হইতে শত শত যোদ্ধা ঐ গান গাহিতে গাহিতে অকাতরে পলাইতে পারিবে। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে ঐ গানটি লিখিয়া বিখ্যাত কবি ওরল্যাং হো বিজেতা ব্লাডিভোস্টকীয়দের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

"ধর বন্দুক।
বোমা shell গুলি
কর কন্দুক;
ইংরাজ খুলি
পাকা বেলবৎ
ফাটাও ফটাস্
দিলে নাক্‌খৎ
চড়াও চটাস্"।
ওকি দুদ্দাড়
ছোটে কেন ওরা?
ওঠে 'মার্ মার্' *
'ওই আসে গোরা'।
নিয়ে প্রাণটা
পালিয়েছে বেশ!
গেছে কান্‌টা
বেঁচেছে ত দেশ!
বক্তৃতা পাবে
শুন্‌তে তোমার—
তাহ্‌লেই হবে
দেশ উদ্ধার।

এ কবিতাটি একটু টানিয়া টানিয়া পড়িতে হইবে।

৮। গুনোস ট্যাঁসা!

হুতোম প্যাঁচা
শুক্‌নো ডালে
ডাক্‌ছে বসে
ভর সাঁঝে
সেজে গুজে
যাচ্ছ কোথা
একটু দাঁড়াও
পথ মাঝে।
আজ্‌কে হ'ল
ভাদ্র মাসের
ষোলই তারিখ
শুক্রবার।
ডাক শুনে কি
এমন দিনে
ঘর হতে কেউ
হয় গো বার?

৯। ব্লাসী তন্ছুক্ বিস্টাপ্

গাজী আব্বাস্ বিট্‌কেল।
কল্লি মহা খিট্‌কেল।
লিখে ফেল্‌লি কাব্‌বি।
তাও আবার ছাপ্‌বি?
ছাপ্‌লে তাও কাট্‌বে—
কেউ কেউ তা চাট্‌বে।
পাবি মহা সম্মান—
সভায় গাইবি তোর গান
শুন্‌তে সবাই কাঙলা
দেশটা যে রে বাঙ্‌লা।

১০। **মিলহীন ছন্দ**। এই ছন্দ লেখা একটু কঠিন। ইহাতে মিলের গন্ধমাত্রও থাকিবে না, যাঁহারা এই ছন্দে লেখেন তাঁহারা স্বভাবতঃ মিল আসিলেও তাহা গরমিলে পরিণত করেন। আদর্শের নমুনা দিলাম না।

(ক) সমাক্ষর মিলহীন ছন্দ।

ওরে ওরে ইষ্টুপিড্
এই তোর ছিল মনে?
ফেলিলি আমায় ফেরে।
নিজে তুই চিঠি লিখে
মোর নামে ছাপাইলি—
চাক্‌রী বুঝিবা যায়।
আমি বড় সাহেবের
কাছে গিয়ে আজ খুলে
সব বলিব নিশ্চয়।
ধরিব তাঁহার পদ
দিয়ে নাকখৎ লম্বা
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি লব।
জানিস্ না ওরে আমি
বাঙ্‌লার কেরানী যে।

(খ) অসমাক্ষর মিলহীন ছন্দ

দিকে দিকে ওঠে রণরণি
বাজি উঠে দামামা ও ঢোল
বাজে শিঙ্গা বাজে করতাল
রবাব মৃদঙ্গ কত বাজিছে চৌদিকে
থরে থরে চলে নর গজ অশ্ব কাতারে কাতারে।
চারিদিকে মহা হৈ চৈ
কত বাজি পুড়িল যে কত বাজি হইল যে খোঁড়া
কে করে গণন

ভাবিলাম কোনো মহারাজ রাজচক্রবর্তী কেহ
শত্রু পক্ষে জিনি, বন্দী করি শত্রুরাজে
স্বরাজ্যে ফিরিয়া এল বুঝি।
শুধালেম এক পদাতিকে
চমকিয়া উঠিলাম শুনি
শীলেদের গদাধর বিবাহ করিয়া
আজি বৌ লয়ে ফেরে।
কী বীরত্ব কাজ!
তাই এই সমারোহ, এত আয়োজন।
মাথা মোর ভক্তি ও শ্রদ্ধায়
আপনিই নত হল।
ধন্য গদাধর তুমি শীল বংশ চূড়া!

১১। অসমছন্দ

বর্তমানে কামস্কাট্‌কীয় এই ছন্দের অত্যন্ত ব্যবহার হইতেছে। মিলহীন ও ছন্দহীন কবিদের এই ছন্দটি প্রায় panacea গোছ। অসমছন্দের দুটি একটি লাইন তুলিয়া দিলে কিছুই বুঝা যাইবে না।

আমি ব্যাঙ্‌
লম্বা আমার ঠ্যাং,
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাং।
আমি ব্যাঙ,
আমি পথ হতে পথে দিয়ে চলি লাফ;
শ্রাবণ নিশায় পরশে আমার সাহসিকা
অভিসারিকা
ডেকে ওঠে 'বাপ বাপ'।
আমি ডোবায় খানায় কাদায় ধূলায়
খাটিয়ার তলে—কিম্বা ব্যবহারহীন চূলায়,
কদলী-বৃক্ষের খোলেও কখনও রহি;
ব্যাঙাচি রূপেতে বাঁদরের মত লেজুড়ও আমি সহি।
আমি প্রাতে ও দুপুরে বিকালে ও সাঁজে
যখন ঝিল্লী ঝাঁঝার কাননে কাননে বাজে *
গেয়ে যাই গান
'আসমান' †

ফেড়ে ফেড়ে
মিছে বলে লোক গলাটা আমার হেঁড়ে।
আমি 'শির' তুলে হেরি 'কেয়ার' করিনে কারেও
মোরে আঁট্‌কাতে নারে কাঁটার বেড়ার তারেও

* মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাষায় দুই একটি শব্দ প্রয়োগ করাও কামস্কাট্‌কীয় এই অসমছন্দে রীতি।

† Trained কান যাঁহাদের নয় তাঁহাদের মাঝে মাঝে পড়িবার সময় বাধিতে পারে, তাঁহারা কোনও ছন্দবিদের মুখে কবিতাটি শুনিয়া লইবেন। এই কবিতার ছন্দ নিখুঁৎ—একেবারে কামস্কাট্‌কীয়।

আমি কচুর বনের আড়ালেতে রহি মাঝে মাঝে দিই লাফ
গিন্নী মিছাই দেখায় যে ভয় 'সাপ ওগো ওই সাপ'
আমি সাপেরে করিনে 'কেয়ার'
দাঁড়াওয়ালা যত ক্যাঁক্ড়ারা মোর 'এয়ার'।

আমি ব্যাঙ আমি বিদ্রোহী ব্যাঙ
আমি উল্লাসে কভু নেচে উঠি ড্যাং ড্যাং
আমি ব্যাঙ
দুইটা মাত্র ঠ্যাং।

আমি সাপ আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।

আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিত ফণা
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর 'মিনিট' যে যায় গোণা
আমি নাগশিশু আমি ফণী মনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি।
আমি 'বেঅফ বিস্কে' 'সাইক্লোন' আমি মরু সাহারার 'আঁধি'।

আমি বেদুয়ীন, আমি মহম্মদ ঘোরী,
আমি কিশোরী মেয়ের নাকের নোলক
ঢাকীদের আমি সখের ঢোলক
সৌখীন যত মডার্ণ ছেলের West End হাত ঘড়ি।

আমি বেন্দা কলুর ঘানি
আমি খোদার ষণ্ড, 'নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি'
গলা 'ধাক্কার ধমক' আমি যে 'ঝরণার কুলকুচি'
'দাড়িম ফাটার' অসহ্য 'ক্ষুধা' পুঁটি মোদকের লুচি
আমি 'ঝড়' আমি 'কড় কড় কড়' K. M. Dasএর চটি
মেমসাহেবের cero pearls আমি মেছুনীর আঁশবটি

আমি যুবতী মেয়ের গলার পুষ্পহার
আমি বাসর ঘরের মশক আমি বাসক তোযকে ছার
আমি নবীন আমি যে কাঁচা,
আমি বাহির হয়েছি ভাঙিয়া ফেলিয়া খাঁচা।
আমি 'হে বিরাট নদী' বৈশাখ আমি রুদ্র
তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহী আমি ভাইকম শূদ্র।
আমি 'এ্যারোপ্লেন' আকাশের বুক চিরি
'ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট' আমি গান্ধী মার্কা বিড়ি
আমি 'কে সি এন'* কত প্রেমিকের মান রাখি
বাঙালী ছেলের 'নোটবই' আমি এক্‌জামিনের ফাঁকি।

---

* অর্থাৎ KCN কিনা Potassium Cyanide আমরা যত দূর জানি Chemical formula এই প্রথম কবিতায় ব্যবহৃত হইল।

আমি ভাদ্রের বান পৌষের শীত
'ওরিয়েন্টাল আর্ট' আমি ; আমি কালোয়াতি গীত
কচি শিশুদের কচি দাঁত আমি প্রৌঢ়া নারীর চুল
আমি নন্দী, গায়ত্রী আমি ঘরের কোণের ঝুল।
চতুরঙ্গের আমি জ্যাঠা মহাশয়
জগদীশ্বর মানিনেক আমি করিনে কাহারে ভয়,
মেসের পেটেন্ট ইলিসের ঝোল পুই চচ্চড়ি আমি
আমি বেহারী চাকর সাবিত্রী ঝি নই আমি রামী বামী
আমি প্রণয়ীর প্রণয়ের লিপি 'shell' আমি 'ডিনামাইট'
ঘোর পুন্নাম নরক আমি যে আলোমাঝে 'সার্চ লাইট্'
আমি ছুঁচ হয়ে হেথা সেথা ঢুকে ফাল হয়ে বাহিরাই
আমি হুঙ্কার করি প্রথমে কিন্তু শেষ কালে চুমু খাই †
আমি গান গাই
গান গেয়ে গেয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া চলি
আমি চলিতে চলিতে ঢলি
বিঘ্ন বিপদ শ্যাওলার মত পদতলে যাই দলি
মাঝে মাঝে কভু পিছ্‌লিয়া পড়ি আমি
প্রেমিকার প্রেম পাশে ধরা পড়ে চলিতে চলিতে থামি
আমি থামিতে থামিতে ঘামি
কবে 'বেহেস্তে' পহুছিব তাই ভাবি যে দিবস যামি
আমার কোমল নারীর প্রাণ
নিমিষে নিমিষে পথে ঘাটে মাঠে
অকাতরে করি দান।
ওগো সুন্দরী
ওগো কিশোরী
বেলা শেষে ওগো অবেলায়
কটাক্ষ তুমি হেনো মোর পানে
আমি মাতি রব ছায়ানট গানে
কেলে হাঁড়ি মোর টাঙ্গায়ে রাখিব শ্যাওড়া গাছের তলায়।
ওগো প্রেয়সী করুণা কোরো,
আমার জটা পড়া চুল ছেঁটে দেবো তাই ধোরো,
তুমি থেকো গো 'আদুল' গায়
আমি আপনারে টেনে টেনে
'বহুত কোশিষ' মেনে
তোমারে লক্ষ্য করিয়া ছুটেছি ঠাঁই দিও ফাটা পায়।

১ম বর্ষ / আশ্বিন ১৮ / ১৩৩১

---

† এই চুমু খাই পদটি বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিট্‌কেলের "প্রলয়ের ফুলকি" নামক কবিতা হইতে কবির অনুমত্যানুসারে গৃহীত।

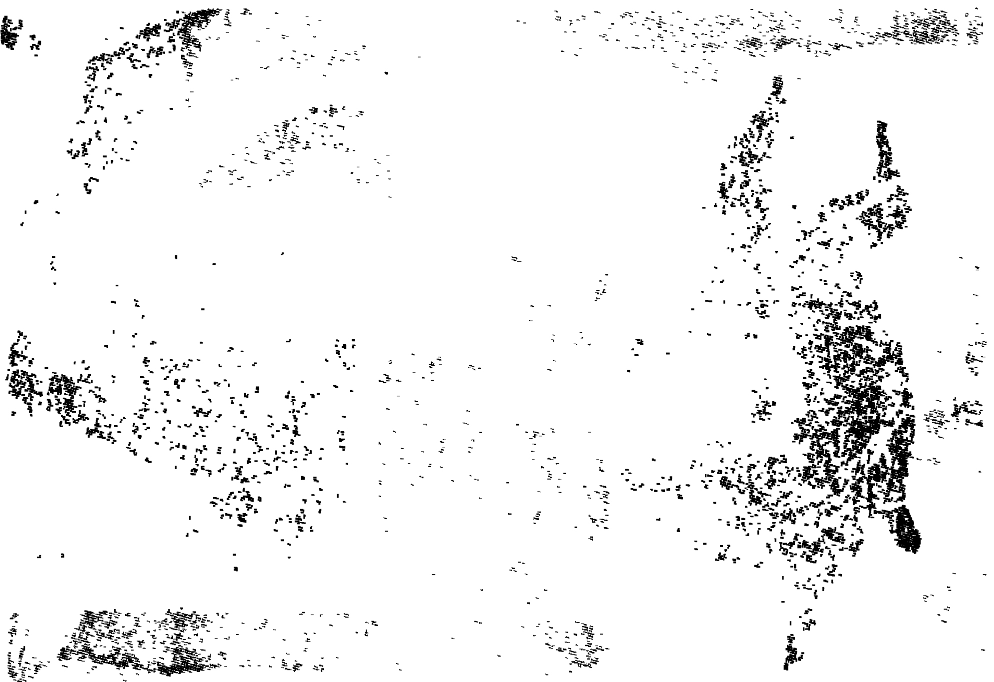
ছবিতা

রেখা : হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

লেখা : সজনীকান্ত দাস



'জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'
'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না'
'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন'



‘ওহে সুন্দর মরি, মরি তোমায় কি দিয়ে বরণ করি’

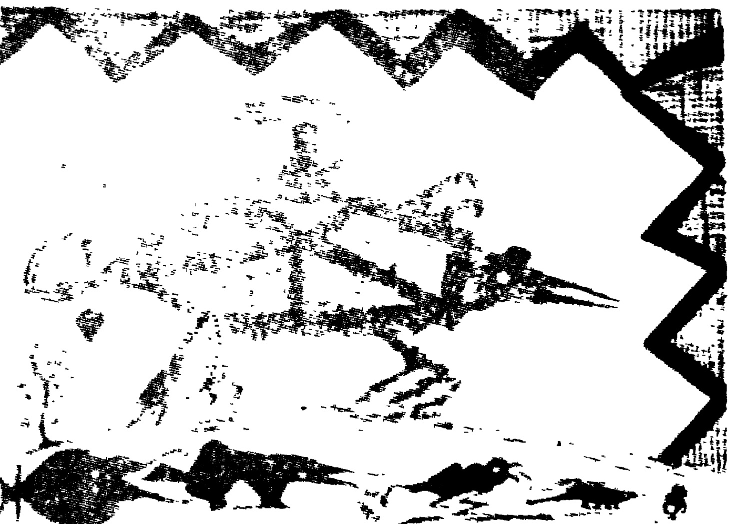
‘চোখে চোখে দেখা হ’ল পথ চলিতে’

‘এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি’

‘অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ’



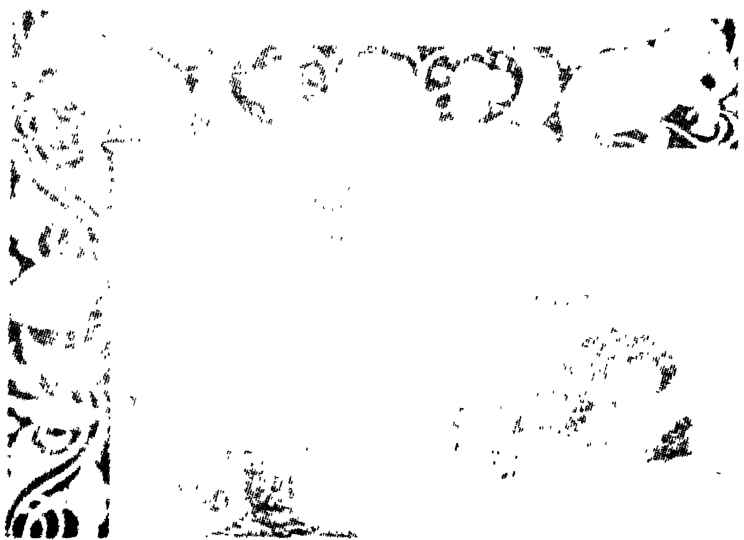
'আমি তো চাহিনি কিছু
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম নয়ন করিয়া নীচু'
'তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে কাননে কুসুম চয়নে'
'চোখে কেন লাগ্‌ছে নাকো নেশা
মনে মনে ভাব্‌ছে কেসর খাঁ।'



'ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজ মোর ঘরের সুমুখ পথে'
'মন্ত্রমুগ্ধ অচেতনসম চড়িনু অশ্ব 'পরি'
'জয়-যাত্রায় যাওগো'



'মম চিত্তে নিতি-নৃত্যে কে-যে নাচে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ!'
'জানি না কি মরণ নাচে নাচে গো ঐ চরণ-মূলে'
'প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ'



'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'

'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি'



'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'
'বীর্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি'
'বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও'
'এস দাঁড়ি নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা'



'কুঁড়ের ভিতরে কাঁদছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'

'যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার আমারে ঘেরিছে আজি'

'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
মোর পুরাতন ভৃত্য



'হতাশ পাথক সে যে আমি, সেই আমি
'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা'
'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্ ।'



'দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে'
'লাগাব লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়'

'চল চপলার চকিত চমকে
করিছ চরণ বিচরণ'



'আজি আসিয়াছে ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলো চুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়।
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল।'

'কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি'



'বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে'

'জগৎ পারাবারের তীরে'

'আম্র কহে একদিন হে মাকাল ভাই'

আধ্যাত্মিক জাতি

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত ও চিত্রিত



'মগ্ন রয়েছি পরমার্থের চিন্তায়'

(১)

আজি জড়বাদ-বন্যা ছুটিছে জুড়ি' ইউরোপ, মার্কিন,
ভাসিল মিশর, জাপান, তুর্কি, চীন তায়!
Satan-এর ডাক ধ্বনিছে গগনে ;—but we never hearken,
মগ্ন রয়েছি পরমার্থের চিন্তায় ;
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি!—
দলিত করিয়া ধরণী দৃপ্ত চরণে,
আমরা চাহি না করিবারে মাতামাতি।



'আমাদের কাছে ক্ষণভঙ্গুর দেহটার কিছু দাম নাই'

(২)

বাঁচিবার তরে খাই না আমরা, খাই স্বর্গের কামনায় ;—
শোর গরু ছেড়ে কদু থোড়ে তাই মর্‌জি।
আমাদের কাছে ক্ষণভঙ্গুর দেহটার কিছু দাম নাই—
ভোজ পেলে তাই প্রাণের মমতা মর্জি।
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি!
বোকার মতন খেটে মরি নাক' অকারণ,
দুদিনের তরে বাড়াতে বুকের ছাতি।



'বিয়ে করি বটে,—সেটা শুধু পুত্রার্থে'

(৩)

মোরা সংযমী—রমণী লইয়া ফিরি না danceএ dinnerএ,
করি না travel স্ত্রীর সাথে জোড়া berthএ।
তুচ্ছ করিয়া রোগ শোক জরা, বসি মৃত্যুর কিনারে,—
বিয়ে করি বটে,—সেটা শুধু পুত্রার্থে ;
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি!
জীবন মোদের কাটুক আঁধারে ক্ষতি নাই—
বংশে তা ব'লে নিবিতে দিব না বাতি।

'তাই আমাদের নাহি ভয় কানাকৌড়ি'

(৪)

জেনেছি আত্মা অবিনশ্বর, জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া।—
তাই আমাদের নাহি ভয় কানাকৌড়ি ;
তাই পথ চলি ক্ষণ বেছে, খনার বচন শুনিয়া,
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি' ;
কারণ আমারা আধ্যাত্মিক জাতি !
ইহকালে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক্,-
আমরা রহিনু পরকালে হাত পাতি'।

ফাল্গুন ১৩৩৪

চিপোর্ট

সজনীকান্ত দাস রচিত ও হরিপদ রায় চিত্রিত

এই মাসের 'কল্লোলের' 'ডাকঘর' বিভাগে সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত স্থান উদ্ধৃত হইল—

"গত ৪ঠা চৈত্র, শনিবার এবং ৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার বিশ্বভারতী সম্মিলনী হইতে জোড়াসাঁকোস্থ 'বিচিত্রা' গৃহে দুইটি আলোচনা সভা আহূত হয়। দুই দিনই বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত ছিলেন, আমরা কয়েকজনও নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম।"

"আমরা স্থানীয় ও বিদেশস্থ অনেকের নিকট হইতে পত্র পাইতেছি, তাঁহারা আলোচনা সভার এই দুই দিনের সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের নিকট জানিতে চাহেন। প্রত্যেকের পত্রের উত্তরে এরূপ দীর্ঘ বিষয় সম্যকভাবে লিখিয়া জানান অসুবিধা। এই সভার বিবরণ কখনও প্রকাশিত হইবে আমরা তাহা বিবেচনা করি নাই, তাই সমগ্রভাবে উহার কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করি নাই।"

ইহার পর সম্পাদক মহাশয় প্রথম দিনের আলোচনার একটা সংক্ষিপ্তসার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আশ্চর্য তাঁহার ধীশক্তি—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বৈশাখের 'প্রবাসী'তে প্রথম দিনের সভার যে বিবরণী লিখিয়াছেন তাহার সহিত এই 'মুগ্ধবোধ' বিবরণের আশ্চর্য সাদৃশ্য—হুবহু মিল! শুনিয়াছি 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকের একটি ভালো রিপোর্টারের প্রয়োজন আছে। কল্লোল-সম্পাদক মহাশয় এই কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, উপযুক্ত কেন, যোগ্য পাত্র।

ইহার পর লিখিত হইয়াছে—

"আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদিগকে, বিশেষ করিয়া নবীন লেখকদিগকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের কোনও পার্থক্য নাই এবং তিনি এটি জানিতেন বলিয়াই তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভালো ইস্কুল-মাস্টার। তাঁহার সহিত নবীন লেখকদের মতের পার্থক্য নাই জানিয়াও তিনি পুরানো পড়া ঝালাইয়া দিবার জন্য তরুণদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লেখাপড়ায় তরুণদের এই মনোযোগ প্রশংসনীয়।

আমাদের নিধে চাঁড়ালকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোর ঘর কোন্‌খানে রে।" নিধে একগাল হাসিয়া বলিয়াছিল, "আমার ঘর চেন না বাবু?—আমার দরজার সামনেই তো ঠাকুর বাবুদের সিং-দরজা।" ঠাকুর বাবুদের কি কপাল!

দ্বিতীয় দিনের সভারও কিঞ্চিৎ বিবরণী অতঃপর দেওয়া হইয়াছে। তাহার শেষটি এইরূপ—

"সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ নবীন লেখকদের কয়েকজনকে ডাকিয়া বলেন, তাহারা যেন রাগ না করে। তোমাদের শক্তি আছে; তোমরা নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে নিজের পথ কেটে যাবে, সত্যকার সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তোমরা নিজেদের সত্যকার মর্যাদা দিও।"

কোটেশন মার্কা কল্লোল-সম্পাদকের। নিজেদের 'মর্যাদা' নিজেরা দেওয়াই ভাল। আর রাগ করা-কবির কথা—They know not what they do, Father!

প্রথম দিনের কথা জানি না। দ্বিতীয় দিনে আমরাও অনিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। নিকট ও দূর, বহু দেশ হইতে সভার সংবাদ চাহিয়া চিঠিপত্র কিঞ্চিৎ আমাদের নিকটও আসিয়াছে, অসংখ্য ভাষায়, অপূর্ব লিপিভঙ্গীতে। উক্ত সভাসম্বন্ধীয় চিঠির বাবত টিকিট সংগ্রহ করিয়া একজন টিকিট-সংগ্রহকারী বড় লোক হইয়া গেল। সকল ভাষা সকলের না জানাই সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের জন্য জানাইতেছি যে, আন্তানানারিভো হইতে একজন আমাদের

প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন (বাংলা হরফে দিলাম)—

'হ্যোৎ ফিন তিদ্‌ব ুয়ো স্তুপে বা রবীন্দ্রনাথ, কিউটিপাক্স লোহাম্‌।' পোপোকেটাপাট্‌ল হইতে একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন,—

'কপট্‌ সাম লোন্‌টিফিস্‌ প্রশান্ট-অপূর্ব-প্রমঠ ছুবেলানডিফিক্স। ডীনেশা বুড্ডু অচিন্ট্‌ পুদ্‌ পাহের ?'

রিওডিজেনিরোর বিখ্যাত কবি মিতাল ফেলাস্কিন একটি সুবৃহৎ লিপি পাঠাইয়াছেন, তাহার শেষাংশ এইরূপ—

'মুদাতি হায়েৎ কো বিশ, তম্‌ হ্রের হু হ্লালেন—কিম্‌তো দিওরো ক্যালোল-প্রাগ্‌তি ?'

কাম্‌স্কাট্‌কা হইতে কম্‌রেড বিথেলোতেলাচুংভিস্কি লিখিয়াছেন,—

'ফিলিয়েনোলাক, ব্লাসিতনদ্ধপক্রুপ দেহাই সোভিস্কি, স্তেমাচুস্কি হিপোস।'

এইরূপ আরো ১৩৯৩২ খানি আছে। সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সকল ভাষায় সকলকে এ বিষয়ে.জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং আমরা বহু গবেষণা করিয়া ও প্রভূত পরিশ্রম করিয়া সার্বজনীন ভাষায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের বিবরণী দিতে চেষ্টা করিলাম। শনিবারের চিঠি বাংলা কাগজ বলিয়া ছবির নীচে বাঙলা বিবরণ একটু করিয়া দেওয়া হইল বটে, তবু এই বিবরণ না পড়িতে পারিলেও পাঠক মাত্রেই শুধু ছবি দেখিয়া সেদিনের ঘটনা আঁচ করিয়া লইতে পারিবেন। চিত্রে রিপোর্ট দেওয়া হইতেছে বলিয়া, 'সাঁচো' (সাহিত্যিক+ছুঁচো)-আদর্শে ইহাকে 'চিপোর্ট' আখ্যা দেওয়া হইল।

যুগন্ধরদ্বয়



'আমার চরিত্র খারাপ হওয়ার আশঙ্কা নেই, তবে—'

"হায়রে, সেকাল হায়রে
কখন্‌ চলে যায়রে—"



'আমাদের জন্ম—অভিজ্ঞতা—Tendency!'

গোপাল যখন চাইল ননী, দিলেম না তা হায়রে—
নদেয় গোরা গড়াগড়ি—শ্রীপাট ভেসে যায়রে!

খুঁটি-যুগল



'তাতে আর দোষ কি?'

আইন্‌স্টাইন্‌ থাক্‌ বেঁচে থাক্‌, আলু-ডাঙার মাঠে,
দেখ্‌লে তেনায় সূর্যিমামা ওজন-মাফিক হাঁটে।



'হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হোঃ'

দেখ তো ভাই হাস্‌লে আমার টোল পড়ে কি গালে-
ঈশান কোণে সান্‌কী-ভাঙা চাঁদ যে সুধা ঢালে!

'এক ঢিলে দুই পাখী'



'ব য় ১ ন'

হুঁকাও নয় বিড়িও শুধু সিগার টানি,
একূল ওকূল দুকূল গেল, এযে ডহর পানি।



করুণ কেন '

মিইয়ে আসে তপ্ত মুড়ি, গুম্ফ ধরে ফণা—
বাঘের ঘরে রাত না হ'তে ঘোগের আনাগোনা।

কড়ি ও কোমল



'ছম্মাবা। কাব্যবিশারদ—।'

রাতারাতি ভাগ চেয়েছে মাতুল সে কালনেমি—
রেস-কোর্সে কালের রথের হারিয়ে গেছে নেমী।



'অনেক ক্ষমা করেছি—সময় আস্‌বে—'

বাণীর সেবায় সইল কেবা চরম অপমান—
'দাঁড় ধ'রে আজ বস্‌রে সবাই টান্‌রে সবাই টান্‌।'

রিপোর্ট দেখিয়া যাঁহারা সভার বিবরণ সম্যক বুঝিতে পারিবেন না তাঁহাদিগকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার লিখিত 'ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা' 'কন্‌সল্ট' করিতে বলি। ইহা অনেকটা হজমীগুলির কাজ করিবে।

'বিচিত্রা' গৃহে দ্বিতীয় দিনের এই সাহিত্য-বৈঠক সম্বন্ধে আমাদের ভূলো একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছে। সে নিউইয়র্ক হইতে কবিতা লিখিবার এক প্যাঁচ শিখিয়া আসিয়াছে। যে-কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে দুচারটি point কতকগুলি কাগজের টুক্‌রাতে লিখিয়া সেগুলি একটা ঘুরন্ত চাকীর উপর ফেলিয়া দেয়। খানিকক্ষণ পরে আপনা হইতে একটি আস্ত কবিতা বাহির হইয়া আসে। এই কৌশলে এই সম্পর্কে যে কবিতাটি বাহির হইয়াছে তাহা এইরূপ—

'টেগার্ট সাহেবের বাড়িতে হ'ত যদি'—
'থাক্‌ Doctrine আজ ;'
'ন্যাজা ও মুড়ার কথা যে বলা মিছে'—
'ঘরেতে ঢুকে এই কাজ!'
'রুচি ও কাঁচা, প্রেম, ভূত ও ভগবান'—
'দারিদ্র্যে ঠাট্টা যে করে'—
'মোদের বাধা এত, ওদের বেলা'—
'উদার উদাত্ত স্বরে।'
'বিয়ে করা দম্পতী সেও তো সংস্কার'—
'স্মরণ কর বিশারদে,'
'অনেক সহিয়াছি করিনু ক্ষমা এত,'
'পদ্মা ডুবে গেল মদে'।
'জংলী তুমি থাম, নীরদ বল বল'—
'পড়ি না কল্লোল-আদি',
হি হি হি হো হো হো হো হাসিল আর্ট-সই,
কে যেন উঠে গেল কাঁদি'।
জুতার শুকতলা হরিল সুখ কার,
মুক্তা চেনাই ত গোল—
ন্যাংড়া আম যদি খাইতে চাহ, কেনো
শ্রীরাধাবাজারের ওল

দৈনিক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

রাতারাতি একজন আত্মত্যাগী বীর হইয়া পড়িয়াছি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে—হিরো। ব্যাপারটা নিতান্ত আকস্মিকভাবে ঘটিয়া গেল। সামান্য বিলম্বের জন্য পারের স্টীমারটা হাতছাড়া হইল। দুই ঘণ্টা বসিয়া না থাকিয়া নৌকাতেই যাওয়া স্থির করিলাম। প্রায় জন আষ্টেক আরোহী হইলাম আমরা, তাহার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। বৃদ্ধই বলা উচিত, তবে বয়স হইলেও বেশ সবল চেহারা। গায়ে নামাবলি, পায়ে কটকী চটি, হাতে মালা জপিবার একটি পুরানো মখমলের ঝুলি। শুচিতা রক্ষা করিয়া এক দিকে একটু ধার ঘেঁষিয়াই বসিয়াছেন। দুই-একজন বলিল, তাহাতে মৌনভাবেই একটু হাস্য করিলেন মাত্র।

জোর ভাঁটাব টান, পার হইতে সময় লইবে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বেশ একটি ঝিরঝিরে বাতাস উঠিয়াছে। এখানে ওখানে বীচিকুঞ্চিত গঙ্গাবক্ষে আলোর প্রতিবিম্ব দোল খাইতেছে। অভ্যাসের দোষে একটু ভাবের আবেশে পড়িয়া গেলাম। একটু বাড়াবাড়িও হইয়া গেল,—নীচে সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে নৌকার ছইয়ের উপর গিয়া বসিলাম যখন মাঝামাঝি আসিয়াছি এবং গুনগুনানির মধ্যে একটা গান স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কোথা হইতে কি হইল বলিতে পারি না, নৌকাটা হঠাৎ একপেশে হইয়া গিয়া ছইয়ের পিচ্ছিল তেরপলের গা বাহিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। যখন সম্বিত হইল অনুভব করিলাম, আমার হাতে একগোছা কাহার চুল, আর কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে আমার বাঁ হাতটা ধরিয়া আছে। এইটুকু বুঝিতেছি যে, যতই উঠিবার চেষ্টা করিতেছি, ততই ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে এবং এই ভাসা-ডোবার ক্ষণিক আলো ও ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলা ত্রস্ত মিশ্র কলরোল ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে।

ইহার পরের ব্যাপার যাহা আমার মনে পড়ে তাহা এই যে, আমি বাবুঘাটের একটি রানার উপর চিত হইয়া শুইয়া আছি। আমাকে ঘিরিয়া একটি বেশ বড়গোছের ভিড়! কাছে সিক্তবসনে, পা মুড়িয়া পণ্ডিতমশাই বসিয়া আছেন।

প্রথম সংলগ্ন কথা কানে গেল—ঐ চোখ খুলেছেন! কেমন আছেন মশাই? আর একটু ব্র্যাণ্ডি হ'লে হ'ত। কোথায় গেলে হে, দেখ না আর একটু পার কি না যোগাড় করতে—

একজন সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া একটু জোরেই বলিল, ঠিকানাটা দিন, না হয় খবর দিই, অবিশ্যি ভয় নেই, মা-গঙ্গাকে ডাকতে থাকুন।

আশা করিয়াছে, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছি। কোন রকমে ঠিকানাটা দিয়া ক্লান্তির বশে আবার চক্ষু বুজিলাম। শুনিতেছি, পেলে? ওঁকেও দাও একটু ব্র্যাণ্ডি। খেয়ে নেবেন ঠাকুরমশাই ঢুক ক'রে একটু। ওষুধ, ওতে দোষ নেই।

একটা ক্লান্ত স্বরে উত্তর হইতেছে, না না বাবারা, আমি হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণ, আমায় শুনতে নেই ও কথা। দাও নি তো আমায় খাইয়েটাইয়ে? দুর্গা দুর্গা! তা হ'লে আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একটু জিরিয়ে আমি বেশ যেতে পারব 'খন, একটা গাড়ি ডেকে দিও বরং।

ভাঙা ভাঙা হিন্দী-বাংলায় কে বলিতেছে, না মহারাজজী, আপনার মুহমে কিছু না দিয়েছে, আপনি তো বরাবর জাগিয়ে ছিলেন। শুধু একবার দু মিনিটকা বাস্তে বেহোস হয়ে

গেলেন। যেই বাবু ওপর থেকে গঙ্গাজীমে গিরিয়ে পড়ল কি—

স্মৃতিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। স্বরটা যেন চেনা, খুব সম্ভবত মাঝি পণ্ডিতমশায়ের শক্তির পরিচয় পাইয়াছে, সংযমের পরিচয় পাইয়া ওর মনটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আসল ঘটনাটা সবাইকে বুঝাইতে চায়, কিন্তু বৃদ্ধ যুবাকে বাঁচাইবে, এ কথাটা যেন কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না। ওরই নৌকায় দুর্ঘটনা হইয়াছে, সুতরাং ওর সত্য মিথ্যা কোন কথাই গ্রাহ্য হইতেছে না। আমি যে পণ্ডিতমশায়ের টিকি যথাপদ্ধতিতে বাগাইয়া ধরিয়াছিলাম আর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, এইগুলা আমার পক্ষে মস্ত বড় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

কি একটা বলিবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, কিন্তু শক্তি হারাইয়া যেন কোথায় তলাইয়া চলিয়াছি। গলায় একটা উগ্র জ্বালা অনুভব করিলাম, আবার যেন অতল হইতে ভাসিয়া উঠিতেছি, যা হোক চলিয়া যাইতে পারিব। কেমন একটা অস্পষ্ট আনন্দে আমায় উপরে ঠেলিয়া তুলিতেছে, কোথাও বহুদিনের জন্য যাইবার আগে সবচেয়ে দরকারী কথাটা বলিয়া যাইবার একটা অস্পষ্ট নিশ্চিন্ততা, একটা দায়মুক্তির ভাব. হাতটা বাড়াইলাম, গোলমালটা হঠাৎ বাড়িয়া কোথায় যেন বিলীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বার যখন সংজ্ঞা হইল, তখন পূর্বের চেয়ে বল পাইয়াছি মনে হইল। ঘটনাটাও পূর্বাপর যেন স্পষ্টতরভাবে মনে পড়িতেছে। কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছি, চারিদিকে আতঙ্কসূচক একটা বারণের কলরব উঠিল, আপনি একটু শুয়ে থাকুন মশাই, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ততক্ষণ—

বলিলাম, অ্যাম্বুলেন্সে দরকার নেই। পণ্ডিতমশাই কোথায়?

একসঙ্গে উত্তর ও অভিমত আরম্ভ হইয়া গেল, তিনি চ'লে গেছেন গাড়ি ক'রে, তাঁর তো বিশেষ কিছু হয় নি, আপনি সমস্ত ভারটা নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন কিনা. কি রকম বোধ করছেন এখন?

আপত্তি সত্ত্বেও উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম, ভালই বোধ হচ্ছে; আপনারা স'রে গিয়ে একটু হাওয়া ছাড়ুন দয়া ক'রে।

অগ্রণী কয়েকজনের ঠেলাঠেলি আর অনুরোধে ভিড়টা একটু পিছনে সরিয়া গিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিল। মিনিটখানেকের জন্যও নয়, তখনই আবার বীরের মুখের কথা শুনিবার আগ্রহে আরও চাপ বাঁধিয়া ঘিরিয়া ফেলিল; নানাবিধ প্রশ্ন, মন্তব্য—কি হয়েছিল মশাই? আচ্ছা দোরস্ত হাত, এসা বজ্রমুষ্টিতে পণ্ডিতমশায়ের টিকিটা ধরেছিলেন মুঠিয়ে। আপনি যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, তখন উনি বুঝি একেবারে তলিয়ে গেছেন?

মাঝিটা কি বলিতে যাইতেছিল, চারিদিক হইতে আবার মারমুখো হইয়া উঠিল সকলে, তোম চোপ রও, পুলিসমে হ্যাণ্ডোভার করেগা। বল কি তোর নৌকোর নম্বর, ব্যাটার লাইসেন্স কনফিসকেট করিয়ে দাও, যত সব আনাড়ী মুল্লুক থেকে জুটেছে, হাল ধরতে পারে না, রোজ একটা না একটা—

বলিলাম, ওকে বলতে দিন মশাই, কি হয়েছিল আসলে ওই জানে, আমার ঠিক গুছিয়ে মনে আসছে না।

একটি বয়স্কগোছের লোক আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন, গুছিয়ে মনে পড়া মানে? তুমি তো আর যাত্রার মহলা দিচ্ছিলে না বাপু যে, পড়া মুখস্থর মত সব মনে ক'রে ক'রে বলবে! দেখলে, একটা বুড়ো মানুষ যেতে বসেছে, যেমন ছিলে তেমনটি ঝাঁপিয়ে পড়েছ। সাবাস ছোকরা! বাঃ! তোমার চেহারা দেখলে মনে হয়, জলে পড়লে কুটোর মত ভেসে যাবে, কিন্তু তুললে তো লাস ডাঙায় টেনে! কোথায় বাড়ি?

বলিলাম, মশাই, আমি তাকে টেনে তুলেছি বললে ভুল হয়। আমি তো—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া অনুমোদনের ভঙ্গিতে তর্জনীটি বাঁকাইয়া বলিলেন, নিমিত্ত মাত্র। ঠিক

ঠিক। সাধু। সব কর্ম তাঁকেই সমর্পণ করবে বাবা, আমি করলাম, আমি ধরলাম, আমি এত বড়, আমি তত বড়, আরে তুই কে? কতটুকুই বা খ্যামতা তোর?

একটা বখাটে গোছের ছোকরা একটা বিড়ির শেষ প্রান্তে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, তুই তো স্রোতের কুটোটি। কি বলুন ঠাকুরমশাই?

বৃদ্ধ তাহার দিকে একবার আড়ে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, নাও, একটা গাড়িটাড়ি ডেকে দাও তোমরা কেউ, ভিড় হ'লেই আবার গাঁটকাটা জোটে। তুমি ঘরে যাও বাবা, ভিজে কাপড়ে আবার বেশিক্ষণ থাকাটা—

ছোকরার দিকে আর একটা বক্রদৃষ্টি হানিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

২

ঘোড়ার গাড়িটা মেটকাফ হলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে, 'এই গাড়োয়ান! এই গাড়োয়ান!' করিয়া একটা চিৎকার কানে গেল এবং গাড়োয়ানটা গাড়ি থামাইয়া ফেলিল। গলা বাড়াইয়া দেখি, সেই বখাটে গোছের ছোঁড়াটা আর একজন ভদ্রবেশী যুবক, একরকম ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিয়া ছোকরা আমায় দেখাইয়া দিয়া বলিল, এই ইনি। আমি বিস্মিতভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যুবক যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কার! ডিটেন করলাম, মাফ করবেন। আপনিই আজ একজন জলমগ্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেছেন?

বলিলাম, আজ্ঞে, আমি তাঁকে উদ্ধার করি নি, আসলে—

ভগবান করেছেন।—বলিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত যুবক পকেট হইতে একটা নোটবুক-গোছের বাহির করিয়া একটা কি টুকিয়া লইল, তাহার পর নোটবই আর পেন্সিলটা হাতে করিয়াই বলিল, সে তো ঠিক, আমরা কে? ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড, আপনার সঙ্গে খানিকটা যেতে পারি কি? মানে, ওখানে আমি খানিকটা বিবরণ যোগাড় করেছি, তারপর এ বললে, আপনি বোধ হয় বেশি দূর যান নি, তাই ভাবলাম, মানে, আমি হচ্ছি 'দৈনিক সত্যপ্রকাশে'র স্টাফ-রিপোর্টার—

বলিলাম, মশাই, যদি আদত কথাটা রিপোর্টেড হয়, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু—

যুবক গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, একটি অক্ষর বাদ যাবে না। এইখানেই ব'সে ব'সে স্টোরি ঠিক ক'রে নিয়ে আপনাকে শুনিয়ে নোব। ডাক-এডিশনেই বের ক'রে দোব আপনাকে। এই কোচম্যান, হাঁকো। বাই দি বাই, ফোটো আছে আপনার?

বলিলাম, আছে একটা বোধ হয়।

তবে আর কি। সুইমিং-কস্টিয়ুমে?

না, ধুতি-চাদরে।

যুবক একটু বোধ হয় নিরাশ হইল, কিন্তু তখনই উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, হয়েছে, আই হ্যাভ এ ব্রেন-ওয়েভ। আপত্তি না থাকে তো নেমে সরকার কোম্পানির ওখানে আপনার একটা টাটকা-টাটকি ফোটো তুলিয়ে নিই। চমৎকার হবে। এই ভিজে কাপড়-জামা, ভিজে চুল, ক্লান্ত ভাব—

দৈনিক কাগজের রিপোর্টার স্বয়ং স্বশরীরে আমার সামনে! কি রকম একটা যশের মোহ ধীরে ধীরে পাইয়া বসিতেছে। তবুও ক্লান্তিতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম, সিধে বাড়িই যেতে দিন এখন মশাই ; সমস্ত জলটা গায়েই শুকোচ্ছে—

এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর, একটু ভেতরে গিয়েই। বিলেত হ'লে আপনি বোধ হয় এতক্ষণ পঞ্চাশখানা কাগজে উঠে গেছেন—অলরেডি। আমাদের অর্গ্যানাইজেশ্যন তার সিকির সিকিও নয়। তবু—মিনিট পাঁচেকও লাগবে না। আপনার একটু পাবলিসিটি দরকার

মশাই, অমন সব ব্যাপারই তিনি করিয়েছেন ব'লে ছেড়ে দিলে চলে না। কাল আপনার এই রকম ভিজে কাপড়, ভিজে চুলের ব্লকের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট বেরুবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ থেকে অসাধারণের কোটায় উঠে পড়বেন। হ্যাঁ, বলতে হবে না, বুঝেছি আপনার ফিলিংস ; কিন্তু দেশের সামনে আদর্শ থাকা চাই তো মশাই, সবাই ভাল কাজ ক'রে যদি 'ত্বয়া হৃষিকেশ' ব'লে চুপ ক'রে ঘরে লুকিয়ে থাকেন তো দেশের ইউথরা আদর্শ পায় কোথা? আর ওসব পুরোনো ইয়ে ছাড়ুন মশাই, সাঁতরে আধমরা হলেন আপনি, ক্রেডিটটা নেবেন হৃষিকেশ? উত্তর দিন, চুপ ক'রে থাকলে শুনব কেন? নিন, সিগারেট খান। ও, খান না! এক্স্‌কিউজ মি—

সিগারেট খাই, বিশেষ দরকারও ছিল। খাই যে তাহার প্রমাণ পকেটে ভিজে গোল্ডফ্লেকের বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু ভদ্রলোক নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। ঠিক মুখবন্ধও বলিতে পারি না, স্পষ্ট উত্তর দিলাম, আজ্ঞে না, ওটা অভ্যেস নেই।

যুবক পেন্সিলটা নোটবুকের উপর লাগাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, মানে, আপনার মত হচ্ছে, ওটা মস্তবড় একটা বদ অভ্যেস? আপনার বক্তব্য—স্মোকিং লাংসকে উইক ক'রে দম নষ্ট ক'রে দেয়?

অথচ প্রশ্নকর্তা স্বয়ং ধূমপান করিতেছে। আমি কতকটা কুণ্ঠিতভাবে, পকেটের বাক্সটার উপর হাতটা ধীরে ধীরে চাপিয়া বলিলাম, একটু করে বইকি অপকার।

একটু না, বিলক্ষণ। আমাদের কথা বাদ দিন, ভবঘুরের দল। পেন্সিলটা চালাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, নাম?

বলিলাম, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যুবক পড়িতে পড়িতে লিখিয়া চলিল, শৈলেনবাবু মনে করেন ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকারক, যেহেতু নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থ ফুসফুসযন্ত্রকে দুর্বল করিয়া শেষ পর্যন্ত রুগ্ন করিয়া তোলে এবং তাহার দ্বারা পরিশেষে প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করিয়া যাঁহারা ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলাধূলা এবং সন্তরণ বা অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ধূমপানের শৈলেনবাবু একেবারেই বিরোধী। তিনি নিজে সমস্ত জীবনে কোন মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করেন নাই এবং এ বিষয়ে কাহারও মতের সঙ্গে আপস করিতে একেবারেই নারাজ।

বিনা আয়াসেই বাঁধা গতের মত সমস্তটা লিখিয়া যুবক পেন্সিল থামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন এই আপনার অভিমত তো? অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখুন মশাই।

বেশ অনুভব করিতেছি, মোহটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে আমায়। কাল এই সময় সমস্ত বাংলা দেশে শৈলেনবাবুর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার কোন একটা গলির অখ্যাত অজ্ঞাত শৈলেন নয়, বিখ্যাত সন্তরণবীর, উদারপ্রাণ পরোপকারী শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তবুও কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের শান্ত নিরহঙ্কার মূর্তিটি মনে পড়িয়া যাইতেছে, বোধ হয় মুখ ফুটিয়া বলেনও নাই যে, তিনিই আমার ত্রাণকর্তা। চিন্তার একটা যেন অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো এই রকমই ভাবি।

যুবক "সো ফার সো গুড" বলিয়া একটু গুছাইয়া বসিল। সিগারেটটা ধরাইয়া দুইটা আঙুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এবার আমি এ পর্যন্ত যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি লিখে ফেলি। সংগ্রহ করা কি সহজ মশাই? জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে একটা দাঁড় করানো। তা আপনাকে যখন পাওয়া গেছে,-শেষ পর্যন্ত তখন শুনিয়ে মিলিয়ে নিলেই হবে। একটু রেস্ট নিন, মেলা বকাব না আপনাকে।

মাঝে মাঝে গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে, কখনও বা পেন্সিলটা ঠোঁটে চাপিয়া

একটু ভাবিয়া লইয়া গড়গড় করিয়া খানিকটা লিখিয়া ফেলিল। আমার মনটা অকৃতজ্ঞতার অনুশোচনা আর যশের আকর্ষণে তোলপাড় খাইতেছে। একবার সিগারেটটা সরাইয়া সমস্তটা মনে মনে পড়িয়া ও এক-আধটা জায়গা সংশোধন করিয়া লইয়া যুবক বলিল, শুনুন, যেখানটা ঠিক হবে না, বলবেন।—

গঙ্গাবক্ষে নৌকা-দুর্ঘটনা

নদীগর্ভ হইতে নিমজ্জিত অশীতিপর বৃদ্ধের পুনরুদ্ধার

বাঙালী সন্তরণবীরের অসমসাহসিকতা

কল্য গঙ্গাবক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা একজন বাঙালী যুবকের সৎসাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় নিবারিত হইয়াছে। চাঁদপাল ঘাটের সাতটা বারোর স্টীমার ছাড়িয়া যাইবার পর পরিশিষ্ট কয়েকজন যাত্রী লইয়া শিবপুর ফেরী ঘাট হইতে একটি নৌকা ছাড়ে। যাত্রীদের মধ্যে একজন প্রায় অশীতিপর পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর ছিলেন—আপনার ঠিকানাটা?

ঠিকানাটা দিলাম। যুবক খালি জায়গাটুকুতে ঠিকানাটা বসাইয়া দিয়া পড়িতে লাগিল, আর ছিলেন হাতিবাগানের (১৭ নং রামু খানসামা লেন) বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৬)। পুরোহিত মহাশয় শুচিবায়গ্রস্ত, নৌকায় দুই-একজন ধোপা ও নিম্নশ্রেণীর লোক থাকায় তিনি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও এক প্রান্তে গিয়া উপবেশন করেন। নৌকা যখন প্রায় মাঝগঙ্গায়—ভিন্নমুখী দুইটি স্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা হঠাৎ বানচাল হইয়া যায়। পশ্চিমা আনাড়ী মাঝি কোন প্রকারেই সামাল দিতে না পারায়...

যুবক নোটবুক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া বলিল, দুটো লাইন দিলাম মশাই জুড়ে, যত সব আনাড়ী মেড়ো এসে নিতুই এই রকম দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। তাও চোখের সামনে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, খোঁজ রাখবে? বলে, সেই বুড়ো আপনাকে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ইডিয়ট! অ্যাজ ইফ ওয়ান কুড সোয়ালো দ্যাট অ্যাব্‌সার্ডিটি! ঐ যে পুরুত, আর রক্ষে আছে? কত কায়দা ক'রে, আর পাঁচজনকে জিজ্ঞেস ক'রে তবে আসল ব্যাপারটা বের করা গেল। হ্যাঁ, সামাল দিতে না পারায়, বৃদ্ধ টাল সামলাইতে না পারিয়া সেই বিপরীতমুখী জাহাজের ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়া একেবারেই তলাইয়া যান। জাহাজে ইতরভদ্র অনেকগুলি লোক, কিন্তু কেহই এই বৃদ্ধের প্রাণরক্ষার্থে অগ্রসর হইল না। শ্রীমান শৈলেন্দ্র নৌকার ছইয়ের উপর পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিলেন, বোধ হয় স্বভাবত একটু ভাবপ্রবণ হওয়ায় কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, প্রথমটা সেকেণ্ড কয়েক কিছু বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ঘুরিয়া প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করামাত্র যেমনভাবে ছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই ঊর্মিমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া যাওয়ায় ঘটনাটি কোন স্টীমার বা অপর কোন নৌকার গোচরীভূত হয় না এবং বৃদ্ধকে উদ্ধার করা নিরতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাহার উপর তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়—কি বলেন, প্রায় রশিখানেক দূরে গিয়া পড়েছিলেন ব'লে আপনার মনে হয়?

চমৎকার দাঁড় করাইয়াছে! এত বড় একটা বীরত্বের মূল নায়ক হওয়ার লোভ না হইয়া পারে না। মনে করার ভঙ্গিতে একটু টানিয়া বলিলাম, হাঁ, তা রশিখানেক হবে বইকি—ইজিলি।

অনুশোচনার দংশনে আর ততটা জ্বালা নাই; অথবা কোথায় একটা সগর্ব আনন্দ ঠেলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেই বিষটা কতকটা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতেছে; যাহা হউক।

তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রশিখানেকেরও আগে গিয়া পড়েন। নৌকার আর সকলেই নৌকার আশেপাশে অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু...এবার আপনি নিজের মুখেই বলুন শৈলেনবাবু, মানে, ঝাঁপ দিয়েই আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ প্রেজেন্স অব মাইণ্ড হারিয়ে ফেললেন; না, বেশ বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হাতের কাছে নেই,

তলিয়ে রশিখানেক দূরে ঠেলে উঠে থাকবেন?

একটা যে কুণ্ঠা ছিল, বেশ অনুভব করিতেছি, সেটা দ্রুত অপসৃত হইয়া যাইতেছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, না, ও সামান্য ব্যাপারে আর মাথা ঠিক রাখতে পারব না?

যুবক যোগাইয়া দিল, ডুবন্তদের উদ্ধার—এ তো রোজই আপনাদের সুইমিং ক্লাবে প্র্যাক্‌টিস করছেন, কি বলেন? হ্যাঁ, বাই দি বাই, কি নাম আপনাদের ক্লাবের?

পাড়ায় কয়টা সাঁতারের ক্লাব আছে, অথবা একটাও আছে কি না, জানা নাই। বলিলাম, আমাদের আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাব।

আমারও ঐ রকম একটা আন্দাজ ছিল। এ তো শখের ওয়াটার-পোলো-খেলা হাত নয়, দস্তুরমত স্রোতে প্র্যাক্‌টিসের লক্ষণ। আমার মনে হয়, এর আগে আরও দু-পাঁচটা অ্যাক্‌সিডেন্টে হাত পাকিয়েছেন আপনি। "না" বললে শুনব কেন মশাই?

একেবারে সোজা "হ্যাঁ" বলাটা বিপজ্জনক, তবু "না"ও বলিতে মন সরিল না। মুখটা নীচু করিয়া লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলাম।

স্টুডিওর ফ্ল্যাশ-লাইটে ফোটো লওয়া হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, ফোটো লইবার পূর্বে টাটকা নদী ছাড়িয়া ওঠার ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া লইতেও রাজি হইলাম। যুবকেরই 'প্রযোজনায়' মুখে দিব্য একটি ক্লান্ত অথচ উদার আত্মত্যাগের ভাবও ফুটাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলাম।

৩

পরদিন সকালে ক্লান্তির জন্য একটু বিলম্ব করিয়া উঠিলাম; কিন্তু উঠিয়াই দেখি, এত বিখ্যাত হইয়া গিয়াছি যে নিজেকেই নিজে চেনা দায়।

প্রথমেই পিসীমার সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত রাগিয়া আছেন বলিয়া বোধ হইল। কারণ না জানায় প্রশ্ন করিতেই ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, সক্কালবেলায় মুখ খুলব না মনে করেছি শৈল, আমায় বকাস নি। তোর এরকম বিদকুটে বাই কেন শুনি? একটা এঁদো ডোবার কখনও মুখ দেখলেন না, উনি বীরপুরুষ হয়ে গঙ্গায় সাঁতরে—

বুঝিলাম, কালকের জের, খবরটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, একটা লোক ডুবে মরছে চোখের সামনে, চেষ্টা করব না পিসীমা? কি যে বল তুমি! কিন্তু তুমি টের পেলে কি ক'রে?

না টের পেয়ে কাজ কি! সমস্ত শহরে টিটি প'ড়ে গেছে, কাগজে কাগজে ছবি, আর বাইরে একপাল সব জড়ো হয়ে ব'সে আছে। ও অলপ্পেয়েদের আর কি! হাততালি দিয়ে দিয়ে উস্কে দিয়ে একটা কাণ্ড না ঘটিয়ে ছাড়বে? দাদা আসুন, বলি, আমায় দিন কাশী পাঠিয়ে, নইলে বুড়ো বয়েসে আমায় অনেক কিছু দেখতে হবে। শরীরে এককড়া দম নেই, অথচ গোঁয়ারতুমি ষোল আনা,—ও ছেলেকে মাদুলি-মানতে কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? জলে ভেজা ছবি দেখলে বুক আঁতকে ওঠে-একেবারে!

গরগরানি শুনিতে শুনিতে বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই প্রায় জন ত্রিশেক ছোকরা বাহিরের ঘরে, বারান্দায় ভিড় করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সবার মুখেই একটি স্তম্ভিত শ্রদ্ধার ছাপ। বাহির হইতেই সকলে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। কয়েকজনকে চিনি, তাহাদেরই একজনকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিলাম, যতীন, ব্যাপার কি হে?

যতীনের হাতে একখানি 'সত্যপ্রকাশ', অগ্রসর হইয়া বিনীত হাস্যের সহিত আমার হাতে কাগজটা দিয়া বলিল, ব্যাপার আপনার পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের পাড়ার আজ মুখোজ্জ্বল হয়েছে।

কাগজটার দিকে চোখ পড়িতেই সমস্ত শরীরে একটা রোমাঞ্চ হইয়া গেল,—সিক্ত বস্ত্র,

সিক্ত কেশে আমারই ছবি, এমন একটা চমৎকার ক্লান্ত অথচ নির্লিপ্ত ভাব, যেন এই জগতের বহু ঊর্ধ্বে কোন এক ভিন্ন জগতের মানুষ আমি। একবার মনেও পড়িতে দিল না যে, আমি একজন অভিনেতা,—অত ভালও কিছু নয়, একজন প্রবঞ্চক মাত্র। বিবরণীর খানিকটা পাঠ করিলাম, তাহার পর কাগজটা ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, যা অপছন্দ করি তাই, টেরই বা পেলে কি ক'রে? ফোটোই বা নিলে কখন?

যতীন ধীরে ধীরে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, জানি আপনি পাব্লিসিটি পছন্দ করেন না, নইলে এতদিন এই পাড়ায় রয়েছেন, ঘুণাক্ষরেও কি কেউ জানতে পেরেছে যে...আমরা কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আপনাকে একটা অভিনন্দন দোব ঠিক করেছি...না, মত না দিলে শুনব না।

একটি নতুন জগৎ একেবারে! যশ—অপ্রত্যাশিত যশ ;—একটা নবজীবন। একটা চাপা উল্লাসের জোয়ার সত্য-মিথ্যার বিচারকে তৃণখণ্ডের মতই কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তবু চকিতে একটা আত্মসমাহিত নির্লোভ ব্রহ্মণ্যমূর্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—আমার এ যশোলোকেরও বহু ঊর্ধ্বে কোন এক লোকে। কি একটা বেদনা—ক্ষণিক, কিন্তু তীব্র, যশোঘাতীর অনুতাপ।

বলিলাম, না, আমি ওসব একেবারেই পছন্দ কবি না।

সমস্বরে আপত্তি হইল, সে তো জানিই—তবে, আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো। আজ সন্ধ্যেয় আমাদের ক্লাবে...আপনার এই ছবিটা এনলার্জ করিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে এসেছি আর্টিস্টকে।

যাক, বিবেকের কাছে কর্তব্য তো করা হইল। যদি না-ই ছাড়ে এরা তো কি করিতে পারি আমি?

কি রকম যে একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছি!

ঠেলিয়া সামনে আসিল অপর দলের কয়েকজন। চিনি না। একজন অগ্রসর হইয়া বলিল, কাগজে দেখলাম, আপনি আহিরীটোলা ক্লাবের মেম্বার—

বেশ অনুভব করিলাম, আমার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত যেন উঠিয়া গেল এক মুহূর্তে। কপালে কিছু কিছু ঘাম জমিয়া উঠিল। এইবার চোরের যা প্রাপ্য, প্রবঞ্চকের যা পুরস্কার—কিন্তু অদৃষ্ট স্বয়ং যখন একের প্রাপ্য মাল্য অন্যের কণ্ঠলগ্ন করে, তখন আটঘাট বাঁধিয়াই করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন বলিল, কিন্তু আহিরীটোলায় তো মাত্র একটা সুইমিং ক্লাব নয়, এমন অনেক আছে; তবে আমাদের ক্লাবটাই সবচেয়ে প্রাচীন আর রেসপেক্টেব্‌ল। সাতটা রেকর্ড ব্রেক করা আছে আমাদের—আড়াইশো মেম্বার। কিন্তু আমাদের ক্লাবে আপনার নাম না দেখে—

কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলাম, ক্লাবের নামটা আমি ডিস্‌ক্লোজ করতে চাই না, মাফ করবেন।

যতীন সহায় হইল, উনি চান না পাব্লিসিটি, তবে আর শুনছেন কি?...কিন্তু আপনার যা-তা একটা ক্লাবেও প'ড়ে থাকা চলে না শৈলেনদা।

ওদিক হইতে আবার নিবেদন, আমাদের ক্লেমটা আগে...আপনি বরং চলুন একবার আমাদের ক্লাবে একটু সময় ক'রে দেখবেন—

সাতটা রেকর্ড ভাঙিবার স্পর্ধা রাখে, এমন ক্লাবের দিকে পা বাড়াইবার অতটা দুর্বুদ্ধি নিশ্চয় কখনও হইবে না। তাহা হইলে তাহারা এই দুর্বল পা জোড়াটাই কি ছাড়িয়া দিবে? তবুও বলিলাম, আচ্ছা, আপনাদের রুল্‌স রেগুলেশনগুলো দেখাবেন একবার, তবে তারাও কি ছাড়তে চাইবে শীগগির?

কিছু লোক পাতলা হইল, কিন্তু বাড়িল আরও বেশি। পাড়াতেই দুইটা সুইমিং ক্লাব আছে, তিনটে হিতকারিণী সভা আছে। একটু দূরে দূরে আড্ডা, খবর পাইতে একটু দেরি

হইয়াছে বোধ হয়। আসিয়া উপস্থিত হইল। আরও একটু বেলা হইতে আসিল পাঁচজন রিপোর্টার—তিনটি ইংরেজী ও দুইটি বাংলা কাগজের, একেবারে আপ-টু-ডেট, মায় কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়া ক্যামেরা পর্যন্ত ঝোলানো।

যশের সৌধ আকাশ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে—দ্রুত, অব্যর্থ। কিন্তু তাসের সৌধ, একজনের দুটি কথাতেই কি ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে না? উল্লাসের পাশে কোথায় একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিতেছে। যেখানে একটা ক্ষীয়মান শ্রদ্ধা ছিল, সেখানে কি একটা বিদ্বেষের ভাবও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে! না, কোথাও এখনও একটু অনুতাপ রহিয়াছে জাগিয়া!

এমন সময় গলি ঘুরিয়া সাইকেলে অতি ক্ষিপ্রগতিতে মণিমোহন আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি আমার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু, থাকে বৈঠকখানা রোডে।

মণিমোহনের দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্ত। খুব জোরে ঘন্টি দিতে দিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইতেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, কি রকম আছিস? কি ক'রে পড়লি? পিছলে? তোর আবার আস্বাটুকু আছে কিনা, কবিত্ব ক'রে সূর্যাস্ত দেখছিলেন বাবু!

শান্তভাবে বলিলাম, ব'স, কোথায় শুনলি?

স্বয়ং পুরুতমশায়ের কাছে, যিনি বাঁচালেন তোমায়। প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি, তারপর যখন তোর নাম শুনলাম, ইস্তক ঠিকানা সুদ্ধু।

আমার অবস্থা বর্ণনাতীত। শুধু এইটুকু হুঁশ আছে যে, যে মিথ্যাকে কুণ্ঠার প্রশ্রয় দিয়াছি, এবার তাহাকে বুকে হাতে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, না হইলে গঙ্গাগর্ভের চেয়েও অতলে ডুবিলাম। সমস্ত দলটা যেন মন্ত্রবলে নির্বাক হইয়া গিয়াছে। আমি প্রসন্ন অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিলাম, তিনি বললেন তিনিই আমায় বাঁচিয়েছেন? ভাল। কি বললেন একটু শুনিই না, বেশ ইনটারেস্টিং হবে।

সেই ভাবেই চাহিয়া একবার সবার মুখের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঘুরাইয়া আনিলাম। মণিমোহন অতিমাত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, মানে?

আমি ধীরে ধীরে কাগজটা বাড়াইয়া দিলাম এবং সকলেই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মণিমোহনের পরিবর্তিত মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। উপরে কাগজের নামটা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা, মণিমোহন তবুও শেষ করিয়া একবার প্রথম পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া দেখিয়া লইল, ব্লক টাইপে 'সত্যপ্রকাশ' লেখাটা জ্বলজ্বল করিতেছে। মণি ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর চোখ তুলিয়া বলিল, আর স্বচ্ছন্দে আমায় উল্টো বুঝিয়ে দিলে! হয়েছিল সন্দেহ ভাই। তুই ষাট বছরের একটা নড়বড়ে বুড়ো, চালকলা খেয়ে জীবন কাটালি, হোক রোগা, কিন্তু তবুও একটা সমর্থ লোক তো? পারিস তাকে তুই তুলতে? লোকটা যে এরকম, কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি রে!

দলের মধ্যে কে একজন বলিল, কত রকম লোক আর কাণ্ড দুনিয়ায় দেখবেন মশাই। উই লিভ টু লার্‌ন।

একজন রিপোর্টার আগাইয়া আসিয়া কহিল, আমাদের অভিজ্ঞতায় এরকম ঘটে মাঝে মাঝে। যশের লোভ। কি করেন ভদ্রলোক?

মণিমোহন চোখ বড় বড় করিয়া উত্তর করিল, আমাদের কুলগুরু মশাই। থাকেন শিবপুরে। কাল রাত্তিরে—

সমস্ত ভিড়ের মধ্য হইতে একটা গুঞ্জন উঠিল, গুরুঠাকুর!...ফোঁটা-চন্দন!...নো ওয়াণ্ডার।

বুকের কোথায় একটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। মুখের ব্যঙ্গহাস্যটা কিন্তু বেশ সহজভাবেই ধরিয়া রাখিলাম।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

গল্প লেখার আদর্শ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(নম্বর ওয়ান্)

স্থান

হবে সেটা দার্জিলিং কি পুরী—কিম্বা ওয়ালটেয়ার
থাকাটা চাই—সমুদ্র কি ঝর্‌ণা অন্ততঃ পাহাড় ;
বাড়িটে হবে অট্টালিকা—পুষ্পিত নব লতিকা—
বারাণ্ডাতে মারবে উঁকি,—মাধবী সব রইবে ঝুঁকি
"ক্রিসেনথিমাম" ফুট্‌বে টবে,—রইবে লিলির বাহার
শেফালী আর শিশির থাক্‌বে,
তা, যে ঋতুই হোক্ যাহার।

কাল

হবে সেটা বসন্ত—অর্থাৎ ফাল্গুন কি চৈত্র মাস
মৃদু মৃদু মিঠে মিঠে বইবে(ও) মলয় বাতাস,
কোকিল, অন্তত পাপিয়া—ঘন ঘন ডাকিয়া—
নায়ক ও নায়িকার দরকার বুঝে
দুপুর রাত্তিরে সহকার খুঁজে,
বাড়িয়ে দেবে আনন্দ বা হাহুতাশ ;
তাঁদেরও আলবৎ ফেলাটা চাই দীর্ঘশ্বাস।

পাত্র

জননী, তাঁর মেয়ে (অবশ্য ষোড়শী), আর তাঁর পিতা
এ কথাটা নাইবা বল্লুম্ যে মেয়েটি অপরিণীতা ;
হবেন তিনি উর্বশী কি রম্ভা, চুল হবে রেশ্‌মী ও লম্বা ;
অবশ্য কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ,
চক্ষু আকর্ণ, রংটা বিগলিত স্বর্ণ ;
এবং নিশ্চয়ই হতে হবে তাঁকে খুবই উচ্চ শিক্ষিতা—
ইংরাজীতে, আর সঙ্গীতে নৃত্যে ও পিওনোতে সুদীক্ষিতা।

প্রবেশ

পরীক্ষান্তে আসবে সেথা পরেশ কি বিনয়, বি-এটা দিয়া—
পরিবর্তন হেতু, কারণ ধরেচে দুষ্ট ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।
খুড়ো কি জ্যাঠা সেথা প্লীডার—এটা করে রাখা চাই ধাতার।
আলাপ হবে যখন ভ্রমণ,—পরে চা পানের নিমন্ত্রণ,
শেষে বিনয়ের প্রবেশ ও যাতায়াত, ক্রমে চঞ্চল হিয়া,
এবং কথায় কথায় ওঠা চাই—
(একজন খুব কাল হলেও, যদিও তা হতে নেই)
—পরস্পরের মুখানি রাঙিয়া।

আসবাব

ঘরটায় থাকা চাই টেবিল চেয়ার সোফা ও পিওনো,—
উপন্যাস ও কবিতা, যাতে আছে প্রেমের কথা জিওনো,
মাথা ছাড়ার সরঞ্জাম, উৎকৃষ্ট কাগজ আর খাম,
এলবম আর ফুলদানী এবং বিনয়ের ফটোখানি ;
দারিদ্র্য বা কষ্ট এসব সেথায় থাকতে পারে না কোনো
থাকবে কেবল গীত বাদ্য হাস্য,—পাছে—না লাগে মিওনো।
তারপরেতে, জ্যোৎস্না আর প্রভাত অরুণের আলো,—
(রবি চন্দ্রে বলাটা থাকবে, নায়িকার মুখেতে ঢালো)
গবাক্ষ দে' ঢুকে তারা—বিনয়ের কাছে সে চেহারা—
করে তুলবে হৃদয়স্পর্শী—যেন বোয়াল ধরা বর্শী ;
বেসেই ছিল, আরও বিনয় বেসে ফেলবে ভালো,
ক্রমে পত্রাঘাতে সেটা দাঁড়িয়ে যাবে নিবিড় এবং ঘোরালো।

জোটনা

হোকনা কেন (উভয় মধ্যে) একজন ধোপা কি তাঁতি আর একজন রায়
খাঁটি পবিত্র প্রণয় না চেয়েছে, না কারুর মুখ চায়।
অতঃপর, মুহুর্মুহু,—আদমরা করবে কুহু কুহু,
ভুলে, জুতোটা দিয়ে হাতে—পা ঢোকাতে যাবে দস্তানাতে ;
এমন সময়, রেগে নায়িকা হয়ে গেলেও ঢোল্-কানা,
ত্যাজ্যপুত্র হয়ে বিনয়—তারি ' লায় (দেবেই) দেবে মালা।

উপসংহার

এই হবে গল্প লেখার আদর্শ, এবং বিবাহেরও!
তা যদি পারত' ভালই—না হয় ওপথ থেকে ফেরো।
অস্বাভাবিক ও অকস্মাৎ—যেমন চোখের তারায় বজ্রাঘাত
অর্থাৎ অঘটন ঘোটলে তবে প্লটের খোলতাই হবে।
কিম্বা, বিদেশী মাল রং বদলে—তরজমাতেই সেরো,
আর যদি সুসাহিত্য লিখতে যাও ত'— সেটা তোমার গেরো।

সার

বিষয়টা হবে খাঁটি জ্যাঠামী,—আর যে অপরার্ধ
সেটা হবে ভাষার ভেল্কি, কথার কাঁড়ি, আর সাহিত্যের শ্রাদ্ধ।

ভাদ্র ১৩৪০

সোনার পাথর-বাটি

সজনীকান্ত দাস

হায়রে—
'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা',—
বারি নাই একবিন্দু তবু পূর্ণ ঘড়া।
মন নাই মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি,
মাথা নাই মগজের বহরেতে মরি।
পৌরুষ নাহিক তবু দর্প পুরুষের,
বিদ্যা নাই পেটে তবু ফোয়ারা বাক্যের
নিত্য উৎসারিত হয় হাটে মাঠে বাটে,
যে গরু দেয় না দুধ মরি তার চাটে,—
হায়রে!

হায়রে—
বুলির বহরে হয় খুলির বহর—
মায়ের কণ্ঠেতে শোভে বচন-লহর!
মালার ওজনে মার অস্তিত্ব বিকল,
বাকা তত বাড়ে যত বাড়িছে শিকল।
ইংরেজ পাঞ্জাবী উড়ে কাবুলী গুজরাটি,
কাচ্ছি মাড়োয়ারী পার্সী আগুলিছে ঘাঁটি,
খাঁটি মাটি, মুলধন হ'য়ে এল ফাঁক,
শুনিতে উত্তম লাগে মগজের জাঁক—
হায়রে!

হায়রে—
যে গুটি পাকিল, আধা কাঁচিয়া তা যায়,
ধর্ম এসে ঠেকিয়াছে গোবর-ন্যাতায়।
বোমা কেঁচে হ'ল কালী-পূজার আতস,
জেলে গিয়ে বিদ্রোহীর লাগিছে ধাধস।
পূজার মণ্ডপ হ'ল গাঁজার আসর,
রাষ্ট্রে-ধর্মে ক্ষেন্তি হাবি জাগিছে বাসর।
পড়িছে দশের পিঠে বেটনের গুঁতা,
হোটেলে বোতল শুঁকে নেতাদের জুতা—
হায়রে!

হায়রে—
যাহারা তুলিবে মাথা—কাঁদিয়া ভাসায়,
জাগিবে যাহারা তারা কাদায় লুটায়।
যাহারা করিবে কাজ, শিবনেত্র তারা,
ফিরিছে বুকেতে ল'য়ে বিরহ-সাহারা।
মার নামে যে দাঁড়াবে সতেজ নির্ভীক্—
কামাতুর হ'য়ে দেখি ফেরে দশ দিক।
যাহারা আপন পায়ে দাঁড়াবে সবলে,
তাহারা মরিছে ধুঁকে কীটের কবলে—
হায়রে!

বৈশাখ ১৩৩৫

বোমার হিড়িক

শিবরাম চক্রবর্তী

সাইরেন বাজল রে
বাজল আবার!
আবার পড়ল বোমা—
গুদাম সাবাড়!
শোনা ছিল বোমা নাকি ওড়াব সহায়,
বোমা পড়লেই সব কোথা উড়ে যায়—
কিছু রহে কি?
বলব কি, হেথা যেই পড়ল বোমা,
উড়ে গেল কত কি যে, তাই তো ওমা!
মারা গেল যত তার ঢের গেল উড়ে—
তাই তো দেখি!
শুধু কি উড়েই গেল, গেল খোট্টাও,
গুজরাটী, মাড়োয়ারী—সবাই উধাও,
আত্মীয়-পরিজন—হরিজনরাও,
কাবুলীও ফাঁক।
ঘুম গেল উড়ে—সাথে লেপ বিছানা,
সিঁড়ির তলায় হ'ল বৌটুকখানা,
মৌমাছি উড়ে গেল কোন্ ঠিকানা
ফেলে মৌচাক!
আবার বাজল বাঁশী—
বাজল আবার!
রাস্তায় রেষারেষি
ভিড় পালাবার!
নামল আকাশ থেকে
নামল আবার!
মিটে গেল শখ যত
ট্রাম পোড়াবার!
বেমক্কা হাতবোমা কোত্থেকে ভাই,
কার ঘাড়ে এসে পড়ে কিছু ঠিক নাই,
স্বদেশী কিনা!
আসল বোমার যেই আসল হিড়িক,
অমনি কি টের পেল নিজের নিরিখ,
তার চোটে তারাও কি উড়ে গেল ঠিক—
নোটিশ বিনা?

ট্রাম-ভাঙা থেমে গেল এটাই যা সুখ।
কলেরায় সারে যথা পেটের অসুখ,
গেঁটে বাত সেরে যায় পক্ষাঘাতে—
ঠিক সে রকম
উড়ে গেল আমাদের দিশী চুনকাম,
দোকান বাজার হাট উড়ল তামাম—
কোথায় যে উড়ে গেল কোন্ তফাতে
পড়তেই বম!
নামল আকাশ থেকে
সব ওড়াবার—
সন্দেশও নেই—লোক
'আবার খাবার'।
বৃথাই বাজল বাঁশী
বোমার বিলাস!
অমন চাঁদনী রাতে
ওই রাহু গ্রাস!
নামল স্বর্গ হতে নর্ত্তকী যে,
পথে পথে নেই তার গর্ত্ত কি হে
পদচিহ্নের?
ঘর বাড়ি পথ ঘাট সব বেমালুম
ঠিকঠাক! এরই নাম বোমার জুলুম?
মাঝখান থেকে শুধু ভাঙল কি ঘুম?
ভাঙল যে ঢের!
খাঁদা নাক আর দাদা বাধায় না ত্রাস,
জাপানী আমারে ভাই করেছে হতাশ!
নয় এ ঝঞ্ঝাবাত, 'মলয়' বাতাস—
অকথ্য বাত!
গুনগুন রবে অলি জুটবে কি ফের?
কোথায় fool রা আছে পাবে সে কি টের?
ওরা যদি ফেল করে—মোদের পাসের
খারাপ বরাত!
ফের কি বাজবে বাঁশী,
বাজবে আবার?
স্বর্গে মর্ত্ত্যে খুব
হবে কারবার?
শুধাও আমার কথা—
বলি কি রকম!
আমারো বোমার মজা
লেগেছে বিষম!
সাইরেন না বাজলে আসে নাকো ঘুম,
বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুম—দুম—দুম
শুনতে আরাম।

কাছাকাছি যেটা এত মিষ্টি শোনায়,
দূরে গেলে সেটা আরো বাড়ে রসনায়,
শুনবে বেজায় জোর ব'সে পাটনায়—
সেকি ধুমধাম!
যেমন ওদের ভাই মিষ্টি আওয়াজ,
তেমনি কি মোলায়েম তার কারুকাজ।
চোখে যা এলেম দেখে ঘুরে চারদিক—
সুবিধের নয়।
মজবুতমত ভাই একখানা ওর
যুতমত না পড়লে এই ঘাড়ে মোর
ষোলো আনা উপভোগ হচ্ছে না ঠিক—
অতি নিশ্চয়!
ফের কি কাঁদবে বাঁশী
ওঁয়াও-ওঁয়ায়—
আকাশের শিশু হবে
ভূমিষ্ঠ হায়?

মাঘ ১৩৪৯

ভেজালিয়াতি*

সজনীকান্ত দাস

জালিয়াৎ যত কুপোকাৎ হ'ল ভেজালিয়াতির ঠেলাতে ;
সর্বনেশে এ খেলায় সকলে তেলামাথা চায় তেলাতে।
জালিয়াৎ করে টাকা-নোট জাল
অথবা দলিল—পড়ে তার তাল
দু-চার মাথায়, যত হতভাগা ঘাল হয় সেই ঢেলাতে ;
ব্যাপক মরণ হয় না কখনো জালিয়াৎদের খেলাতে।।

জাল ফেলে যারা দিতেছে ভেজাল ময়দা ঘৃত ও তৈলে,
তারা সারাখন হানিছে আঘাত জাতির জীবন-শৈলে।
সকলেরে ধ'রে মারে তারা টান
শহুরে গেঁয়োর বাহিরায় প্রাণ,
দশের বাড়ে না ব্যাঙ্কের পুঁজি লাখো জন নাহি মৈলে,
তেলের ভেজালে তুমি আমি সবে পরিণত হই খইলে।।

খাদ্য-ভেজাল হ'তে ক্রমে ক্রমে ভেজালে ভরিছে বিশ্ব ;
মস্কো হইতে মম্বাসা তক্ ভেজালিয়াতের শিষ্য
সবে তৎপর এই শিক্ষায়
জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রেমে দীক্ষায় ;
শত মণ চালে কাঁকর মিশিয়ে শুধুই করে না বিশ শ',
পেটেতে মারিয়া খুশি নয় শুধু, অন্তরে করে নিঃস্ব।।

দেশভক্তিতে ভেজাল ঢুকেছে শনি ঢোকে সেই রন্ধ্রে,
স্বাধীন জাতির খাতিরের লোক আছেন পরমানন্দে।
পারমিট্ পেয়ে যমদূত যত
মালে ও ওজনে পশিছে নিয়ত,
শকুনি-শেয়াল শেয়াল-কাঁটায় প্রহরে প্রহরে বন্দে ;
ফোলা পায়ে লোকে যত ধোঁকে তত ম'রে যায় বিনা দ্বন্দ্বে।।

নব-মহামারী ভেজালিয়াতিতে ভুগিতেছে সারা দেশটা,
ভুগিছে গোমেস রাম ও রহিম ভোগে ইজিকেল কেষ্টা ;
ফুলিছে চরণ ফুলিতেছে গাল
শিরায় শোণিতে বহিছে ভেজাল

"জাল" হইতে যেমন জালিয়াৎ, জালিয়াতি' "ভেজাল" হইতে তেমনি ভেজালিয়াৎ ভেজালিয়াতি পদ সিদ্ধ।

বুক ধড়ফড় করে দিনরাত অম্বলে বাড়ে তেষ্টা—
বলা-কওয়া নেই হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া যেতেছে শেষটা।।

তাজ্জব মানি যখন দেখি যে মরে না সোনার চাঁদারা,
মরে না বিড়লা মরে না বাঙুর মরে না কাসেম দাদারা।
মরে না নেহরু মরে না প্যাটেল
পায়ে মাখে শুধু খায় না তো তেল
তেল দিই তবু তেল খেয়ে মোরা চক্ষে দেখি যে আঁধারা,
বুদ্ধিমানের নহে এই ব্যাধি, এ ব্যারামে মরে হাঁদারা।।

এবার পূজায় মা-দশভুজায় এই নিবেদন জানাবো—
দেখিয়া শিখিয়া পুরাতন মতে ছুরিও আমরা শানাবো ;
ভেজালিয়াতের ঠ্যাঙে বেঁধে দড়ি
টাঙাইয়া দিব চুলার উপরি
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িবে চর্বি তা দিয়ে দাল্‌দা বানাবো,
বাজারে চালাতে বোম্বে হইতে লেবেল মারিয়ে আনাবো।।

ভেজালের জ্বালা অনেক সয়েছি, দোহাই দুর্গা, রক্ষ,
অনেক লক্ষ উহারা কামালো, মোরা মরিলাম লক্ষ।
কাতরে ধরি মা চরণপ্রান্ত
এবার উহারা দিক্‌ না ক্ষান্ত
খাঁটি খেতে দিয়ে সামলাতে দাও ধড়ফড়-করা বক্ষ,
ভেজালিয়াতেরে অনেক দিলে মা, এইবারে দাও মোক্ষ।।

আশ্বিন ১৩৫৬

পুরানো খাতার পাতা

(১৩২৬)

শ্রী বাঙালীর মেয়ে

খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় একটা নূতন কথার চলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কেরসিন সমস্যা। এ সমস্যাটা কেরসিন তেলের আমদানি কি রপ্তানি কি দরের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যা নয়, এটা হচ্ছে কেরসিন তেলের অপব্যবহার সম্বন্ধীয় একটা সমস্যা। এতকাল ধরে উনানে আগুন দেওয়া এবং হ্যারিকেন লণ্ঠনের পেট ভরানো এই দুইটা কাজেই বাঙালীর সংসারে সচরাচর কেরসিনের ব্যবহার দেখা যেত, কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে মেয়ে মানুষের গায়ে আগুন ধরানো কার্যেও এর ব্যবহার খুব ব্যাপক হয়ে পড়েছে। কোনো একটা জিনিসের নূতন একটা রূপ দেখতে পেলেই মানুষ তার আলোচনা করে থাকে, সুতরাং কেরসিনের এই সংহাররূপের আলোচনাও ঘরে বাইরে খুব চলেছে। আলোচনাটা কয়েক বৎসর ধরেই চলছে, কিন্তু আমাদের দেশের চির চলিত প্রথামত ব্যাপারটা মেয়েদের নিয়ে আলোচনাটা মুখখোলা অথবা ঘোমটাপরা পুরুষেই করে আসছেন। পুরুষ পাঠ্য উপন্যাস বলে কোনো বই আমাদের দেশের কেন কোনো দেশের মেয়েরাই কখনও লেখেননি, কিন্তু পুরুষের লেখনী প্রসূত স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস ও গ্রন্থের ছড়াছড়ি আমাদের দেশেই দেখা যায়। পুরুষমানুষের ঘুঁটে দেওয়া ও মশলা বাঁটা উচিত কিনা এ বিষয়ে কোনো মেয়েকে কখনও মাথা ঘামাতে দেখা যায় না কিন্তু মেয়েদের শেক্ষপীর পড়াটা বেশী কার্যকরী কি রান্না ঘরে গোবর দেওয়া বেশী কার্যকরী এই কথা ভাবতে ভাবতে বড় বড় মহারথীর মাথায় অকালে টাক পড়ে যাচ্ছে। সেই রকম পুড়ে যদিও মরছে মেয়েরা তবুও দুর্ভাগ্যক্রমে পুরুষেরাই তর্ক করছেন মেয়েদের পুড়ে মরা উচিত না আধঝল্সা হয়ে বেঁচে থাকা উচিত। এই ব্যাপারটার থেকে বোঝা যায় যে নিজেদের জীবন মরণের মধ্যে মেয়েরা তেমন একটা রস খুঁজে পান না। মরি কি বাঁচি, গলায় দড়ি দি কি কাপড়ে আগুন ধরাই এ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

পুনা মান্দ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় খুব সম্প্রতি আর একটা কথা নিয়ে আলোচনা চলছে যে মেয়েদের শিক্ষাটা ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গেই বাধ্যতামূলক করা হবে কি আপাতত: বছর তিনেকের মত মেয়েদের ধামাচাপা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ছেলেদেরই ঘসে মেজে মানুষ করে তোলা হবে। গল্প আছে দেবী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের দেহের ওজনের সমান সোনা দান করবেন বলে তুলাদণ্ডের একদিকে শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে আর একদিকে কেবলি সোনা ঢেলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সংসার উজাড় করে সোনা ঢেলেও শ্রীকৃষ্ণের দিকটাই ভারী থেকে গেল। অবশেষে একটি ছোট্ট তুলসী পাতায় কৃষ্ণনাম লিখে সোনার উপর রাখতেই দণ্ডের সেই দিকটা ঝুঁকে পড়ল। কৃষ্ণনামের গুণ স্বয়ং কৃষ্ণের বেশী কিনা জানি না, কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়া নাম যে ঠিক কৃষ্ণের সমান নয় এটা খুব সত্য। তাই বলি মুখে মেয়েদের দেবীই বল আর জগন্মাতাই বল আর স্ত্রী-পুরুষের অধিকার ভেদ নিয়ে দোয়াত কলমই ছোঁড় যতক্ষণ না আসল জিনিসটি ঠিক জায়গায় পড়ছে ততক্ষণ তৌলদাড়ির একদিকটা শূন্যে আর অন্যদিকটা মাটিতে ঠেকে থাকবেই। এক্ষেত্রে একটা শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে পুনা প্রভৃতি জায়গায় বালিকাদের শিক্ষা বিষয়ে মেয়েরাও ভাবতে এবং কিছু বলতে কইতে শুরু করেছেন। কিন্তু

বাংলাদেশের মেয়েরা "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

আমাদের দেশের মেয়েদের মুখ কেন ফোটে না, কেন তাদের হাত পা চলে না, এবং কেনই বা তারা কথায় কথায় গলায় দড়ি দেয় আর কাপড়ে আগুন ধরায় সে সম্বন্ধে মনে অনেক সময়ই প্রশ্ন জাগে। তার যে কয়েকটা উত্তর এবং প্রতিকার দেখতে পাই সেগুলো বলা উচিত মনে করি। সেগুলো যে ধ্রুব সত্য এমন কথা হলপ করে বলা যায় না।

প্রথম বর্ষ / মাঘ ৪/১৩৩১

নেতা*

বঙ্গচন্দ্র সিদ্ধান্ত

জনমেজয় কহিলেন, "হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে কলিযুগে নেতা নামে একপ্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন, পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে কেমন করিয়া উদ্ভূত হইবেন এবং কি কি কার্য করিবেন, শুনিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে নরবর! আমি সেই বিপরীতকর্মা, বাক্যাশ্রুকুশলী নেতাদিগের কথা কহিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই পোশাকী খদ্দর-পরিহিত, স্বধনগোপনকারী ও পরধনসেবী, স্বচ্ছন্দচরিত্র, কর্মবিমুখ ও বক্তৃতাপ্রিয় নেতৃগণের মহিমা কীর্তন করিব, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যাঁহারা দেশবাসীকে সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন করিতে বলিবেন এবং স্বয়ং মোটরকার নামক যান ব্যতীত ভ্রমণ করিতে অক্ষম হইবেন, যাঁহারা পরমতসহিষ্ণু হইবার জন্য বারংবার অনুজ্ঞা প্রচার করিবেন এবং নিজমতবিরুদ্ধ কথার উল্লেখমাত্রে অসহিষ্ণু হইবেন, যাঁহারা শক্তের ভক্ত ও নরমের যম হইবেন, সত্যে অন্ধ ও মিথ্যায় সতত জাগ্রত থাকিবেন তাঁহারাই নেতা। যাঁহারা একাধারে অধ্যয়ন না করিয়াও পণ্ডিত হইবেন, কবিতা না লিখিয়াও কবি হইবেন, আচরণ না করিয়াও ধার্মিক হইবেন এবং সংবাদ না জানিয়াও তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাঁহারাই নেত.। যাঁহারা নিরন্তর চৌর্য ও জালিয়াতি করিয়াও, অগণিত পরদার গমন করিয়াও ও সদা মিথ্যাবাক্য কহিয়াও মনুষ্যলোকে পূজিত হইবেন, তাঁহারাই নেতা!

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, নারীনির্যাতন প্রভৃতির জন্য চাঁদা তুলিতে হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে নেতা জন্মিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যখনই শ্রমিকেরা শ্রমবিমুখ, কর্মীরা কর্মবিমুখ, ছাত্রেরা পাঠবিমুখ ও নারীরা অন্তঃপুরবিমুখ হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে নেতা জন্মিবার সময় আসিয়াছে।

হে মহীপতে! যেখানে সহস্র ব্যক্তি থাকিবে সেখানে একজন নেতার জন্ম হইবে। যেখানে লক্ষাধিক ব্যক্তি বাস করিবে সেখানে একাধিক নেতার উদ্ভব হইবে। যেখানে কোটি কোটি লোক বিদ্যমান সেখানে নেতৃসংঘ বা পার্টি নামক অন্ধকার গুহান্তরালে একসঙ্গে বহুতর নেতা জন্মপরিগ্রহ করিবেন। যাবৎ পরস্পরে সংঘর্ষ বাধিবে না, অর্থাৎ পরস্পরের প্রাপ্য সম্বন্ধে পরস্পরের এবং সকলের সম্মিলিত সম্মতি থাকিবে, তাবৎ সংঘ অটুট থাকিবে। বিরোধ বাধিলেই মাতৃস্বসৃসুত-সম্পর্কীয় নেতারা পৃথক হইয়া পৃথক সংঘ স্থাপন করিবেন এবং সংঘে সংঘে বা পার্টিতে-পার্টিতে কলহ, কটূক্তিবর্ষণ এমন কি, প্রহারাদিও হইবে। কিন্তু সকল সময়েই গৌরীসেন নামক জনসাধারণের মস্তকে কাঁঠাল নামক সুখাদ্য ফল ভাঙ্গিয়া খাইবার অধিকার ও নৈপুণ্যই তাঁহাদের সকলকে সাধারণভাবে নেতৃসংজ্ঞায় সূচিত করিবে।

হে লোকনাথ! নেতারা গৌণতঃ ভারতবর্ষে ও মুখ্যতঃ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইবেন। ইহাদিগের মধ্যে আবার অনেকেই কলিকাতা নামক শহরপল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ নেতাদিগের এলাকা হইলেও ইঁহারা নিজ নিজ জুরিস্‌ডিক্‌শন্

* শ্রীকবিরঞ্জন সারণি প্রেরিত বঙ্গচন্দ্র সিদ্ধান্তের রচনাবলী হইতে। বঙ্গচন্দ্রের লেখার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত প্রভাব লক্ষিত হয়। বঙ্গচন্দ্রের আরও লেখা আমরা ভবিষ্যতে পাঠককে উপহার দিব। সং. শং. চিঃ

ভাগ করিয়া লইবেন। এক প্রদেশের নেতা অন্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবেন না। ইঁহাদিগকে সাক্ষাতে নেতা বলিয়া সম্বোধন করিলে আনন্দিত হইবেন এবং একের সম্মুখে অপরকে নেতা বলিয়া উল্লেখ করিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, এমন কি 'ব্লাড্-প্রেশার' নামক ব্যাধিও দেখা দিবে।

হে মহারাজ! নেতৃগণ বক্তৃতামঞ্চ নামক উচ্চ ভূমিতে ভূমিষ্ঠ (মঞ্চস্থ) হইবেন। এবং ইঁহাদিগের তিন অবস্থা ঘটিবে। প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ একবার কারাগারে যাইতে হইবে; দ্বিতীয় অবস্থায় কারাগার হইতে বাহির হইয়া গৌরীসেনের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুখে বাস করিবেন; তৃতীয় অবস্থায় স্কন্ধে থাকিয়াই দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে সফরে বাহির হইবেন।

হে পুরুষোত্তম—যাঁহারা কায়ে, মনে ও বাক্যে দেশের সেবা করিবেন এবং স্বয়ং উপার্জন করিয়া অন্ন গ্রহণ করিবেন তাঁহারা অধম নেতা; যাঁহারা মনে ও বাক্যে দেশসেবা করিবেন এবং কখনও উপার্জন করিবেন, কখনও করিবেন না, তাঁহারা মধ্যম; যাঁহারা বাক্যমাত্র আশ্রয় করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন এবং জীবিকা উপার্জন না করিয়া বা নামমাত্র করিয়া নেতৃত্বকেই মুখ্যপেশারূপে গ্রহণ করিবেন তাঁহারাই উত্তম নেতা।

হে নরেশ! দেশের সকল ভূত অনুচর হইবেন বলিয়া নেতারা ভূতনাথ। তাঁহাদের মস্তিষ্কে ক্ষিতি, নেত্রে বারি, মুখে তেজঃ, চরণে বায়ু এবং সর্ব দেহে ব্যোম বিরাজ করিবেন। জিলাপীনামক মিষ্টান্নতুল্য এবং সুদর্শন অপেক্ষাও জটিল চক্রে চক্রী হইবেন বলিয়া ইঁহারা চক্রধারী। এবং ব্রহ্মে আকার দান করিয়া পৃথগ্‌ভূত করিবেন বলিয়া ইঁহারা ব্রহ্মা।

হে নরাধিপ! নেতার দশ অবতার—ছাত্র, নারী, তরুণ, স্বরাজী, ব্রাহ্মণ, বিদ্রোহী-কবি, সংবাদ পত্রের সম্পাদক, বার-মেম্বর ও শ্রীখোকা-ভগবান্। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র বার-মেম্বরই যুগ্মাবতার। ইনি দুমুখো হইবেন—এক মুখে ব্যারিস্টার, অন্য মুখে সেনেটের মেম্বর, এক মুখে স্বদেশী কাগজের মালিক হইবেন অপর মুখে বিদেশী বিজ্ঞাপনের মালাকার হইবেন এক মুখ বারে অর্থাৎ বোতলে সংলগ্ন থাকিবে, অপর মুখ মেম সাহেবকে বরণ করিবে অর্থাৎ বিলাতকে প্রিয়ারূপে হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। লীলাময় শ্রীখোকা-ভগবান্ নেতার পূর্ণাবতার রূপে প্রকট হইবেন। ইঁহার লীলাখেলার ধারণা মনুষ্যলোকের অতীতে হইবে।

হে জনরঞ্জন! ছাত্র-অবতারে নেতা বিদ্যাকে বধ করিবেন, নারী-অবতারে লজ্জাকে, তরুণ-অবতারে শ্রীকে, স্বরাজী-অবতারে শক্তিকে, বাবাজী-অবতারে বিধবাকে, ব্রাহ্মণ-অবতারে মনুষ্যত্বকে, বিদ্রোহী-কবি-অবতারে রমণীকুলকে, সংবাদ-পত্রের-সম্পাদক-অবতারে সত্যকে, বার-মেম্বর-অবতারে বুদ্ধিকে এবং শ্রীখোকা-ভগবান্-অবতারে সমগ্র জাতিকে বধ করিবেন।

হে ভূপপ্রধান! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যিনি অনুচরের নিকটে হাস্য করিবেন, প্রবলের নিকট ক্রন্দন করিবেন, দুর্বলের নিকট তর্জন করিবেন, পাওনাদারের নিকট গর্জন করিবেন, পরনারীর ইঙ্গিতে নর্তন-কুর্দন করিবেন এবং প্লাটফরম নামক মঞ্চে আরোহণ করিলে যুগপৎ সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন করিবেন তিনিই নেতা। যিনি স্বার্থের উদ্দেশ্যে অর্থসঞ্চয় করিবেন, অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ফণ্ড তুলিবেন, ফণ্ডের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করিবেন, আন্দোলনের উদ্দেশ্যে মিথ্যাপ্রচার করিবেন এবং মিথ্যাপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন তিনিই নেতা। যিনি ভোটারকে ঘুষ দিয়া ভোট সংগ্রহ করিবেন, পতিকে মাহিনা দিয়া সতী সংগ্রহ করিবেন, এবং শরণাগতকে চাপ দিয়া মদ্য ও উপপত্নী সংগ্রহ করিবেন তিনি নেতা।

হে ক্ষিতিপাল! যাঁহারা ফিরিঙ্গী নামক জাতির ভাষায় শপথ করিয়া তাহাদিগকেই গালি পাড়িবেন, তৎপ্রবর্তিত প্রণালীতে তাহাদিগেরই বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন, তন্নাম-ব্যাধিকে শরীরে ধারণ করিয়া তাহাদিগেরই প্রস্তুত ৬০৬ গুণ-সম্পন্ন ঔষধিসেবনে ব্যাধিমুক্ত হইবার প্রয়াস পাইবেন তাঁহারাই নেতা। ইঁহাদের বল আপোষে বা প্যাক্টে, বুদ্ধি টিকিতে বা ফেজে

ও ভরসা ফতোয়ায় বা আপীলে। নেতৃগণ পরের দ্রব্য আত্মবৎ, নিখিল ভূতকে লোষ্ট্রবৎ এবং পরের মাতাকে দারবৎ প্রত্যক্ষ করিবেন।

হে সৌম্য! ইঁহারা নিজগৃহে পায়জামা ও সভাগৃহে খদ্দরের পাঞ্জাবি পরিয়া, মুখে চুরুট ও হস্তে লাল গেলাস লইয়া চিন্তা করিবেন যে 'আমরা বাক্য ও প্রতিজ্ঞা দ্বারা, সভা ও পার্টির দ্বারা, ফাঁকি ও চালাকির দ্বারা ভারত উদ্ধার করিব।'

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! অনেক শুনিয়াছি। অধুনা আপনি দয়া করিয়া প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করুন।

শ্রাবণ ১৩৩৫

শেষ মহাসঙ্গীতি

শ্রীমহাকাশ্যপ

উৎসব-সন্ধ্যা * * *

অভিনববাবু প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। বন্ধুগোষ্ঠীতে নিমন্ত্রণ চিঠি সকাল-বেলায়ই পাঠাইয়া দিয়াছেন, বান্ধবীসমাজও অবশ্যই বাদ যান নাই।—

"নব-যুগের তরুণ-সখা, তরুণী-সখী,—

আমার ঘরে এ সন্ধ্যায় যুগ-দেবতার বেদি সাজাতে তোমাদের প্রাণের প্রদীপ ক'টির শিখা আজ ধরবে, তোমাদের এ নিমন্ত্রণ রইল।—গত যুগকে তোমরা ওই পিছনের পথটার ওপরে ফেলে দিয়ে এসো,—আমার এই এঁদো থুত্থুরো বাড়ির স্যাঁৎসেঁতে মেঝেয় যুগের জোয়ার উছলে উঠবে। বাইরের দুনিয়ায় আজ আমাদের প্রাণের প্রকাশকে স্বরূপ দেওয়ার পথে গত-যুগের দানব-দস্যু যে বাধা সৃষ্টি করছে, এই ঘরে তার কোনো অধিকার স্বীকার করবার পরোয়ানা নেই। ওগো তরুণ, ওগো তরুণী, তরুণ প্রাণের অবারিত স্বপ্নকে আপনার বেশে সম্পন্ন ক'রে আমারই ঘরে আজকের সন্ধ্যার উৎসবে তোমরা ফুটে উঠবে,—এই লিপি সেই মিনতিই জানাচ্ছে। ইতি"

অভিনববাবু তখনও লৌকিকরূপ ত্যাগ করেন নাই। বন্ধুগোষ্ঠী আসিলেই ঈপ্সিত মূর্তি ধারণ করিবেন এই ইচ্ছা। কিন্তু তিনি অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন,—কৈ, এখনো তো কেহ আসিতেছে না!

মনে হইল বাহিরে যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ হইল। তিনি উৎকর্ণ হইলেন,—কচিকারা কেহ গাড়িতে আসিলেন বুঝি। দরজায় শব্দ হইতেই তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া খুলিতে খুলিতে অত্যন্ত স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,

"নমস্কার! নমস্কার! আপনাদের পদ্মের মত পা দুটির কামনায় আমাদের উৎসব-ভূমিটুকু ঠোঁট উঁচিয়ে—"

ব্যস, কথা শেষ হইল না। অভিনববাবুর ধনুকের মত বাঁকা দেহটি একেবারে লাঠির মত খাড়া হইয়া উঠিল। "বাপ্"—

একলাফে পিছনের সাত হাত দূরের দেয়ালটায় মাথা ঠুকিয়া বসিয়া পড়িলেন।

খট্ খট্ খট্—একেবারে আস্ত ঘোড়া!

ঘোড়াটা ঘরে ঢুকিয়া পিছনের পা দিয়া দরজাটা চাট মারিয়া বন্ধ করিল। অভিনববাবুর গলা শুকাইয়া গেল!

"চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ —"

অভিনববাবু ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "হি-হি-হি—"

"গুড় ইভ্‌নিং, ওল্ড্ বয়।"

"ওঃ! তুমি! তা—তা—এ কি রকম?"

"কি রকম আবার? এই তো স্বরূপ।"

"মানে?"

"আমার স্বরূপ, তথা বর্তমান সাহিত্যের স্বরূপ। তরুণ তুরগ—তাতারী তুরগ আমি হে আজিকে—তুরঙ্গিনী আজ বাগ্‌বাণী।"

অভিনববাবু অর্থ বুঝিলেন না। বলিলেন, "সত্য বটে এ যুগ গতিরই যুগ, তুমিও সত্যই

যেন কোনো লাগামের ফাঁস গলায় না প'রে ছুটছ। সাহিত্যও তুরঙ্গিণীই বটে যে ভাবে তাকে আমাদের রথের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি!"

"আমি তা বলছি নে। সাহিত্য যে বস্তি ও আঁস্তাকুড়ের—এটা দশ বছরের পুরনো কথা। আজ সাহিত্য কোথায় জানো? একদম আস্তাবলে। দেহে, মনে, প্রাণে আজকের সাহিত্যিক হবেন তরুণ তুরগ।"

অভিনববাবু কথাটা এতক্ষণে বুঝিলেন। বলিলেন, "ঠিক বলেছ। কিন্তু এ কথা ওরা সবাই মানে না।"

"ব'য়ে গেছে না মানলে। যাক্ গে, আসল জিনিস কই—আই মিন্ তোমার সঙ্গিনীরা?"

"এখনই আসবেন।"

"রাইট্ও! যাক্, একটা সিগারেট দাও।"

সিগারেট বাহির করিয়া দিলেন।

একটু পরেই দরজার কড়া নড়িল। অভিনববাবু উঠিয়া দরজা খুলিতে গেলেন। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ হয় নাই, ভাবিলেন, হয়ত কচিকারা কেহ নহেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল, এই সংসদের 'কচিকারা' অভিসারিকার মত নগ্নপদেও আসিতে পারেন, আবার এমন কি রোল্‌স্-রয়েসেও নিঃশব্দে আসিয়া সারপ্রাইজ করিতে পারেন; এসব অভ্যাস তাঁহাদের আছে। তাই, যথাসম্ভব স্মিতমুখে দরজাটা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আসুন! আসুন!"

অভিনববাবু এবার আর পিছাইয়া গেলেন না বটে, কিন্তু একটু বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। এ আবার কি! চোখে তো দেখিতেছি কচি-কবির সোনার চশমা-জোড়া!

একটি কালো কুচ্‌কুচে ছাগ ঘরে ঢুকিল। অভিনববাবু তাহার পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন, "কে ও?"

এক পাক নাচিয়া ছাগটি কহিল, "অঃ বন্ধু, গ্রেট্ গড্ প্যান্।"

"কিন্তু, এই রূপে—"

"জাত-কবি না হ'লে প্যান্-এর মর্যাদা বুঝবে না।"

"তুমি তো সম্প্রতি-কথা-সাহিত্যেই—"

"জাবর কাটছি, না? ওগুলো চিবিয়ে দেখলে পাবে কাব্যি-রস। আমি জাত-কবি। আমার কাছে দুনিয়াটাই কাব্যিময়, যেন কচি ঘাস,—'খেটেল মজুর' থেকে 'বেঁটেল ছুঁড়ি' ও গোঠেল গয়লানী পর্যন্ত।"

অভিনববাবু হাস্যমুখে বলিলেন, "তা ঠিক; জীবনের সমস্ত জিনিসেই তুমি কবিতা খুঁজে পাও বটে।"

তরুণ তুরগ কথা কহিল, "আমি মানি নে। জীবন হচ্ছে আদিরসের চিনির রসে ডোবানো।"

প্যান বসিয়া সিগারেট খাইতে লাগিল। কচিকারা আসেন নাই দেখিয়া তরুণ তুরগ, প্যান ও অভিনববাবু অধৈর্য হইয়া উঠিলেন।

আবার শব্দ হইল। অভিনববাবুই দরজা খুলিলেন;—এবার আর পূর্বেই স্বাগত-সম্ভাষণ করিলেন না; কিন্তু পরে করিবার সময়ও পাইলেন না। এক লম্ফে একটি বানর ঘরে ঢুকিয়া দুই লাফে একেবারে প্যান ও তরুণ-তুরগের সঙ্গে গিয়া জুটিল। হাঁ, ক্ষ্যামতা আছে বটে!

অভিনববাবু কহিলেন, "তুমি কে হে এমন প্রমিসিং?"

মুখ খিঁচাইয়া বানরটি কহিল, "আদি-মানব এবং ভাবী-সাহিত্যিক।" অভিনববাবু ঠিক বুঝিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। তখন বানরটি কহিল, "বুঝলে না? আদি-মানব কি ছিল জানো তো? আর আদিম নিয়েই ভাবী-সাহিত্য তা মানো তো?"

তরুণ তুরগ কহিল, "তা বটে,—আদিরসেই সাহিত্যের অন্ত্য ও অনন্ত উপকরণ। তবে শাখামৃগ হয়ে কোনো লাভ নেই। সাহিত্য আর ওপরে উড়ছে না, গাছেও চড়ছে না। তার

দৃষ্টি খাঁটি মাটিতে।"

আদি-মানব মুখ খিঁচাইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তর্ক করি নে। যাও! যাও!" তরুণ তুরগ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, "তর্ক আমিও করি নে। দরকার হ'লে চাট মারি।" অভিনববাবু আদি-মানবের গায়ে ও তরুণ তুরগের খুরে হাত বুলাইয়া শান্ত করিলেন।

আবার শব্দ হইল এবং দরজা খুলিতেই একটি সারমেয় ঘরে ঢুকিল। কচির দলের সেও দেখা গেল একটি পাণ্ডা, এবং ভাবী-সাহিত্যের কাণ্ডারী; কারণ, ভাবী-সাহিত্য যে আঁস্তাকুড়েতেই থাকিবে। তারপরে আসিলেন দু'জন মহা-সং—মহামহোপাধ্যায় আচার্য বিড়াল-তপস্বী যিনি বহুকাল বহুশাস্ত্র চিবাইয়া খাইয়া গোমতী-তীরে চান্দ্রায়ণ ব্রতের সঙ্গে কাব্য-কণ্ডুয়নব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মহামহোপাধ্যায় আচার্য বক-ধার্মিক, ন্যায়শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যে, নব-সাহিত্যের ধর্মাধর্ম বিচারে যাঁহার খ্যাতি অন্য কেহ না জানিলেও তিনি নিজে খুব জানেন। কিন্তু, কচির মহলে দ্বিপদের আদর নাই, পদবৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া বক-ধার্মিক গুরুর আসন পান নাই। সে-আসন বিড়াল-তপস্বীর ভাগ্যে জুটিল। ইনি সাহিত্যিক নহেন, তবে সাহিত্যের অস্থি চিবাইয়া রস-গ্রহণে ওস্তাদ, এবং কচি ছাগ-সাহিত্যের অস্থি তাঁহার বিশেষ প্রিয়। তাই, কচির আসরে তাঁহার বিশেষ প্রভাব।

সর্বশেষে শিং নাড়িয়া অভিনববাবুকে তাড়া করিয়া একটি বলীবর্দ ঘরে ঢুকিল। ভাবী সাহিত্য তো বিদ্রোহেরই সাহিত্য, তাই তাহার এই রূপ, এই আচরণ।

গুরু-শিষ্য সংবাদ * * *

অভিনববাবু এক একে সকলের সঙ্গে আচার্যদ্বয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। আচার্য বিড়ালতপস্বী তাহাদের মধুর বচনে তুষ্ট করিলেন; সকলেই কহিল যে বর্তমান ও ভাবী-সাহিত্যের এলেকাটা তাহারই। তরুণ-তুরগের সঙ্গে আদিমানব শাখামৃগটির এতক্ষণ একটু মনকষাকষি ছিল।—এই সময়ে গুরুর নিকটে পরিচিত হইতে হইতে নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সত্য সত্যই সে শাখামৃগটিকে একটি চাট মারিয়া বসিল। সেও কিচির-মিচির করিয়া এক লাফে তাহার কাঁধে চড়িয়া আঁচড় কাটিতে শুরু করিয়া দিল। অভিনববাবু তাহাকে অতি কষ্টে নিজের কাঁধে আনিয়া বসাইয়া কহিলেন,

"আচার্যদেব, এই কঠোর সমস্যা আপনাকেই সমাধান করতে হবে। বর্তমান সাহিত্য কিরূপ,—ভাবী-সাহিত্যই বা কি,—আপনি মীমাংসা-শাস্ত্রের সহায়ে আমাদের উপদেশ দিন?

আচার্য বিড়ালতপস্বী মিঁও-মিঁও করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাদের কলহের কারণ নেই। সাহিত্য একটা সাধনা,—না, না, একটা খেলা,—কিম্বা কলা—"

সোৎসাহে শাখামৃগ কহিল, "হ্যাঁ, কলা। তাই সাহিত্যিক মাত্রই শাখামৃগী—"

বিড়াল-তপস্বী কহিলেন, "ঠিক তা নয়। আচ্ছা, বরং বলি সাহিত্য একটা সাধনা (কথাটা অবিশ্যি নিতান্ত সেকেলে, তবু আর কিছু না পেয়ে ওটাই ব্যবহার করছি); তবে যান ও মার্গভেদ আছে। যথা,—মহাযান ও হীনযান, আর—অশ্বমার্গ, ছাগমার্গ, কুক্কুরমার্গ, বানরমার্গ—"

আচার্য বক যোগ করিলেন, "বকমার্গ—"

আচার্য বিড়াল তাঁহার দিকে একবার তীক্ষ্ণ চোখে চাহিয়া কহিলেন,—"দ্বিপদের সাধন-পথকে আমি প্রশস্ত করি না। তাহা হীনযানের অন্তর্গত। হীনযানের মধ্যে অবশ্য মনুষ্যমার্গ অপেক্ষা বকমার্গ উঁচুদরের; তোমরা তথাপি স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম আশ্রয় করো না।"

কচিরা সবাই পরিতুষ্ট হইল এবং আচার্য বিড়াল তাহাদের সস্নেহে আশীর্বাদ করিলেন।—বলীবর্দকে কহিলেন, 'অনুপ্রাসিনি সন্দর্ভে গোনন্দনঃ সমঃ কুতঃ', শাখামৃগকে কহিলেন, 'ত্রেতাযুগ থেকে তোমার জয়জয়কার,' প্যান্‌কে কহিলেন, 'লক্ষযুগের তপস্যায় তোমার জন্ম। দক্ষের রূপ ছিল অপূর্ণ। দক্ষ পেয়েছিলেন শুধু মুণ্ড,—তুমি একেবারে পা থেকে লাঙ্গুল পর্যন্ত সম্পূর্ণ," সারমেয়কে কহিলেন, "তোমার গীতে কি শক্তি," তরুণ তুরগকে কহিলেন,

"তোমারই সাধনায় স্বর্গের উর্বশী ঘোটকীরূপ গ্রহণ করেছিলেন।"

সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কিন্তু, এদিকে অভিনববাবুর চিন্তার শেষ নাই। একি হইল! কচিকারা কেহ আসিল না যে! একটা মিক্স্‌ড্‌ নাচ হইবে, কথা ছিল। আচার্য উপস্থিত। নাচ হইবে কাহাকে লইয়া?

তরুণ তুরগ চটিয়া চাট মারিতেছিল। শাখামৃগ রীতিমত মুখভঙ্গী করিয়া হতাশা ব্যক্ত করিতেছিল। প্যান্‌ কচিকাদের হৃদয়কে বাঁশী করিয়া বাজাইতে ওস্তাদ বলিয়া দম্ভ করে, আজ কাহাকেও না দেখিয়া অভিনবের উপর দোষ চাপাইল। বলীবর্দ শিং নাড়িয়া কহিল, "কাগজে একটা প্যারা বের ক'রে 'আমি থাকব' লিখলে দেখতে! ঘরে জায়গা হ'ত না।"

অভিনববাবু কহিলেন, "এখন উপায়? ফূর্তিটা মাটি হবে? আমার ঘরে ঝি পটলমণি আছে। তাকে আজ আমি সরস্বতী সাজিয়ে পূজা করেছি, আমি তাকে পট্‌লি-বাণী বলি,—সে আমার সমস্ত সাহিত্য প্রেরণার মূল কিনা—"

প্যান্‌ কহিল, "আমাদেরই বা কম কি?"

অভিনববাবু কহিলেন, "তাকে আনব কি?—তবে সরস্বতীর পোশাক-পরা।"

সকলে একবাক্যে সমর্থন করিল। বলীবর্দ কহিল, "তা আনো, আমিও একটু ঘুরে আসছি। নিশ্চয় দু'চারটি দেখবে পিছনে পিছনে চ'লে এসেছে।"

বলীবর্দ বাহির হইয়া গেল। প্যান্‌ কহিল, "আমি একবার বেরুলে দু-চারশ' জুটিয়ে আনতে পারি; তবে এখানে পট্‌লির প্রতি আমার একটা অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে কি না,—তাই।"

আচার্যদ্বয় এতক্ষণ মৃদু গুঞ্জন করিতেছিলেন। এবার অভিনববাবুকে বলিলেন, "আমরা আসি; তোমাদের উৎসব পূর্ণাঙ্গ হোক।"

"সে কি! নাচ রয়েছে যে।—সেইটেই তো আসল উৎসব।"

আচার্যদ্বয় অনেক কষ্টে বুঝাইয়া সুঝাইয়া আর একবার বর্তমান সাহিত্যকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন।

পট্‌লি-বাণী! * * *

কিছুক্ষণ পরে পট্‌লিকে লইয়া অভিনববাবু ঘরে ঢুকিলেন। অভিনববাবু এবার নিজের সাজ পরিয়া আসিয়াছেন,—খ্যাঁক-শিয়ালী। চোরাবাজারের কেনা সর্টস্কার্ট ও জাম্পারে অভিনব সরস্বতীরূপিনী পটলমণিকে অতি সুন্দর মানাইয়াছিল। নূতন হাই-হিল জুতায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পট্‌লি ঘরে ঢুকিতেই একটা হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

তরুণ তুরগ অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যায় তুমিই আমার জুরী? কেমন?"

শাখামৃগ কহিল, "ছিঃ! তুমি ওই ছ্যাক্‌রা গাড়ির ড্যাক্‌রাটার সঙ্গে কেন যাবে?—তুমি আমার সঙ্গেই আজ নাচবে, কেমন?" বলিয়াই সে কবিতা বলিয়া ফেলিল,

"নদী-জাঙ্গাল বনে ছুঁড়ি-কাঙাল ফিরি—
গাছ থেকে গাছে, আর ছাদ থেকে ছাদে।
কামরাঙ্গার ডালে শৃঙ্গার-অভিসারে
কারে খুঁজে শুচি ব্যথা, কার তরে কাঁদে?
কুড়ি বছরের এই প্রাণের কুঁড়িটি,
'সড়কে'-গড়ানো এ-হিয়া নুড়িটি;—
কে কুড়াবে, সই, কে কুড়াবে তুমি বাদে?"

সারমেয় অগ্রসর হইয়া কহিল,

"যা, যা, বাঁদর-নাচ নাচতে ওর মত মহীয়সী নারীর সাধ যাবে না। তুমি, এসো, হে প্রেয়সী" বলিয়াই তিনি একেবারে অসম-ছন্দে কবিতা বলিলেন,

"মোর ব্যথা অফুরন্ত, অসীম অপার—

কামনা আমার অতল, নিবিড়, দুর্জয়, অনিবার—
কোন্ অনাগত কালে শুধায়েছে তোমা প্রিয়া
সীমাহারা নীহারিকা মাঝে লইবে কি প্রাণখানি উপহার?"
কালশেষে বাসনা আমার
অন্তর-অনল-তাপে হবে কাঁচা সোনা,
বলিবে চাহিয়া তব মুখ-পানে হে চির-উর্বশী,—
"লয়েছিলে প্রাণখানি তুমি মোর, হে প্রেয়সী।"

প্যান্ ধিন্ ধিন্ করিয়া লাফাইয়া বলিল,

"কাম-কাননের অজপতি আমি ঘাসে ঘাসে ঘুরি—
রতি-মদনের বদন চুমিয়া রভস-আবেশে ঝুরি।—
বাসা বাঁধিবার আশা ছাড়ি উঠি—
'খোসা-উঠা' মুখে মধুটুকু লুটি,
আধ-ভিজা ঠোঁট মুছিবারে ছুটি
আধফোটা বুকে; ফুটাইয়া দিই নখ-'কাম কুঁড়ি'।"

অভিনব কহিল, "আচ্ছা নাচ যাহাদের সঙ্গে হয় নেচো। এখন আমার সঙ্গে একটু শাম্পেন খাবে, এসো।—তোমার ঠোঁটটি ছুঁইয়ে দাও।"

তরুণ তুরগ—"ছো, শাম্পেন!" হঠাৎ একটি বোতল বাহির করিয়া বলিল, "আস্ত হুইস্কি—ফর ইওর লিপ্স ডিয়ারী এণ্ড মাইন্।"

শাখামৃগ কহিল, "না, না, ওসব ছেড়ে দাও। দিশী ভাঁটি থেকে চোঁয়ানো কিছু সুধা আমি দূর থেকে এনেছি। তোমার ঠোঁটেই আগে ছোঁয়াও, পরে আমি।"

সারমেয় কহিল, "দ্যাখো, আমাদের ওদিকে প্রোহিবিশন, তবু স্মাগ্‌ল করেছি তোমার জন্যে। এসো।"

প্যান্ উচ্চ হাস্যে বোতল বাহির করিয়া বলিল, "এ আসল রাসান্ ভোড্‌কা। তোমার ঠোঁটে আগে ছোঁয়াও; আমি তারপর তোমার ঠোঁট থেকেই পান করব।"

পট্‌লির সবাই চেনা—অনেক দিনের। সে মুচকিয়া হাসিতে লাগিল।

খ্যাঁক-শিয়ালী অভিনববাবু কহিলেন, "না গো প্রিয়া, তুমি আমার সঙ্গে ফক্‌স্‌ট্রট্ নাচবে।"

তরুণ তুরগ কহিল, "না, তুমি আমার সঙ্গে ভাইস্‌রয়েস্ কাপে পাল্লা দেবে।—চলো, এখনই তোমার ট্রট গুণে নিই। কিম্বা এসো আমি তোমাকে পল্কা শেখাব।"

শাখামৃগ কহিল, "আমি তোমায় নতুন নাচ শেখাব—ডালেডালে নাচ। কিম্বা এসো টেঙ্গো।"

প্যান্ কহিল, "আমি বাটারফ্লাই নাচ জানি, শিখবে? না থাক, আজ তোমাকে রাশান্ মাজুরকা নাচ শেখাব।"

সারমেয় কহিল, "ও সব থাক, আমি তোমাকে টিবেটান ডেভিল ডান্স শিখাই, এসো।"

ঠিক এমনি সময়ে কাহাকে তাড়া করিয়া বলীবর্দ ঘরে ঢুকিল।—আগে আগে যিনি আসিলেন আবেগে তাঁহার বেশবাস বেসামাল হইয়া পড়ে আর কি! কবরী তো শিথিল হইয়া গিয়াছেই।

সদর্পে বলীবর্দ কহিল, "মুরদ দ্যাখ্, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হাজির হ'ল কি না! কালীতলার মোড়ে দেখা—নমস্কার করছেন। পিছনের এই কেশপাশ, বেশ ঘাড়টি!—সেই বুড়ো কবিটা বলেছিল,—'যেন একটা মশাল।' পিছু নিলুম। এখানে আসতেই একবার সামনে গিয়ে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালুম। তারপর বুঝতেই পার, গলাটি জড়িয়ে ধরলেন। অমনি মাথা নেড়ে দেখিয়ে দিলুম এই ঘর। আগেই এসে উনি ঢুকলেন—পিছনে আমি।"

সকলে যতক্ষণ কথা শুনিতেছিল, শ্রীমতী পট্‌লি তখন ক্ষুব্ধ চিত্তে অগ্রসর হইয়া এই নতুন 'কচিকাটিকে' দেখিতেছিল। বলীবর্দের বক্তব্য শুনিবার অবসর শাখামৃগটির ছিল না;—

সে এই নবাগতার বেশবাস ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। নবাগতা এক কোণে আশ্রয় লইয়া হৃদয়াবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে বসন-ভূষণ সামলাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।—শাখামৃগের টানে হঠাৎ কাপড় একটু সরিয়া গেল, পট্‌লি সবিস্ময়ে পিছাইয়া গিয়া কহিল, "আঁ! জগড়নাথ!"

"তো পটলি! এমন পোশাক কাহেরে? মুই তোর কাছে আসিল যে—"

একেবারে পট্‌লির গলা জড়াইয়া ধরিল। পট্‌লি তড়াক্ করিয়া হাত ছাড়াইয়া বলিল, "ছাড়্, ডাকরা, ছাড়্! দেখছিস না বাবুরা এখানে।"—বলিয়াই পট্‌লি সবেগে প্রস্থান করিল। অভিনব দেখিলেন তাহারই পাশের বাড়ির উড়ে বামুনটি! শীত বলিয়া আপাদমস্তক বেশ ঢাকা ছিল—মাথায়ও কেশের সুমেরুশিখর।

জগড়নাথ হাঁ করিয়া ভাবিতেছিল, বাবুরা কোথায়। এমন সময় বলীবর্দ নর্দন করিয়া তাড়া করিতেই সে আবার খোলা দরজা দিয়া পালাইয়া বাঁচিল।

সকলে বলীবর্দকে মনে মনে গাল দিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস করিল না। প্যান্ কহিল, "অভিনব, পট্‌লিকে আনো ভাই। সন্ধ্যাটা একটু জমুক।"

অভিনববাবু কাতর স্বরে কহিলেন, "সে আর হয় না। জগড়নাথের সঙ্গে ওর একটু প্রেম আছে কিনা। আমাদের সঙ্গে এরূপ অবস্থায় জগড়নাথ ওকে দেখাতে ওর কি ব্যথা বেজেছে, বুঝছ তো?"

শাখামৃগ কহিল, "পট্‌লি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফ্লার্ট;—তাকে আমার অভিনন্দন।"

সারমেয় কহিল, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষা-সম্পন্ন মহিলা;—তাকে আমার শ্রদ্ধা।"

প্যান্ কহিল, "পট্‌লি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট ;—তাকে আমার প্রণাম।"

তরুণ তুরগ কহিল, "পট্‌লি চিরন্তনী রমণী;—তাকে আমার অন্তহীন বাসনার অর্ঘ্য।"

বলীবর্দ কহিল, "পট্‌লি ঝি, ঝি ছাড়া আর কিছুই নয়; তাই আমার কাছে তার দর আরো বেড়ে গেল।"

সিবিনেড। * * *

কতক্ষণ পরে বলীবর্দ কহিল, "যাক্, ফূর্তি তো খুব হোলো। খেঁকশিয়ালী ভায়ার মুরোদও দেখলুম। কিন্তু আমার গানগুলোর কি হবে? আজ যে এখানে গাইবার জন্যে আমি কটা গান শিখে এসেছিলুম।" বলিয়া গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে গাহিতে লাগিল,—

"আজ ফাগুন রাতের, মদনরতির পাগল মিলন ক্ষণে,
সখি, কে আসিবি তোরা, কে আসিবি মোর সনে?"

শুনিয়াই সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল "কি? কি?"

বলীবর্দ তখন গলা ছাড়িয়া গান ধরিল,—

আজ ফাগুন রাতের, মদন রতির পাগল মিলন ক্ষণে
সখি, কে আসিবি তোরা, কে আসিবি মোর সনে?

চারিদিকে ব্রাভো ব্রাভোর সাড়া পড়িয়া গেল। "খাশা জিনিস" বলিয়া সকলে সমস্বরে গাহিতে লাগিল—"আজ ফাগুনরাতের মদনরতির, মদনরতির, মদনরতির" ইত্যাদি বলীবর্দ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "গজলটা যে আরও চমৎকার ছিল হে!

তরুণী হিয়ার তক্ত-তাউসে আমি যে শাহান্‌শাহ্—

এমন জিনিসটে মাঠে মারা গেল। (কপালে চাঁটি মারিয়া) কপাল! সবই কপাল।"

সকলে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "মুষড়ে যেও না, দাদা, আমরা তো শুনলুম।"

"কি আর শুনলে? 'দিলচোরা চিল্-সই' গানটা শুনলে কই? আর 'আক্‌রা হয়েছে আখরোট আজ বোখরা সমরখন্দে'? যাক্—"

আজ ফাগুনরাতের মদন-রতির, মদন-রতির
মদন-রতির, ইত্যাদি—

গান চলিতেছে এমন সময় প্যান হঠাৎ উঠিয়া দরজার দিকে চলিল। খ্যাঁকশিয়ালী পিছন

হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ হে?"

প্যান বলিল, "তোমরা গান কর ভাই, আমি চল্লুম।"

"না, না," বলিয়া সকলে গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। "কোথায় যাচ্ছ না বল্লে যেতে দিচ্ছি নে। একা একা মজাটি মারবে তা হতে দিচ্ছি না, বাবা! শুনি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

প্যান্ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ঘাড় ঘুরাইয়া শাখামৃগের হাত হইতে শিং ছাড়াইয়া নিয়া বলিল,— "বলছি এমন ফাগুন রাতটি আমি বিফল যেতে দেব না,

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।

আমি চল্লুম তাঁর কাছে, গান তো? তাঁর দেখা না পাই, তাঁর জানালার নীচে দাঁড়িয়ে সারারাত সিরিনেড করব।"

শাখামৃগ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "দি আইডিয়া, চল না আমরা সবাই মিলে যাই!"

প্যান্ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উত্তর করিল, "তা হয় না।"

"কেন হয় না, শুনি। তুমি কি প্রমিস্কিউইটির বিরুদ্ধে নাকি?"

প্যানের মুখ শুকাইল। সে কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, "তা কি হয়? তা কি হয়? সত্যি বলছি আমি সে রকম নই। তবে কি না.....এঁ্যা, এঁ্যা—সমাজ আছে, পাড়া-পড়শী আছে, তাঁর --তাঁর মান-সম্ভ্রমের দিকটাও তো একটু দেখতে হয়!"

"ডাম্ সমাজ, ডাম্ মান-সম্ভ্রম, ডাম্ পাড়াপড়শী। তাছাড়া পাড়ার চোখে তিনি তো অলরেডি আমাদের সবাকার রক্ষিতা।"

প্যান নিরুপায় হইয়া বলিল, "তা যেতে চাও চল, কিন্তু—"

"কিন্তু কিন্তু আবার কি? আমরা যাবই যাব। তুমি কোনো ভয় করো না। আমি বলে দিচ্ছি তিনি খুশী বই অখুশী হবেন না। ভ্যারাইটি ইজ দি মাদার অফ এনজয়মেন্ট।" সকলে একত্রে বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। রাস্তা একেবারে নির্জন। শুধু আলোমাথায় গ্যাসের থামগুলো নিঃশব্দে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরিয়া কাঁচি-গোষ্ঠীটি এক বাড়ির জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্যান কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া গান ধরিল,

ভিখারী দাঁড়ায়ে বধূয়া তোমার, পথপাশে নিরালায়,
নিদালির ছায়ে থেকো না সখি গো, এস এস জানালায়;—
সদর দরজা খুলি দিয়া চুপে
পার যদি এস আলুথালুরূপে,
শিহরণ তোলো প্রতি রোমকূপে
বিবসনা দেহ-ভায়।
দাঁড়ায়ে হেথায় ছ'জন আমরা আছি তব ভরসায়,
তবুও কি সখি ঘুমের আলসে রবে শুয়ে বিছানায়!

প্যানের গান শেষ হইতে না হইতে উপরের ঘরে একটি ইলেকট্রিক লাইট জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। তখন তুরগ এতক্ষণ ফুটপাথের উপর খুর মারিয়া খটাশ্ খটাশ্ করিয়া প্যানের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিতেছিল, সে উপরে আলো জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া ও আরও একটা ছায়ার মত কি দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। প্যানের গান থামিবামাত্রই সে একবার চিঁ হিঁ হিঁ করিয়া গলা ভাঁজিয়া লইয়া গান জুড়িয়া দিল—

ঝরোকার ফাঁকে বোরখায় ঢাকা কোন্ সে বসোরাগুল,
আরব আমি যে সাঁতারি এসেছি শাতিল দারাতজুল্!
খোল্ গো বোরখা খোল্—
জানালার নীচে ফুটপাথে আজ বাঁধাব হট্টগোল।
খোল্ গো বোরখা খোল্—
রুমের, কেরোর, সকলের সেরা ইরাক্ দেশের ফুল,
ঝরোকার ফাঁকে, দেখিনু চকিতে কোন্ সে বসোরাগুল!

আবেগের আতিশয্যে সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল! ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলে নাচিতেছে এমন সময় দড়াম্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে বলীবর্দের কণ্ঠে একটা কাতর হাম্বা-আ-আ ধ্বনি শোনা গেল। কচি-গোষ্ঠী পিছন ফিরিয়া দেখে এক গালপাট্টাধারী দারোয়ান বিরাট ভোজপুরী লাঠি উঁচাইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। বলীবর্দের পিঠটাই ইহাদের সকলের মধ্যে পিটাইয়া সুখ পাইবার মত। সেজন্য ভোজপুরী দারোয়ানের রোখও বেশী তাহার প্রতি। আর এক ঘা পিঠে পড়িতে না পড়িতেই বলীবর্দ আর একবার আর্তনাদ করিয়া উর্ধ্বপুচ্ছ হইয়া পলায়ন করিল। খ্যাক্‌শেয়ালী "এভরি মান ফর্ হিম্‌সেলফ্, ডেভিল টেইক দি হাইণ্ডমোস্ট" এই শেষ অর্ডার দিয়াই বিদ্যুতের মত মিলাইয়া গেল। বলাবাহুল্য তরুণ-তুরগ, প্যান, সারমেয়, শাখামৃগ কেহই তাহার কাছে হার মানিল না।

উৎসবের রাত্রে সেই যে ছত্রভঙ্গ হইয়া কচির দলটি ছুটিল, অভিনববাবু কিছুতেই তাহার নিশানা করিতে পারিলেন না।

মহাকচি বলীবর্দ পিঠের জ্বালায় ছুটিয়া ছুটিয়া গেঁড়াতলায় এক কসাই-খানায় বাঁধা পড়িল। সেই রাত্রিতে তাহাকে 'মিঠ্‌ঠা কাবাব্ বানেনাকে ওয়াস্তে' কি জবরদস্তী! সে যতই বলে, মাঁয় হেঁদু না হ্যায়, গউ বি না হ্যায়, ততই তাহাদের অবিশ্বাস। শেষটা যখন গজল গাহিয়াও তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না, তখন অগত্যা কল্‌মা পড়িল। গেঁড়াতলার ধর্মপ্রাণ ভাইরা তখন স্বীকার করিল যে, হাঁ, 'গউ হ'নে বি ও কাফের না হ্যায়'। সেই অবধি ওই অঞ্চলেই তিনি গেঁড়াতলা-সাহিত্যের সেবা করিতেছেন ও মাঝে মাঝে দ্বিচক্রমহাযান বহন করিতেছেন।

শ্রীমান্ শাখামৃগ দুই লাফে দেশ, নদী, নালা,—খাল,—বিল ডিঙাইয়া, একেবারে সাত বছর থেকে সাতাত্তরের তরুণী পর্যন্ত কাহারও দিকে না তাকাইয়া সাহিত্যলোকের শাখায় শাখায় ফিরিতেছেন!

তরুণ-তুরগ ছুটিয়া ছুটিয়া পাশের একটা আস্তাবলে ঢুকিয়া চুপটি করিয়া রহিল। পরদিন সকাল হইতে আবদুল গাড়োয়ানের ছ্যাক্‌রা মহাযানখানা একটা নয়, একেবারে একজোড়া ঘোড়ায় টানিতে লাগিল। তরুণ-তুরগ আস্তাবল-জীবন হাতে-কলমে আস্বাদন করিতেছে; কচির দলে আর ফিরিবে না—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যকে সে যে ডিম্ব উপহার দিতেছে তাহার তুলনা কোথায়?

সারমেয়ের অদৃষ্টটা মন্দ! গলিতে পথ হারাইয়া, অনেক কুকুরের তাড়া খাইয়া যখন হাঁফ ছাড়িল, তখনই ধাঙ্গরের লাঠি পড়িল তাহার মাথায়,—কর্পোরেশনে তাহার নাম তো রেজিস্ট্রি করা ছিল না—তাই কর্পোরেশনের বাহিরে ধাপার ময়দানে চিৎ হইয়া সে তারা গণিতে লাগিল। ধাঙ্গরটা নগদ চার আনা পাইয়া বেশ করিয়া তাড়ি খাইয়াছিল, কচি প্রাণের দরদ, তো সে বুঝিল না!

প্যান তাড়া খাইয়া একটা বাড়ির গেট খোলা পাইয়া ঢুকিয়া গেল। অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল বলিয়া হোক অথবা হয়ত জন্মজন্মান্তরের বাঁধনের জোরেই হোক কাছেই একটা ছাগ-গৃহও ছিল, তাহাতে একটি ছাগও ছিল। তাহারই এক কোণে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া সে কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা লোক ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

নিশ্চিন্ত মনে প্যান এবার আরামে দু'এক পা অগ্রসর হইল। পাশের ছাগটির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে গেলে, সে সোনাবাঁধানো শিং দুটি নাড়িয়া ধমকাইয়া কহিল, 'অরর্-রর্'। ইনি লম্বকর্ণ, অত্যন্ত এরিস্ট্রোক্রেটিক্ ধাঁচের। এসব ভাগাবণ্ড্ জীবের সান্নিধ্য তাঁহার পছন্দ নয়, ইহা তিনি জানাইয়া দিতে দেরি করিলেন না। সারারাত্রিটা প্যান যেমনি আলাপ জমাইয়া মুখ খুলিতে চায়, লম্বকর্ণ অমনি দাবাইয়া দেয়।—রাত্রি প্রভাতে কিন্তু অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। ভজুয়া চাকর রায়বাহাদুরকে সবিস্ময়ে কহিল, নূতন দোসরা একটা বকরি আসিয়া মিলিয়াছে। রায়বাহাদুর চটিয়া লাল, "দুটোকেই খেয়ে ফেল। ছাগলের গুষ্টি পেলে আর কি হবে? পিণ্ডী দেবে?" এই উপদেশ পালিতে ভজুয়া প্রস্তুত ছিল; কিন্তু ইতিমধ্যেই গিন্নীর খাস তদারক-কারিণী নেত্য ঝি প্রতিদিনের মত লম্বকর্ণের তদারকে আসিয়া কাণ্ডটা দেখিয়া গিন্নীকে গিয়া খবর দিল। গিন্নী সাগ্রহে কহিলেন, "ছাগল বড় পয়মন্ত রে। নেত্য, ওর আদর যত্ন যেন হয়, দেখিস। আর স্যাকরাকে খবর দে, ওরও শিংটা বাঁধাতে হবে যে।" নেত্য জানাইল, "মা ওটার চোখে সোনার চশমা।" গিন্নী বিশ্বাস করেন না, শেষে প্যানকে আনিয়া দেখাইতে হইল। গিন্নী কহিলেন, "আহা, কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা বুঝি"! গৃহিণী তাহার খুর রূপায় বাঁধাইয়া দিলেন। লম্বকর্ণের সহিতও তাই প্যানের বন্ধুত্ব জমিয়া গেল;—দুটিতেই এক সঙ্গে পাশের বাড়ির পাঁচ বছরের তরুণীটির করের পরশ পায়, দুটিই নেত্য ঝি'র প্রেম-মাখা ভূষি খায়। তবে জাতকবি! এখনো দিস্তা দিস্তা কবিতা লেখে আর লম্বকর্ণ 'নব্বই টাকার লোটের' অভাবে এই নব্য কথা ও কাব্যের টুকরোগুলিই চিবোয়।

মহাযানের মহাসঙ্গীতি ভাঙিয়া গেছে। অভিনববাবু নিঃশ্বাস ফেলেন। "দুঃখী অভিনব!"

ফাল্গুন ১৩৩৪

ধার্মিক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মহেশ গাঙ্গুলী লোকটি বড় ধার্মিক। কিন্তু একেবারে চার পো কলি, ধার্মিক লোকের আর ভদ্রস্থ নাই ; যত অত্যাচার তাহাদেরই উপর।

গঙ্গার ঘাটে বসিয়া মহেশ গাঙ্গুলী সেই কথাই ভাবিতেছিল। কাল গোপাল চৌধুরী গরুটা খোঁয়াড়ে দিয়াছে।

বেশ তোর কথাই মেনে নিলাম, অবলা জীব, এই নিয়ে পাঁচ পাঁচ বারই গেছে ; কিন্তু তোর বাগান কি উজোড় ক'রে ফেলত? বড় বাড় বেড়েছিস গোপালে। কিন্তু অবোধ জীব হ'লেও গরু সাক্ষাৎ ভগবতী তা জানিস, এত অহঙ্কার সইবে না। এই মা গঙ্গার সামনে ব'সে প্রাতর্বাক্যে বলছি, যাবি—যাবি—যাবি। অন্যের অনিষ্ট কখন মনেও আনি নি, আমার কথা ফলবেই, দেখে নিস।

হাতের তেলোয় খানিকটা তেল ঢালিয়া লইয়া সজোরে নস্য করিয়া লইল। তাহার পর তেলটা দুই হাতে মাখিতে মাখিতে বলিল, নাঃ, ফলেই বা আর কই মা, কলিতে তোমার মাহাত্ম্য আর রইল কই? নইলে জীবন কুণ্ডু, বেটা কেওট, ছেলের অসুখের দোহাই দিয়ে সুদ দিলে না, বাড়ির মধ্যে বামুনকে অমন কটুকাটব্য করলে, উল্টে ছেলেটা দেখতে দেখতে চাঙ্গা হয়ে উঠল! আর মাহাত্ম্যের গুমোর ক'র না, যে দিন থেকে সাধ ক'রে পায়ে ইংরেজের বেড়ি পরেছ, সেই দিন থেকেই তোমার মাহাত্ম্য গেছে। তা হক কথা বলব বইকি মা।

প্রায় শূন্য ঘাট। সকালবেলা মেয়ে-বুড়োদের স্নান, তাহার পর ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের পালা, এখন ক্বচিৎ এক আধ জন মাঝে মাঝে আসিতেছে, দুই একটা কথা, তাহার পর স্নান করিয়া চলিয়া যাইতেছে। গাঙ্গুলী গঙ্গাস্নানের সাতহাতী কাপড়টি পরিয়া তেল মাখিতেছে আর কলিতে অধর্মের দৌড় সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তাকুল হইয়া উঠিতেছে।

মাধব গয়লার মেয়েটা জল লইতে নামিল, আবার জল ভরিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙিয়া চলিয়া গেল।

চিন্তাস্রোতে একটু বাধা পড়িল। মেয়েটা উপরের আগাছার আড়ালে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলে গাঙ্গুলীর সম্বিৎ হইল, দৃষ্টি ফিরাইয়া একেবারে গঙ্গার পানে চাহিয়া বলিল, তাই দেখছিলাম মা, আমার সেই পূজোর ঘটিটার কাঁসাটাও ঠিক মেথোর মেয়েটার ওই কলসীর কাঁসার মত ছিল কিনা, মনে প'ড়ে গেল, তাই ঠায় দেখছিলাম। গেল তো? নেয়ে উঠে অশত্থ-গোড়ায় বুড়ো শিবের মাথায় একছিটে ক'রে জল দিচ্ছিলাম, সেটুকুও বন্ধ হ'ল তো? আর গেল কিনা তোমার চোখের সামনে এই গঙ্গার ঘাটেই! ধম্মকম্মের জিনিস, করকরে একটি টাকা—বুকের রক্ত, তাই দিয়ে কেনা, নিক, কিন্তু ও ঘটি আর সরতে হবে না, তোমাতে যদি ভক্তি থাকে মা, কায়মনবাক্যেও যদি কারও অনিষ্ট-চিন্তা না ক'রে থাকি—

এমন সময় হুড়মুড় করিয়া একদল পশ্চিমা ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। দুই তিন জন গঙ্গাবক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, হউ আবতা।

মেয়ে পুরুষ কাচ্চাবাচ্চায় বেশ সুপুষ্ট দলটি। সঙ্গে পোটলা-পুঁটলি হাঁড়ি-কুড়ি লোটা-কম্বলে অনেকগুলি লটবহর। বেশ বোঝা যায়, মুলুক হইতে আসিতেছে, এখানে স্টেশনে নামিয়াছে, গঙ্গা পার হইয়া ওপারে কর্মস্থানে যাইবে।

এরা ভুল করিয়াছে, এটা ফেরি-ঘাট নয়, ফেরি-ঘাটটা আর একটু সরিয়া ডান পাশে।

ঠিক সামনাসামনি ওপারের ঘাট হইতে দুইটা ফেরির নৌকা ছাড়িয়াছে। সেই দুইটাকে লক্ষ্য করিয়াই, হঊ আবতা, অর্থাৎ ঐ আসছে। কিন্তু ও দুটা এ ঘাটে লাগিবে না। মহেশ গাঙ্গুলী ধার্মিক হইয়াও, পরোপকারব্রতী হইয়াও কথাটা কেন জানাইয়া দিল না বলা শক্ত। একটি কচি ছেলে জলখাওয়ার জন্য 'দিদি, দিদি' করিয়া কান্না ধরিয়াছে। তাহার দিদি একটা ঘটি লইয়া লঘু চঞ্চল গতিতে ঘাটের রাণা ভাঙিয়া নামিয়া গেল, খানিকটা জলে নামিয়া ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর মাথার কাপড়টা খুলিয়া মুখে কপালে সামনে চুলে আঁজলা আঁজলা জল ছিটাইতে ছিটাইতে ওরই মধ্যে হাসির সঙ্গে চিৎকার করিয়া ভাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, চুপ কর, এই এলাম ব'লে, চুপ কর বউয়া।

অথচ জল পাইয়া আর নড়িবার নাম নাই। সতেরো আঠারো বছরের ধাড়ী, আচ্ছা বেয়াক্কেলে তো! ঠায় দেখিয়া দেখিয়া মহেশ গাঙ্গুলীর রাগে আর বাকস্ফূর্তি হইতেছিল না।

মহেশ গাঙ্গুলী যে রাগিয়াছে, এটা আমার আন্দাজ, ধার্মিক লোক বলিয়াই আন্দাজ করিতেছি, তবে বাকস্ফূর্তি যে হইতেছে না, এটা আন্দাজ নয়। সত্যই বাকস্ফূর্তি হইতেছে না এবং চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না। যাহার উপর রাগা যায়, তাহার মুখের উপর হইতে কি চোখ ফেরানো যায়? যে কাহারও উপর একবার রাগিয়া দেখুন না।

মেয়েটার সঙ্গে এদিকে তাহার মায়ের তুমুল বচসা লাগিয়া গিয়াছে। ছেলেটা কাঁদিয়া সারা, ওদিকে মুখ ধোওয়া আর শেষ হয় না ; ইহারা লজ্জাসরমের মাথা খাইয়া বসিয়া আছে!

মেয়েটা বলিতেছে, খেয়েছি মাথা লজ্জাসরমের, তোর কি? ইস! উহারই মধ্যে আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। বেশ বোঝা যায়, অন্তত নিজের তরফ হইতে ঝগড়া করিবার উদ্দেশ্যটা ততটা প্রবল নয়, যতটা বুড়ীকে চটাইয়া তুলিবার।

বুড়ী বলিল, তবে রোস, এই আসছি তোর মুণ্ডুপাত করতে, গঙ্গাজীর মধ্যে থেকে তোকে আর উঠতে দোব না, রোস তুই।

সে দুইটা ধাপ নামিতে একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক বলিল, রুনিয়ার মা, যাচ্ছিস তো, আমার এই ঘটিটা নিয়ে যা। তেষ্টা পেয়েছে।

ঘটি লইয়া কলহের পর্দা চড়াইতে চড়াইতে রুনিয়ার মা প্রায় জলের কাছে পৌঁছিয়াছে। রুনিয়া আঁজলা ভরিয়া জল উঠাইয়াছে, মা আর একটু অগ্রসর হইলেই বরুণাস্ত্র ছাড়িবে। চার পো কলির প্রভাব দেখিয়া ধর্মপ্রাণ মহেশ গাঙ্গুলীর চোখের আর পলক পড়িতেছে না, এমন সময় উপরে সবাই সমস্বরে 'হৈ হৈ' করিয়া উঠিল।

মহেশ গাঙ্গুলী গোলমালের মধ্যে ভাষাটা ঠিক বুঝিল না বটে, কিন্তু দলের কয়েকজনের ভীত দৃষ্টি এবং ব্যস্ত তর্জনীনির্দেশ অনুসরণ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। ওপার হইতে যে নৌকা দুইটা ছাড়িয়াছিল, মাঝ গঙ্গার একটু এদিকে আসিয়া গতি পরিবর্তন করিয়াছে; সবাই যে যাহার বোঁচকা-বুঁচকি কচি-কাচা কাঁখে পিঠে মাথায় করিয়াছে। রুনিয়া ও তাহার মাকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গিয়াছে, এদের ত্রস্ত তাগিদ ভাল রকম বুঝিতে না পারিলেও মহেশ গাঙ্গুলীর এটুকু আর সন্দেহ রহিল না যে, ভাষাটা খুব শুদ্ধ নয়।

বুড়ী তাড়াতাড়ি ফিরিল। রুনিয়া একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া নৌকা দুইটার দিকে দেখিল, তাহার পর পড়ি-কি-মরি করিয়া কাপড় ভিজাইয়া কাদা ছিটাইয়া মাঝপথে মাকে সামনের দিকে একটা ঠেলা দিয়া উঠিয়া গিয়া ভাইটাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং হস্ত ও ঊর্ধ্বাংশ সঞ্চালন করিয়া বুড়ীকে উচ্চৈঃস্বরে তাগাদা দিতে লাগিল।

বুড়ী আসিলে সবাই ফেরি-ঘাটের দিকে হন হন করিয়া অগ্রসর হইল। নৌকা দুইটা তখন ঘাটে প্রায় ভিড়িয়া গিয়াছে।

*　　*　　*

রুনিয়া যেখানটায় দাঁড়াইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, মহেশ গাঙ্গুলী চিত্রার্পিতের মত খানিকক্ষণ সেইখানটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর উহারা যে পথ ধরিয়া

চলিয়া গিয়াছে, একবার সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল, একবার মনে হইল, একটা হাঁক দেয় রুনিয়ার নাম ধরিয়া, আর কাহারও তো নাম জানে না। কি ভাবিয়া ডাকিল না। তেলের শিশি, কাচা কাপড় আর নামাবলিটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া রুনিয়া যেখানটায় দাঁড়াইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহার ঠিক সামনে ঘাটের শেষ রাণাটির উপর গিয়া বসিল, তাহার পর চিন্তা।

মহেশ গাঙ্গুলী ধার্মিক, তাহার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আলোড়ন জাগিয়াছে। এ আলোড়নের বিক্ষোভ সে কখন বুঝিবে না, যে নিজে ধার্মিক নয়—মহেশ গাঙ্গুলীর মতই ধার্মিক নয়। একবার মনে হইল নিজেই ছুটিয়া যায় রুনিয়ার কাছে ; এখনও উহাদের চেচামেচির আওয়াজ শোনা যাইতেছে। আবার মনে হইল, চাই কি রুনিয়া নিজেই নিশ্চয় আসিয়া পড়িতে পারে। সে কি এতই অন্ধ? এতবড় একটা ভুল কি সে করিতে পারে? হঠাৎ সন্ত্রস্তভাব মধ্যেই এই বিভ্রমটা ঘটিয়াছে। এ ভাবটা কাটিয়া গেলেই রুনিয়ার মনে পড়িবে, নিশ্চয় মনে পড়িবে।

ঘাটের ওদিকে উহাদের কলরবের আওয়াজ মিলাইয়া গেল। নিদারুণ উদ্বেগে মহেশ গাঙ্গুলীর বুকে একটা উষ্ণ নিশ্বাস জমিয়া উঠিতেছিল, একটি দীর্ঘশ্বাসের আকারে সেটি নামিয়া আসিল। তখন মনে হইল, ফেরির নৌকা না ছাড়া পর্যন্ত রুনিয়ার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে।

মহেশ গাঙ্গুলী দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফেরি-ঘাটের দিকে চাহিল। জায়গাটা কিন্তু ছাড়িল না, বক্ষের স্পন্দন বাড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে আশায় সেই জায়গাটিতে যেন সম্মোহিত হইয়া গিয়াছে মহেশ গাঙ্গুলী। একবার গঙ্গার দিকে চাহিল, তাহার পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, এই খেয়ার নৌকো ছাড়া পর্যন্ত দেখব, তারপরই বুঝব, তোমার কি ইচ্ছে মা। বুঝছই তো, এই ধন্দে প'ড়েই আমি নিজে গেলাম না, চিরকালই তোমার ওপরই মতিগতি, তুমি যা করেছ তাই হয়েছে, আমি নিজে হতে এগিয়ে তোমার ওপর কারসাজি করবার কে মা? তোমার যদি সেই রকমই অভিরুচি হয়, রুনিয়ার মনে পড়বে, সে ফিরে আসবে ; না হয় বুঝব, সেও তোমারই ইচ্ছে।

নৌকা বোঝাই হইতেছিল। ঐ একটি দলকে লইয়াই ছাড়িয়া দিল। মহেশ গাঙ্গুলী আড়চোখে দূরস্থিত নৌকাটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। এখনও ধুকপুকানি, মনের ধর্মই এই, এখনও যদি মনে পড়িয়া যায়, চকিতে চোখে পড়িয়া যদি মনে পড়িয়া যায় ঘাটের কথা তো, রুনিয়া ফিরিবেই। তুচ্ছ দুইটা ফেরির পয়সার মায়ায়, কি আত্মীয় স্বজনের ভয়ে—আর আত্মীয়-স্বজন তো জানিবেই কথাটা একদিন—একি। নৌকা দূরে চলিয়া গেল, উহাদের হাস্যকলরব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া আসিতে লাগিল।

মহেশ গাঙ্গুলী রাণা হইতে নামিয়া, রুনিয়া যেখানে জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহার হাত চারেক এদিকে পাঁকের উপর হইতে একটি ঘটি তুলিয়া লইল। অর্ধেক পিতল অর্ধেক তামার চমৎকার একটি বেনারসী লোটা।

মহেশ গাঙ্গুলী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে গঙ্গার পানে চাহিয়া বলিল, তাই তো বলি মা, তুমি এখনও ধরাতলে বইছ, আর কলির প্রভাবই কি এতটা প্রবল হয়ে উঠতে পারে? পূজোর ঘটিটা গিয়ে অবধি মনটা যে কি হয়েছিল, অন্তর্যামী মা সুরধুনী, আর কেউ না জানুক, তুমি তো তা জান। কায়মনবাক্যেও কখনও পাপ করি নি, মনের দুঃখ শুধু তোমায়ই জানিয়েছি, না শুনে কি পারিস বেটী? তাই একেবারে হাতে তুলে দিলি, বললি, নে। ঘটিটিও চমৎকার, একেবারে বাবার ধামের জিনিস—তামায় পেতলে একেবারে পূজোর যুগ্যিটি। আহা, মেড়ো মাগীর হাতে কত অনাচারই হয়েছে, গঙ্গামৃত্তিকে দিয়ে মেজে নিই।

মহেশ গাঙ্গুলী খুব ভক্তিভরে গোটা কতক বেশি ডুব দিয়াই স্নান করিল। তাহার পর বুড়োশিবের মাথায় ঢালিবার জন্য ঘটিটি পরম নিষ্ঠার সহিত গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে উঠিয়া গেল।

ধর্মতলা টু কলেজ-স্কোয়ার

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ধর্মতলার মোড়ে ট্রামে উঠিলাম, "—চিঠি"-র অফিসে যাইতে হইবে। একটু অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় রব উঠিল, এই, বাঁধো. বাঁধো—লেডি।

একদমসে বাঁধ করকে ; স্ত্রীলোক উঠতা হ্যায়।

ঘুরিয়া দেখিলাম একটি চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক মন্দগতি ট্রামের পাশে পাশে পা চালাইয়া অগ্রসর হইতেছে। রডটা ধরিবার জন্য ডান হাতটা উঁচু করা। উঠিবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু উপযুক্ত সাহস সঞ্চিত না হওয়ায় একেবারে থামিয়া না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

আমার পাশের বেঞ্চে অত্যন্ত মোটা কাচের চশমা পরা একটি প্রবীণ ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। হাতপাঁচেকের পরেই সব ঝাপসা দেখেন বলিয়া বোধ হইল, এবং সেই জন্য হাতপাঁচেকের বাহিরে চারিদিকেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রহিয়াছে মনে করিয়া খুব সতর্ক। একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া একটু রাগতভাবে ড্রাইভারকে বলিলেন, এই, ডেডস্টপ করো। লেডি উঠতা হ্যায়, শুনতা হ্যায় নেহি?

হাসি পাইল,—লেডিই বটে!

তুলতুলে, মেয়ালী ঢঙের চেহারা। ফাঁপা চাদর, সিল্ক পাঞ্জাবি আর লটপটে কাপড়েও অনুরূপ ভাব! সলজ্জ এবং সঙ্কুচিত,—এই ট্রাম সম্পর্কিত ব্যাপারে লজ্জা সঙ্কোচে যেন আরও লুটাইয়া গিয়াছে। ট্রামটা নিশ্চলভাবে থামিয়া গেলে উঠিয়া কয়েক জনের দিকে চকিতভাবে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

একটি মেয়ে ট্রামের পিছনের বারান্দাটিতে একটা রড ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যুবক উঠিতেই নিম্নস্বরে বলিল, চল. সামনের সীটটায় গিয়ে বসি, খালি আছে।

এতক্ষণে ভুলটা বুঝিতে পারিলাম, এই তাহা হইলে 'লেডি'।

কালোর উপর বেশ সুশ্রী। একটা টকটকে লাল শাড়ি পরা। পায়ে অল্প একটু উঁচু-গোড়ালির জুতো, হাতে একটি খর্বাকৃতি ছাতা! সঙ্গীর অবস্থায় একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তবুও ভাবটা বেশ সপ্রতিভ।

দুইজনে একটু অগ্রসর হইল।

যুবক বলিল, তুমি এই লেডিজ সীটেই ব'স না। আমি বরং ওখানটায় গিয়ে বসছি।

অর্থাৎ গা-ঝাড়া দিতে চায় ও ভিড়ের মধ্যে মেয়েটির সান্নিধ্যে সে কুণ্ঠা তাহা কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। মেয়েটি নিশ্চয় তাহাকে চেনে, বেশ একটু দৃঢ়তার স্বরে বলিল, আচ্ছা, এস তো তুমি!

আমার সামনে একটি বেঞ্চ খালি ছিল ; সেইটিতে গিয়া দুইজনে বসিল। একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর মেয়েটি মাথা নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমার এমন হাসি পাচ্ছে!

যুবক কারণটা যে বুঝে নাই এমন নয়, তবু জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন?

মেয়েটা ঘুরিয়া একবার পিছনে চাহিল। আমি একটা খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, সেটা সঙ্গে সঙ্গেই তুলিয়া ধরিতে, আমার মুখ দেখিতে পাইল না। নিজের পড়া লইয়া আছি ভাবিয়া নিশ্চিন্তস্বরে কহিল, কেন আবার!—তোমার কাণ্ড দেখে! সবাই 'লেডি হ্যায়—বাঁধকে, লেডি হ্যায়—বাঁধকে' করছে, এ লেডির সাহস হচ্ছে না যে টুপ ক'রে উঠে

পড়বেন। আগেভাগে উঠে প'ড়ে এমন লজ্জা করছিল আমার। তোমায় ঠাট্টা ক'রে সব লেডি বলছে, কি আমার ইঙ্গিতে টম-বয় বলছে। এমন জ্বালায়ও পড়ে মানুষে!

একটু তরল হাসি উঠিল।

উত্তর হইল, গেলে কেন উঠতে?

অপরাধ হয়েছিল। লেডি সঙ্গিনীকে আগে তুলে দেওয়া উচিত ছিল বটে।

আর একটু হাসি ছলছল করিয়া উঠিল। তাহার পর—

আজকে কেমন আমার অনেকদিন পরে স্কুলের খেলাধুলো, ড্রিল, স্কিপিঙের কথা মনে প'ড়ে গেল বাপু; অতশত ভাববার পূর্বেই টুপ ক'রে কখন উঠে পড়লাম। আর ট্রামটা তখন চলতে আরম্ভ করেছে। তবু কি ভাবলে লোকে কে জানে!...ভাবুক গে! ব'য়ে গেল।

আঃ, সবাই শুনতে পাবে; কি করছ?

সাহেব মেম আর কি বুঝবে?

ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন হইল, আর পেছনে?

ফিসফিস করিয়া উত্তর হইল, হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করেছে— দু ইঞ্চি টাইপের বোল্ড হেডলাইন।—উনি এখন জার্মেনিতে; সেখান থেকে ধর্মতলার কথাবার্তা শোনা যায় না।

যুবক একবার নিশ্চয় ঘুরিয়া দেখিল। সত্যই কাগজ পড়িতেছি দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া থাকিবে, বলিল, না, শোনা যায় না! বরং—

মেয়েটি প্রশ্ন করিল, বরং কি, ব'লেই ফেল না! কেউ আমাদের আলাপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্চে না। আর ঘামালেও শুনতেই পাবে বড়! পুরনো ট্রামের এই একটা মস্ত সুবিধে।

বলছিলাম—বরং কাছে সুন্দরী ব'সে থাকলে হিটলারের বিজয়ের কথাই অতি সামান্য ব'লে মনে হয়।

কালো আবার সুন্দরী!

সুন্দরী আবার কালো!

এবার তার একলার হাসি নয়, দুইটি স্বরের মিশ্র হাসি উঠিল, অবশ্য চাপা,—যুবকটির বেশি চাপা।

একটু নীরব। আবার হিটলারে মনঃসংযোগ করিব, প্রশ্ন হইল—আচ্ছা, আমি কাছে রয়েছি ব'লে তুমি অমন গুটিসুটি মেরে রয়েছ কেন বল দিকি? যেন ভয়ে সারা। আমি প্রথমেই ব'লেছিলাম—তোমার কর্ম নয়। ল কলেজের ফার্স্টবয় হ'লেই হয় না, বড্ড মর‍্যাল কারেজের অভাব তোমার। আমি তো তোমার সঙ্গে রয়েছি—

ব'লেই কাউকে গ্রাহ্য করি না। পাশে যখন নিজের—

এই সময় ট্রামটা দাঁড়াইয়া পড়ায় বাক্যটা অসমাপ্ত রহিল।

আমাদের সামনে এই সময় কয়েকটা সীট খালি হইল। একটি ইংরেজ যুবক আসিয়া একটাতে বসিতে যাইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের যুবক-দম্পতির সামনের সীটে উপবিষ্ট সাহেবটির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, হ্যালো জোনস, তুমি এখানে! জামালপুর থেকে কবে এলে?

জোনস করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, পরশু এসেছি। তোমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দি। তোমার ঠিকানা কোন মতেই জোগাড় করতে পারলাম না, খবর দিতে পারি নি, মার্জনা ক'র।

আগন্তুক বন্ধুপত্নীর সহিত করমর্দন করিয়া কুশলাদি প্রশ্ন করিল। ওদের একেবারে সামনের দুটো সীট—তিন জনের কথাবার্তা জমিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ট্রাম ছাড়িয়া আওয়াজটা বাড়িয়াছে। মেয়েটি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, যাচ্ছ তো আমায় নিয়ে ওভারটুন হলের মীটিঙে—ধর, যদি কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, এই রকম ভাবে ইনট্রোডিউস ক'রে দিতে পারবে?

যুবকটি শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয়, এ আর কি শক্ত?

কি বলবে?

বলব--

কণ্ডাকটর আসিয়া দাঁড়াইল। আমি মাসিক টিকিট তুলিয়া ধরিলাম। যুবকটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গটা মন্দ লাগিতেছিল না; আমি কাগজের উপর দিয়া দেখিতে লাগিলাম কত দূরের দৌড়। যুবক একটু ইতস্তত করিল, তাহার পর একটা আট-আনি বাহির করিয়া বলিল, শ্যামবাজার।

মেয়েটি একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি? কলেজ-স্কোয়ারে নামবে না?

যুবক একটু অপ্রতিভ ভাবে দুর্বল কণ্ঠে বলিল, শ্যামবাজারেই চল না।

বাঃ রে! মীটিং কলেজ স্ট্রীটে, ওভারটুন হলে, আর যাবে শ্যামবাজারে?

আরও দুর্বল সন্ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তর হইল, আঃ, আস্তে!

কণ্ডাকটর একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, কোথাকার দোব ঠিক ক'রে ফেলুন।

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল কলেজ-স্কোয়ার?

কাগজের উপর হইতে দেখিলাম-- মেয়েটি একবার সঙ্গীর দিকে চাহিল। মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিলাম তাহার অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়।

মেয়েটি কণ্ডাকটরের দিকে চাহিয়া বলিল, না, শ্যামবাজার।

স্বর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। ট্রাম তখন মোড় ফিরিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটে প্রবেশ করিতেছে। টিকিট লওয়ার পর মেয়েটি ঘুরিয়া পার্কের দিকে মুখ করিয়া বসিল।

বুঝিলাম [illegible] হইয়াছে, এবার নিঃশ্বাসের পালা চলিবে। কাগজগুলা ঠিক করিয়া লইয়া আবার হিটলার অভিযানে মনোনিবেশ করিয়াছি, এমন সময় পেছন থেকে শুনিলাম-- গাঢ় অনুতপ্ত, ভাবাকুল স্বরে অনুরোধ [illegible] হইয়াছে [illegible]

স্বর লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম মুণ্ডটাও প্রেমাস্পদার ঘাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, নিতান্ত যদি ঘাড়ে নাই পড়িয়া থাকে। একটু শঙ্কিত হইলাম, ছেলেমানুষদের কাণ্ড, ট্রামের মধ্যেই জ্ঞান হারাইয়া কিছু একটা করিয়া না বসে। একটু গলা খাঁকারি দিলাম।

কিন্তু আমাকে যাহারা জার্মানি প্রবাসের অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা নিজেই এখন শুধু অন্য দেশে নয়, একেবারে অন্য লোকে-- কোন ফল হইল না।

শুনছ? রাগ হ'ল নাকি?

একটু চুপচাপ। আবার

কেন যে শ্যামবাজারের টিকিট করতে চাইছিলাম, একবার তো জিগ্যেসও করলে না।...রাগ।

বুঝতে পেরেছি, জিগ্যেস করার প্রয়োজন নেই। ওভারটুন হলে যদি আবার কারুর কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় সেই ভয়ে।

যে পরিচয়ে গর্ব, তাতে ভয়?

থামো, খুব গর্ব! গর্ব না, লজ্জা—কালো নিয়ে; তাই তো এড়িয়ে যাচ্ছ।

আরও চাপা গদগদ স্বরে উত্তর হইল, আমার কালোর কাছে কোন ফরসা দাঁড়াত একবার, দেখতাম—

ওঃ! তা কেন শ্যামবাজারের টিকিট করা হচ্ছে শুনি?

স্বর পরিবর্তন হইয়াছে, কঠিন বরফে তরলতা আসিয়াছে একটু। যাক, ল কলেজের ফার্স্ট বয় বাঙ্গালী যুবক, সে চলতি ট্রামে উঠিতে না পারুক, কথায় যে মন ভিজাইতে পারিয়াছে, ইহাতে আশান্বিত হইলাম ;---ঐ করিয়াই তো খাইবে। প্র্যাকটিসও হইতেছে জজ সাহেবের চেয়ে কড়া এজলাসেই। আহা, ভাল!

যুবক সেই রকম গাঢ় স্বরে বলিল, বলব?

শুনিই না!

আজ মীটিং-ফিটিং ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করছে, দুজনে সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজকের দিনটা কাটাই। কতটুকুই বা পাই তোমায় নন্দা?

কথাটা নিশ্চয় অন্য তরফেরও মর্ম স্পর্শ করিল। কোন উত্তর হইল না খানিকক্ষণ। আবার আপীল হইল, কি মত তোমার?

আমার আবার আলাদা মত আছে নাকি? তা কোথায় কাটাবে? সিনেমা?

সিনেমায় কি পরস্পরকে পাওয়া যায় নন্দ? এদিকে কায়ার ভিড় ওদিকে ছায়ার ভিড় -- বাস্তবে অবাস্তবে ওখানে অনুভূতিটাকে আধখেঁচড়া ক'রে দেয়। তুমি থাকবে পাশে অথচ সে কথা ভুলে এক অলীক ছায়ালোকে তোমার পেছনে ঘুরব, কখন নাগাল পাব না; আমি তোমায় চাইছি, পেয়েওছি, অথচ বিরহী যক্ষের মত --

ট্রাম বউবাজারের মোড়ে দাঁড়াইল। একটু উঠা নামা চলিল, পুরাতনের স্থানে নূতনরা আসিয়া বসিল। বিশ্রম্ভালাপ একটু স্থগিত রহিল। আমি অস্ট্রিয়া অভিযানের আর একটা প্যারাগ্রাফ শেষ করিলাম। সামনে সাহেব-দম্পতির পরিত্যক্ত সীটে একটি বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। মেয়েটি অতি সাধারণ ঔৎসুক্যের কণ্ঠে কতকটা জোরেই যুবককে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এপ্রিল থেকে শুনছি আমাদের ঈ আই আর-এর টাইম অনেক চেঞ্জ করবে, সত্যি নাকি?

অর্থাৎ এই ধরনের কথাই এতক্ষণ হইতেছিল এবং পরেও হইবে; প্রতিবেশী আমাদের অযথা ঔৎসুক্যের প্রয়োজন নাই। অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার লোপ সুখের না হইলেও আমায় কাগজের আড়ালে হাসিতে হইল। এরা আমাদের ভাবে কি? অথবা আমরাও বোধ হয় এককালে এই করিয়াছি, আজ আর মনে নাই। ট্রাম চলিয়া আবার শব্দ আরম্ভ হইল।

যুবক আবার নিম্নকণ্ঠে বলিল, এই ধর দেশবন্ধু পার্ক, কিম্বা আরও দূরে দমদম, এরোড্রোমের দিকে, কিম্বা—

মেয়েটি উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, চল, সত্যি চল। দমদমাই ভাল। না, আর দ্বিধায় কাজ নেই।

আঃ, আস্তে!

বাবাঃ, ভয়েই সারা!

বলছ তো যেতে, কিন্তু হবার উপায় নেই যে।

শঙ্কিতকণ্ঠে উত্তর হইল, কেন?

ওভারটুন হলের সামনে যতীন আর তিমির দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছে- তোমায় অভ্যর্থনা করবে।

একটু চুপচাপ গেল। এদিকে অভ্যর্থনা, ওদিকে দমদমা। তাহার পর মেয়েটি মীমাংসার স্বরে বলিল, না, দমদমা যেতেই হবে কোন রকমে।

তারা যে প্রত্যেক ট্রাম লক্ষ্য করবে সুনু, দেখলেই টেনে নামাবে।

একটু আবদারের সুরে উত্তর হইল, আমি কিছু শুনব না—আমার মীটিং-ফিটিং একেবারে ভাল লাগছে না। বিয়ের আগে ওসব হুড়ুদ্দুম ক'রে বেড়ানো শোভা পেত। আর এখন--

এখন দমদমায় গিয়ে উড়ে বেড়ানো!

ঠাট্টা রাখ।—বুঝিলাম মুখ আবার অন্যদিকে ফিরিয়াছে।

বিমুখভাবেই উত্তর হইল, আর বাবা মা ভাগলপুর থেকে ফিরলেই বলব, তাঁরা নেই দেখে আমায় ভুজংভাজুং দিয়ে মীটিঙে একপাল লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে—

স্ত্রীয়াশ্চরিত্র!—ভদ্রসন্তানকে তো বড়ই ফাঁফরে ফেলিল মেয়েটা। কিন্তু আমার হাতে তো কোন রকম উপায় ছিল না, থাকিলেই বা ট্রামের এই ক্ষণরচিত অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ কোথায়? অধিকারই বা কি? চুপ করিয়া বসিয়া ঘটনা কি ভাবে বিকশিত হয় তাহারই

অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শানু!

ঐ যুবক ঐ মেয়েটিকেই ডাকিল। এরই মধ্যে 'নন্দা' 'নদু' 'সুনু' আবার এই 'শানু'। টুকরা এই পাপড়িগুলির মূলপুষ্প কি—সুনন্দা? যাই হোক, বড় বেদনা বোধ হইতেছিল। নামের প্রতি অক্ষরের মধ্যে যে এতটা মধু পাইয়াছে, তাহার এই বঞ্চনা।

কোন উত্তর নাই। প্রশ্ন হইল, কিন্তু এ অবস্থায় করাই যায় কি বল না! যা বলবে, তাই করা যাবে না হয়।

দমদমা।

কিন্তু কি ক'রে হবে। তারা পথ আগলে রয়েছে।

এপথ ছেড়ে দাও।

ঘুরে? বৌবাজার দিয়ে?

একটু থামিয়া আবার করুণকণ্ঠে, কিন্তু কণ্ডাকটরটা জানে আমরা শ্যামবাজারের টিকিট করেছি—পাশের সব ভদ্রলোকেরাও দেখেছে শ্যামবাজারের টিকিট করতে। কি ভাববে বল তো?—উঠলেই কণ্ডাকটর বলবে—শ্যামবাজার এখানে তো নয় বাবু। আর গাড়িসুদ্ধ লোক শ্যামবাজার কোথায় তা বলবার জন্যে হামড়ে উঠবে;—সঙ্গে মেয়েছেলে দেখলে উপকার করবার জন্যে কি রকম করে সব দেখ নি তো?...

সেই সঙ্কোচপীড়িতা, ব্রীড়াময়ী 'লেডি'!

এত আপীল-উপরোধের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, কণ্ডাকটরকেই খুশি কর তা হ'লে।

যুবক বিপন্নভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, কিঁ যে করি! মেডিকেল কলেজ এসে পড়ল এদিকে!

আমিও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। আদ্যোপান্ত শুনিয়া উদ্বিগ্ন না হইয়া গতি ছিল না। আহা! আর বোধ হয় দুটো মিনিট, তাহার পরই সংসারের ভাণ্ডার থেকে অতি কষ্টে অপহৃত এই কয়টি ঘন্টা একেবারে নিস্ফল হইয়া যাইবে। ওদের ওভারটুন হলে আর মন নাই।—যুবকের বোধ হয় সঙ্কোচে, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীর মন যে সত্যই মুক্তপক্ষ হইয়া উধাও হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাড়ির তুলনায় ওভারটুন ছিল মুক্তি, কিন্তু দমদমার কাছে তাহাই হইয়া পড়িয়াছে পিঞ্জর।

দুইটি মিনিট, ওদের আজকের দিনের চরম কথাটি এরই মধ্যে।...কোন উপায় নাই?

এই সময় সামনে একটা রিকশ বাঁচাইতে ট্রামের হঠাৎ ব্রেক দেওয়ায় সবাই যেন হোঁচট খাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। আমি কাগজসুদ্ধ যুবকটির বেঞ্চের পিঠে গিয়া পড়িলাম। নিজেকে সামলাইতে হাতের কাগজটা তাহার পাশে ছিটকাইয়া পড়িল। যুবক উঠিয়া বসিয়া কাগজটা আমার হাতে তুলিয়া দিল। একটু যেন সন্দেহের সহিত আমার চোখের দিকে একবার চকিত দৃষ্টি হানিল। আমি কাগজটা লইয়া সহজভাবে বলিলাম, থ্যাঙ্কস।

আবার না-পড়ার পড়া শুরু হইল।

ট্রাম আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যুবক কতকটা নিজের মনে কতকটা সঙ্গিনীকে শুনাইয়া বলিল, যদি একটা খবরের কাগজও হাতে থাকত, তা হ'লেও—

মেয়েটি গ্রীবা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, কি হ'ত তা হ'লে?

তা হ'লে ঐ জায়গাটুকু—ওভারটুনের সামনে দুজনে আড়াল হয়ে বসতাম—কাগজের আড়াল দিয়ে। ওরা ট্রামে উঠে দেখতে আসত না!

মনে হইল, যেন স্বামী-গরবিণী প্রশংসাদীপ্ত নেত্র তুলিয়া চাহিল।—এটা আমার নিছক কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু এর পরের নীরবতাটুকুতে যেন এই ছবিই ফুটিয়া উঠিল। অন্তত সে যে ঘুরিয়া বসিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না আমার।

একটু পরে শুনিলাম, খবরের কাগজ তো রয়েছে।

কই?

পেছনে।

ধ্যাৎ, চাওয়া যায় কখন?

মেয়েটি ঘেঁসিয়া আসিল। আরও নিম্নকণ্ঠে বলিল, এক উপায় ঠাউরেছি; কিন্তু তুমি যা মেয়ে-মুখো! আমি শুনিয়ে শুনিয়ে তোমায় জিগ্যেস করি—কোয়ালেশান মিনিস্ট্রি ফর্‌ম্‌ করবার কি হ'ল বলতে পার? তুমি বলবে—না, আজকের কাগজটা মোটেই পড়া হয় নি, অথচ ভয়ানক আগ্রহ জেগে রয়েছে। তা হ'লেই ভদ্রলোক ভদ্রতা ক'রে কোন্‌ না কাগজটা একবার বাড়িয়ে দেবেন। আদ্ধেক প'ড়ে অমৃতবাজারটা যদি না ফেলে আসতে তাড়াতাড়ি…। তা হ'লে আমি শুরু করছি। (প্রকাশ্যকণ্ঠে)—আচ্ছা, কোয়ালি…। যুবক একরকম শিহরিয়া উঠিয়া তাহার বাম হাতটা চাপিয়া ধরিল, চাপা ত্রস্তস্বরে বলিল, না না না, না নদু, ছিঃ!

আবার সে 'লেডি'!

ট্রাম কলেজ স্কোয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কি নীরব অসহায় উদ্বেগ।

আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম না। মাথায় একটি মতলবও আসিয়াছে, কিন্তু দারুণ দ্বিধায় মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। আর কিন্তু সময় নাই; এর পরের স্টপেজ একেবারে ওভারটুন হলের সামনে।

আমি কাগজটি সীটে রাখিয়া দিয়া বেশ জানান দিয়া সাড়ম্বরে উঠিয়া পড়িলাম। দরজার দিকে পা বাড়াইতে একটি মারোয়াড়ী ভদ্রলোক বলিলেন, বাবুজী, আপনার অখবার প'ড়ে রইল যে!

আমি ঘুরিয়া দেখিলাম। পলক মাত্রের দ্বিধা, তার পর বিমূঢ়দৃষ্টি যুবকটিকে দেখাইয়া ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, না কাগজটা ওঁর; পড়তে নিয়েছিলাম।

ফল কি হইল, আর ফিরিয়া না দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম।

বৈশাখ ১৩৪৫

দেশী ও বিদেশী

পরিমল গোস্বামী

১

একটি ইংরেজী গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটি এইরূপ—

জীবনে নানারূপ অ্যাডভেঞ্চার করিয়াছেন বলিয়া জনৈক ভদ্রলোকের বড়ই গর্ব ছিল। দশ-বারোটি মাত্র অ্যাডভেঞ্চারের গল্প ছিল তাঁহার সম্বল। তিনি ইহারই কোনো না কোনো একটার দ্বারা সর্বত্র মজলিস জমাইতেন। সিংহ-শিকার হইতে প্রেম করা, এবং সিংহ-শিকার হইতে প্রেম করার মধ্যবর্তী কয়েকটি পর্যায় ছিল তাঁহার অ্যাডভেঞ্চারের বিষয়। একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বাড়িতে কয়েকজন নবাগত ব্যক্তিকে লইয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রোতাদিগকে তিনি বলিয়া যাইতেছেন—"মনে করুন, একা আমি সেই গভীর জঙ্গলে, হাতে একটা মাত্র বন্দুক! আফ্রিকার জঙ্গল! কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পরেই আমার প্রার্থিতের দেখা পেলাম। প্রকাণ্ড সিংহ! সঙ্গে সঙ্গে গুলি। গুলি খেয়ে সিংহটা ঘোর গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে—"

গল্পটি এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহাকে তাঁহার বাড়ি হইতে টেলিফোনে ডাকিতেছে। ভদ্রলোক চট করিয়া উঠিয়া গেলেন। শ্রোতাগণ আকুল আগ্রহে তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লগিল।

মিনিট তিনেক পরে ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসা মাত্র সকলে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—"তার পর কি হল?" কিন্তু ভদ্রলোক কোন গল্পটি করিতেছিলেন তাহা ইতিমধ্যে ভুলিয়া গিয়া প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "তার পর তাকে চুম্বন করলাম এবং বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরে এলাম!"

২

দেশী গল্পটি গল্প নহে, একটি মর্মান্তিক সত্য ঘটনা। বাঙালী মেয়েরা এত সেন্টিমেন্টালও হইতে পারে! থিয়েটার-বায়োস্কোপ তাহাদের না দেখাই ভাল। বিশেষ করিয়া ছাত্রীদের। পরীক্ষা আসন্ন জানিয়াও তাঁহারা সপ্তাহে অন্তত একবার সিনেমা দেখিবেন এবং মাসে দুইবার থিয়েটার! কোনোদিক দিয়াই নিজের মনের উপর নিজের কোনো প্রভাব নাই—মনটা টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের শব্দের মত দিবারাত্র টক্কা টক্কা করিতেছে।

এমন ছাত্রীর কথাও জানি, যিনি পরীক্ষার তিন দিন আগেও সিনেমার কোনো একটি বিশেষ ছবি দেখিয়া সর্বসাকুল্যে বিংশতিতম সংখ্যা-পূরণের গর্বে আত্মহারা হইয়াছেন।

মিস্ ব্যানার্জি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিস্টরি পড়েন। ফিফথ-ইয়ার। তাঁহার লেখা একটি হিস্টরির প্রশ্নের উত্তর আমি দেখিয়াছি। দৈবক্রমে দেখিয়াছি! দেখা অন্যায় জানিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার চেয়েও, যিনি দেখাইয়াছেন তাঁহার অন্যায় বেশি। মিস্ ব্যানার্জি নাট্যমন্দিরে "বিজয়া" এবং "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক যে একাধিকবার দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার এই লেখাতেই প্রকাশ পাইবে। প্রফেসরের দেওয়া প্রশ্ন, এবং মিস্ ব্যানার্জির দেওয়া উত্তর দুইটিই দিলাম। বলা বাহুল্য, দুইটিই ইংরেজি হইতে অনুবাদ এবং ইহাতে যদি কোনো ভুল থাকে সেজন্য আমি দায়ী নহি।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের স্থান কোথায়?

উত্তর। "ভারতবর্ষ" এই একটি মাত্র নামের দ্বারা এত বড় দেশকে এক কল্পনা করিয়াছিলেন কবি ও রাষ্ট্রনীতিকগণ। এই কল্পনা আংশিকভাবে প্রথম কার্যে পরিণত করেন চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার রাজত্বকালে আমরা শাসনের যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি দেখিতে পাই তাহার পরিপূর্ণতা হঠাৎ একটিমাত্র সম্রাটের হাতেই কিরূপে সাধিত হইল ইহা অনুসন্ধিৎসুর নিকট বিস্ময়কর হইলেও তাঁহার পূর্ববর্তী কালের সঠিক বিবরণ, তথ্য, বা ইতিহাস না পাওয়াতে ধরিয়া লইতে হইবে যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তই নিজের অসাধারণ ক্ষমতা এবং প্রতিভাবলে একটি সম্পূর্ণ অভিনব শাসনপদ্ধতি এবং পূর্ণাঙ্গ বিধি-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পর্যন্ত (ব্রাত্য রাজাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে) আমরা আর্য রাজাদিগকেই দেখি এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত অন্য কোনো বড় অনার্য রাজাকে দেখি না। সুতরাং যতদূর জানিতে পারা যায় চন্দ্রগুপ্তই ভারতবর্ষের সত্যকার প্রথম অনার্য সম্রাট। কিন্তু এতৎসম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজা যিনিই হউন, রাজ্যপরিচালনা-কার্যে মন্ত্রণাদান চিরকাল ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত এই চাণক্যের হাতে-গড়া রাজা। গ্রীকদের হইতে দেশের সম্মান এবং স্বাধীনতা রক্ষাকার্যে প্রতিভাবান যুবক-চন্দ্রগুপ্তকে ব্রাহ্মণ চাণক্য কিরূপ সফলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

"অর্থশাস্ত্রের" বিষয়বস্তু দেখিয়া যদিও ইহা প্রমাণ হয় না যে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বেই সমাজনীতি এবং রাজনীতির চরম উন্নতি হইয়াছিল, কারণ চন্দ্রগুপ্তের সময়ের পূর্ব হইতে ইহার অস্তিত্ব না থাকিলে "বৃন্তহীন পুষ্পসম" হঠাৎ ইহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না, তথাপি একথাও স্বীকার্য যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে রচিত এইরূপ ঐতিহ্য থাকায় ইহা বেশ বুঝা যায় যে রাজনীতি ইত্যাদি পূর্ব হইতেই থাকিলে, হয় ঐ শাস্ত্রগুলি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কারণ বড় রাজত্বের জন্যই ব্যাপকতর রাজনীতিরও প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। অথবা যদি ইহা পরবর্তী কালে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় ইহাই প্রমাণ হয় যে চন্দ্রগুপ্ত বড় রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মোটের উপর ভালই লাগিল। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী চাণক্যের ভূমিকায় যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাঁহার সহকর্মীগণ সেরূপ পারেন নাই। বিশেষত চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় যিনি নামিয়াছিলেন, তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তকে অত্যন্ত খাটো করিয়া ফেলিয়াছেন। চাণক্যেরই আর একটি রূপ দেখিলাম আমরা রাসবিহারীর চরিত্রে। কঙ্কাবতী, বিজয়ার ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার হাবভাব, চালচলন, কথাবলার ভঙ্গি, সমস্তই অত্যন্ত সুমার্জিত। বিজয়ায় ইঁহাকেই দেখিব বলিয়া পুনরায় গিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। নরেনের ভূমিকাতেও অন্য লোক—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। দিদি, তুমি আসিলে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু কে কোন ভূমিকায় নামিবেন পূর্বে ঠিক-ঠিক না জানিয়া কিছুতেই যাইব না। মনের মত না হইলে, সিনেমায় যাইব। আশা করি খোকাখুকীরা ভাল আছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৪২

মারীচ

সজনীকান্ত দাস

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বোনা হয় কার্পেট ; কোনোটিতে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল স্বর্ণমিনার ও চোখ-ঝলসানো রৌপ্যগম্বুজ-শোভিত মসজিদ-প্রাসাদ-সমাকীর্ণ মক্কাশরিফ, কোনোটিতে বা মন্দিরচূড়া ও প্রাসাদ-বিপণির পটভূমিকায় কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট—সিঁড়ির পরে সিঁড়ি, গঙ্গাবক্ষে তরণী-শ্রেণী—দক্ষশিল্পীর নিপুণহস্তে পশম-সূত্রের টানাপোড়েনের মধ্যে একটির পর একটি চিত্র পরিস্ফুট হইতে থাকে—বহুবর্ণে বিচিত্র, অপরূপ। দেশে-বিদেশে এই কার্পেটের সমাদর ; লোকে শুইয়া বসিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে, মুখে তারিফ করে।

কিন্তু উলটাইয়া পাত, দেখিবে মক্কা-মদিনা কাশীকাঞ্চী গয়া-সারনাথ সব একাকার। একবার এক মহামান্য মৌলভীকে কার্পেটের উল্টাপিঠ দেখিয়া বাছাই করিতে বলায় তিনি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাত দিয়া তোবা করিয়াছিলেন এবং একবার এক মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত কাশীবিশ্বেশ্বর মন্দির ভ্রমে দিল্লীর জুম্মামসজিদ বাছাই করিয়া কি ভাবে "রামঃ রামঃ" বলিয়া উঠিয়াছিলেন—মুসলমান শিল্পীরা খরিদ্দারদের কাছে সকৌতুকে সেই গল্প করিয়া থাকে। তাহারা এই কাহিনীটিকে নিজেদের শিল্পদক্ষতার পরিচয়স্বরূপ প্রচার করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এই চিরন্তন দার্শনিক সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে, বহিঃপ্রকাশ যত স্বতন্ত্রই হউক, সকল বস্তুর অন্তরের রূপ এক।

দক্ষিণপন্থী দেশনায়ক শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ ও বামপন্থী "লীডার" শ্রীরাবণচন্দ্র বসু আসলে বরানগরের একই কার্পেট-কারখানায় প্রস্তুত মাল—লোকে এখন অসম্মানসূচক "চীজ" অভিধা দেয়, কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক, এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিতে পারি না। নেপথ্যদর্শনে অর্থাৎ উলটাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, বাল্যকালে দুজনেই পড়াশুনায় অমনোযোগী, খেলাধূলায় দক্ষ, দুর্দান্ত প্রকৃতির বালক ছিল। তাহাদের উৎপাতে পাড়ার আবৃদ্ধবনিতা অর্থাৎ কর্তা ও গিন্নীরা সর্বদা সশঙ্ক সন্ত্রস্ত থাকিতেন। রাস্তায় বেওয়ারিস ঘোড়া দেখিলেই তাহারা পালা করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া, বিনা লাগামে ও জিনে দাবড়াইয়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড নিরীহ পথিকের পক্ষে সচকিত ও বিপদসঙ্কুল করিত এবং দলভ্রষ্ট বা পথভ্রান্ত পাঁঠা দেখিলেই সেটিকে কব্জা করিয়া নিশীথরাত্রে নিঃশব্দে বড়ালদের প'ড়ো বাগানবাড়িতে সদলবলে "ফিস্টি" লাগাইত। হরিদাসের বুলবুল ভাজা, আলু-কাবলি ও গোলাবি গেণ্ডেরি-ওয়ালারা তাহাদিগকে দেখিলেই ঊর্ধ্বপুচ্ছ গাভীর মত দৌড় মারিত, কারণ প্রত্যেককেই কোন-না-কোন সময়ে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়া বস্তুমূল্যে ঠগীকর যোগাইতে হইয়াছে। লুণ্ঠনের ভাগ পাইয়া বরানগরের বাল-সমাজ উভয়কে আদর্শপুরুষজ্ঞানে ভয়ভক্তি করিত। কিন্তু প্রবীণেরা বলিতেন, ত্রেতায় পরস্পরবিরোধী রামরাবণের যুদ্ধে সোনার লঙ্কা ছারখার ও ত্রিভুবন তোলপাড় হইয়াছিল, কলিতে রামরাবণের সৌহার্দ্যে এখন বরানগর ছারখার হইতেছে, ভবিষ্যতে ত্রিভুবনও প্রকম্পিত হইবে।

তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। প্রুফে একটু ভুল ছিল, মহাকাল তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন—ত্রেতার ঐতিহ্য কলিকালেও অটুট আছে। অর্থাৎ, দুই বন্ধু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যতঃ বন্ধু নাই, দুই পরস্পরবিবদমান দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি করিয়া এইরূপ ঘটিল সে কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের পলিটিকাল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা সংক্ষেপে সূত্রমাত্র দিতেছি।

রামচন্দ্রের প্র-প্র-প্র-পিতামহের পিতামহ ভীমচন্দ্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার বরাহনগর মোকামের সেরেস্তাদার খানখানান উজবেকআলি বেগের খাস দাওয়ান ছিলেন। দোলদুর্গোৎসব, বারমাসে তেরপার্বণ—ভীম ঘোষের যেমন রবরবা তেমনই দাপট ছিল। কালের দুরন্ত কশাঘাতে ভীমের গদার তুলা ও ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি বাহির হইয়া ঝড়ের মুখে এদিক-ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্রের পিতা দশরথ ঘোষ কোনওক্রমে একটা ডাইংক্লিনিঙের দোকান ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুত্র রামচন্দ্রই তখন একমাত্র ভরসা। ঘুড়ি-লাটাই ডাণ্ডাগুলি হাডুডুডু ও ফুটবলের মধ্য দিয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিয়া রামচন্দ্র যখন ইন্টার আর্টসের চৌকাঠ পার হইয়া স্কটিশচার্চ কলেজে বি.এ. পড়িতেছে এমন সময় অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সসম্মানে "পরিত্রাণায়" অসহযোগ আন্দোলনের সুদর্শনচক্রহস্তে অবতাররূপী মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রীয় জগতে "সম্ভব" হইলেন। বাইবেল-ক্লাসের সংক্ষিপ্ত কালটুকুকে বাল্যকালের অভ্যস্ত বীরত্ব প্রকাশের পক্ষে অতীব সঙ্কীর্ণ স্থানে পিতার ধোলাই এবং ধোলাই কারবারের ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতারূপ সীতা উদ্ধারকল্পে অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনরূপ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যখন রাক্ষসদের কারাকবলমুক্ত হইয়া আবার ভারত-উপকূলে ভাসিয়া উঠিল তখন দশরথ গতাসু, তাই ত্রিবর্ণ পতাকাধারী পুষ্পমাল্যশোভিত মহিমান্বিত বীরপুত্রকে প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

রাবণচন্দ্রের বংশতালিকা অতখানি অতীত-গৌরববাহিনী নয়, ইংরেজরা যাহাদের 'আপস্টার্ট' অখ্যাতি দেয় রাবণের পিতা হিরণ্যকশিপু বসু সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া শত্রুরা নাসিকাকুঞ্চিত করিত। তিনি শিয়ালদহ-পুলিসকোর্টের দুঁদে উকীল। মক্কেলের কাজে মেজাজ যত মোলায়েমই দেখান, ঘরে তাঁহার মেজাজ তিরিক্ষি, শাসন কড়া। রাবণকে "বাধ্যতামূলক" ভাবে এক 'চান্সে'ই ম্যাট্রিক, আই. এ., বি. এ. পাস করিতে হইল। ভগীরথের মত চরকা-ঘর্ঘর-শঙ্খ বাজাইয়া গান্ধীজী যখন কলিকাতার হুগলীখাল প্লাবিত করিলেন, রাবণচন্দ্র তখন এম. এ. ও ল একই সঙ্গে পড়িতেছে এবং ছাত্রসমাজের ডিবেটিং কম্পিটিশনে কৃতিত্ব দেখাইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। হিরণ্যকশিপুর প্রতাপ তখনও অটুট, কাজেই হুগলীতে গঙ্গার প্লাবন রাবণকে স্পর্শ করিল না।

রাবণচন্দ্র যখন ডিবেটিং সোসাইটিতে যুক্তিকে ধারাল এবং লজিককে সূক্ষ্মতর করিতে ব্যস্ত, রামচন্দ্র তখন ফলতা-টু-কাশীপুরের মিল-এরিয়ার খোলা মাঠে জীমূতমন্দ্রে বক্তৃতা প্র্যাকটিশ করিয়া সিদ্ধ হইয়া অসহায় জনতাকে ইচ্ছামত হাসাইতেছে কাঁদাইতেছে, তাহারা হস্তামলকবৎ তাহার এতই আয়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে যে আজকাল "শ্রীরামচন্দ্রজী কী জয়" ঘোষণা করিবার কালে অরিজিন্যাল শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে না।

ত্রিশ হইতে তেত্রিশ এবং বিয়াল্লিশ হইতে ছেচল্লিশ সনের শেষতক রামচন্দ্র জেলে কাটাইল। রাবণচন্দ্র এম. এ. ও ল পাস করিয়া পিতার আগ্রহে ও বদান্যতায় বিলাত গেল এবং সেখানে ডিবেটিংয়ে প্রভূত সম্মান ও গ্রেজ ইনে বার-এট-ল ছাপ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে এনরোলড হইল। হিরণ্যকশিপু পুত্রের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বাল্যের অবদমিত (রিপ্রেসড) সমাজবিরোধী মনোবৃত্তি রাবণচন্দ্রের কাজে ও চিন্তায় পুনর্মুক্তি খুঁজিতে লাগিল। রাবণচন্দ্র অতীব সঙ্গোপনে উৎকট বামপন্থীদলের পার্টিখাতায় নাম লিখাইল।

ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত পূর্বইতিহাস। একটা ব্যাসকূটও পূর্বাহ্নে এখানেই নিরাকৃত হওয়া প্রয়োজন। কাহিনীর শিরোনামাদৃষ্টে রসিক রোমান্টিক পাঠক স্বভাবতঃই অনুমান করিতেছেন, রামচন্দ্রের সুন্দরী স্ত্রীকে অপহরণ করিবার জন্য রাবণচন্দ্র নিশ্চয়ই কাহাকেও মারীচের মত সোনার হরিণ সাজাইয়া পাঠাইয়াছিল এবং সেই হতভাগ্যই এই ইতিহাসের লক্ষ্য। কল্পনাবিলাসী পাঠক মহাশয়কে আমরা বলিব, ঘটনা মোটেই এরূপ নয় বন্ধু। দেশনেতা

শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ চিরকুমার, আ-সহযোগ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী। সুতরাং সীতাহরণ ও মারীচ-বধ এক্ষেত্রে অবান্তর। এখানে মারীচ কে তাহা বলিতে আমাদের সংকোচ হইতেছে, তবু ঐতিহাসিককে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে, কাজেই বলিতেছি, মারীচ আমি, তুমি, আমরা, তোমরা অর্থাৎ মারীচ হইতেছে দেশের আপামর জনসাধারণ, সভাশোভাযাত্রাসংখ্যাবর্ধনকারী জনতা। এই "মারীচ" কথাটা আমরা কলিকাতার বিখ্যাত হৃদরোগবিশারদ পি. জি. হাসপাতালের ডক্টর ব্যানার্জির কাছ হইতে ধার করিয়াছি।

এখন কাহিনীর পরিণতিটা শুনুন।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। সংখ্যাগুরু দক্ষিণপন্থী রামচন্দ্রের দলের হস্তে শাসনক্ষমতা স্বতঃই ন্যস্ত হইয়াছে। কলির রামচন্দ্র স্বয়ং রাজা হইয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন ভার লইতে পারেন না, কারণ কলিতে অনেক পার্টি, অনেক দলাদলি। কলির রামচন্দ্র অন্তরালে থাকিয়া কলকাঠি নাড়েন, নেপথ্যবিধান করেন।

কাজেই রাবণচন্দ্র একদা গভীর নিশীথে চালতাবাগানে রামচন্দ্রের ভাড়াটে ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিল, দাদা, আমি রাবণ। রামচন্দ্র রাবণের গোপন অপকীর্তির কথা দুর্মুখদের মুখে কিছু কিছু অবগত হইয়া বেশ অপ্রসন্নই ছিল, একটু শুষ্ককণ্ঠেই বলিল, তা রাবণ ভায়া, এখানে কি মনে করে?

একটা প্যাক্ট করতে এলাম দাদা।

প্যাক্ট? কিসের প্যাক্ট?

রাবণের বাম চক্ষু ও বাম ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া মৃদু হাসি ফুটিল। বলিল, প্যাক্ট এই রুজিরোজগারের। যা বাজার পড়েছে, তোমার ধোলাই-কারবার তো ধুয়েমুছে গেছে। বিয়ে-থা কর নি বটে কিন্তু আমি তো জানি, জ্যেঠাইমা মানে তোমার মা আছেন, ভাইবোনেরাও সপরিবারে তোমার কাঁধে চেপে আছে। বক্তৃতা ভাল দিলে নাম হয় বটে কিন্তু এদেশে পয়সা তো মেলে না। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস কর তা হলে বলব, এদেশের হাইকোর্টেও অকাট্য যুক্তি আর সূক্ষ্ম লজিকের কোনও দাম নেই। জজেরা আবেগময়ী বক্তৃতা আর হুজুর-হুজুরের ভক্ত। ছেলেবেলায় রামচন্দ্র ঘোষের শাগরেদি করে কাঁচুমাচু হয়ে মামলা জেতা আমার পছন্দ হয় না। কাজেই মক্কেলও জোটে না। বাবার খুব নামডাক রোজগার ছিল, কিছু রেখেও গিয়েছিলেন কিন্তু একে একে তালপুকুরের তালগাছ সব সাফ হয়ে এসেছে দাদা। এখন ভরসা এই প্যাক্ট।

আরে ছোঁড়া, খুলেই বল না, কিসের প্যাক্ট?

তুমি ডাইনে নাম করেছ, ডাইনেই থাক, আমি বাঁয়ে যাই। আর যোগসাজসে ডাইনে-বাঁয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়ে রাখি। বাজার সরগরম রাখলে—

রামচন্দ্র ধমক দিয়া বলিল, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস? বাঁয়ে তো তুই আগেই ভিড়েছিস, আজ এসেছিস আমড়াগাছি করতে। যা, ভাগ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগানো গেল না। রামচন্দ্রের নরম মন, তাহা ছাড়া মনে মনে হয়তো ত্রেতার ট্রাডিশন অনুযায়ীই রাবণের প্রতি তাহার টান ছিল। প্যাক্ট হইয়া গেল। কী সে প্যাক্ট তাহা খুলিয়া বলা সম্ভব নয়, পাঠককে অনুমানে বুঝিতে হইবে।

ধনী ব্যবসায়ী মহলে স্বভাবতঃই রামচন্দ্রের অগাধ প্রতিপত্তি। রাম-রাজত্বের ইহারাই খুঁটি। একবার রাবণ এক বক্তৃতায় 'মেঘনাদবধ' কোট করিয়া বলিয়াছিল, এই রক্তচোষা ধনীরা দক্ষিণপন্থী ভি. আই. পি.দের মাথায় "ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুতফণা ধরেন আদরে ধরারে।"

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এবং উচ্চ-বেতন-নিশ্চিন্ত শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে লজিকম্যাজিকওয়ালা রাবণচন্দ্রের প্রসার-প্রতিপত্তি দিনে দিনে পরিবর্ধমান হইতেছিল। ছেলে-মেয়েরা হৈ-চৈ চায়, সরকারী কর্মচারীদের ঈর্ষাজর্জরিত চিত্তে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

প্রবল অসন্তোষ ; রাবণচন্দ্র দুইটিকেই কাজে লাগাইতে লাগিল।

পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গমঞ্চ গোপন প্যাক্টের ফলে কিছুকাল মিলনান্ত নাটকের অভিনয়ে নিরুপদ্রব রহিল। কিন্তু উৎপাতহীন নিশ্চিন্ততা বামপন্থীর পক্ষে বাম, মারাত্মক। কাজেই হঠাৎ একদিন শোনা গেল ট্রাম-স্ট্রাইক হইবে। রামচন্দ্র রাবণের দ্বিমুখীনতার আভাস পাইয়া মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিল, ট্রাম-স্ট্রাইক ঘোষণায় সে বিচলিত হইল এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া স্ট্রাইক এবং সমবেদনাসঞ্জাত হরতাল রদ করিতে মনস্থ করিল।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে রাবণচন্দ্র রামচন্দ্রের গৃহাকাশে উদিত হইল। রামচন্দ্র সরাসরি প্রশ্ন করিল, এ কী কাণ্ড শুরু করেছ, এমন তো কথা ছিল না।

চ্যাঙড়াদের কন্ট্রোল করতে পারছি না দাদা। তুমি এবারটা ক্ষ্যামাঘেন্না করে সরে যাও। আর এমন ভুল হবে না।

মানে, বাধা দেব না?

দোহাই দাদা, তা হলে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। তুমিও মরবে, আমি মরব।

কিন্তু আমি যে ভলান্টিয়ারদের পোস্টিংয়ের হুকুম দিয়েছি। তাদের এখন ঠেকাবে কে?

তুমি নতুন হুকুম ইসু কর, গোড়ায় একটু গোলমাল হয়তো হবে কিন্তু তোমার হুকুম পেলেই আমি শেষ রক্ষা করব।

শেষরক্ষা সত্য সত্যই হইল, অর্থাৎ রাবণের জিত, রামচন্দ্রের হার হইল। ট্রাম-বাস পোড়ানো, ইটপাটকেল ছোঁড়া, বোমা-কাঁদুনে গ্যাসের খেল শুরুতেই শেষ হইল, কারণ দক্ষিণপন্থী ভলান্টিয়ারদের কোথাও দেখা গেল না। হরতাল সাকসেসফুল, ট্রামধর্মঘট জয়যুক্ত হওয়াতে রাবণের জয়জয়কার হইল।

কিন্তু খিলাফৎ প্যাক্টের মত, স্বরাজ্যপার্টির প্যাক্টের মত এ প্যাক্টও টিকিল না। দস্যু রত্নাকর শুরুতে রাম-নাম উচ্চারণ করিতে অপারগ হইয়া "মরা-মরা" বলিতে বলিতে রাম-নাম-উচ্চারণের পুণ্যবলে পাপমুক্ত হইয়াছিল, রাবণচন্দ্রও বাহিরে রামচন্দ্রের শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করিতে করিতে সত্যসত্যই তাহার ঘোরশত্রু হইয়া উঠিল। তখনই গোল বাধিল। রামচন্দ্র নিজের হাত কামড়াইতে লাগিল কিন্তু তখন উপায় ছিল না। ইদানীং রাবণ নিশাভিসারে রামের কাছে আসা বন্ধ করিয়াছে। রাম জানিয়া বুঝিয়াও বোকা বনিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে কঠিন হইয়া রাবণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সুযোগ অচিরাৎ মিলিল। রাস্তাঘাটে বনেবাদাড়ে স্টেশনে ক্যাম্পে—যেখানে যত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ছিল রাবণ নানা কৌশল-কসরতে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদিগকেই মারীচস্বরূপ ব্যবহার করিয়া রাবণ রামচন্দ্রের সীতা অর্থাৎ ক্ষমতা অপহরণে তৎপর হইয়াছিল। এবারও স্থান সেই রামায়ণ-খ্যাত দণ্ডকারণ্য। দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন চলিবে না—ইহাই হইল রাবণের ইসু। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বনবাদাড় ক্যাম্প, কলিকাতার পথঘাট স্টেশন এই অসহায় নিরন্ন বিপন্ন মানুষগুলির দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় দেশের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্কিল ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। মাংসলোলুপ ধনী ব্যবসায়ী মক্কেলদের সামলাইতে রামের প্রাণান্ত হইতেছে। দণ্ডকারণ্যকে বাসযোগ্য ও নিরাপদ করিয়া ইহাদিগকে সেখানে চালান না করিলে রাজ্যের সমূহ বিপদ। রাবণের সমূহ বিপদ ইহারা অপসারিত হইলে। কলিকাতায় এবং কলিকাতার আশেপাশে ইহারা আছে বলিয়াই "চলবে না" মিছিলে একডাকে কয়েক হাজার মারীচ পাওয়া যায় ; রাজভবন, মন্ত্রণাভবন, মহাকরণিকভবন, প্রধানমন্ত্রীভবন ঘেরাও করিয়া মন্ত্রী-পরিষৎকে বিচলিত ও শঙ্কিত করিবার ইহারাই একমাত্র অস্ত্র। সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া প্রতিবাদ মিছিলে তেরটি লোক লইয়া কেরোসিনের কুপির মত টিমটিম করিতে করিতে লালদীঘি অভিযান করিলে বামপন্থীরা হাস্যাস্পদ হইবে। কাজেই যেন-তেন-প্রকারেণ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

বানচাল করিতেই হইবে।

দুই পক্ষই প্রস্তুত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন কুরুরাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের মত শেষবারের জন্য রামভবনে রাবণের নিশীথাভিসার হইল। শরৎ মহারাজ কথিত 'লীলা-প্রসঙ্গে'র সে শিষ্যভাব আর নাই, একেবারে শুরুর সেই রণংদেহি-ভাব। রাম বলিল, আবার কী মতলবে?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বন্ধু এবং সখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা শুনিয়েছিলেন। আমি তোমার বন্ধু, সখা এবং ছোটভাইও। দাদা, এখনও বলছি নিবৃত্ত হও। নবযুগের গীতা তোমাকে শোনাতে এসেছি।

কার্লমার্কসের জবানিতে তো? ও আমার পড়া আছে।

না, আরও নতুন—

লেনিনের?

না, আরও অভিনব—

স্টালিনের?

না দাদা, তার পরেরও কথা আছে।

তবে পরের কথা যুদ্ধের পরে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অনুশাসন-পর্বে অনুগীতা শুনিয়েছিলেন। তুমি অনুজ, অনুগীতা শোনাতে পার। সেই পর্বে তুমিও এসো, আমি প্রস্তুত থাকব।

দেখ, তোমার সঙ্গে প্যাক্ট যখন ভেঙেই গেছে, রুজিরোজগারের কথা আর তুলব না। তোমার কল্যাণের জন্যে বলছি, প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমি হেরে যাবে।

রামচন্দ্রের রক্তে মৃত ভীম ঘোষের সিংহ-আত্মা গর্জন করিয়া উঠিলঃ কী, ভয় দেখাতে এসেছ?

শেষে উভয়পক্ষে যে আন-পার্লামেন্টারি বিশেষণ ও সম্বোধন বিনিময় হইল, ঐতিহাসিকের তাহা রেকর্ডযোগ্যও নহে। শেষ-দুটি বাক্য মাত্র ঐতিহাসিক। রাবণ বলিল, ক্যাপিটালিস্ট-গ্র্যামফেড র‍্যাম, সাবধান, তোমাকে মাটন বানিয়ে চপ করে খাব।

রাম বলিল, দূর হ ভূশণ্ডির মাঠের র‍্যাভেন, কা কা করে আর দিক কবিস না।

ইহার পর শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। গড়ের মাঠে অক্টারলনি মনুমেন্টের পাদদেশে শক্তিপরীক্ষা। রাবণের অর্গ্যানিজেশন নিখুঁত। হাজার হাজার বিপন্ন উদ্বাস্তু মারীচ সেখানে সমবেত হইয়া "চলবে না, চলবে না" ধ্বনিতে ফাটা মনুমেন্টে আরও ফাট ধরাইতেছে। সমস্ত দিনের আয়োজনের উত্তেজনায় রাবণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে উঠিল সবশেষে। তাহার নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। সে কষ্ট উপেক্ষা করিয়া সে বজ্রনির্ঘোষে বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু প্রেমাস্পদার কানে কানে প্রেমিকের গভীর আবেগকম্পিত মৃদু ফিসফিসের মতো মাইক ঘোষণা করিল—ভাই সব, জান দিয়াও মান রাখিতে হইবে। রক্তপায়ী ছারপোকাদের টিপিয়া টিপিয়া নিঃশেষে রক্তটুকু বাহির করিয়া লইয়া তবে মারিবে। মানুষের প্রাণ লইয়া এইভাবে গেণ্ডুয়া খেলা—মানুষ আমরা কিছুতেই ঘটিতে দিব না। মোটর-কারেই যাহাদের বিলাস-ভ্রমণ তাহারা নিরীহ দরিদ্র পথচারী মানুষকে চাপা দিতে পারিলেই খুশী হয়। কিন্তু পথের মানুষ সমবেত হইয়া যদি ঘুরিয়া দাঁড়ায়, গতির মুখে তাহাদের দুইদশটির প্রাণ হয়তো বলিদান হইতে পারে কিন্তু মোটরকারসহ ধনী বিলাসীকে ছাতুমাত্রে পর্যবসিত করিতে বেগ পাইতে হয় না। আমরা তাহাই করিব, ছাতু করিয়া দিব, ছাতু—

রাবণ হঠাৎ ডায়াসের উপরে এলাইয়া পড়িল। দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে প্রথমে একটা অসহায় হতভম্ভ ভাব কিন্তু তার পরেই হৈ-হৈ কোলাহল। সভা ভাঙিয়া গেল। বামপন্থী ডাক্তার মজুমদার ডায়াসের উপরেই ছিলেন, তিনি হাঁটু গাড়িয়া পরীক্ষান্তে বলিলেন, করোনারি থম্বসিস। এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তার মজুমদার নিজের

গাড়িতে করিয়া করোনারিশেলাহত অচৈতন্য রাবণকে পি. জি. হাসপাতালে লইয়া গিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাবলে কেবিনজাত করিলেন।

মারীচ-সম্প্রদায় উঠি-উঠি করিতেছে এমন সময় গগনবিদীর্ণ করিয়া রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি শোনা গেল। দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের পরিত্যক্ত ডায়াস ও মাইক অধিকার করিয়া অচিরাৎ মনুমেন্টপ্রকম্পী বক্তৃতা জুড়িয়া দিল। যাহারা চিরকাল "রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে বক্তৃতার বিষয়বদলে তাহাদের কোনই আপত্তি হইল না। বাম ডাহিন, হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পারিলে সব সমান। আর হৃদয়বিদারক ভাষা ও ভঙ্গিতে বলিবার ক্ষমতা রামচন্দ্রের ছিল। সে বজ্রনির্ঘোষে বলিল—ভাই সব, গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ঢালিয়া আত্মহত্যা করিও না। যাহারা তোমাদের কল্যাণকামী সাজিয়া তোমাদিগকে হিতাহিত বিবেচনাহীন ভেড়ার মত নিশ্চিত মৃত্যুগহ্বরে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছে তাহারা তোমাদের শত্রু। নিজেদের স্বার্থসাধনে উহারা তোমাদের সর্বনাশসাধনে পশ্চাদপদ যে নয় তাহার প্রমাণ তোমরা বহুবার পাইয়াছ। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের বুভুক্ষু মুখে উহারা কি এককণা তণ্ডুল দিতে পারিয়াছে, তোমাদের নগ্নগাত্রে কি একফালি জীর্ণবস্ত্রের আবরণ উহারা দিয়াছে? প্রতারকের কথায় ভুলিও না। ওঠো, জাগো, যাহা শ্রেয় তাহাই বাছাই করিয়া লও—

আকাট-বামপন্থী দুইচারিজন এখানে-ওখানে তখনও ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জত লইয়া রাত্রির অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলিয়াছে কে? তোমার ধনী পৃষ্ঠপোষকদের দালালরা। আর আজ আমাদের ভাল করিতে আসিয়াছ তুমি? ফাই, ফাই অন ইউ।

হৈহৈ কোলাহল উঠিল। রামচন্দ্র কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া কোলাহল থামাইতে গেল কিন্তু দীর্ঘকাল জেলের মধ্যে নানা কায়িক অত্যাচার ভোগ করিয়া তাহার হার্ট জখম হইয়াছিল। নিতান্ত মনের জোরে সে দৌড়ধাপ বক্তৃতা করিয়া বেড়াইত বটে কিন্তু ভঙ্গুর দেহ আজ আর এতখানি উত্তেজনার ভার সহিতে পারিল না। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ বাতাহত কদলির ন্যায় মাইকের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

সন্তর্পণে সশ্রদ্ধভাবে রামভক্তেরা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যের পরামর্শমতে রামচন্দ্রকে পি. জি. হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ কেবিনে তাহাকে ভর্তি করা হইল।

পরদিন প্রাতে দুই পরস্পরবিরোধী উত্তেজনার বশে যখন শহরবাসী দুই দলে বিভক্ত হইয়া শোভাযাত্রা করিতে ও শোভাযাত্রা ভাঙিতে তৎপর হইয়াছে, হাতবোমা, ইটপাটকেল বর্ষণে রাস্তার বাতি, পথনির্দেশক বৈদ্যুতিক চিহ্ন এবং ফায়ারব্রিগেডের আহ্বান-যন্ত্র একদল ভাঙিতেছে এবং অন্য দল লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতেছে, ট্রাম পুড়িতেছে, বাস পুড়িতেছে এবং ধরপাকড় এমন কি গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, পি. জি. হাসপাতালে তখন দুই বন্ধু একই কামরায় মিলিত হইয়াছে। রাবণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই সুস্থ হইয়াছিল, বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে হাওয়ায় ওড়া পর্দার ফাঁক দিয়া শয্যাউপবিষ্ট রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া অনাবিল উচ্ছ্বাসে তাহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়াছে। তাহাকে এক ভক্তিময়ী বামপন্থী গতরাত্রেই একটিন ·নেসকফি ভেট দিয়া গিয়াছিল। সে নিজের কেবিনে গিয়া নার্সের কাছে দুধ ও গরম জল চাহিয়া লইয়া দুই কাপ কফি পরিপাটি ভাবে প্রস্তুত করিয়া রামচন্দ্রের কেবিনে লইয়া আসিয়াছে এবং রামচন্দ্রও উপহৃত কোলে বিস্কুটের টিন খুলিয়া মুচমুচে নোনতা বিস্কুট বাছাই করিয়া রাবণকে দিয়া নিজেও লইয়াছে এবং পরস্পরকে তারিফ করিতে করিতে কফি সহযোগে বিস্কুট ভক্ষণ অন্তে রামচন্দ্র 'করোনা' চুরুট ও রাবণচন্দ্র 'চারমিনার' সিগারেট ধরাইয়া আরাম করিয়া টানিতেছে দেখা গেল।

কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ হার্টস্পেশালিস্ট ডাক্তার ব্যানার্জি বেলা ঠিক দশটায় রোগী

পরিদর্শনে আসিয়া দুই দেশবিখ্যাত রোগীকে একই কেবিনে একই শয্যায় ওই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। তাঁহার চোখেমুখে একটা প্রশ্নের ভাব ফুটিতে দেখিয়া রামচন্দ্র একটু জবাবদিহি করা আবশ্যক মনে করিল। সেও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আমরা বাল্যবন্ধু, ডক্টর ব্যানার্জি।

ডক্টর ব্যানার্জির মুখফোড় দুর্নাম আছে। তিনি বলিলেন, রামরাবণে তো বেশ একসঙ্গে বসে কফি-বিস্কুট-তাম্রকূটধূমের সঙ্গে আঁতাত করছেন, ওদিকে যে বেচারা মারীচদের রক্তে কলকাতার রাজপথ ভেসে গেল। মারামারি চলছে এখনও। আর. জি. কর, ন্যাশনাল, নীলরতন, মেডিকাল, ইসলামিয়ার সব বেড ভর্তি, এখন শম্ভুনাথ উপচে আমাদের এখানেও ঠেল মারছে। এমার্জেন্সী ওয়ার্ড আর কোপ করতে পারছে না।

রাম রাবণ উভয়ে একসঙ্গে লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

ভাদ্র ১৩৬৭

রায় বাহাদুর

"বনফুল"

রায় বাহাদুর কর্তব্য-কর্মে লিপ্ত ছিলেন।

গত কয়েক দিবস হইতে তাঁহার আহার-নিদ্রা নাই বলিলেও চলে। বিদ্রোহ-দমনার্থ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিতে হইয়াছে। আইনভঙ্গকারী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিবার আদেশ দিয়া, বিদ্রোহী নেতাগণকে বন্দী করিয়া, পলাতক আসামীদের নামে সমন জারি করিয়া কর্তব্যপরায়ণ রায় বাহাদুর গত কয়েক দিবস হইতে আইন ও শান্তি রক্ষাকার্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, এ জাতীয় কার্য করিতে অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু দেশের এই দুর্দিনে, স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়াই, তাঁহাকে এই সকল অপ্রিয় কর্তব্য করিতে হইতেছে। তিনি ইহা জানেন যে, জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিলে অনেক নিরীহ লোকও মারা পড়ে, যাহারা পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নির্দোষ লোক থাকাও অসম্ভব নহে; কিন্তু কি করিবেন তিনি! কেহই যে আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে না, সকলেই যে আইনভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় নিক্তির ওজনে বিচার করিয়া চলিলে বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব। বিদ্রোহীদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে বিভীষিকাপূর্ণ বিকটতা অবশ্যম্ভাবী। এই আকস্মিক বিপদ হইতে, যে কোন উপায়েই হউক, দেশকে রক্ষা করা প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। তিনি কর্তব্যে অবহেলা করিতে অপারগ।

রায় বাহাদুর একাগ্রচিত্তে লিখিতে লাগিলেন।

রায় বাহাদুর দেশদ্রোহী নহেন। তিনিও স্বদেশহিতৈষী। কিসে দেশের মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল, তাহা তাঁহার অবিদিত থাকিবার কথা নহে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ইতিহাসেই প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। এতকাল শাসন-বিভাগে কর্ম করিয়া তিনি দেশের কার্যই করিয়াছেন এবং মর্মে মর্মে ইহাই বুঝিয়াছেন যে, ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুগত্য করিলেই ভবিষ্যতে হয়তো আমরা কোন দিন স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা লাভ করিলেও করিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই।

যাঁহারা অন্য পন্থার কথা চিন্তা করিয়া স্বল্পবুদ্ধি অথবা দুষ্টবুদ্ধিবশে উত্তেজনাপ্রবণ জনতাকে বিপথে চালিত করেন এবং দেশের অগ্রগতিকে পিছাইয়া দেন, তাঁহারা উন্মার্গগামী বাতুল মাত্র। গারদই তাঁহাদের যোগ্য স্থান।—

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রায় বাহাদুর লেখনী সংযত করিলেন। দূরে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে। কিন্তু সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, রিপোর্টটা আজই লিখিয়া ফেলিতে হইবে। আবার তিনি কাজে মন দিলেন।

—লুঠতরাজ করিলে আমরা স্বাধীন হইব? রেল-স্টেশন, পোস্টঅফিস পোড়াইয়া দিলেই স্বরাজ হইবে? টেলিগ্রাফের তার কাটিলেই বৃটিশ-সাম্রাজ্য পঙ্গু হইয়া যাইবে? ইহারা ক্ষ্যাপা, না পাগল!

যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ইহাদের দৌলতেই যাইবে। ইতিহাসের নজির তুলিয়া রায় বাহাদুর অনায়াসেই প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, ইংরেজ-শাসনের প্রভাবে আমরা কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সুসভ্য আত্মসচেতন জাতিতে পরিণত হইতেছি এবং ভবিষ্যতে ক্রমশ কিরূপে

সুপক্ক হইয়া অবিমিশ্র স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইব। এখনও যে আমরা অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অসমর্থ আত্মকলহপরায়ণ সুবিধাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া অর্থহীন। যোগ্য হইলেই ব্রিটিশ জাতি যে আমাদের স্বাধীনতা দিতে ইতস্তত করিবেন না, এ বিষয়ে রায় বাহাদুর নিঃসন্দেহ। যোগ্যের সমাদর করিতে বৃটিশ জাতি কখনও পরাঙ্মুখ নহেন—ইহার প্রমাণ তিনি নিজেই। অখ্যাত বংশে তাঁহার জন্ম। দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র তিনি। অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া প্রভূত অধ্যবসায়বলে তিনি বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী ইংরেজ তাঁহার সে দুরূহ তপস্যার জন্য অভীষ্ট বরদান করিয়াছে।—

বন্দে মাতরম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ—কোলাহলটা ক্রমশ নিকটবর্তী ও প্রবল হইয়া উঠিল।

বন্দে মাতরম—ইনকিলাব জিন্দাবাদ—

বন্দে মাতরম—ইনকিলাব জিন্দাবাদ—

বন্দে মাতরম—ইনকিলাব জিন্দাবাদ—

চিৎকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল।

দুম—দুম—দুম—দুম—

গুলি-বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। তারপর সব চুপ। রায় বাহাদুর উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতেছে। একটা লোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় মারা গিয়াছে। তাহার হাতে কংগ্রেসের পতাকা। রায় বাহাদুর নামিয়া গেলেন। রক্তাক্ত দেহটার পানে চাহিয়া ক্ষণিকের জন্য তাঁহার হৃদস্পন্দন থামিয়া গেল। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ক্ষণিকের জন্য তিনি বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর মুহূর্তেই মোটরে চড়িয়া কমিশনার-ভবনের উদ্দেশ্যে তিনি ছুটিতে লাগিলেন—নির্বোধ ছেলেটার হঠকারিতার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে হইবে।

কার্তিক ১৩৪৯

'—ট্রিটি'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'লাগ' ও 'ফাঁস' শব্দ দুটি নাগ ও পাশের অপভ্রংশ রূপ নয়। দুটিই আভিধানিক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং দুটি ব্যক্তির নাম। 'লাগ' অর্থে লাগাইয়া দেওয়া বা বাধাইয়া দেওয়া, আর 'ফাঁস' অর্থে ফাঁসাইয়া দেওয়া। আরও একটু খুলিয়া বলা দরকার, বিবাদই হউক আর বন্ধুত্বই হউক, একজন বাধাইয়া দেন অর্থাৎ লাগাইয়া দেন, অপরজন সে বিবাদ বা বন্ধুত্ব ফাঁসাইয়া দেন। বিবাদ ফাঁসাইয়া মিটমাট হয়, বন্ধুত্ব বাধে; বন্ধুত্ব ফাঁসাইয়া বিবাদ বাধে; মোট কথা, পৌনঃপুনিক নিয়ম অনুযায়ী ইহা চলিতেই থাকে। তাহার উপর দেশে ষষ্ঠীপূজার সমারোহ এখনও একবিন্দু কমে নাই, লোক-সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, সুতরাং উপলক্ষ বা পক্ষের অভাব হয় না। তবে কে যে 'লাগ' আর কে যে 'ফাঁস', এ নিরাকরণ এখনও হয় নাই, বোধ হয় এ জীবনে হইবেও না; কারণ ইনি যেখানে বিবাদ লাগাইয়া দেন, উনি সেখানে ফাঁসাইয়া দেন; আবার উনি যেখানে লাগাইয়া দেন, ইনি সেখানে 'ফাঁস'-মূর্তিতে আবির্ভূত হন।

পরস্পরের বাড়ি আট মাইল দূরবর্তী দুখানি গ্রামে। একজন কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শাক্তবংশের সন্তান। কালীচরণের আবক্ষলম্বিত দাড়ি, বড় বড় গোঁফ, বড় বড় চুল; কপালে সে একটা পয়সার মত আকারের সিঁদুরের ফোঁটা কাটে, গলায় ইয়া মোটা এক রুদ্রাক্ষের মালা পরে এবং মোটা গলায় মধ্যে মধ্যে ডাকে, কালী কালী! সে ডাক শুনিলে মনে হয়, কালী কালীচরণের বদ্ধকালা ঝি। পৈতৃক ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহার উপর ভাগ্যক্রমে জুটিয়াছে এই লাগ-ফাঁসের ব্যবসায়।

অপরজন—রাধাচরণ, বৈষ্ণবধর্মী ব্রাহ্মণবংশের সন্তান, উপাধি গঙ্গোপাধ্যায়। রাধাচরণ কিন্তু কেশধর্মী নয়, মুখে তাহার দাড়ি-গোঁফের চিহ্নমাত্র নাই, মাথার চুল সে খুব ছোট করিয়া ছাঁটে, কেবল মধ্যমস্তকে পরিপুষ্ট লম্বা টিকি পাদপহীন দেশের এরণ্ডের মত ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে। গলায় চার ফের মোটা তুলসীর মালা, কপালে নাকে তিলকমাটির ফোঁটা ও বুকে হাতে পদচিহ্নের ছাপে রাধাচরণ বিশোভিত। সেও মধ্যে মধ্যে ডাকে, রাধে রাধে। মোলায়ম গলায় সুরের একটি রেশ ডাকের মধ্যে বেশ বুঝা যায়। সম্মুখের পথে সে সময় জলের কলসী লইয়া সিক্তবস্ত্রে যেসব পল্লীকন্যা বা বধূরা যায়, তাহারা আত্মগতভাবেই বলে, মরণ! এত লোকে মরে—। বাকিটা আর শোনা যায় না, মৃদু স্বর দূরত্বহেতু আর ভাসিয়া আসে না। রাধাচরণেরও পৈতৃক ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহার উপর এই লাগ-ফাঁসের ব্যবসায়।

একজন সাবমেরিন, অপরজন বোমাবর্ষী এরোপ্লেন। কালীচরণ কারণ-সলিলে অহরহই নিমজ্জমান; রাধাচরণ বৈষ্ণব, গঞ্জিকাপ্রসাদাৎ সে ব্যোমমার্গী। আবার উভয়েই উভয়ের পরমাত্মীয়, উভয়েই উভয়েব ভগ্নীপতি অর্থাৎ উভয়েই উভয়ের শ্যালক।

* * *

প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে একটি কায়স্থ জমিদারবংশকে উপলক্ষ করিয়া এই 'লাগ ফাঁস'-লীলা আরম্ভ হইয়াছিল। একই বাড়ি ভাঙিয়া দুই বাড়ি; এক বাড়ির মালিকের ছিল নেড়ানেড়ীর উপর প্রচণ্ড ক্রোধ, অপরজনের ছিল মাতালের উপর বিষম বীতরাগ। ফলে পারলৌকিক সদ্গতির জন্য প্রথম পক্ষ শরণ লইলেন কালীচরণের। কালীচরণ বলিল,

মাভৈ!

অপর পক্ষ রাধাচরণের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পায়ের ধূলা সুপ করিয়া মুখে এবং ভক্তিভরে মাথায় বুলাইয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, আমাকে পার করতেই হবে।

রাধাচরণ গদগদ হইয়া বলিল, রাধারাণী ভরসা!

সদ্গতি ইহলোকেই আরম্ভ হইল। দুই পক্ষেরই দীক্ষা হইল একই দিনে, একই স্থানে, পিতৃপুরুষের এজমালি ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ির এক দিকে কালীমন্দির, অপর দিকে গোবিন্দজীর আনন্দনিকেতন; উভয় দেবতার মন্দিরের সম্মুখে এক প্রশস্ত নাটমন্দির। সন্ধ্যায় উভয় পক্ষেরই গুরু-শিষ্যে আপন আপন ইষ্টদেবতার মন্দির-দুয়ারে বসিয়া স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবার কল্পনা চলিতেছিল। রাধাচরণ ও কালীচরণ পরস্পরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, কারণ কেহ কাহারও মুখ দেখিত না। সে কথা পরে বলিব। রাধাচরণ অকস্মাৎ নাক সিঁটকাইয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস টানিয়া বলিল, উঃ, এমন দুর্গন্ধ কিসের হে?

মাথা চুলকাইয়া শিষ্য বলিল, আজ্ঞে, ও বাড়ির ঠাকুর মশায় 'কারণ' করছেন।

বিষম ঘৃণায় ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া রাধাচরণ বলিল, রাধে রাধে, ছি-ছি-ছি! প্রভু বিরাজমান থাকতে এই অনাচার এখানে! তারপর সন্ধ্যায় যে রকম ঢাকের শব্দ। কাল থেকে তুমি এখানে সন্ধ্যায় হরিনামসংকীর্তনের ব্যবস্থা কর।

শিষ্য উৎসাহিত হইয়া বলিল, যে আজ্ঞে।

গাঁজার কল্কের গোড়ায় গোলাপজলে ভিজানো ন্যাকড়া জড়াইতে জড়াইতে রাধাচরণ বলিল, আর ও ঘৃণিত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটা বন্ধ করারও প্রয়োজন বাবা। রাধাগোবিন্দ ও গন্ধ সহ্য করতে পারেন না।—বলিয়া চোঁ করিয়া টান মারিয়া কুম্ভক করিয়া দম চাপিয়া বসিয়া রহিল। তারপর 'ফু' করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া কল্কেটি শিষ্যের হাতে দিল, বলিল, তাই জন্যে প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল, প্রভু আমার যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে আছেন। সন্ধ্যায় তুমি প্রভুর মন্দিরে ত্বরিতানন্দ ভোগের ব্যবস্থা কর; খুব সুগন্ধি ষোড়শাঙ্গী ধূপের ব্যবস্থা কর, যেন ওই পদার্থটার গন্ধ প্রভুর কানে আর না যায়, মানে নাকে।

শিষ্য আরও খানিকটা উৎসাহিত হইয়া বলিল, তাই করব আমি।

গুরু এবার বলিলেন, কিন্তু কই, তুমি তো ত্বরিতানন্দের প্রসাদ নিচ্ছ না। না না না, ওতে তুমি লজ্জা ক'র না। দেবভোগ্য বস্তু, দেখবে, জপ করতে কত একাগ্রতা আসে মনে।

শিষ্য সলজ্জভাবে মুখটি ঈষৎ ফিরাইয়া চোঁ করিয়া দম টানিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরই লালচে চোখ পিট পিট করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠিক বলেছেন আপনি, প্রভু আমার বিমর্ষ হয়েই আছেন।

* * *

পরদিন সন্ধ্যায় মহাসমারোহে সংকীর্তন আরম্ভ হইল। বারান্দায় গুরু-শিষ্যে ত্বরিতানন্দের ভোগ দিতেছিল। দশ বারোটি ধূপকাঠির মাথায় ধোঁয়া উঠিতেছে, সে বস্তুটার গন্ধ আজ সত্যই চাপা পড়িয়াছে।

ওদিকে কালীমন্দিরের দুয়ারে 'কারণ' করিতে করিতে কালীচরণ খোলের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া আরক্ত চোখে বলিল, একি অনাচার! খোলের শব্দে যোগমায়ার যোগভঙ্গ হবে যে! বন্ধ কর।

শিষ্য বিব্রত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, ওরা বলছে, তা হ'লে এখানে ঢাক বন্ধ করতে হবে।

হুম। চোখ পাকাইয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া হুঙ্কার দিবার ভঙ্গিতে কালীচরণ বলিল, হুম। সঙ্গে সঙ্গে এক পাত্র কারণ ঢালিয়া পান করিয়া শিষ্যের পাত্রও পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া বলিল, পান কর।

আবার একবার অকস্মাৎ বলিল, হুম। তারপর বলিল, উত্তম, তুমি মা কালীর দরবারে

বলির ব্যবস্থা কর।—বলিয়াই অভ্যাসমত হাঁক মারিয়া ডাকিয়া উঠিল, কালী কালী!

শিষ্য একটু দ্বিধাভরে বলিল, আজ্ঞে, বলির প্রথা তো প্রচলিত নেই, এজমালি নাটমন্দির, ওরা যদি বাধা দেয়।

কালীচরণ হাঁক দিয়া উঠিল, মাভৈ!

* * *

পরদিন দ্বিপ্রহরে ঢাকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। রাধাচরণ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, বাবাজী, একি ব্যাপার? বাজনাটা যে কেমন কেমন মনে হচ্ছে!

শিষ্য কোন উত্তর দিবার পূর্বেই একজন কর্মচারী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু, সর্বনাশ হয়ে গেল। ও বাড়ির কত্তা কালীমন্দিরে বলি দিলেন আজ।

বলি? বলি কি?

আজ্ঞে, পাঁঠা।

হা গোবিন্দ!—বলিয়া রাধাচরণ সেইখানেই গড়াইয়া পড়িল। নাটমন্দিরে তখন কালীচরণ পরমানন্দে সিংহনাদে গান ধরিয়াছে—

ও মা দিগম্বরী, নাচ গো!

* * *

রাধাচরণ শিষ্যকে বলিল,' বলি বন্ধ করতে হবে। মোকর্দমা কর তুমি। যা কখনও নেই, তা হ'তে পারে না। আমি জানি, হাইকোর্টে মোকর্দমা হয়েছে, তাতে শাক্তের দেবীমন্দিরে, এক অংশীদার বৈষ্ণবমন্ত্র নেওয়ায় তার পালার সময় বলি বন্ধ হয়েছে। আর এ বলি যখন কখনও নেই, তখন বলি হ'তেই পারে না।

শিষ্যও মাতিয়া উঠিয়াছিল, একে জমিদার, তায় জ্ঞাতি-বিরোধের গন্ধ, সর্বোপরি কিছুক্ষণ পূর্বেই গুরুর প্রসাদ পাইয়াছে। সে বলিল, আপনি আমার গুরু; আপনার কাছে শপথ করছি, এ অনাচার আমি বন্ধ করবই। দেখুন, একটা ভাল দিন দেখুন—

বাধা দিয়া রাধাচরণ বলিল, গুরুর সঙ্গে মঘা-ত্র্যহস্পর্শে যাত্রায় বাধে না। কালই চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব! দিনও অবশ্য কাল খুব ভালই, সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী।

শিষ্য কৃতার্থ হইয়া গেল। রাধাচরণ আবার গাঁজা লইয়া বসিল। ব্যোমমার্গী বোমাবর্ষী এরোপ্লেন উড়িল।

শিষ্যের নায়েব বলিল, মামলার চেয়ে আপনারা দুই গুরুদেবে মিলে একটা মীমাংসা ক'রে দিন—

বাধা দিয়া প্রচণ্ড ঘৃণাভরে রাধাচরণ বলিল, ও পাপিষ্ঠের আমি মুখ দেখি না।

* * *

কালীচরণের শিষ্য একটু চিন্তিত হইয়াই সংবাদটা দিল। কালীচরণ হা হা করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, এতেই তুই ভয়ে পেয়ে গেলি বেটা? মাভৈ রে বেটা. মাভৈ! চল, দেখি, আমার সর্বনাশী ন্যাংটা বেটী কি বলে দেখি! নিয়ে আয় কারণ।

কারণ পান করিয়া শিষ্যকে প্রসাদ দান করিয়া বলিল, দেখ, মায়ের হাসিটা দেখ!—বলিয়া নিজেই খল খল করিয়া হাসিয়া সারা হইল। শিষ্য মূর্তির দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই মা হাসিতেছেন। সে গুরুর পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

কালীচরণ বলিল, লাগিয়েছে মোকর্দমা, লাগাতে দে, তিন তুড়িতে আমি ফাঁসিয়ে দোব। হাইকোর্টের নজির আছে, শাক্তের বাড়িতে এক শরিক বৈষ্ণব হওয়ায় তার পালায় বলি বন্ধ হয়েছে। তখন শরিক শাক্ত হ'লে, তার পাল্লাতেই বা বলি প্রচলন হবে না কেন শুনি?

শিষ্য আর এক পাত্র কারণ পান করিয়া বলিল, ফিন কাল বলি দেঙ্গে জোড়া পাঁঠা।

কালীচরণ হাসিয়া বলিল, এক খোঁচাতেই মামলার তলা ফাঁসিয়ে দোব, ভাবছিস কেন?—বলিয়া হাঁক মারিয়া উঠিল, কালী কালী! আবার পাত্রে পাত্রে কারণ ভরিয়া উঠিল।

বাবা!—শিষ্যের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া বলিলেন, বাবা এই সব মোকর্দমা-ফৌজদারির চেয়ে আপনারা দুই গুরুতে বিচার ক'রে যদি মিটমাট ক'রে দেন, সেই তো ভাল হয়। আপনারা দুজনে পরমাত্মীয়—

কালীচরণ বিপুল বিক্রমে হাঁক মারিয়া উঠিল, কালী কালী! ও কথা ব'ল না আমাকে, ওটা হ'ল ভণ্ড, ওটা একটা পাঁঠা। মা কালীর দরবারে ওকে বলি দিলে তবে আমার রাগ যায়।

পরদিনই জোড়া পাঁঠা বলি দিয়া পূজান্তে কালীচরণ সশিষ্য সদরে রওনা হইল, মামলার জবাবের চেষ্টায়।

সাবমেরিন ভর ভর করিয়া ডুবিল।

* * *

বাক্যালাপ তো নাইই, কেহ যে কাহারও মুখ পর্যন্ত দেখে না—ইহার মধ্যে এতটুকু ছলনা নাই; কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ইহার কারণ স্মরণ করিয়া কালীচরণ দাঁত-কড়মড় করিয়া উঠে বন্য বাঘের মত; রাধাচরণ সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আক্রোশে মুখ চোখ তীক্ষ্ণ করিয়া দুলিতে থাকে দংশনোদ্যত কেউটের মত।

জীবনে প্রথম দেখা হইতেই ইহার সূত্রপাত।

রত্নপুরের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত টোলে একই বৎসরে দুই রত্নের আগমন হইয়াছিল। রত্নপুর গ্রামখানি কালীচরণ ও রাধাচরণ উভয়ের গ্রামের প্রায় মাঝখানে পড়ে। গ্রাম্য পাঠশালায় উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করিয়া দুইজনেই আসিয়া টোলে ভর্তি হইল। মহাপুরুষদের চিন্তাধারা প্রায় এক রকম, এবং কর্মধারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে এক রকমই হইয়া থাকে; এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। উভয়েই মনস্বী, উচ্চ-প্রাথমিক পাস করিতে করিতেই কালীচরণের দাড়ি বেশ ইঞ্চিখানেক লম্বা হইয়া গজাইয়া উঠিয়াছে, এবং রাধাচরণের মুখমণ্ডলেও তখন সপ্তাহে দুইবার ক্ষুর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কামানো মুখে কালসিটে দাগের মত আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কালীচরণ কয়দিন আগে আসিয়াছিল। কিন্তু রাধাচরণ যখন আসিল, তখন সে উপস্থিত ছিল না, পূর্বদিন সন্ধ্যাতেই স্থানীয় এক শিষ্যের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে গিয়াছিল। বেলা প্রায় দুপহরের সময় ঘর্মাক্ত দেহে পাঁঠার একটা ঠ্যাং হাতে করিয়া টোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠ্যাংটা ধপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া রাধাচরণের পাশের বিছানাটাতেই বসিয়া পড়িল। রাধাচরণ সবে তখন স্নানান্তে তিলক কাটিয়া মায়ের দেওয়া মালপোর ভাঁড় হইতে খানদুয়েক মালপো লইয়া জলযোগের উদ্যোগ করিতেছে। ঘৃণায় শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, রাধে রাধে!

কালীচরণ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল, এ বোরেগী কোত্থেকে এল রে?

রাধাচরণ চোখ পাকাইয়া বলিল, খবরদার!

খবরদার! কালীচরণ দুই হাত মাটিতে পাড়িয়া চতুষ্পদের মত ভঙ্গিতে রাধাচরণের মুখের কাছে আসিয়া প্রকাণ্ড এক হাঁ করিয়া বলিল, খেয়ে ফেলব তোকে।

রাধাচরণ অহিংস হইলেও ভয় পাইবার পাত্র নয়; সে চট করিয়া ওই পাঁঠার কাঁচা ঠ্যাংটা তুলিয়া লইয়া সজোরে কালীচরণের হাঁয়ের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, নে, খা।

হাঁ কালীচরণের প্রকাণ্ড, কিন্তু পাঁঠার ঠ্যাংটার গোড়ার দিকটা তার চেয়েও প্রকাণ্ড ছিল, সজোরে গুঁজিয়া দিতেই কালীচরণ ঘায়েল হইয়া পড়িল। রুদ্ধমুখে দুর্দান্ত পশুর মত আঁ-আঁ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাপারটা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইত, কিন্তু কালীচরণের বিকট আঁ-আঁ শব্দ শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া পড়িলেন, কাজেই দুইজনেরই নিরস্ত না হইয়া উপায় রহিল না। সমস্ত শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় দুইজনকে সরাইয়া দুই ঘরে পৃথক বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মজা এমনই যে, সঙ্গে সঙ্গেই দুই ঘরেরই কয়েকটি ছাত্র আপনা হইতেই ঘর বদল করিয়া ফেলিল। শাক্ত যাহারা ছিল, তাহারা চলিয়া আসিল কালীচরণের ঘরে ; বৈষ্ণবেরা আসিয়া রাধাচরণের ঘরে আখড়া জমাইয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে এ ঘরে সমবেতভাবে মালপো ভক্ষণ চলিতে আরম্ভ করিল, ও ঘরে কড়মড়-শব্দে মাংসের হাড় চূর্ণ হইতে লাগিল।

কিন্তু একদা দুইজনের এই বিবাদ সাময়িকভাবে মিটিয়া গেল। সেদিন রত্নপুরের বাবুদের বাড়িতে বিপুল উৎসব। একসঙ্গে দুই গৃহদেবতার পূজা—কার্তিকের শুক্লাষ্টমীতে এক দিকে গোবিন্দজীর গোষ্ঠাষ্টমী, অন্য দিকে শুক্লানবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা। অষ্টমী এবং নবমীর পূজা সেবার একদিনেই পড়িয়াছিল। সন্ধ্যায় কালীচরণ প্রায় একটি গামলা পরিপূর্ণ রান্না মাংস আনিয়া বন্ধুদের বলিল, কেইসা সাঁটিয়েছি দেখ। নে খা, যে যত পারিস খা। দেখুক শালারা চেয়ে চেয়ে।—বলিয়া বৈষ্ণব প্রতিপক্ষীয়দের ঘরের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

ও ঘরে খিল খিল করিয়া হাসির একটা রোল উঠিয়া গেল। শাক্ত ঘরেরই একটি ছেলে বলিল, ওরাও মালপো এনেছে, তাই হাসছে, পণ-খানেক।

কালীচরণ খানিকটা গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

ও ঘরের আর কথাবার্তার সাড়া না পাইয়া এ দিকে রাধাচরণ একজনকে বলিল, চুপি চুপি দেখে আয় তো, কি করছে ওরা।

সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওরা মদ আনবে, কালীচরণ আনতে গেল। খুব ফুর্তি করবে আজ।

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রাধাচরণ বলিল, হুঁ। আচ্ছা, আমরাও গাঁজা আনব। খাস নি এখন মালপো, গাঁজা খেয়ে তারপর। চললাম আমি।

একজন বলিল, এই রাত্রে তুমি গাঁজা পাবে কোথা?

তাহাকে ভ্যাঙাইয়া রাধাচরণ বলিল, রাজারা মানিক পায় কোথা?—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

ওদিকে বাবুদের নাটমন্দিরে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, কনসার্ট বাজিতে শুরু করিয়াছে। ছেলেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল ; একজন বলিল, ঘরে ব'সে থেকে কি করব? চল, রাধাচরণ আসতে আসতে যাত্রা শুনে আসি।

অমত কাহারও ছিল না, তবুও একজন বলিল, রাধাচরণ এলে কি হবে? দরজায় তো তালা দিতে হবে!

চাবি রেখে যাব সেইখানটিতে।

সেইখানটিতে চাবি রাখিয়া সকলে বাহির হইয়া গেল।

রাধাচরণ ফিরিয়া দেখিল, দুই ঘরের দরজাতেই তালা ঝুলিতেছে। চাবির জন্য সেইখানটিতে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার একটা সঙ্কল্প মনে জাগিয়া উঠিল, উহাদের ঘরের চাবিও তো ওই ঘরের মাথাতেই আছে, ঘর খুলিয়া গামলাটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলে কি হয়! গাঁজা একটান টানিয়াই সে আসিয়াছিল, দ্বিধা বিশেষ হইল না তাহার। খানিকটা খুঁজিয়াই সে চাবি বাহির করিয়া ফেলিল। ঘর খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া গন্ধে গন্ধে ঠিক গামলার কাছে হাজির হইল। বড় চমৎকার গন্ধ উঠিয়াছে কিন্তু! গামলার কিনারায় হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত সে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর এক টুকরা মাংস তুলিয়া মুখে দিল। আবার এক টুকরা, সে টুকরাটা বড়, তাহার পর গবগব করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাধা পড়িল। তাহাদের ঘরে বোধ হয় ছেলেরা ফিরিয়াছে, শব্দ উঠিতেছে। হাতটা ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা গন্ধ পাইলে

সর্বনাশ হইবে। দ্রুত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সম্মুখেই লোক, সে আঁতকাইয়া বলিয়া উঠিল, কে?

সে লোকটিও আঁতকাইয়া উঠিল, কে?

রাধাচরণ দেখিল কালীচরণ, কালীচরণ দেখিল রাধাচরণ।

রাধাচরণের হাতে মাংসের টুকরা, কালীচরণের হাতে মালপো। কয়েক মুহূর্ত পরে উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর মাংসের গামলা, বোতল, গাঁজার কল্কে, মালপো লইয়া দুইজনই বাহির হইয়া গেল। উভয়েই বলিল, মরুক বেটারা। অর্থাৎ উভয়েরই সহচরবৃন্দ।

রাধাচরণ বলিল, আমাদের বাড়ি চল না, কি বকম মালপো খাওয়াই একবার দেখবে।

কালীচরণ বলিল, মাংস খেতে কিন্তু আমাদের বাড়িও যেতে হবে।

নিশ্চয়। কিন্তু মাংস খাই এ কথা বলতে পাবে না কারু কাছে।

কালী কালী! তাই পারি? মালসাভোগ খাওয়ার কথা কিন্তু তোমাকেও গোপন রাখতে হবে।

রাধাচরণ বলিল, ওহে, রাধাকৃষ্ণের পীরিতি পর্যন্ত গোপনে, সে ভাবনা আমাদের বাড়িতে নেই।

কালীচরণই প্রথম রাধাচরণের বাড়ি গেল। কারণ পাঁঠাবলি দিতে পর্বের প্রয়োজন হয়, মালপো কিন্তু পর্ব না হইলেও চলে। রাধাচরণের বাপ-মা খুব খুশি হইয়া উঠিলেন, শাক্তের ছেলে, বিশেষ করিয়া এই শাক্ত চাটুজ্জেবংশের ছেলেটিকে মালপোর প্রসাদে মালা ধরাইতে পারিলে সাক্ষাৎ গোবিন্দকে খুশি হইতে হইবে।

রাধাচরণের মা কন্যা ললিতাকে লইয়া ক্ষীরের মালপো তৈয়ারি শুরু করিয়া দিল। কালীচরণ মালপো মুখে দিয়া বলিল, চমৎকার!

রাধাচরণের মা বলিল, আর দুখানা এনে দিক।

না না, বলিয়া কালীচরণ মৃদু আপত্তি তুলিলেও মা শুনিল না, ললিতাকে ডাকিয়া বলিল, ললিতে,আর দুখানা নিয়ে আয় তো।

ললিতার কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। মা বিরক্ত হইয়া বলিল, চোদ্দ বছরের ধাড়ী হারামজাদী নাচতে নাচতে পালাল কোথাও বুঝি! ও ললিতে! এবার সে নিজেই উঠিল। ললিতা উনানশালেই বসিয়া ছিল, মা বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, সাড়া দিস নি যে?

বিরক্তিভরে ললিতা বলিল, আমি যদি না পারি?

কেন, পারবি না কেন, শুনি?

না, ওই হুঁদ-মুষলো অসভ্যর সামনে যাব না।

যেতেই হবে তোকে। চল বলছি।

রাগে লজ্জায় রাঙা হইয়া ললিতা মালপো লইয়া কালীচরণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কালীচরণ হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, আমার বোনের সঙ্গে তোমার সই পাতিয়ে দোব ললিতে। সে কিন্তু ভারী কথা বলে, তোমার মত লাজুক নয়। ভারী পাজী সে। এই লজ্জাই আমি পছন্দ করি, বুঝলেন মা!

রাধাচরণ সেটা নিজেই প্রত্যক্ষ করিল।

কালীচরণের বাড়িতে রাধাচরণ বসিয়া ছিল। কালীচরণ আদার সন্ধানে বাহিরে গিয়াছে, কালীচরণের মা ও বোন শ্যামা রান্না করিতেছিল। শ্যামা রাধাচরণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঝাল কেমন দোব, বল।

রাধাচরণ বলিল, তোমার ঝাঁঝ যতখানি, ততখানিই দাও।

শ্যামা বলিয়া উঠিল, ও মা!—বলিয়া সে গালে হাত দিল।

মা বলিলেন, কি হ'ল?

ওই বেড়ালটা।—বলিয়া হাতার বাঁটের সূচালো দিকটা উঁচাইয়া বলিল, দোব, চোখ খুঁচে, এমন ক'রে দৃষ্টি দিবি তো।

রাধাচরণ হাসিয়া বলিল, যে দুর্নাম করলে তোমার দাদা আমার কাছে, বলে, ভারী কথা কয়, ভয়ানক মুখরা। আমি বলি, মুখরা আমার ভারী ভাল লাগে!

ইহার পর বন্ধুত্বটা গাঢ় হইয়া উঠিল। যাওয়া-আসা চলিতেই ছিল। কিন্তু পরস্পরের বাপ-মায়ের অগোচরে। তাহারা প্রত্যেক পক্ষই ভাবিত, উহাদের জাতি মারিলাম বুঝি। কিন্তু সহসা ব্যাপারটা ফাঁস হইয়া গেল। উভয় পক্ষ হইতেই ছেলেকে কড়া শাসন করিয়া দিল।

সেবার কিসের একটা ছুটিতে কিন্তু লুকাইয়া রাধাচরণ কালীচরণের বাড়ি আসিয়া হাজির হইল।

কালীর মা খুশি হইয়া বলিল, এস বাবা, এস। কিন্তু কালী তো মামার বাড়ি গিয়েছে।

রাধাচরণ বিব্রত হইয়া বলিল, তাই তো!

শ্যামা বলিল, কিসের তাই তো? কেন আমরা কি কেউ নই নাকি?

রাধাচরণ তবু বলিল, না না, মানে—

মা বলিল, তা শ্যামা তো ঠিকই বলেছে বাবা, নাই বা থাকল কালী ঘরে, আমরা তো রয়েছি।

রাধাচরণ সবিনয়ে একটু হাসিল। শ্যামা বলিল, এত মান হয় তো বাড়ি যাও।

রাধাচরণ ফিক করিয়া হাসিল। শ্যামার মা বলিল, তোর ভারী মুখ কিন্তু শ্যামা।

শ্যামাও এবার ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, মুখরাই রাধুদার ভাল লাগে মা।

কয়েকদিনের পর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে শ্যামার মায়ের মনে এই কথাটা হঠাৎ অন্য আকারে মনে পড়িয়া গেল, রাধাচরণের সহিত শ্যামার বিবাহ দিলে কেমন হয়? এক আপত্তি, উহারা বৈষ্ণব ; তাহাতে কি, ও তো মাছ মাংস ধরিয়াছে। এইবার শ্যামার হাত দিয়া গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিলেই তো হইয়া গেল, কন্যাদায় হইতে বিনা পয়সায় উদ্ধার পাওয়া যাইবে। কথাটা আজই স্বামীকে বলিতে হইবে। আর শ্যামাকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার, যে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কথা বলে সে। মা উঠিয়া শ্যামার ঘরে আসিয়া দেখিল, শ্যামা নাই। কোথায় গেল? সহসা চাপা গলায় খিল খিল হাসি যেন ভাসিয়া আসিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া শিষ্যদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দুয়ারে আসিয়া সে দাঁড়াইল। হ্যাঁ, এই ঘরেই। দরজার একটা ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিয়া কালীর মায়ের মুখে আর বাক সরিল না।

শ্যামা তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছে, আর রাধাচরণ পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছে, প্রিয়ে চারুশীলে! প্রিয়ে শ্যা-মা আমার, চারুশীলে!

সন্তর্পণে পলাইতে পলাইতে মা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ক্রোধে আপন কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, এই নে, এই নে, এই নে।

রাধাচরণ চকিত হইয়া উঠিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল, শ্যামার মা যাইতে যাইতে কপালে করাঘাত করিতেছে। সে আর দাঁড়াইল না, সটান ওদিকের বাহিরে যাইবার দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আপন গ্রামের পথ ধরিল।

প্রায় অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করিয়া সে সভয়ে দাঁড়াইয়া গেল। কালীচরণ আসিতেছে! সর্বনাশ, দেখা হইলে সে তো ছাড়িবে না! ফিরিতে বাধ্য করিবে! সে ছাতাটা আড়াল দিয়া সন্তর্পণে চলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে ছাতার ফাঁক দিয়া দেখিল, কালী হন হন করিয়া

চলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে রৌদ্রে পুড়িয়া সে ছাতাটা পূর্ব দিকে ধরিয়া চলিয়াছে কেন? যাহা হউক, নিজে বাঁচিলে বাপের নাম বজায় থাকিবে। পুড়ুক কালীচরণ, রৌদ্রে কেন, আগুনে পুড়ুক।

বাড়ি আসিতেই সে দেখিল, তাহার বাপ বাঁশী ছাড়িয়া অসি ধরিয়াছে; বলে, তোকে তো কাটবই, তারপর কাটব ওই কেলেকে।

ললিতার দেখা পাওয়া গেল না, মা ভাম হইয়া বসিয়া ছিল।

সে চলিয়া গেলে কালী আসিয়াছিল। তারপর ঘরে অন্নপূর্ণা-মূর্তির আবির্ভাব মা দেখিয়াছে। ললিতা অন্নপূর্ণা, আর কালীচরণ শিব সাজিয়া বলে কিনা, একটি চুম্বন ভিক্ষা দাও।

বাবা আর একবার গাঁজা টানিয়া বলিল, অন্নপূর্ণা, শিব! আমার ধর্ম্ম সুদ্ধু জলে গেল!

রাধাচরণও আগুন হইয়া উঠিল।

ওদিকে কালীচরণ তখন খাঁড়াখানা লইয়া আপন বাড়িতে ঘুরাইতেছিল।

ইহার পর ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। দুইজনে দুইজনের ভগ্নীপতি হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না, হইলও তাই; কিন্তু আপন আপন ভগ্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের তুষের আগুন উভয়েরই মনে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। আজও তা নেবে নাই। বিশ্বাসঘাতক!

* * *

সহসা রাধাচরণ সংবাদ পাইল, তাহার শিষ্যের অবস্থা অন্তিমে উপনীত হইয়াছে। একরূপ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সে আসিয়া শিষ্যের শিয়রে উপস্থিত হইল।

ব্যাপার সাংঘাতিক। বিপরীতধর্মী দুই শরিকে সর্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়িয়া উভয়ে উভয়কে ঘায়েল করিয়াছে। ও বাড়ির কর্তাও মর-মর হইয়া রহিয়াছে। ইনি খাইয়াছিলেন গাঁজা, উনি খাইয়াছিলেন মদ। প্রথম কলহ বাধে গুরু লইয়া; তাহার পর ধর্ম; তাহার পর ইষ্ট; অবশেষে দুইজনকে দুইজনে গালি দিল, পরে চড়-চাপড় কিল-ঘুষি, শেষ লাঠি ও তলোয়ার। লাঠির আঘাতে শাক্তের মাথা দুখানা হইয়া গিয়াছে, বৈষ্ণবের পেটে তলোয়ারখানা আমূল ঢুকিয়া গিয়াছে।

শিষ্য গুরুকে দেখিয়া এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রশান্ত হাসি হাসিল, বলিল, শান্তিতে মরতে পারব এইবার। মনে মনে আপনাকেই স্মরণ করছিলাম।

রাধাচরণের আজ দুঃখ হইল। সে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। শিষ্য আবার বলিল, আমার সম্পত্তি আর কিছুই নেই। গোবিন্দজীকে আপনাকে দিলাম। ওঁকে আপনি নিয়ে যাবেন আপনার ঘরে। যা হয় সেবা করবেন। ওঁর গায়ের অলঙ্কার—সেও আপনি নিয়ে যাবেন। আপনার হাতে ভার দিয়ে আমি এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। এইজন্যেই আমার মৃত্যু বোধ হয় হচ্ছিল না।—অকৃত্রিম বিশ্বাসের সুর তাহার কথাগুলির মধ্যে যেন রন রন করিয়া বাজিতেছিল।

কথাটা বোধ হয় সত্য; পরদিন ভোরেই সে মারা গেল। তাহার আগের সন্ধ্যাতেই মারা গিয়াছে ও বাড়ির কর্তা। রাধাচরণের চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল।

রাধাচরণ দুঃখ অপনোদনের জন্য একটান গাঁজা টানিয়া রাধাগোবিন্দকে বেশ করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঁধে করিয়া রওনা হইল। ছোট মূর্তি, কিন্তু ভারী অনেক।

ক্রোশ খানেক আসিয়া সে হাঁপাইয়া পড়িল। একটা গাছের তলায় বসিয়া বলিল, আঃ!

একটু দূরেই ঐ গাছটার তলে কে বসিয়া? কালীচরণ? হাঁ, কালীচরণই বসিয়া রহিয়াছে। রাধাচরণের বড় রাগ হইল, সে উঠিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া বলিল, কি হ'ল বল তো?

কালীচরণ তাহার মুখের দিকে খানিক কটমট করিয়া চাহিয়া হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া

বলিল, বেশ হ'ল, ভালই হ'ল। মামলা করলে ওরা, আমাদের এল টাকা-পয়সা।

রাধাচরণও এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, তা যা বলেছ। আমাদেরও ঝগড়া মিটে গেল।

কালীচরণ শাসাইয়া উঠিল, খবরদার! কেউ যেন এ কথা না জানতে পারে। তুই লাগাবি, আমি ফাঁসাব।

ঘাড় নাড়িয়া সমঝদারের মত রাধাচরণ বলিল, ঠিক বলেছ। তুমি লাগাবে, আমি ফাঁসাব।

কিছুক্ষণ পর কালীচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, লোক দুটো কিন্তু না ম'লেই বেশ হ'ত।

রাধাচরণ একটু ভাবিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল, আমরা কে, ভগবান মেরেছে, আমরা কি করব? তারপর, ওরা তোমাকে গয়না সমেত ঠাকুর দেয় নি?

দিয়েছে। কিন্তু বিষম ভারী।

এক কাজ কর।

কি?—প্রশ্ন করিয়াই কালীচরণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, গয়নাগুলো খুলে নিয়ে—

রাধাচরণ বলিল, হ্যাঁ। কাছেই নদী, দহের জলে—

আশ্বিন ১৩৪৬

দিব্য চক্ষু

শুভগ্রহ

কঠিন কোন তপস্যা করিয়া অসম্ভব কোন ক্ষমতা লাভ করিতে হইবে। স্থির করিলাম পূর্ণ একবিংশতি বৎসর কাল চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে মাত্র একটি উন্মীলিত রাখিয়া জগতে বসবাস করিব তৎপরে ভগবান আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইবেনই হইবেন—তৎপরে বরপ্রার্থনা—তৎপরে আকাঙ্ক্ষাপূরণ.....

* * *

অসহ্য কষ্টের ভিতর দিয়া একবিংশতি বৎসর কাটাইয়া তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে। কত দুঃখ, কত বেদনা, কত তাচ্ছিল্য, কত প্রলোভন আমার সিদ্ধির পথে গৌরীশৃঙ্গ-বিজয়ী বীরের পদতলস্থ অসংখ্য দুর্গম শিখরমালার ন্যায় স্তরে স্তরে পুঞ্জে পুঞ্জে পড়িয়া রহিয়াছে। শুধু বাম চক্ষু মেলিয়া শুভদৃষ্টিকালে প্রিয়ার মুখ অবলোকন করিয়াছি, একচক্ষু হরিণের ন্যায় কলিকাতার রাজপথে 'বাস' বিতাড়িত হইয়া মৃত্যুকে নিকটে, অতি নিকটে আসিতে দিয়াছি, কানা বলিয়া ইতর লোকে উপহাস করিয়াছে, অজ্ঞাতসারে মুদিত চক্ষুপার্শ্বস্থ পকেট হইতে টাকা কড়ি-ঘড়ি কত কি না অপহৃত হইয়াছে, কতবার মণিহারা ফণীর ন্যায় কুপিতা পলাতকা প্রেয়সীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া মরিয়াছি—রন্ধনকক্ষ, স্নানাগার, শয়নকক্ষ সর্বত্র খুঁজিয়াও পাই নাই—অথচ প্রিয়া অনুসন্ধাননিরত আমারই ডান পার্শ্বে সতত অবস্থান করিয়া নিঃশব্দ-হাস্যে নিজ চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন। আমার তপস্যা অর্জুনের তপস্যা, একলব্যের তপস্যা, বাল্মীকির তপস্যা সকল তপস্যাকে পরাভূত করিয়াছে। একবিংশতি বর্ষকাল শুধু এক চক্ষে জগৎকে অবলোকন করিয়াছি—আকাশের নক্ষত্র-শোভা, পর্বতশিখরস্থ বৃক্ষমালা, অনন্ত প্রান্তর, প্রিয়ার মুখারবিন্দ, ক্ষৌরকার্য কালে মুকুরে নিজমুখের সফেন প্রতিচ্ছায়া, আম্রকুঞ্জে ঝড়ের উদ্দাম লীলা, সরোবর বক্ষে পদ্মকলিকার ভ্রমরসম্ভাবণসঞ্জাত বিব্বোক-হিন্দোলা, পথিপার্শ্বস্থ তাম্বুল-বিপণি বিহারী বিশ্বস্ত যুবাজনের তৈলনিষিক্ত বদনের স্থূলাস্যহাস্য, চৌরঙ্গী রাজমার্গে স্বল্পবসন অস্থিসার-দেহ ম্লেচ্ছরমণীর স্বজাতীয় প্রণয়ীর সহচরণ, এবম্বিধ অসংখ্য ও বিচিত্র দৃশ্য, কোটি বারিবিন্দু যেরূপ একপথে সমুদ্রপ্রবিষ্ট হয়, তেমনি ঐ একমাত্র উন্মীলিত নয়ন পথে আমার মানসসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

* * *

একবিংশতি বর্ষকাল পূর্ণ হইল। আজিও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু, সংহারকর্তা মহেশ্বর অথবা বিভিন্ন গুণসম্পন্ন অপর কোন দেবতার আবির্ভাব হইল না। আমি পথে পথে, রঙ্গশালায় রঙ্গশালায়, চলচ্চিত্রশালায়, অপরের বৈঠকখানায় অথবা পুরাতন পুস্তকের দোকানে বিচরণ করিয়া দেবতার অপেক্ষা করি—ডান চক্ষু আমার আজিও মুদ্রিত—ব্রত উদ্‌যাপিত হয় নাই—সাধনা সফল হয় নাই।

আবার আষাঢ় আসিয়াছে। আকাশে কোটি কোটি মেঘদূত কোটি কোটি স্বাধিকারপ্রমত্ত বিরহীর প্রণয়-বার্তা বহন করিয়া, কোটি কোটি বিরহিনীর উদ্দেশ্যে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, হাটে হাটে, মাঠে মাঠে যত্র তত্র ছুটিয়াছে। আকাশে জল, বাতাসে জল, পথে জল, প্রাঙ্গণে জল, কক্ষে জল, বক্ষে কাব্যাশ্রুজল, জলে জলময়। একচক্ষে এ দৃশ্য অদ্যাবধি একবিংশতিবার অবলোকন করিয়াছি—ভগবান সদয় না হইলে কি ভবিষ্যতেও এক চক্ষেই প্রকৃতির এ মহদাভিনয় আরবার দর্শন করিতে হইবে?

জনবহুল এস্প্লানেড রাজবর্ত্মে 'বাস'-শিখর হইতে ছত্র হস্তে অবতীর্ণ হইলাম। পিচ্ছিল পথ, বাম পার্শ্বে প্রসিদ্ধ 'থ্যাকার স্পিঙ্ক' কোম্পানীর পুস্তকাগারের সুসজ্জিত জানালার স্তরে স্তরে পুস্তকসম্ভার রক্ষিত—আমার চিত্তক্ষুধায় ক্ষুধিত বাম চক্ষু স্বতই ময়রার দোকানের দিকে লুব্ধরসনা বালকের ন্যায় সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। আমি এইরূপ অনামনস্কচিত্তে বাস হইতে নামিতে না নামিতে লম্ফমান ঐরাবতের ন্যায় বাস পুনর্বার ঝটকিত গতিতে অগ্রগামী হইল। আমার শরীর যেন আর আমার রহিল না—জ্যাবিমুক্ত শরবৎ আমি বিদ্যুৎগতিতে একটি আলোকস্তম্ভের উপর গিয়া পড়িলাম—চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল—যেন নভঃস্থলের সকল তারকা অকস্মাৎ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল।

একি দেখিলাম! ভস্মঅঙ্গ জটাজূটধারী বৃষবাহন পর্বতাকার এ মহাদ্যুতিমান পুরুষ কে? সর্ব অঙ্গে কেউটা, গোখুরা ও অজগরের অলঙ্কার, ললাটশীর্ষে চন্দ্রমা শোভা পাইতেছেন, তদূর্ধ্বে স্বর্গদুহিতা অলকনন্দা গঙ্গা ধীরে প্রবাহমানা। হে শঙ্কর শিব পিনাকি, হে গঙ্গাধর বামদেব, হে ডমরুকর ত্রিলোচন, হে পশুপতি এতদিনে কি এ অধমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল? হে দিগম্বর, তোমার দর্শনে যদি মরণ আসে তবু দাঁড়াও আরও ক্ষণিকের জন্য এ দীনের সম্মুখে।

ভীমগম্ভীরকণ্ঠে নিনাদিত হইল, "রে তাপস, তোর অসাধারণ তপস্যায় আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, নন্দীহস্তে ভাঙপাত্র তেজোহীন হইয়া পড়িতেছে, মহামায়ার রূপ পরিবর্তনে ভুলচুক দেখা যাইতেছে, কৈলাস কম্পিত, শিখিগণ চঞ্চল ও আমার দেহাবরণ বিস্রস্ত। তোর এক চক্ষুর চাহনির আলো আমার সংহারস্বপ্নের মধ্যে সৃষ্টিচ্ছটা আনিয়া ফেলিয়া সে স্বপ্নের নিঃশব্দ নিনাদের তাল কাটিয়া আমার নিস্পৃহ নির্মমতার মধ্যে দরদের সৃষ্টি করিতেছে। তুই বর গ্রহণ কর্।"

যে বর চাহিব বলিয়া আজ একবিংশতি বৎসর কাল প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা মনে মনে জপ করিয়াছি, সেই বর আজ আমার হস্তের মধ্যে। রোমাঞ্চ হইল, বলিলাম."প্রভু বর দেও যেন ডান চক্ষু মেলিয়া যাহাই দেখিব তাহার সত্যরূপ আমার নিকট প্রকাশিত হয়।"

যেন হিমাচলের সহিত বিন্ধ্যাচলের সংঘর্ষণ ঘটিল এরূপ ধ্বনিতে নিনাদিত হইল "তথাস্তু!" ডান চক্ষু মেলিলাম---দেখিলাম মহেশ্বর মিলায়িত, তৎস্থলে একটি লৌহনির্মিত আলোক-স্তম্ভ—বৃষস্থলে একটি বৃটিশ শান্তি-রক্ষক। সে আজ্ঞা করিল "উঠ্ যাও," উঠিলাম, যাইলাম।

*　　　*　　　*

অভ্যাসবশত অদ্যাবধি ডান চক্ষু সতত উন্মীলিত রাখিতে পারি না। কখন কোন বিশেষক্ষেত্রে সত্যকে নিজ সমক্ষে প্রত্যক্ষমান করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে মহেশ্বরবরাভিষিক্ত আমার ডান চক্ষু খুলিয়া দেখি। রণ্টজেন আলোকরশ্মি সঞ্চালনে যে রূপ মনুষ্যদেহের বহুস্তর মদ মাংস অতিক্রম করিয়া তাহার উদর অভ্যন্তরের লৌহশলাকা বৈদ্য সমীপে আপনার অস্তিত্ব অচিরাৎ জ্ঞাপন করে, তেমনি আমার এ শিবশক্তিউদ্দীপ্ত নয়নালোকের সম্মুখে সত্য আপনাকে কদাচিৎ গোপন করিতে সক্ষম হয় না।

*　　　*　　　*

কার্জন উদ্যানে বসিয়া আছি। বাম চক্ষে দেখিতেছি কত যুবক-যুবতী পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে! গ্যাসালোক চন্দ্রালোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত। একটা বিদেশীয় সারমেয় কোন অজ্ঞাত আনন্দে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিয়া আমার হস্ত লেহনে প্রবৃত্ত। ঠেলা গাড়িতে বহু শ্বেতকায় শিশু বহু কৃষ্ণকায় দাসীর তত্ত্বাবধানে বায়ু ভক্ষণে ও অকারণ ক্রন্দনে পরিব্যস্ত।

সে আসিয়া আমার কাছে বলিল। শীর্ণকায় দীর্ঘনাসা চঞ্চলচক্ষু যুবা। বয়স ২১ কিম্বা ৩১ তাহা কপোলগহ্বর অথবা পাতলা পাঞ্জাবির অন্তরালস্থ পঞ্জরাস্থি সন্দর্শনে নির্ণয় করা

সম্ভব নহে। বলিল, "আমি আজ বড়ই উতলা···মনুষ্য সঙ্গ চাই···চন্দ্রালোক আমায় হাতছানি দিয়া আত্মহত্যার পথে টানিতেছে, অন্তরে আমার জ্বালা নিদারুণ···কি যেন বলিতে চাই, কি যেন শুনিতে চাই, কে যেন আমার কাছে নাই, কোন যেন রাক্ষসী চুম্বনে আমার হৃদয়টাকে চুষিয়া নিঃশেষ করিয়া নিষ্পেষিত দ্রাক্ষার ন্যায় আমার বুকের এক কোণে ফেলিয়া দিয়াছে···কোথায় যেন আমার প্রাণটা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আমারই অদর্শনে ঝট্‌পট্‌ করিয়া মরিতেছে···উঃ উঃ উঃ···ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ। শুনুন আমার কথা···আপনি কে তা জানি না কিন্তু আপনি আমার বড়ই আপন···কেন না আমার হৃদয় যে তাই বলে।" যুবাটি পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

"আমি শুষ্ক সরসে শীর্ণ কমল-কলিকা
বহু যতনে গোপনে রেখেছি এ মধুটুকু
বক্ষে আমার, তব তরে ওগো ভ্রমরা
পিয়ে যাও মধু নিঃশেষে এ নিশীথে
শুধু পায়ে পড়ি মোর হুল ফুটাও না বুকে।"

আমি অবাক হইয়া শুনিলাম। ভাবিলাম একি! এ কি প্রকার উন্মাদনা? ডান চক্ষু মেলিয়া যুবার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম আমার পার্শ্বে কোন মনুষ্য নাই। একপার্শ্বে কে যেন কসাইখানা খুলিয়াছে। একটি বিরাট পাকস্থলী তাহার অভ্যন্তরে অর্ধজীর্ণ দুর্গন্ধ দুষ্পাচ্য খাদ্যের রাশি জীবানু সঞ্চারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগ্নেয়গিরি-গর্ভস্থ দ্রবমান শিলা ও মৃত্তিকাশয় হইতে যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলন্ত বুদ্বুদ্‌ বক্ষ বিদারিত করিয়া ধরণীর আদিম তেজঃপুঞ্জ বাষ্পাকারে অনন্তে উৎক্ষিপ্ত হয় তেমনি এই সুবিশাল পাকস্থলী মধ্যে মুহুর্মুহু বিকৃত বাষ্প সঞ্চার হইয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। পাকস্থলীর উর্ধ্বে হৃদ্‌যন্ত্র, মাদক-বিষবাহী রক্তসংস্পর্শে তাহা অর্ধ বিকল। এক পার্শ্বে স্নায়ুকেন্দ্র, তাহাও কোন ব্যাধি-সংক্রমণে ক্ষতবিক্ষত। কতকগুলি জীর্ণ মাংসপেশী শীর্ণ কয়েকখানি অস্থিগাত্রে সংলগ্ন। মস্তিষ্কাধার করোটিখণ্ডে কতকটা তরল পদার্থ রক্ষিত আছে। সকল দেহাংশই শোণিত-সিঞ্চিত, কিন্তু সে শোণিত জলবৎ ও দুষ্ট।

আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া ডান চক্ষু মুদিয়া ফেলিলাম, দেখিলাম শীর্ণ যুবক আকাশের দিকে অশ্রুবিগলিত চক্ষে চাহিয়া আছে ও আধভাষে বলিতেছে—

"নিষ্পেষিয়া এ হৃদয় মম
বক্ষরক্তে কি সুরা বানাবে সাকি ;
তরল অনল সম!
কিছু কি রবে না বাকি,
সব ঢালি দিবে হায়
বনানীবক্ষের সে পলাশ পেয়ালায়!"

আমি আর শুনিলাম না ; একটা বিকট চিৎকারে বহু শিশু ও আয়াকে সচকিত করিয়া সেই পূতিগন্ধাকর যুবাকে ছাড়িয়া দ্রুত পলায়ন করিলাম।

*

সকাল বেলা 'আর ভয় নাই' নামক দৈনিকখানি খুলিয়া পড়িতে গিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম একজন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছে ও একটি সুদীর্ঘকর্ণ জীব শর্টহ্যাণ্ড লিখনে তাহা টুকিয়া লইতেছে। দেখিলাম একটি বিরাট টাকার থলি ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু লোক সশব্দে তাহার স্তব স্তুতি ও আরতি করিতেছে। আর একটি লম্বকর্ণ জীব টাইপ্‌রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে সেই সকল স্তব স্তুতি টুকিয়া লইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে কাডাক যন্ত্রে ঘটনাবলির চিত্র প্রতিকৃতি গ্রহণ করিতেছে। একপার্শ্বে একটি বড় সাইনবোর্ডে "বিজ্ঞাপন" লিখিত রহিয়াছে, তন্নিম্নে কতকগুলি অঙ্ক, যথা ;

সর্পমেদ+টিন+লেবেল=গব্যঘৃত। প্যারাফিন তেল+রং—দুর্গন্ধ+খোসবয়=বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ কেশ তৈল। কোন প্রকার ক্যানভাসিং নিষিদ্ধ=গোপনে ঘুষ পাইলে সুসিদ্ধ। জীবন-বিজ্ঞানের চরম গবেষণাপূর্ণ পুস্তক = কয়েকটি উলঙ্গ নারীর চিত্র ও কয়েকটি অশ্লীল ঘটনা বর্ণনা। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য=ভ্রূণহত্যার জীবন্ত চিত্র।

মাপ ও ওজন

১১ ইঞ্চিতে	১ ফুট	১৩ ছটাকে	এক সের
২।।০ ফুটে	১ গজ	৩৩সেরে	এক মণ ইত্যাদি

ডান চক্ষু বুজিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।—পার্কে দেখিলাম স্বদেশী বক্তৃতা হইতেছে। সেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। কৌতূহলবশত ডান চক্ষু মেলিয়া বক্তৃতা মঞ্চের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম সেখানে বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়াছে। একজন এক হস্তে একটি খাতা ও অপর হস্তে একটি কাঁইচি লইয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অপরাপর ব্যক্তির পকেট প্রান্তে শনৈঃ শনৈঃ তাকাইতেছেন। আর এক ব্যক্তি কোটপ্যান্টের উপর দিয়া খদ্দরের আলখাল্লা পরিয়া "মহাত্মা গান্ধির চরণামৃত" মার্কা দেওয়া একটি বোতল হইতে ঢুকু ঢুকু মদ্য পান করিতেছেন। অপর এক ব্যক্তি নিজ হেড কনেস্টবলের পোশাকটি একটি ব্যাগে ভরিয়া কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালককে বলিতেছেন, "এ ব্যাগে বোমা ও রিভলভার আছে। তোমাদের কি সাহস আছে, দেশভক্তি আছে, তবে চল যাই ইংরেজ-হনন করি।" চতুর্থ এক ব্যক্তি একটি কাষ্ঠাশ্বে আরোহণ করিয়া একটি রাংতা ও পেস্ট বোর্ডের অসি হস্তে গাহিতেছেন "আগে চল, আগে চল।" শ্রোতাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই শুধু একপাল ভেড়া চরিতেছে ও তাহার মধ্যে দুই একটি পশ্চিমদেশীয় কসাইএর হস্ত লেহন করিয়া প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। একস্থলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া পথের গতিশীল যন্ত্রযানগুলি অবলোকন করিতে লাগিলাম। ডান চক্ষু মেলিবামাত্র দৃশ্য বদলাইয়া গেল। দেখিলাম গাড়ি ঘোড়া সবই রহিয়াছে শুধু আরোহি ও পথিকগণেব রূপ বিভিন্ন। কোন বিরাট রোলস্ রইসের বক্ষে দেখিলাম একটি কুক্কুর একজোড়া বিলাতী জুতা লেহন করিতেছে—কোথাও কোন টু-সিটারে একজোড়া কুক্কুর কুক্কুরী পরস্পরের গাত্র আঘ্রাণ করিতেছে—বিরাট বাসগুলি চালাইয়া তাল বেতাল উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে। কোন যানে তিন চারিজন জেলের কয়েদি কম্বলের কোর্তার উপর সোনার গার্ডচেন ঝুলাইয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি যানে এক একটি মর্কট অহংকারমত্ত মুখে সিগার লাগাইয়া ও মস্তকে টুপি আঁটিয়া জগৎকে হেয় জ্ঞান করিতে করিতে চলিয়াছে। আবার চক্ষু বুজিলাম···চলিলাম···চক্ষু খুলিলাম···দেখিলাম একটি খাবার দোকানে স্তরে স্তরে কর্দম ও অপরাপর দুষিত পদার্থ বিক্রয়ার্থে সাজান রহিয়াছে। একটি দোকানে এক ব্যক্তি মৃত ইন্দুর বিড়াল দিয়া চপ কাটলেট প্রস্তুত করিতেছে। অপর এক স্থলে পুরাতন-জুতা-সিদ্ধ জল পেয়ালায় ভরিয়া অনেকে পান করিতেছে—একজন কুষ্ঠ রোগী পেয়ালাগুলি ধুইয়া পুঁছিয়া রাখিতেছে।··

আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। —র মন্দিরে গিয়া দেখিলাম যে অনেক লোক জুটিয়া পূজা আরতিতে লাগিয়াছে। আমি আবার ডান চক্ষু খুলিয়া চাহিলাম—কয়েকটা ক্রূরহাসানিরত টিকি ও পৈতাধারী লোক মস্তকে সূতা বাঁধা কতকগুলি কাষ্ঠপুত্তলিকাকে সূতা টানিয়া যথেচ্ছ হাত জোড়, প্রণাম, শিবনেত্র ইত্যাদি করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের ঝাঁকুনি দিয়া টাকা পয়সা বাহির করিতেছে। যূপকাষ্ঠে বাঁধা ছাগশিশুটা শুধু সত্যই প্রাণভয়ে আর্ত ও ব্যাকুল।

আর তো পারি না, প্রাণ যায় যায়। চক্ষু বুজিয়া দ্রুত পদক্ষেপে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম আবার একবিংশতি বৎসরকাল ও চক্ষু আর খুলিব না। মহেশ্বের আবার আবির্ভূত হইলে নতজানু হইয়া বর চাহিব যেন ডান চক্ষু খুলিলে সত্য আর না দেখিতে পাই।

আশ্বিন ১৩৩৪

তিন ডিটেকটিভ ঃ তিন রহস্য

পরিমল গোস্বামী

হোমসের শিষ্য মিস্টার লক তিন দিন তিন রাত্রি কিছুই খান নি, যা খেয়েছেন কাজের আরম্ভে। এখন শুধু একটু একটু কফি আর প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পাইপ। বেহালা থেকে কিছু দূরে ডায়ামণ্ড হারবার রোডের পাশে কোনো এক পল্লীতে একটি নির্জন বাড়ি তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বেহালায় যে বাড়িতে খুন হয়েছে সে বাড়িতে তিনি মাত্র পনেরো মিনিট ছিলেন। এই পনেরো মিনিট তিনি, যে ঘরে খুন হয়েছে তার ভিতর প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের মাপজোক করেছেন। তার বেশি কিছু না।

ডায়ামণ্ড হারবার রোডে যেখানে লক আছেন, ঠিক তার বিপরীত দিকের এক পল্লীতে থর্নডাইকের শিষ্য মিস্টার থর্ন মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ঘটনাস্থলে কিছু ধুলো, একগোছা বেওয়ারিশ চুল এবং হত্যার পর দরজা ভেঙে যারা সে ঘরে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যকার একমাত্র স্থানীয় পুলিস ভিন্ন আর সবার মাথার একটি করে চুল নিয়ে পরীক্ষা করছেন আজ কয়েকদিন ধরে।

এঁরা দুজনেই লণ্ডন থেকে এসেছেন দিন সাতেক হল। এ সবই অবশ্য প্রাইভেট ব্যবস্থা। পুলিসের ব্যবস্থাও কম নয়। কেসটি এমনই রহস্যপূর্ণ যে তা ভেদ করতে যত রকম সম্ভব উপায় অবলম্বন করার হুকুম আছে বাড়ির মালিকের। কাজেই পুলিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি গোয়েন্দা কুকুরকে তার পরিচালক বা প্রযোজকসহ আনিয়ে নিয়েছে।

এ ভিন্ন একটি দেশী রোগা কুকুরকেও মাঝে মাঝে সন্দেহজনকভাবে বেহালা-ডায়ামণ্ড হারবার রোড এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

বেহালার বিখ্যাত হাম্বড়া চৌধুরীর বাড়িতে খুন হয়েছে। প্রচুর টাকার মালিক। প্রকাণ্ড বাড়ি। এঁর পূর্বপুরুষ উত্তর-প্রদেশের কোনো জেলা থেকে এসে ইংরেজ আমলে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে এই পরিবার ধনাঢ্য। এঁদের যে কত টাকা তা কেউ অনুমান করতে পারে না। এঁরই স্ত্রী একবার জলে ডুবে অজ্ঞান হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার বললেন কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যায় কোথা? হাম্বড়া উত্তেজিতভাবে বললেন, মানে? আমার স্ত্রীকে কৃত্রিম শ্বাস? ডাক্তার, অবিলম্বে আসল শ্বাসের ব্যবস্থা কর, যত টাকা লাগে দেব। তুমি না পার, অন্য ডাক্তার ডাকছি।

এই কাহিনীটিই কি করে বিলেতে চালান হয়ে যায় এবং এটা এখন তাদেরই দেশের গল্প বলে প্রচলিত।

এই হাম্বড়া চৌধুরীর বাড়িতে খুন! অসম্ভব কাণ্ড। অসম্ভব এজন্য যে, ঘর ভিতর থেকে বন্ধ, অথচ খুন। আরও অসম্ভব এজন্য যে আততায়ীর এত বড় স্পর্ধা হল কি করে।

কিন্তু কে খুন হয়েছে তা এতক্ষণ বলা হয় নি। সেটা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলেই বলা হয় নি। যেকোনো একটি স্ত্রীলোক খুন হয়েছে ধরা যাক। সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকটি হাম্বড়া চৌধুরীর স্ত্রী। তাঁর ঝিও হতে পারে। মোট কথা কে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, কেন না সে আপনার আমার কারও আত্মীয়া নয়।

পুলিসের প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হয়ে গেছে। দিনের বেলা ঘর ভেঙে ভিতরে প্রবেশ

করতে হয়েছিল পুলিসের। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ হয়। দরজা পার হয়ে বাঁয়ের দিকে পাঁচ হাত দূরে খাট। খাটের শিয়রে জানলা। সে জানলা দিয়ে একটা বিড়ালও বাইরে পালাতে পারে না। সামনের দিকে দরজার পাশের জানলা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

দারোগা যখন দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল ছিল, তারা দরজা ভেঙে দিয়েই বিদায় হয়ে যায়। ভিতরে প্রবেশ করেন পুলিসের দারোগা ও হাম্বড়া চৌধুরী। দরজা ভাঙার শব্দে আরও কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসেন সেই দোতলার ঘরে।

ক্রম অনুযায়ী সাজালে এই রকম হয়। প্রথম দারোগা, পরে হাম্বড়া চৌধুরী, পরে দুজন নবাগত আত্মীয় দুলালচাঁদ ও নকুলেশ্বর। সবশেষে তাঁদের ঠিক পিছনে ঘরে ঢুকেছে হাম্বড়ার ভাইপো সনৎকুমার।

জেরার সময় নকুলেশ্বর স্বীকার করেছে যে সে-ই সবার শেষে ঘরে এসেছে। অথচ সনৎ বলছে সে সবার শেষে এসেছে।

সবাই অবাক। অবাক আততায়ীর কৌশলে। এই কৌশলটি কি, তার মীমাংসা না হলে আততায়ী যে কে তা ভাবাই যাচ্ছে না।

গলা টেপা হয়েছে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন। তারপর ধস্তাধস্তির চিহ্ন এবং সর্বশেষ গলায় ছুরির আঘাত। অতএব কোনো মতেই এটি আত্মহত্যা নয়। ছুরি পড়ে আছে দূরে। ছুরির হাতলে আঙুলের ছাপ নেই।

যদি কেউ খুন করে থাকে তবে সে পালাবে কি করে? কে আততায়ী? কিন্তু এ প্রশ্ন আপাততঃ উঠছে না, কারণ যেই হোক সে কি করে পালাবে আগে তা আবিষ্কার না হলে কে খুন করল ভেবে লাভ নেই। লাভ নেই এই কারণে যে যাকে ধরা হবে সেই বলবে কি করে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে পুলিসকে।

তিন দিন ধরে বাড়ির সবাইকে জেরা করা হয়েছে এবং পুলিসের তিনখানা মোটা খাতা লেগেছে তা লিখতে। কিন্তু অন্দরের দোতলার সুরক্ষিত ঘরে একটি স্ত্রীলোক খুন হল অথচ ভিতর থেকে দরজা এমনভাবে বন্ধ যে বাইরে এসে সে রকম বন্ধ করা অসম্ভব এবং দরজা বন্ধ রেখে ঘর থেকে কারও বাইরে আসা অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ ঘরের মধ্যে কোনো গুপ্ত দরজা আছে কি না। কিন্তু সে দিকেও নিরাশ হতে হল। একটি দেওয়াল-আলমারি আছে বটে, কিন্তু নানা যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা হল, কোনো রহস্যের সন্ধান মিলল না।

অতএব সব যেমন আছে তেমনি রইল। পুলিস বলল, আগে দরজা-রহস্যের সমাধান চাই, তারপর অন্য কথা। অর্থাৎ কে খুন করল, খুনের 'মোটিভ' কি ইত্যাদি ভাবা যাবে। ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শিক্ষিত কুকুর স্কট এসে পৌঁছচ্ছে প্লেনে। সে যাকে নির্দেশ করে, তাকে গ্রেপ্তার করে রেখে পরে ভাবা যাবে দরজার রহস্য।

হাম্বড়া দেখলেন সমস্যা জটিল। তিনি সব শুনে বহু টাকা খরচ করে বিলেতের দুই বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আনিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের কথা আগেই বলা হয়েছে। পুলিসের বড়ই আপত্তি ছিল, বলেছিলেন ওদের আবার কেন? কিন্তু হাম্বড়া পুলিসের কথা রাখতে পারেন নি। তাঁর বাড়িতে খুন—সাধারণ ব্যাপার নয়।

মিস্টার লক এবং মিস্টার থর্ন দুজনেই ভারতবর্ষে এসে খুব স্ফূর্তি বোধ করছেন। তবে এ কথাও বলেছেন, ঘটনার বিবরণ পেলে লণ্ডনে বসেই রহস্য ভেদ করতে পারতেন। তবে থর্ন শুধু বিবরণ পেলে কিছু করতে পারতেন না, ঘটনাস্থলের কিছু ধুলো পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারতেন।

ইতিমধ্যে পনেরোটা দিন কেটে গেছে। পুলিস কাউকেই গ্রেপ্তার করে নি। কিন্তু স্কট

এসে পড়াতে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। স্কটের সঙ্গে তার পরিচালক কনস্টেবল রবার্টও এসেছে। তাদের তো আর বেকার বসিয়ে রাখা চলে না, তাই নিহতা স্ত্রীলোকের রক্ত শুঁকিয়ে রবার্ট কুকুরকে ইশারা করতেই কুকুর তার কর্তব্য পালনে রত হল। সে মাটি শুঁকতে শুঁকতে অদৃশ্য আততায়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগল। সে প্রথমে এলোমেলো ঘুরতে লাগল। একবার বাড়ির ভিতরে গেল, কিন্তু সেখানে সেদিনকার কেউ উপস্থিত ছিল না, ছিলেন একমাত্র হাম্বড়া চৌধুরী। কুকুর একটু বিভ্রান্তভাবে বেরিয়ে এলো পথে, আবার বাড়ির ভিতর গেল, আবার এলো। প্রকাণ্ড বাড়ির ভিতর কুকুর দিশাহারা হয়ে ঘুরে একটি বেলা কাটাল। কিন্তু উপায় তো নেই, সে শেষ বারের মত যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথের দিকে চলতে লাগল তখন প্রায় সন্ধ্যা। চলল সে ডায়মণ্ড হাবরার রোড ধরে।

আরো একটি দেশী কুকুর তাদের অনুসরণ করছিল, কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করে নি। এই সময় লক একটু সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ রবার্টের সঙ্গে দেখা হতেই আনন্দে গদগদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, একটু কফি খেয়ে যা। রবার্ট বলল, স্কট অনুসরণ করছে রক্তের গন্ধ। লক বললেন, তা হোক। ও এগিয়ে যাক, তুমি তো গাড়িতে আছ, ভয় কি। রবার্ট লকের পুরনো বন্ধু।

রবার্ট লকের ঘরে গিয়ে বসলেন। পুলিসের দারোগাও রবার্টের সঙ্গে ছিলেন, তিনিও অগত্যা লকের বাড়িতে গেলেন। মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার। রবার্ট ও দারোগা কফি খেলেন এক পেয়ালা করে, কিন্তু হত্যা বিষয়ে একটি কথাও লক বললেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, কবে ফিরবে মনে করছ? রবার্ট বলল, বোধ হয় দিনতিনেকের মধ্যে। দারোগাকেও লক খুব অভ্যর্থনা জানালেন, এবং কলকাতার আবহাওয়া ভিন্ন তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়েই কোনো আলাপ করলেন না।

লক মনে মনে ভীষণ খুশী, কেন না তাঁর কাজ প্রায় শেষ। কিন্তু বাইরে থেকে তা কারও বোঝবার উপায় নেই। এদিকে থর্নও আপন ঘরে বসে যে সব অদ্ভুত পরীক্ষা চালাচ্ছেন তাও প্রায় সাফল্যের মুখে এসে পড়েছে।

দারোগা ও রবার্ট যখন লকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় রাস্তার উপর এলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন স্কট বেশিদূরে যায় নি। কয়েকজন লোক তাকে আদর করছিল, এবং স্কট আনন্দে ল্যাজ নাড়ছিল। কিন্তু রবার্টকে দেখে ল্যাজ নাড়া থামিয়ে দিল, যারা ওকে আদর করছিল তারাও নিজেদের অপরাধী মনে করে ওখান থেকে সরে গেল বলে মনে হল।

কালো দেশী কুকুরটিকে আর দেখা গেল না।

কিন্তু স্কটের মধ্যে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কারণ স্কট হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। সে যেন তার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। সন্দেহ জাগল, কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছে হয়তো। যারা আদর করছিল তারা সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাদের আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সবই একটা রহস্য বলে মনে হতে লাগল, রহস্যসংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

ভয়ানক ব্যাপার যে! শিক্ষিত কুকুর। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা কুকুর। তার এই পরিবতনে রবার্ট মুষড়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক উৎসুক হয়ে আছে কুকুরের ওস্তাদি দেখার জন্য। বিলেতে ট্রাঙ্ক কল করা হল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বলল, ওখানে চিকিৎসা না করিয়ে স্কটকে অবিলম্বে এখানে পাঠিয়ে দাও। টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে দিও।

জরুরি নির্দেশ।

এদিকে লক দরজার রহস্যভেদের কাজে আরও কিছু এগিয়েছেন। এখন মাত্র আধ-আনা বাকি। তাঁর কাজের সুবিধা এই যে কাউকে জেরা করতে হচ্ছে না। সমস্ত তর্কবিতর্ক শুধু

নিজের সঙ্গে। তাঁর পদ্ধতি তাঁর নিজের। তিনি যদি দেখেন একটি ত্রিভুজ পড়ে আছে অথচ তার একটা বাহু নেই, তা হলে যতক্ষণ না সেই হারানো বাহু খুঁজে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর আর বিরাম নেই। খুঁজে পেলে ওই ত্রিভুজের যে-কোন দুটি বাহু তৃতীয় বাহুটির চেয়ে বড়, অথবা ত্রিভুজমধ্যস্থিত তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান, প্রমাণ করে তবে নিষ্কৃতি।

লক ভাবছেন। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা অসম্ভব। ভিতর থেকে বন্ধ করলে দরজা না খুলে বাইরে আসা অসম্ভব। অথচ খুন। অথচ দেওয়ালে কোনো গুপ্ত দরজা নেই।

তা হলে আততায়ী কি—

লক লাফিয়ে উঠলেন। ত্রিভুজের হারানো বাহু খুঁজে পাওয়া গেছে। সব মিলে যাচ্ছে। তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান।

ওদিকে থর্নের পরীক্ষাও শেষ। মাত্র কয়েকটি চুল নিয়ে পরীক্ষা। তিনিও আনন্দে লাফাতে লাগলেন এবং ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ছোট্ট গাড়িখানায় স্টার্ট দিলেন। এবং ওই একই সময়ে লকও তাঁর গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। দুজনেই নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছেন, দুজনেরই অধৈর্য চরমে উঠেছে, এবং কেউ এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট করবেন না প্রতিজ্ঞা করে স্পীড দিয়েছেন। ফলে ডায়মণ্ড হারবার রোডের দুপাশের দুই গলি থেকে দুজনে বেরিয়ে এসে হেড-অন কলিশন হতে হতে বেঁচে গেলেন। গাড়ি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দুজনেরই অসাধারণ, সামান্য একটু গুঁতোর উপর দিয়েই তাই তাঁরা রক্ষা পেলেন। গুঁতোটা প্রায় আদরে পিঠ চাপড়ানোর মতোই হালকা এবং প্রীতিপূর্ণ।

তবু ব্যাপারটা কারোরই ভাল লাগল না। ওঁরা ঠিক করলেন গাড়ি দুখানা ওখানেই রেখে হেঁটে যাবেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক আলাপ করা যাবে।

আলাপের বিষয়, কলকাতার ইতিহাস। খুনজখম গোয়েন্দাগিরি নয়—মোট কথা নিজেদের বৃত্তিবিষয়ে কিছুই না।

ওঁরা দুজনেই গিয়ে পৌঁছলেন চৌধুরী বাড়িতে। হাম্বড়া চৌধুরী খুব খুশী। অভ্যর্থনা জানালেন ওঁদের।

গিয়ে শুনলেন সেদিনকার উপস্থিত সবাই নিজের কাজে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সনৎও বাইরে গিয়েছিল কিন্তু ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল অন্যরাও ফিরে এসেছে।

লক শুধু হালকাভাবে একবার জিজ্ঞাসা করলেন সেদিন সবশেষে ঘরে কে ঢুকেছিল? এবং এ কথা জিজ্ঞাসা করার আগে বারবার ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

সনৎ বলল, আমি।

নকুল বলল, আমি।

লক প্রশ্ন করলেন, নকুলবাবু, আপনিই যে শেষে ঢুকেছিলেন এ বিষয়ে এমন নিশ্চিত হলেন কি করে?

নকুল বলল, আমি পিছনে কাউকে আসতে দেখি নি।

পিছনে তাকিয়েছিলেন দোতলায় ওঠবার সময়?

একবার।

কেন?

দেখলাম আরো কেউ আসছে কি না।

বড়ই অস্বাভাবিক ইচ্ছা। যাই হোক কিছু মনে করবেন না, এটি আমার নিছক কৌতূহল।

কৌতূহল কেন বলছেন? আপনি তো তদন্ত করছেন এই কেস।

না। আমার কাজ হচ্ছে দরজার রহস্য ভেদ করা। তার বেশি কিছু না।

লক পাইপে নতুন তামাক পুরে আগুন ধরিয়ে টানতে টানতে বলতে লাগলেন, দরজার রহস্যটা এত সহজ আগে ভাবতে পারি নি। ত্রিভুজের একটি বাহু হারালে তার সন্ধান করা সহজ। কিংবা অনেক বাহু কুড়িয়ে এনে কোনটা ফিট তা দেখাও সহজ। কিন্তু ত্রিভুজ পড়ে আছে অথচ তার তিনটি বাহুর একটিও নেই, এ বড় কঠিন রহস্য। আমার চিন্তাধারাটি এইভাবে চলল ঃ হয় তিনটি বাহুই আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, অথবা একটিও নেই, এবং কোনো দিনই খুঁজে পাব না।

তারপর একটু থেমে পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ খুললেন এবং বললেন এইটি হচ্ছে ওই ঘরের নকশা। আপনারা দেখুন সব ঠিক আঁকা হয়েছে কিনা।

সবাই বললেন, ঠিক হয়েছে। সবাই অর্থাৎ ওখানে তখন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের পূর্ব-পরিচিত। রবার্টও স্কটকে নিয়ে এসেছিল সেখানে। যদি আততায়ী এদের মধ্যে কেউ থেকে থাকে তবে হঠাৎ স্কটের মাথা ভাল হয়ে যেতে পারে, এই আশা। এজন্য রবার্ট মাঝে মাঝে পকেট থেকে নিহতার রক্তমাখা শাড়ির টুকরো বার করে শোঁকাচ্ছিল। কিন্তু স্কট নির্বিকার।

এমন সময় হঠাৎ ফটকের বাইরে সেই রহস্যজনক রোগা কুকুরটির মাথা দেখা যেতেই স্কট ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং শিকল ছিঁড়ে তাকে আক্রমণ করবে বলে বারবার চেষ্টা করতে লাগল। রবার্ট লজ্জিত হয়ে স্কটকে আড়ালে নিয়ে গেল।

লক বলতে লাগলেন, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। দরজা ভেঙে যাঁরা ঘরে ঢুকেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষে যিনি ঢুকেছেন তিনিই আততায়ী। তিনি কে, তা আমি বলব না, তা বলতে আমি আসিও নি।

লক অতঃপর ম্যাপ খুলে একে একে সব বোঝাতে লাগলেন। বললেন, এই দেখুন, এই দরজা ভাঙা হয়েছে, তারপর এইভাবে আপনারা বাঁয়ের দিকে গেছেন নিহতার খাটের কাছে। আপনাদের অনুসরণ করেছে আততায়ী।

কেমন করে?—সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলেন।

লক বললেন, আততায়ী ঘরেই লুকিয়ে ছিল, দরজার আড়ালে। আপনারা তখন উত্তেজিত ছিলেন, তাই দুদিক দেখেন নি, ঘরে ঢুকে শুধু বাঁ দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু আততায়ী খুন করে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় নি কেন, তার হাজার রকম কারণ থাকতে পারে। তাকে জেরা করে আপনারা প্রকৃত কারণ নির্ণয় করুন। আমি এবারে আসি। নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্ত সময় আমার হাতে নেই—এক ঘন্টা পরে আমার প্লেন ছাড়বে।

পুলিসের এতক্ষণ যে সন্দেহ ছিল, তা অনেকটা দূর হল, তাই দারোগা লকের বিদায়কালে তাঁকে জড়িয়ে ধরে গোটা দশ-বারো চুমু খেলেন।

এবারে থর্নের পালা। এক-একটি অংশ এক একজনের হাতে। লকের অংশ শেষ হয়ে থর্নের অংশ আরম্ভ হল।

থর্ন বলতে লাগলেন, আমি যে সাফল্যের কথা এখন আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি—আততায়ীর নাম আবিষ্কারের সাফল্য—তা সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ ভারতীয় বিখ্যাত ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকারের নিষ্ঠাপূর্ণ সহযোগিতায়। ব্রজবিলাস যখন ছদ্মবেশের বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য বিলেতে ছিলেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। এবং তিনি আজ এই সভাতে উপস্থিত আছেন বলা চলে।

সবাই পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন।

থর্ন বললেন, ঠিক এখানে নয়, ফটকের বাইরে। আপনাদের অনুমতি পেলেই তাঁকে ডাকতে পারি।

নিশ্চয় ডাকুন।—বললেন চৌধুরী।

থর্ন ডাকতেই বাইরের কুকুরটি ভিতরে এল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে।

থর্ন বললেন, ইনিই ব্রজবিলাস সরকার। বর্তমানে ইনি কুকুরের ছদ্মবেশে আছেন। মিস্টার সরকার, আপনি ছদ্মবেশ ছাড়ুন।

আদেশ পাবামাত্র কুকুর মানুষের ভঙ্গিতে দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মানুষের ভাষায় বলল, একটু অন্তরাল দরকার।

তাকে বাথরুম দেখিয়ে দেওয়া হল। দু-মিনিট পরেই ব্রজবিলাস বেরিয়ে এল, হাতে চামড়ার ব্যাগ। ছদ্মবেশটা উলটো করে ধরলেই ব্যাগের চেহারা পায়, এ এক অদ্ভুত ব্রিটিশ আবিষ্কার।

থর্ন বললেন, লকের পরে অবশিষ্ট আছে দুটি রহস্য, তার একটি আমি ভেদ করেছি, আর একটি করেছেন মিস্টার সরকার। আমারটি একটু জটিল, আপনাদের ধৈর্যের উপর অত্যাচার করা হবে না তো?

বিলক্ষণ! আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা সময় নিন।—বললেন চৌধুরী। দারোগাও বললেন, আমার ক্রমেই সব অদ্ভুত লাগছে—আপনি সব বলুন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনব।

ইতিমধ্যে থর্নের ঘর থেকে দুটি বড় বড় বাক্স এসে পৌঁছেছে। তার একটিতে টেপ রেকর্ডিং যন্ত্র অন্যটিতে মাইক্রোস্কোপ। থর্ন বাক্স দুটি খুলতে খুলতে বললে, আততায়ীর নাম আমি আগেই প্রকাশ করে দিই—তার নাম সনৎ।

হঠাৎ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল, সনৎকে দারোগা ধরে ফেললেন।

থর্ন বলতে লাগলেন, আমার পদ্ধতি একটু ঘোরা পথে। মাপজোক দরকার হয় না। আগেই বলেছি যে হত্যার ঘর থেকে আমি চুল সংগ্রহ করেছিলাম। তারপর কি করেছি শুনুন। আমি ব্রজবিলাসবাবুব সাহায্যে জানতে পেরেছি সনতের একজন প্রণয়িনী আছে। তার নাম প্রকাশ করব না। তবে তাকে আমি আমার পরীক্ষা ঘরে আনাবার ব্যবস্থা করেছিলাম নানা কৌশলে। গভীর রাত্রে ঘটনাটা ঘটেছিল, কেউ জানে না। খুনের কিনারা হতে পারে ভেবেই এটি করেছিলাম। কারণ ঘর থেকে আমি যে চুল সংগ্রহ করেছিলাম তা সনতের চুল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, কারণ পরে ও-ঘরে যাঁরা গেছেন সবার চুল আমি পরে চেয়ে নিয়েছি। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা সহজ।

তারপর মেয়েটিকে জেরা করে শুনলাম ওদের প্রণয় গভীর। শুনলাম সনৎ ওর সান্নিধ্যে এলেই রোমাঞ্চিত হত। এ কথা মেয়েটিকে সে বারবার বলেছে। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, ঠিক। মাইক্রোস্কোপের স্লাইডে চুল বসিয়ে মেয়েটিকে বললাম তুমি সনৎ সনৎ বলে ডাক। মেয়েটি ডাকতে লাগল—আমি দেখলাম মাইক্রোস্কোপে, সে ডাকে স্লাইডের উপর চুলটি খাড়া হয়ে নাচছে। এ নাচ এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে ভাল দেখা যায় না!

আপনাদের এ পরীক্ষা দেখাবার জন্য আমি মেয়েটির কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে নিয়েছি।

থর্ন সবাইকে তাঁর পরীক্ষা দেখিয়ে অবাক করলেন। নিহতার হাতের মুঠিতে যতগুলো চুল ছিল সব একসঙ্গে স্লাইডের উপর নাচতে লাগল, টেপ রেকর্ডে মেয়ের কণ্ঠে "সনৎ সনৎ" ডাক শুনে।

থর্ন বললেন, আমার অংশ শেষ হল, আমি এবারে বিদায় নিই! পরের অংশ ব্রজবিলাসবাবু বলবেন। দারোগা আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠে থর্নকে জড়িয়ে শ'খানেক চুমো খেলেন এবং বললেন, আপনি যাবেন না, একটুখানি অপেক্ষা করে যান।

ব্রজবিলাস দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, আমার উপর ভার পড়েছিল স্কট নামক স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শিক্ষিত গোয়েন্দা কুকুর হঠাৎ বিগড়ে গেল কেন তা আবিষ্কারের। আমি ঠিক এই ঘটনার সন্ধান করতেই কাজ আরম্ভ করি নি। ব্যাপারটা হঠাৎ আমার চোখে পড়েছে। এটি নিতান্তই দৈব যোগাযোগ।

স্কট বিপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। ঘুষ খেয়ে তার কর্তব্য থেকে সে চ্যুত

হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন সে আমাকে কুকুরের ছদ্মবেশে এখানে দেখেই চিনতে পেরেছিল, আমাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, এবং শিকলবাঁধা না থাকলে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। কারণ তার ওই দুষ্কার্যের সাক্ষী ছিলাম আমি।

স্কটকে অতঃপর সেখানে আনা হল। স্কট লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

রবার্ট সব শুনে স্তম্ভিত।

শোনা গেল দশ-হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে।

স্কট ধরা পড়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ল এবং আত্মরক্ষার জন্য নিজের ব্যবহার হঠাৎ পরিবর্তন করে আগের মত ল্যাজ নাড়তে লাগল। রবার্ট তা দেখে আশান্বিত হয়ে নিহতার রক্তমাখা কাপড়ের টুকরো নাকে ধরতেই স্কট একলাফে সনতের ঘাড়ে পড়ে তাকে চিত করে ফেলল।

থর্ন বললেন, ভারতবর্ষের জল-বায়ুতে কিছু একটা আছে বলে মনে হয়। কারণ আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বিপক্ষ অনেক টাকা ঘুষ দিতে এলে হয়তো নিয়ে ফেলব।

সবাই হেসে উঠলেন। এবং দারোগা ব্রজবিলাসকে তিনটি চুমু খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

হত্যার মোটিভ নিয়ে অতঃপর তিনি ভাবতে লাগলেন।

ভাদ্র ১৩৬৭

হনুমানের বস্ত্রহরণ

(একখানি নবাবিষ্কৃত পুথি)

“দীপঙ্কর”

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছিলাম, পি. আর. এস. নাড়ুগোপালের নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ “হনুমানের বস্ত্রহরণ” হইতে নজির তুলিয়া আমার বক্তব্যকে সমর্থন করিব এবং এই মহামূল্য পুথিখানির একটি টীকা-টিপ্পনী সমন্বিত সমালোচনা পাঠকদের উপহার দিব।

বহু সাধ্য-সাধনার পরে নাড়ুগোপাল তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধীয় এই সমালোচনা বা বিজ্ঞপ্তিটুকু প্রকাশের সুযোগ দিয়াছেন। বেশি বলিবার অধিকার নাই, কারণ যথাসময়ের পূর্বে জিনিসটার অধিক ‘পাব্লিসিটি’ হইয়া গেলে গবেষণার কদরটা মারা যাইবে। অতএব সংক্ষেপেই লিখিব। যিনি ইহা হইতেই রসগ্রহণ করিতে পারিবেন; তাঁহার রসগ্রাহিতাই প্রমাণিত হইবে এবং যিনি পারিবেন না, তাঁহার বেরসিকত্ব সম্বন্ধে সংশয় নাই।

কিন্তু এই সমালোচনাটুকু প্রকাশ করিতে গিয়াও গোল বাধিয়াছিল সম্পাদক মহাশয়কে লইয়া। সাহিত্যের খুঁত বাছিতে বাছিতে তাঁহার দৃষ্টি এমনই অযথা তীক্ষ্ণ ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, বিনা তর্ক-প্রমাণে কোন জিনিস তিনি মানিয়া লইবেন না। সুতরাং প্রবন্ধমধ্যে গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ পড়িয়াই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং এমনভাবে ভাষাতত্ত্ব ব্যাকরণ লইয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিলেন যে, আমি রীতিমত হিমসিম খাইয়া গেলাম। অকস্মাৎ বুদ্ধি গজাইল। তৎক্ষণাৎ তাহার শেল্‌ফ হইতে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বিদ্যানিধি মহাশয় সম্পাদিত কৃষ্ণ-সেনের ‘চণ্ডীদাস-চরিত’ টানিয়া নামাইয়া তাঁহার সামনে মেলিয়া ধরিলাম, সম্পাদক মহাশয় ‘স্পীকটি নট’ হইয়া গেলেন। অনুমতিও মিলিল।

সমালোচনা করিবার পূর্বে মূল পুথি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। পুথি চমৎকার ফুলস্ক্যাপ কাগজে লিখিত, হস্তলিপি দ্বিতীয়-ভাগ-পড়া বালকের ন্যায় হইলেও কাজল কালি এবং ভাল ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করা হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। হাতের অক্ষরগুলি এমন বিকৃত যে, খ্রীষ্টিয় ১৯৩৯ সালেও তাহা লিখিত হইতে পারে, আবার চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের হওয়াও বিচিত্র নয়। শীঘ্রই হস্তলিপিবিশারদদের নিকট যথার্থ কাল-নির্ণয়ের জন্য বইখানি পাঠানো হইবে। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে নাকি ইতিপূর্বেই অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া স্বীকৃত না হওয়াতে, সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সাহিত্যের বর্তমান অধ্যাপক মহাশয়কেই এই ভার দেওয়া হইবে। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এ সময় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঁচিয়া নাই।

কিন্তু এই পুথির কাল-নির্দেশ বা ভাষা-বিচার করিবার মত পাণ্ডিত্যের দুঃসাহস আমার নাই, আমি নিতান্তই অজ্ঞ মুগ্ধ ভক্ত। আমার মত ভক্তদের জন্যই এই সমালোচনা লিখিত, পণ্ডিতদের জন্য নহে। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিরা অনুগ্রহ করিয়া ইহা পড়িবেন না।

বইখানার টাইট্‌ল পেজে লিখিত আছে যে, ইহা কেন্দুয়া-নিবাসী কবি জয়গোপাল দেব কর্তৃক রচিত। রচনার তারিখটা পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমি পূর্বেই গীতগোবিন্দকার জয়দেবকে ইহার গ্রন্থকারত্ব আরোপ করিয়াছিলাম, সুতরাং নামের মধ্যস্থ ‘গোপাল’ কথাটি বোধ হয় অনেককেই সন্দিগ্ধ করিতেছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরস্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান যুগে যেরূপ নামের উদর বর্জন করিয়া আমরা নামকে সংক্ষিপ্ত, ভদ্র ও পাংক্তেয় করিয়াছি, প্রগতি-পন্থী কবি জয়দেবের পক্ষেও সেইরূপ সৎসাহস থাকা কিছুমাত্র

অসম্ভব নয় ; কারণ যে 'কামায়ন' বর্তমান 'ফ্রয়েডো ম্যানিয়াগ্রস্ত' ক্লীব সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যে জয়দেব যে কি পরিমাণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, গীতগোবিন্দে তাহার উদাহরণের অভাব নাই। আর যুগের সামান্য একটু মোচড় খাইয়াই যে কেঁদুয়া কি ভাবে 'কেঁদুলি'তে পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ তো ভাষার সর্বত্রই আছে। ধরুন, 'নৈমিষারণ্য'। কালক্রমে সেটা হইল 'নিম্‌খারণ', তারপরে 'নিমখার' এবং বর্তমানে 'নিমখা'তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

পাণ্ডিত্যকে এড়াইতে গিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে আমিও খানিকটা পণ্ডিতীয়ানা করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু উপায় নাই, স্বর্গে যাইবার পথে সিঁড়ি অনেক। উত্তরমেঘে পৌঁছিতে হইলে পূর্বমেঘকে চোখ বুজিয়া গিলিতেই হইবে, রসালের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া দুই চারিটি কাঁটার আঁচড় বা কাঠপিঁপড়ার দংশনে ঘাবড়াইলে চলিবে না।

বইখানির প্রথমেই একটি বন্দনা আছে। তাহার খানিকটা এখানে তুলিয়া দিলাম—

"বন্দোঁ বন্দোঁ তোমারে ধামাই,
তুহুঁ ধর্ম তুহুঁ কর্ম
একাধারে শ্বশুর জামাই।
তুরে লিয়ে বাজার করি,
ধনীর দোবে তোরেই ধরি,
বিদ্যে বুদ্ধি মা-ভবানী
হাজার টাকা তবু কামাই।"

অস্য টীকা : বন্দোঁ—উত্তম পুরুষহেতু অনুনাসিক। ধামাই—'ধামা' অর্থে, আদরে 'ই' যোগ হইয়াছে। যেমন, যাহার নাম গদাধর বা গদা, তাহাকে আদর করিয়া ডাকা হয়, 'বাছা রে গদাই!' তুহুঁ—ব্রজবুলি। 'তুরে লিয়ে'—বিকৃত হিন্দি, সাওতাল পরগণার ভাষার অনুরূপ। অর্থ, 'তোকে লইয়া'।

কিন্তু উহুঃ, টীকা চলিবে না। সম্পাদক মহাশয় স্থানাভাবের ফাকড়া তুলিয়া বসিয়া আছেন। অতএব অতঃপর আমি শুধু কবিতাই উদ্ধৃত করিয়া যাইব। যিনি বোদ্ধা, তিনি বুঝিবেন ; আর যিনি নির্বোধ, তিনি পাতা উলটাইয়া যাইবেন।

খুটিয়া খুঁটিয়া এই মহাগ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, আশা আছে, অচিরাৎ কোন গবেষক-ধুরন্ধর এই মহাকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দেশবাসীগণের জ্ঞান ও রস-পিপাসা নিবৃত্ত করিবেন। আমি শুধু কবির সাহিত্যোৎকর্ষমূলক শ্রেষ্ঠ স্থানগুলিই কিছু কিছু উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিব। বলা প্রয়োজন, এ বিষয়ে আবিষ্কর্তা নাড়ুগোপাল আমাকে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন।

এখানে আর একটা দরকারী কথা বলিয়া লইতে হইবে। এই পুথিখানি রামায়ণের উপরে ভিত্তি করিয়া লিখিত হইলেও ইহার আখ্যানভাগ রামায়ণবহির্ভূত এবং অভিনব। ইহা কবির সৎসাহসেরই পরিচয় দিতেছে, অদ্ভুতাচার্যের অদ্ভুত রামায়ণ পর্যন্ত ইহার নিকটে নাবালক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইহাতে রামায়ণ ও মহাভারতের পাত্র-পাত্রীদের একসঙ্গে মিলাইয়া ফেলা হইয়াছে, রামায়ণের হনুমান মহাভারতোক্ত প্রমীলাদের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে কবির সমর্থনার্থে ইহা বলা যাইতে পারে যে, হনুমান অমর, তিনি যে কোন কালে, যে কোন রূপ লইয়া লীলা করিতে পারেন। সেদিনও আমাদের দেশে বীর অশ্বত্থামা তাঁহার পদচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

পুথির ঘটনাংশ এই, একদা পবননন্দন হনুমান মন্দারপর্বতের চূড়ায় আরোহণ করিয়া অষ্টাদশ শত পরিপক্ক কদলীযোগে তাঁহার বৈকালিক আহার সমাপ্ত করিলেন। তখন বসন্তকাল, চন্দনের গন্ধ লইয়া মলয়পবন প্রবাহিত হইতেছে, কিংশুক অশোক মঞ্জরীসম্ভারে পীনোন্নতা নব-যৌবনা তরুণীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চতুর্দিকের বসন্তশ্রী নিরীক্ষণ করিতে

করিতে সহসা অভূতপূর্ব পুলকে হনুমানের অন্তর প্লাবিত হইল. তিনি সানন্দে একটি লম্ফ প্রদানপূর্বক সোজা পঁচাত্তর যোজন পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে প্রমীলারাজ্যে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। সেই মহামেঘপ্রভ বিশালপুচ্ছসমন্বিত মূর্তি দেখিয়া এবং লঙ্কাদাহনের প্রতীক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া নাগরিকগণ বিস্মিত বিদ্রূপে কহিল—

"কে বট, কে বট তুম্ হো!
আশমান পাকড়ে লেঙ্ঙ্ মুখে ওঠে শাদা গেঙ্ঙ্
কিবা মুখ পোড়া রূপ, যাও ভা-গো!"

এই ব্যঙ্গভাষণ শুনিয়া হনুমানের মেজাজ গরম হইয়া গেল, হাজার হোক পবননন্দন তো।—

"যে হই সে হই আমি
তোমাদের তাতে কি?
কয়াবো এমন চাটি
বুঝে নেবে মজাটি।
বখামি শিখেছ ঢের
সহবৎ শেখ নি
ঘুঘু দেখিয়াছ বাপা
ফাঁদটি তো দেখ নি!"

ভীতা অপমানিতা নারীকুল অগত্যা রোদন করিতে করিতে রাণীর নিকটে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। প্রমীলা শুনিয়া গর্জিয়া কহিলেন, কি, এতবড় কথা! আমার রাজ্যে আসিয়া আমারই সহচরীদিগকে এইরূপ অপমান! যাও, শীঘ্র সেই দুর্বৃত্তকে বাঁধিয়া আন।—

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল, সহস্র সহস্র মণ দড়ি-কাছি ব্যয় করিয়া মারুতিকে বন্ধন করা হইল। এই স্থানের বর্ণনা অনেকটা বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ। বন্দী হনুমানকে সম্মুখে আনিলে প্রমীলা কাদম্বরীপ্রসাদে প্রমত্তা হইয়া রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, প্রকাশ্য সভায় হনুমানের বস্ত্রহরণ করিয়া পুনর্বার তাহার লেজে অগ্নিদান করা হউক। সেই সঙ্গে এই আদেশও দেওয়া হইল যে, লঙ্কাকাণ্ডের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য নগরের সর্বত্র যেন উপযুক্ত ফায়ার ব্রিগেডের বন্দোবস্ত থাকে।

অতঃপর লজ্জাভীত মহাবীরের যে কাতর বিলাপ এবং লজ্জাবারণের নিমিত্ত পিতা পবনদেবের নিকট যে সকাতর প্রার্থনা তাহাই এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভাব-মাধুর্যে, পদ-লালিত্যে ও আন্তরিকতায় ইহা অতুলনীয়। পাঠকদের জন্য তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দেওয়া হইল—

"পিতা, মোর রক্ষ রক্ষ মান,
পড়িয়া প্রমীলা ফান্দে প্রাণের চিঁড়িয়া কান্দে
জেনানারা বড় বেইমান।
মন্দার পর্বতে ছিনু কি কুক্ষণে মাটি খাইনু
বেকুফের মত দিনু ঝম্প,
তার পরে হায় হায় জান মান সব যায়
দেহে ওঠে পালাজ্বর কম্প।"

ম্লেচ্ছ পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ইহার তুলনা দূরে থাক, মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত তাঁহার অমর কাব্য 'কুমারসম্ভবে'র রতিবিলাপেও করুণরসের দিক দিয়া এমন অপূর্ব অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। উদ্ধৃত সামান্য কয়টি পংক্তির মধ্যেই বিপন্ন লজ্জাপীড়িত হনুমানের যে দৈহিক, মানসিক অবস্থার কথা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা এক অভিনব ভাবঘনীভূত মূর্তি

লইয়া অতি অবলীলাক্রমে রসোত্তীর্ণ কাব্যলোকে চলিয়া গিয়াছে।

পুত্রের এই সকরুণ প্রার্থনায় পিতৃদেব আর থাকিতে পারিলেন না, নানা কারণে পিতৃত্বের দাবিটা লোকত লুকাইয়া রাখিলেও রক্তের টান যাইবে কোথায়? হু হু করিয়া পাঁচ সাত শো কালবৈশাখীকে সঙ্গে লইয়া দেবতা স্বয়ং আসিয়া হাজির। কিন্তু যে প্রমীলার দল অর্জুনকে ঘোল খাওয়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা সোজা নয়; আয়রন ফ্রেমের ব্যবহার তাহারা জানিত, পবন সুবিধা করিতে পারিলেন না। গায়ের জোরে কুলাইল না, তিনি বুদ্ধিবলের আশ্রয় লইলেন। এক ঢিলে দুই পাখী বধ, হনুমানের লজ্জা নিবারণ এবং প্রমীলাদের জব্দ করা। উপায় মিলিতেও দেরি হইল না। আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য এবং সিংহলের সমস্ত অরণ্য হইতে তিনি ঝাঁটাইয়া কার্পাস ও শিমুল তূলা উড়াইয়া আনিতে লাগিলেন। বিবস্ত্র হইবার পূর্বেই সেই তূলার রাশি হনুমানকে ঢাকিয়া ফেলিল, তিনি রক্ষা পাইলেন। ওদিকে প্রমীলাদের অবস্থা কাহিল, সেই তূলা নাকে মুখে ঢুকিয়া তাহাদের দমবন্ধ করিয়া আনিল, তূলায় প্রায় নগর ঢাকা পড়িয়া গেল। এমন অস্ত্র কি আছে যে, এ অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়? চৈত্রের দারুণ গরমে তূলার বস্তার নীচে চাপা পড়িয়া প্রমীলারা গলদঘর্ম হইয়া উঠিল।

অতএব প্রতিক্রিয়ার পালা, ব্যতিব্যস্ত প্রমীলারা পবনের বন্দনা শুরু করিল। স্তবে তুষ্ট হইয়া পবন কহিলেন, রাশি রাশি ধামা নির্মাণ করিয়া এই সমস্ত তূলা সংরক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমরাও নিষ্কৃতি পাইবে, ভবিষ্যতেও উপকার দর্শিবে। আর মনে রাখিও।—

"পবন কহেন তবে হও অবহিত।
আজি হতে ধামা পূজা কর একচিত।।
যে জন পূজিবে ধামা পরাণ খুলিয়া।
রম্ভাতক হবে তার আঙ্গুল ফুলিয়া।।
গাড়ি ঘোড়া হবে তার গজাইবে ভুঁড়ি।
ব্যাঙের ছাতার মত উঠিবে সে ফুঁড়ি।।"

এইরূপ আরও প্রচুর মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের পর ধামাদেবতার মহিমা-প্রচারান্তে গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। বস্তুত, ধর্ম > ধামাতত্ত্বের পথ ও মতবাদ সম্পর্কে ইহাই একমাত্র প্রামাণিক রচনা। এই গ্রন্থ আবিষ্কারের দ্বারা সমাজে বাহ্যত লুপ্ত অথচ অন্তরালে নিত্যবহমান ফল্গুধারার ন্যায় যে ধর্মসম্প্রদায়ের উপরে আলোকপাত ঘটিয়াছে, তাহাতে পি. আর. এস নাড়ুগোপাল বঙ্গের প্রত্যেক জ্ঞানভিক্ষু ব্যক্তিরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, এই অপূর্ব গ্রন্থের কেবল কণিকামাত্র আমি পাঠকদের আস্বাদন করাইতে পারিলাম। ভরসা করি, অতঃপর বাংলার মনস্বীকুল এই গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করিয়া সাহিত্য-জগতে ইহার যথাযথ স্থান নির্ণয়পূর্বক ইহাকে সম্মানিত করিবেন এবং পাঠকেরাও সুচিন্তিত টীকাসংশ্লিষ্ট সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ পাঠ করিয়া জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের সুযোগ পাইবেন। আমি শুধু ইহার পরিচয়মাত্র দিয়াই বিদায় লইলাম। কাঠবিড়ালীর পক্ষে সেতুবন্ধনকার্যে ইহার অধিক সহায়তা সম্ভব নহে।

উৎসাহী পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে সার্কুলার রোডস্থ '—' পত্রিকার আপিসে গিয়া মূল পুথিখানি দেখিয়া আসিতে পারেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ

"বনফুল"

তিনি বলিতেছিলেন, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল। "দেখ, আমরা সকলেই ভ্রমণশীল, কেহই এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, জীবনই আমাদের চালিত করিতেছে, আন্তরিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই আমরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। কত স্থানে যে গিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেদিন যে অদ্ভুত দেশে আমি গিয়া পড়িয়াছিলাম, তেমন বিচিত্র দেশে আমি আর কখনও যাই নাই, যাইব বলিয়া কল্পনাও করি নাই। সে দেশের গল্পই আজ তোমাদের শুনাইব।

আমি সেদিন যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম তাহা নয়। আমি বাহির হইয়াছিলাম খাদ্যসন্ধানে। যে স্থানে প্রত্যহ খাদ্য পাই, সেই স্থানেই আমি গিয়াছিলাম, খাদ্যের সন্ধানও পাইয়াছিলাম। একাগ্র চিত্তে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় এক প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি যে স্থানটায় ছিলাম, সেই স্থানটাই যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি স্থানচ্যুত হইয়া একটা ঘন জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া গেলাম। বিস্ময়ের ভাবটা যখন কাটিয়া গেল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, স্থানটা নিতান্ত মন্দ নহে। মোটামুটি খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর ইচ্ছা হইল বাড়ি ফিরি, আমার বিলম্ব দেখিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ। কি যে ঘটিয়াছে তাহা তোমাদের বলিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছিল। সেই ঘন অরণ্য হইতে বাহির হইয়া কিন্তু ঘরের দিকে ফিরিতে পারিলাম না। একটা অপরূপ গন্ধ আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিসের গন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম, ওই গন্ধকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার উপায় নাই। একটা অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম জানি না, কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম আমি একটা কালো রঙের টিপির উপর উঠিয়াছি। টিপি হইতে নামিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম, টিপিটাই চলিতেছে। সেও যেন গন্ধটাকেই অনুসরণ করিতেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, তাহার পর লক্ষ্য করিলাম টিপির উপর একটা লম্বা গাছের মত কি যেন রহিয়াছে। সেটা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিছুদুর উঠিয়াই কিন্তু বিপন্ন হইতে হইল। কে যেন ঝটকা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। যেখানে আমি পড়িলাম তাহা পাথরের মত কঠিন, ঘোর রক্তবর্ণ এবং অতিশয় মসৃণ। এরূপ দেশ পূর্বে কখনও দেখি নাই। সবুজের কোন চিহ্ন বা মাটির কোনও আভাস কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। সেই মধুর গন্ধটা কিন্তু আরও তীব্র আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল। তাহা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি আচ্ছন্নের মত দ্রুতপদে সেই মসৃণ কঠিন রক্তবর্ণ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, সেই মধুর গন্ধই যেন আমার বাহক হইল। কিছুক্ষণ চলিবার পর আর একটি আশ্চর্যজনক বৃক্ষ দেখিলাম। বাদামী রঙ, সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে এইরূপ একটি অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, এই বৃক্ষটিতে উঠিব কি না ইতস্তত করিতে লাগিলাম। আমার ইতস্তত ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ টিকিল না। যে গন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল মনে হইল তাহার উৎস যেন ঊর্ধ্বে, অদৃশ্য শতধারায় তাহা যেন শূন্য হইতে বর্ষিত হইতেছে। আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, সেই অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোনও

বিপদ হইল না। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখিলাম, আর একটি নূতন দেশে উপনীত হইয়াছি। চতুর্দিক শ্যামল। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, ইহাই বুঝি স্বর্গ। কিছুদুর অগ্রসর হইয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। দেখিলাম, বিরাট এক দুধের নদী সেই শ্যামল দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। তাহার পর আগাইয়া গিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম। আকণ্ঠ পান করিলাম। এমন সুস্বাদু সুমিষ্ট দুগ্ধ বহুকাল পান করি নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। সেই সুমধুর গন্ধ কিন্তু তখনও আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, কাছাকাছি কোনও ফুল ফুটিয়াছে কিনা। ফুল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গন্ধের উৎসটি দেখিতে পাইলাম। দুগ্ধ-নদীর পরপারে বিরাট একটি হ্রদ রহিয়াছে, জলপূর্ণ হ্রদ নয়, মধুপূর্ণ হ্রদ। সেই হ্রদ হইতেই যে এই অপূর্ব সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। সেই হ্রদের সমীপবর্তী হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই বিরাট দুগ্ধনদী অতিক্রম করিব কিরূপে? শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাহা সমস্ত দেশটাই জুড়িয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, যদি সন্তরণযোগ্য কোনও ক্ষীণ ধারা পাই।...”

যিনি কাহিনীটি বলিতেছিলেন তিনি রবিনসন ক্রুশো, গালিভার অথবা সিন্ধবাদ নহেন, সামান্য একটি পিপীলিকা মাত্র। তাঁহার দৃষ্টি দিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন মানবীয় দৃষ্টিতে তাহা এইরূপ এক কাঠুরিয়া একটি গাছের ডাল কাটিতেছিল। ডাল যখন ছিন্ন হইল, তখন তাহা একটি ঝোপের মধ্যে পড়িল। ডালে একটি পিপীলিকা ছিল, সেটিও ঝোপে পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটাইতেছিলেন তিনি ঝোপের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিপীলিকা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার জুতার উপর উঠিল। তিনি যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন পিপীলিকা তাঁহার পা বাহিয়া হাঁটুতে উঠিয়াছে। তিনি হাত দিয়া তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পিপীলিকা তখন লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘরের মেঝের উপর পড়িল। সেখান হইতে সে একটি টেবিলের নিকট উপনীত হইল। টেবিলের পায়া বাহিয়া সে সবুজ অয়েল-ক্লথ-মোড়া টেবিলে আরোহণ করিল। টেবিলের উপর একটু আগে খানিকটা দুধ পড়িয়া গিয়া নানা ধারায় বহিয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপর একটি বড় কাচপাত্রে খানিকটা মধুও ছিল।

আশ্বিন ১৩৬২

বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য

মৌলা দোপেঁয়াজি

দিনদিন ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির সঙ্গেসঙ্গে আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের প্রচলন বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সেইসঙ্গে একটি সমৃদ্ধিশালী এবং অতি বলবান্ বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যেরও ক্রম-বিকাশ হইতেছে। এমন বিজ্ঞাপনও মাঝে মাঝে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ইত্যাদি বিবিধ পত্রিকার বুকের উপর জাজ্জ্বল্যমান দেখা যায়, যে তাহাতে চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না এবং বারবার মনে হয়—নহি মোরা দীন, নহি মোরা হীন—হতে পারি ক্ষীণ—ইত্যাদি। বিলাতী বিজ্ঞাপন বহরে এবং রঙচঙে বড় কিন্তু আমাদের দেশী বিজ্ঞাপনের মতো মনোহরণ এবং চমকপ্রদ হয় না। বিলাতী কাগজের বিজ্ঞাপন, সাধারণত লোকে বিজ্ঞাপন-ছাড়া কাগজের অন্যান্য লেখা পড়িয়া, পড়ে, কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনের ভাষা এমনই চমকদার যে বিজ্ঞাপনই সম্পূর্ণভাবে পাঠকের মনোহরণ করে। অন্য লেখা পড়িতে মন যেন আর চায় না। সেটা একদিক দিয়া অবশ্য ভালোই হয়। বিলাতী বিজ্ঞাপনকে আমরা এই একটি বিষয়ে বিষম পরাজিত করিয়াছি এবং তাহাতেই মনে হয় "Plassey is avenged"। বিজ্ঞাপন-বিষয়ক বিজ্ঞাপন না দিয়া এখন কতকগুলি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের নমুনা দিব—মনোযোগের সহিত পঠিত হইলে সুখী হইবেন। যদি কাহারো ভাল না লাগে তবে পড়িবার দরকার নাই, কারণ তাহাতে সযত্ন এবং সকষ্ট-সংগৃহীত বিজ্ঞাপনের রস বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

১নং— **লোমহর্ষণ! খুব কম দাম!! লোমহর্ষণ!!!**

কবিজগতের ভরাবাদর, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী,
ভাবজগতের বে অফ্ বিস্‌কে, বাংলার বৈদ্যকুলপতি,
ছন্দরাজ্যের অঘটনঘটন পটীয়সী, মহাপ্রাণ

কেয়ারী রঞ্জনের

"প্রণয়-দহন-জ্বালা-নিবারণী-কাব্য"
বঙ্গের বিরহীকুল! আর ভয় নাই, এসো, একসঙ্গে এসো,
দৃঢ়পদে অগ্রসর হও, মা ভৈঃ, মা ভৈঃ, অর্থাৎ ভয় নাই, নাই,
বাণী আসিয়াছে। কবি-বৈদ্য কেয়ারীর প্রেমজ্বালার
একমাত্র মলম ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও।
হৃদয় জুড়াইবে, প্রাণ শীতল হইবে। খুব কম দাম, মাত্র
১৪ পয়সা। বিরহীকুলের বুকের দিকে চাহিয়াই আমরা
এত কম দামে এই অমূল্য কাব্য-মলম বিতরণ করিতেছি।
রবীন্দ্র-নাথ এই কেতাব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শুনিতে চান?
তিনি বলেন, "কবি কেয়ারীর এই বইখানি আমি পড়ি নাই।"
সব জায়গায় প্রাপ্তব্য।

২ নং— **কিনিবেন না—কিনিবেন না**

বঙ্গ সাহিত্য-স্বরস্বতীর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং
একছত্রী-সম্রাজ্ঞী, উপন্যাস-জগতের পাগ্‌লা ঝোরা,

ভাবপ্রবাহের মিসিসিপি, প্রেমিক-হৃদয়ের সাহারা
শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী হাড়ের—"হৃদয়-বিদারণ-প্রেম" ছাড়া
অন্য বই!!!

এই মহা-উপন্যাস সম্বন্ধে দার্শনিক হেমেন্দ্রলাল বলেন,
"আপনার বইটি কাল পাইয়াছি।"
বণিকরাজ রাজেন্দ্রনাথ বলেন,
"বইখানি শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী হাড়ের লেখা, ১৩৩০ সালে প্রকাশিত।" এইরকম আরো অনেক সু-সমালোচনা আছে।

প্রথম সংস্করণ মাত্র ১০০ ছাপা হইয়াছিল, সব বিক্রয় হইয়া যায় নাই, এখনো কিছু বাকি, অতএব সত্বর হউন। একমাত্র বিক্রেতা সীতিকণ্ঠ হাজরা, হোগল কুঁড়ে লেন।

৩ নং— **গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!**

আবার গর্জিয়া উঠিল, সারা বাংলাদেশ কেরামতী সাহিত্য-মন্দিরের কামান-গর্জনে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ দেখুন, পিলপিল করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা বাংলার সকল নরনারী কামান-গর্জনে সচকিত হইয়া কেরামতী সাহিত্য-মন্দিরের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে! কিন্তু এ কামান মানুষ মারিবার জন্য নহে—বিলাতী হিংসা শ্রাপ্‌নেল নহে, ইহা তাপিত হৃদয়ে শান্তিবারি বরিষণকারী জলদ-গোলা!! বেদ-বিশারদ মহা-পণ্ডিত প্যালারাম কাব্যতীর্থের "চঞ্চুবিক্রমণিকা" এই কামান!! ছেলেমেয়ে কিম্বা যুবাবৃদ্ধকে উপহার দিবার এমন উপদেশপূর্ণ বই আর নাই! প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'কবুতরের' সম্পাদক এই পুস্তক পাঠে বলেন, "এই বইয়ের মধ্যে যুবক-যুবতীর চপল হাস্য-পরিহাস নাই, ঘটনা-বৈচিত্র্যের ম্যাজেন্টা রং নাই, বিরহী-বিরহিনীর চোখের জল নাই।" তাহার উপর বইখানির দাম খুবই অল্প--মাত্র ছয় পয়সা।

৪ নং— **কেন? কে? কাহারা? কোথায়?**

জানিতে আপনার বড়ই ইচ্ছা হয়, নয়? তবে শুনুন, আমরা চশমখোর ব্যবসায়ী নই—পরের দুঃখ বুক দিয়া অনুভব করিতে পারি তাই শান্তিপুর এবং ফরাশডাঙ্গা হইতে জরিপাড়ের ঠাসা বুনন অতি পাতলা ধুতি শাড়ি শস্তা দরে বিক্রয় করিতেছি। জোড়া ১৩৲ টাকা হইতে ১০০৲ পর্যন্ত; দরদস্তুর নাই অথচ আপনি ঠকিবেন না কারণ কাপড় চরকায় বোনা।—সেবক দরিদ্রবন্ধু খদ্দর ভাণ্ডার।

৫ নং— **বিজ্ঞাপনের ভড়ংএ ভুলিবেন না**

যাহারা বিজ্ঞাপন দেয়, তাহারা লোক ঠকায়। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু আমাদের ঔষধালয়ের দামোদর বটিকা সেবনে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, এসিয়া, ইয়োরোপ, এক কথায় সমগ্র পৃথিবীর লোক শত শত ব্যাধি হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। পায়ের হাজা হইতে আরম্ভ করিয়া কালাজ্বর, প্লীহা, যকৃত, যক্ষ্মা, নালি ঘা, কুষ্ঠ, চুল ওঠা, কার্যে অনিচ্ছা, পেট বেদনা, মাথাধরা, এমন কি দাদ, চুলকানি, হেঁটোয় বাত, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি সব রকম ব্যাধিই আরোগ্য হয়। আমরা বিজ্ঞাপনের ভড়ং দেখাইতে চাই না, আত্মপ্রশংসাও চাহি না, তাহা হইলে এতদিনে ঘরে ঘরে আমাদের নাম উচ্চারিত হইত! কেবলমাত্র নিজেদের সম্বন্ধে নিখুঁত সত্যটুকু বলিতে চাই। ১৩ ঘন্টা সেবনে ফল পাইবেন। কোন রোগ না থাকিলেও খাইতে পারেন, রোগ হইতে বেশীক্ষণ লাগে না। এক বটিকার মূল্য মাত্র নয় পয়সা। ভজহরি ভৈষজ্যালয়। নয়নতলা।

কাপড় পরুন **কাপড় পরুন**
এখনি কাপড় পরুন
(খাণ্ডব-বস্ত্রালয়ের, শস্তা দর, মাল ভাল)
উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনটি একবার শিয়ালদহ স্টেশনে
দেখা গিয়াছিল।

সব পেয়েছির দেশ

(নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রেরিত)

প্র. না. বি.

আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার। যে সংবাদপত্র দেশ চালায়, আমি তাহাকে চালাই, অতএব কম লোক নই। পুরাণে আছে দধীচি মুনি অস্থি দিয়াছিলেন, তাহাতে বজ্র গড়িয়া ইন্দ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অনেক দৈত্য মরিয়াছিল। এখন, কোন্ পাহাড়ে হয় বাঁশ, তারা দিতেছে মর্মাস্থি, টিটাগড় কাগজের কলে সুলভ বজ্র গড়া হইতেছে, কিন্তু এবার আর দৈত্য মরে না, কারণ তাহারাই এই বজ্রের নিক্ষেপক। আমরা প্রত্যহ সকালে (সোমবার ছাড়া) সংবাদপত্রের বজ্র দেশময় নিক্ষেপ করিতেছি, আর কত নিরীহের বিবাহ ভাঙিতেছে, কত বন্ধুর প্রণয় ভাঙিতেছে; কখনও দেশের লোক কাঁদিতেছে, কখনও ক্ষেপিতেছে। আমরা বড় কম লোক নই। ওদিকে পাহাড়ের বাঁশের বন ধ্বংস হইতেছে, বৃষ্টিতে পাহাড় ধসিয়া নদী-নালা বন্ধ হইতেছে, সারা দেশ অনুর্বর হইতেছে। আর এদিকে মানুষের মন সেই বাঁশের প্রেতাত্মার তাড়নে ক্ষিপ্ত, মত্ত, শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। বাঁশ, মরিয়াও এক তোমার প্রতিশোধ।

কিন্তু সম্প্রতি মুশকিলে পড়িয়াছি। আমরা সবাই অবশ্য ইংরেজী কাগজ হইতে অনুবাদ করিয়া খবর ছাপাই, তবে গোলদীঘির সহযোগী কাগজ কিনিয়া অনুবাদ করে, একটু তাড়াতাড়ি হয়; আমরা কাগজ চাহিয়া লইয়া অনুবাদ করি, দেরি হইয়া যায়; পিছাইয়া পড়িতেছি। সম্পাদক মহাশয় তাড়া দিতেছেন।

তাহা ছাড়া, এত নূতন খবর পাইবই বা কোথায়? একদিনের বাসি খবর পাঠকদের আর রুচে না। এত যুদ্ধ, এত বিমানধ্বংস, এত আত্মহত্যা পাই কোথায়? সত্য কথা বলিতে কি পৃথিবীর লোকের আত্মবিসর্জনের ভাব তেমন আর যেন উগ্র নয়। এখন ভরসা ইউরোপের গোটা চার পাঁচ ডিক্টেটার; তাঁহারাই এখন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধবিগ্রহ বাধাইয়া সংবাদপত্রের প্রেস্টিজ রক্ষা করিতে পারেন। আমরা ভারতীয়েরা খবরের কাগজ পড়িবার জন্যই জন্মিয়াছি, তাহাতেও ইউরোপ বাদ সাধিলে নাচার।

আমি কম লোক নই, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় আমার চেয়েও বড়, তাঁহার কড়া হুকুম, নূতন সংবাদ চাই।

কি করি? একবার ভাবিতেছি একটা রিপোর্ট আগেই লিখিয়া রাখিয়া লেকের জলে ডুবিয়া মরি। কিন্তু সে সংবাদ যে ছাপা হইবে তাহা কেমন করিয়া জানিব! অতএব ভাবিতেছি, মাকড়সা যেমন করিয়া নিজের রস দিয়া জাল বুনিয়া তুলে, তেমনিই করিয়া চিন্তা-রসের দ্বারা সংবাদ বয়ন করিব। কবির আশ্বাস মনে পড়িল—"ঘটে যা তা সত্য নহে, যা ভাবিবে সেই সত্য—"

চিন্তার আবেগে সংবাদ আসিল না, ঘুম আসিল।

* * *

কে যেন পিঠের উপর হাত রাখিয়াছে, ধাক্কা দিতেছে! ফিরিয়া দেখি এক সাহেব। চমকিয়া গেলাম, সাহেবকে দূরে দেখাই অভ্যাস, একেবারে এত কাছে! দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণ; চুল অল্প, দাড়ি বিস্তর, দুই-ই সাদা; চোখের ভুরু-জোড়া কপালের প্রান্তে উপরের দিকে বাঁকানো; নাকটা ঘুষির মত উত্থিত; মুখে অদ্ভুত হাসি, লোকটা যেন হাসি দিয়াই পৃথিবীকে দেখে—চোখ দিয়া নয়।

সংবাদপত্রের লোকের মনে প্রথম যে কথা আসে তাহাই আসিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, পুলিসের লোক?

সাহেব বলিল, আন্তর্জাতিক পুলিস। আমার লেখা পড় নাই?

বুঝিলাম সাহেব এদেশে নবাগত; কারণ আমরা লিখি বটে, কিন্তু পড়ি এ অপবাদ স্বয়ং পুলিসেও দেয় না। আমার মনের ভয়ও ভাঙিয়া গেল, সাহেব লেখে! সে আবার কি কথা? এ দেশে কোন সাহেবকে কখনও লিখিতে তো শুনি নাই!

সাহেব আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিল, আমিও সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিলাম।

এখন?

এখন নাটক লিখি।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, সাহেব আমার চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত। একটা প্রকৃতিস্থ লোক কতখানি বিপন্ন হইলে তবে নাটক লিখিতে শুরু করে! হঠাৎ তাহার পোশাকের দিকে দৃষ্টি পড়িল; এতক্ষণে সব পরিষ্কার হইল, সাহেব নিশ্চয় Alms House-এর সভ্য!

সে বলিল, আমার সঙ্গে এস, নূতন খবর যদি চাও।—বলিয়া সে হিড়হিড় করিয়া আমাকে টানিতে আরম্ভ করিল।

ইস, কি কড়া হাত!

এক সময়ে ঘুষি-খেলার অভ্যাস ছিল।

এখন?

প্রয়োজন হইলে এখনও পারি।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সাহেবের অনুসরণ করিলাম।

* * *

একটা আদালতের মত বাড়ির সম্মুখে বড় ভিড়; ঢুকিয়া দেখি আদালতই বটে, বিচার চলিতেছে। উঁচু আসনে বিচারক বসিয়া ঘুমাইতেছে। পাশেই পেস্কার নীচু একটা চেয়ারে বসিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে, বোধ হয় ইষ্টনাম জপিতেছে। আসামীর কাঠগড়ায় জীর্ণ শীর্ণ ভিক্ষুক-জাতীয় একটা লোক, পরে বুঝিলাম ভিক্ষুকই বটে।

আসামীর উকিল বলিতেছে, হুজুর, আমার মক্কেল অতিশয় নিরীহ, সাধু-সচ্চরিত্র লোক, সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই। সমাজের কোন হানি সে করে নাই, অন্যের ধনের প্রতি তাহার আকাঙক্ষা নাই, রাষ্ট্রের আইন সে ভঙ্গ করে না। সমাজের আইন সে মানিয়া চলে। সে চোর নয়, বদমায়েস নয়, বিপ্লবী নয়, দাগী নয়, এমন কি সাহিত্যিকও নয়, সামান্য একজন ভিখারী মাত্র। দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র অপরাধ, কিন্তু সে অপরাধের জন্য দায়ী কে? আর যে-ই হউক, আমার মক্কেল নয়।

সরকার পক্ষের উকিল আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, হুজুর, দারিদ্র্য সবচেয়ে বড় অপরাধ; অন্য সব অপরাধের মূল দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের জন্যই চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, আত্মহত্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সামাজিক অশান্তি; দারিদ্র্যের জন্যই রোগ এবং রোগের বিস্তার : এমন কি সাহিত্যের মূলও দারিদ্র্যে।

আসামী পক্ষের উকিল একবার মুখ খুলিয়াছিল, কিন্তু সরকারী উকিলের নায়েগ্রা তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, হুজুর, একবার শুনুন।

বিচারক মাথা তুলিয়া বলিলেন, তুমি কি ভাব আমি ঘুমাইতেছি? অত চিৎকার না করিয়া ধীরে কথা বল। সে আবার টেবিলে মাথা রাখিয়া নিদ্রার ভঙ্গিতে বোধ হয় সব শুনিতে লাগিল।

সরকারী উকিল গর্জিয়া চলিল, হুজুর, দারিদ্র্যই মানুষের original sin, দারিদ্র্যই জীবনে মৃত্যু; দেবতা ও মানবের ভেদ ওই দারিদ্র্যের তারতম্যে। স্বর্গের ঐশ্বর্য সরাইয়া লইলে কালই দেবতারা এ উহার পকেট কাটিতে শুরু করিবে। আবার দারিদ্রকে ঐশ্বর্য দিন, সে আপনার

আমার মত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত নাগরিক হইয়া উঠিবে। নিখিল পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্যই সমাজকে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে পলে পলে নীচের দিকে টানিতেছে, রোগের দিকে, কুশিক্ষার দিকে, অপরাধের দিকে, দুরতিক্রম্য মৃত্যুর দিকে। গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসের মূলে গ্রীক সমাজের ক্রীতদাস সম্প্রদায় ও তাহাদের দারিদ্র্য ; রোমক সমাজের ধ্বংসের মূলও ওই একই স্থানে।

আসামীর উকিল বলিল, আমার বন্ধু যদি সাম্যবাদী হন, তবে ধন বিভাগ করিয়া আমার মক্কেলের সঙ্গে সমান হন না কেন?

বাদী পক্ষের উকিল বলিল, আমি কেন তাহার সমান হইতে যাইব? বরঞ্চ সে আসিয়া আমার সমান হউক, আপত্তি কি! আমি তাহার সমান হইলে পৃথিবীতে আর একটি দরিদ্র বাড়িবে ; সে আমার সমকক্ষ হইলে জগতে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাড়িবে।

আসামীর উকিল বলিল, শুধু সম্ভ্রান্ত নাগরিক নয়, একজন উকিলও বটে।

আমরা দুই জন দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। সাহেব বলিল, ইহারা আমার নাটক পড়িয়াছে দেখিতেছি, তোমাদের দেশে আমার নাটক হয়।

আমি বলিলাম, আমরা এখনও বঙ্গে বর্গী, আলিবাবা, মোগল-পাঠানের যুগে আছি। ইংরেজী নাটক করিবার ফুরসৎ আমাদের কোথায়?

আসামীর উকিল বলিতে লাগিল, হুজুর, হইতে পারে যে দারিদ্র্য অশেষ দোষের কারণ, কিন্তু সেজন্য আমার মক্কেল দায়ী নয়, কারণ দারিদ্র্য ও দরিদ্র ব্যক্তি এক নয়।

বাদী পক্ষের উকিল বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ধর্মাবতার, দারিদ্র্য এক প্রকার ব্যাধি এবং ভীষণ ছোঁয়াচে ব্যাধি! দারিদ্র্য ও দরিদ্রে ভেদ করিব কি উপায়ে? দরিদ্রকে ছাড়িয়া দারিদ্র্য কোথায় পাওয়া যায়? ছোঁয়াচে ব্যাধি হইলে রোগীকে, সে রোগী যতই প্রিয়পাত্র হউক না কেন, যেমন স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা তাহার বিষস্পর্শে সমাজ বিষাক্ত, কলুষিত, বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে। অতএব আমি প্রার্থনা করি, সমাজের নামে, রাষ্ট্রের নামে, সমগ্র মানব জাতির নামে, এই ব্যক্তির উপরে আইনের চরম দণ্ড দান করিয়া সুবিচার করা হউক।

বিচারক মাথা তুলিয়া বলিল, আপনারা ভাবিবেন না আমি ঘুমাইতেছিলাম। গভীর চিন্তা ও গভীর নিদ্রার বাহ্যিক লক্ষণ এক রকম ; আমি চিন্তা করিতেছিলাম মাত্র। পেস্কারবাবু—

পেস্কার বলিল, হুজুর, ভাবিবেন না আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলাম। ইষ্টমন্ত্র জপ ও আইনের উপধারাগুলির আলোচনা বাহ্যত একই রকম দৃষ্ট হয় ; আমি উপধারাগুলির আলোচনা করিতেছিলাম মাত্র।

বিচারক রায় লিখিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে রায় পড়িল, দারিদ্র্যাপরাধনিবন্ধন এই ব্যক্তিকে পঁচিশ ঘা বেত মারা হউক, এবং এক বৎসর পর এই ব্যক্তি যদি মাসিক এক শত মুদ্রা আয় না দেখাইতে পারে, তবে ইহাকে পুনরায় আদালতে উপস্থিত করা হউক।

রায় শুনিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ কোথায় আসিলাম! ইহা কি সনাতন ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষে দারিদ্র্য তো দোষের নয়, বরঞ্চ সে দেশে কে কত দরিদ্র হইতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা চলিতেছে! সাহেবটি মোটেই বিস্মিত হয় নাই ; সে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল, চল অন্যত্র যাওয়া যাক।

২

একটা বড় বাড়ির সম্মুখে ভিড় জমিয়াছে। বাড়ির দরজা আলো ও ফুলে সাজানো। আমরা দুই জনে ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, বোধ হয় কাহারও জয়ন্তী হইতেছে।

সে বলিল, সে আবার কি?

আমি বলিলাম, দেখ তোমরা যতই সভ্য বলিয়া গর্ব কর না কেন, এখনও কোন কোন

বিষয়ে পিছাইয়া আছ। জয়ন্তী মানে বড়লোকের সম্বর্ধনা।

সে তো মরিবার পরে করে।

আমি বলিলাম, আমরা মরিবার পরে মনে রাখি না, তাই আগেই করি।

সভায় ঢুকিয়া দেখি, মঞ্চের উপরে অতি প্রবীণ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত সভাপতি, গলায় গলকম্বলের মত একরাশি মালা। আর পাশেই একটা লোক। কিন্তু লোকটা কে? কানে বিড়ি গোঁজা; চোখ দুইটা লাল; চুল রুক্ষ; রোমাঞ্চিত দাড়ি; গায়ে আজানুলম্বিত সূক্ষ্ম পাঞ্জাবি; পরনে বোধ হয় লুঙ্গিই! ওই লোকটারই কি সম্বর্ধনা!

সভাপতি উঠিয়া সভাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বন্ধুগণ, আজ আপনারা এই মহাত্মার সম্বর্ধনার জন্য সমবেত। ইনি এত স্বনামধন্য যে ইঁহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। রজত-জয়ন্তী কমিটির সম্পাদক একখানি মানপত্র পাঠ করিবার পূর্বে মহিলাগণ একটি সঙ্গীত করিবেন।

সভাপতি মহাশয় চেয়ার গ্রহণ করিলে মহিলাগণ গান ধরিলেন—

বাতায়ন পথে যাতায়াত তব,
নহ তুমি নহ সমীরণ,
তস্কর বলে নিন্দুক যত,
মনোচোর বলে কবিগণ।
তোমার পরশে খোলে সিন্দুক

(পরের ছত্রটি গোলমালে বুঝিতে পারিলাম না।)

হাতুড়ির ঘায়ে ভাঙো অর্গল
সারা নিশি করি জাগরণ।

সঙ্গীত ও করতালি থামিলে সম্পাদক মহাশয় কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া মানপত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

মহাত্মন্,

তোমাকে আমি সমগ্র জাতির নামে সাদর আহ্বান করিতেছি। তুমি যুগপৎ জাতির রুদ্ধ চিত্ত ও বদ্ধ তালা খুলিয়াছ; তুমি যুগপৎ জাতির হৃদয়-মন্দিরে ও ধন-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ: তুমি যুগপৎ বাতায়ন ও দ্বারপথে প্রবেশ করিতে পার; তুমিই ধন্য!

হে দেব,

দারিদ্র্যকে আমরা ঘৃণা করি; ঐশ্বর্য আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। নিরীহভাবে দরিদ্র থাকিবার অপেক্ষা উগ্রভাবে তস্করবৃত্তিও শ্রেয়।

হে বীর,

দারিদ্র্য প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে টানিতেছে, তুমি সেই সর্বগ্রাসী মৃত্যুকে এড়াইবার জন্য যে বৃত্তিকে বরণ করিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় বীরের যোগ্য বটে। তুমি একাধারে মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয়!

হে আদর্শবাদী,

আদর্শের জন্য যাহারা দুঃখবরণ করিয়াছে, তুমি তাহাদের অন্যতম। মানুষের জীবন ফুটপাথ ও কারাগারের মধ্যে দোদুল্যমান; তুমি যুগপৎ এই দুইকেই জয় করিয়াছ। তোমার হস্ত চুম্বক হইতেও প্রবল, কারণ তাহা স্বর্ণ ও রজতকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তোমারই রজতজয়ন্তী সার্থক!

হে ভাগ্যবান,

সার্থক চৌর্যেরই নাম বীরত্ব। তুমি তস্কর-বৃত্তিতে ধরা পড়িয়া কারাগারে গেলে তোমাকে ঘৃণা করিতাম। কিন্তু যেহেতু তুমি নৈশ-অধ্যবসায়ে জানালার শিক ভাঙিয়া, সিন্দুকের তালা ভাঙিয়া, মালিকের মাথা ভাঙিয়া ও পুলিসের আইন ভাঙিয়া পলায়ন করিতে

সমর্থ হইয়াছ, কাজেই তুমি বীর, তুমি বীরোত্তম!

হে তস্করর্ষি,

তোমাকে রজত-জয়ন্তী সভার পক্ষ হইতে একটি সামান্য উপহার দিতেছি, কিন্তু ইহার প্রভাব সামান্য না হইতে পারে। ভারতীয় সিঁধকাঠি অতি প্রাগৈতিহাসিক ধরণে প্রস্তুত; বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা প্রায় অচল। ইউরোপের কাছে এই আদিম সিঁধকাঠির জন্য আমরা মাথা নত করিয়া আছি। তোমাকে আমরা ইউরোপীয় ধরণে রচিত সিঁধকাঠি উপহার দিতেছি। ইহার শক্তি প্রায় অলৌকিক, ইহার লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না, ইহা নানা নামে প্রখ্যাত। ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স, ডিরেক্ট ও ইন্‌ডিরেক্ট ট্যাক্সেশান, কাস্টম্‌স্ ডিউটি, হোমচার্জ, সুপার ট্যাক্স, গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড অফ শিলিং রেশিও, টেরিফ ওয়াল, কাটোয়া চুক্তি প্রভৃতি অসংখ্য ইহার নাম! হে প্রভু, তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া ইউরোপীয়গণের উপরে ইহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া আমাদের কলঙ্ক দূর কর!

সম্পাদক মহাশয় মানপত্র পাঠ শেষ করিয়া একটি ভেল্‌ভেটের কৌটায় ভরা সিঁধকাঠি লোকটির হাতে দিলেন। করতালিতে কানে তালা লাগিয়া গেল।

সভাপতির আদেশে মহিলাগণ পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত থামিলে দেখা গেল লোকটি নাই। খোঁজ পড়িয়া গেল। এদিকে সভাপতি দেখিলেন তাঁহার পকেটের নিম্নার্ধ নাই ; সম্পাদকের আণ্ডার-উয়্যারের পকেটটিও অন্তর্হিত; তখন 'ধর ধর' রব পড়িয়া গেল।

এতক্ষণ আমাদের কেহ লক্ষ্য করে নাই, এইবারে অনেকে তাকাইতে লাগিল। সাহেব বলিল, গতিক ভাল নয়, বাহিরে চল।

বাহিরে আসিলাম। সাহেব বলিল, সবাই যেরূপ তাকাইতেছে, মার-ধর করিতে পারে, চল।

আমি বলিলাম, আমাদের কি হাত নাই?

সে বলিল, পা-ও তো আছে।

বেশ, লাথি মারিব।

সে বলিল, নির্বোধ, লাথি মারিবে কেন? পলাও।

আমি বলিলাম, পলাইবার চেয়ে সত্য কথা বলিব।

সাহেব হাসিয়া উঠিল, মূর্খ, সত্য কথা বলিয়া জগতে কেহ কখনও স্বস্তি পাইয়াছে? সে আশা ছাড়।

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, তা বটে, তোমরা তো একবার যীশুকে সত্যবাদিতার জন্য পেরেক ঠুকিয়া মারিয়াছিলে। বোধ হয় এবার আসিলে আবার তাহাকে মারিবে।

সাহেব বলিল, না, যীশুর আর ভয় নাই। লোকটা বেশ নাম করিযাছে, এবার আসিলে সে 'নাইটেড' হইতে পারে। সার্ যীসাস ক্রাইস্ট! মন্দ শোনায় না! আমরা প্রথমে লোককে দণ্ড দিয়া দমাইয়া দিতে চেষ্টা করি, শেষে যখন তাহার খ্যাতি আর চাপিয়া রাখা যায় না, তখন 'নাইটেড' করিয়া ফেলি। সত্য কথা কি, যীশুর খ্যাতি এখন আমেরিকা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, এবার আসিলে সে 'নাইটেড' কেন 'পীয়ার'-ও হইতে পারে। ব্যারন অব বেথেলহাম! কেমন শোনাইতেছে?

কয়েকটা লোক আমাদের দিকেই আসিতেছিল ; তাহা দেখাইয়া সাহেব লম্বা পা ফেলিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল : আমিও ক্ষুদ্র শক্তিতে ছুটিলাম। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সাহেবের নামটি তো জানা হয় নাই ; চিৎকার করিয়া বলিলাম, সাহেব, তোমার নামটি তো বলিলে না? দেখিতে পাইলাম, সাহেব একখানি কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। আর বলিল, আজকার বর্ণনাটা তোমাদের কাগজে লিখিও, আর কিছু না হউক নূতন হইবে। কাছে গিয়া কার্ডখানা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, ইংরেজী অক্ষরে লেখা আছে—জর্জ বার্নার্ড শ!

আশ্বিন ১৩৪৪

তন্দ্রাহরণ

[ঐতিহাসিক কাহিনী]

'চন্দ্রহাস'

পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রার মন একেবারে খিঁচড়াইয়া গিয়াছে। মধুমাসের সায়াহ্নে তিনি তাই প্রাসাদশিখরে উঠিয়া একাকিনী দ্রুত পায়চারি করিতেছেন এবং গণ্ড আরক্তিম করিয়া ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম!

অনেক দিন আগেকার কথা। ভারতীয় রমণীগণের মন তখন অতিশয় দুর্দমনীয় ছিল; মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে কণৌজে সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী তন্দ্রার বয়স আঠারো বৎসর, ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন। তথাপি মধুমাসের সায়াহ্নে তাঁহার মন কেন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার আসন্ন বিবাহই একমাত্র কারণ।

কিন্তু আঠারো বছরের বিকশিতযৌবনা কুমারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন? একালে তো এমনটা দেখা যায় না! তবে কি সেকালে—

না, তাহা নয়। সেকালেও এমনই ছিল। কিন্তু কুমারী তন্দ্রার আপত্তির কারণ—তাঁহার মনোনীত স্বামী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ চন্দ্রানন মাণিক্য। কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আসল কথা—বর বাঙাল।

যতদিন এই বিবাহ রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল, ততদিন কুমারী তন্দ্রা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। যুবরাজ চন্দ্রানন বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাজধানীতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়াছেন।

গোড়া হইতেই তন্দ্রার মন বাঁকিয়া বসিয়াছে। তবু তিনি গোপনে প্রিয় সখী নন্দাকে পাঠাইয়াছিলেন—চন্দ্রানন মাণিক্য লোকটি কেমন দেখিবার জন্য। নন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—যুবরাজ দেখিতে শুনিতে ভালই, চালচলনও অতি চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষা একেবারে অশ্রাব্য। 'ইসে' এবং 'কচু' এই দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ সহযোগে তিনি যাহা বলেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।

শুনিয়া কুমারী তন্দ্রা একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। এ কি অত্যাচার! তিনি রাজকুমারী বলিয়া কি তাঁহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? হউক সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ—তবু বাঙাল তো! দেশে কি আর রাজপুত্র ছিল না? আর রাজপুত্র ছাড়া রাজকুমারী বিবাহ করিতে পারিবে না এই বা কেমন কথা!

কুমারী তন্দ্রা রাজসভায় নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া তীব্র লিপি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে মন্ত্রীগণ কর্তৃক পরামর্শিত হইয়া রাজা কন্যাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, চন্দ্রানন মহা বীরপুরুষ, উপরন্তু বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে বিবাহে অস্বীকৃত হইলে নিশ্চয় কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গোঁ অতি ভয়ানক বস্তু। সুতরাং বিবাহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তদবধি ক্রোধে অভিমানে কুমারী তন্দ্রার চোখে তন্দ্রা নাই। তাই মধুসায়াহ্নে একাকী প্রাসাদশীর্ষে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে গণ্ড আরক্তিম করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম!

* * *

সহসা একটি তীর হাউইয়ের মত প্রাসাদপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া তন্দ্রার পদপ্রান্তে পড়িল। বিস্মিত হইয়া তন্দ্রা চারিদিকে চাহিলেন। রাজপ্রাসাদশীর্ষে কোন্ ধৃষ্ট তীর নিক্ষেপ করিল? তন্দ্রা ছাদের কিনারায় গিয়া নিম্নে উঁকি মারিলেন।

ঠিক নীচেই জলপূর্ণ পরিখা প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার পরপারে একটি উষ্ণীষধারী যুবক উর্ধ্বমুখ হইয়া গুম্ফে তা দিতেছে। তন্দ্রাকে দেখিতে পাইয়া সে হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

চতুস্তল প্রাসাদের শিখর হইতে যুবকের মুখাবয়ব ভাল দেখা গেল না; তবু সে যে বলিষ্ঠ ও কান্তিমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্দ্রা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তীরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে।

লিপি খুলিয়া তন্দ্রা পড়িলেন—

"ছলনাময়ী নন্দা, আর কতদিন দূর হইতে দেখিয়া অতৃপ্ত থাকিব? তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ কর; আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না। যদি আমাকে বঞ্চনা কর, নিজেই পরিতাপ করিবে। পরদেশী বন্ধু কতদিন থাকে?

সদয়া হও—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। একবার সাক্ষাৎ হয় না?—তোমার অনুগত বন্ধু"

লিপি পড়িয়া কুমারী তন্দ্রা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল, ইদানীং প্রিয় সখী নন্দা যখন তখন ছলছুতা করিয়া ছাদে আসে। এই তাহার অর্থ! ঐ কমকান্তি বিদেশী নন্দাকে দেখিয়া মজিয়াছে; নন্দাও নিশ্চয় তাহার প্রতি আসক্ত। দুইজনে কাছাকাছি হয় নাই, দূর হইতেই প্রণয়। তীরের মুখে প্রেম!

সহসা তন্দ্রার দুই নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া আবার উঁকি মারিলেন। ধৈর্যশীল যুবক তখনও উর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফে তা দিতেছে।

কবরী হইতে কাজললতা লইয়া চুলের কাঁটা দিয়া তন্দ্রা লিপি লিখিলেন, হাত কাঁপিতে লাগিল। লিপি শেষ হইলে তীরের গায়ে জড়াইয়া পরিখার পরপারে ফেলিয়া দিলেন। নিরুদ্ধনিশ্বাসে দেখিলেন, যুবক সাগ্রহে তীর তুলিয়া লইল।

নন্দা ছাদে আসিয়া তন্দ্রাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, 'প্রিয় সখি, তুমি এখানে?'

তন্দ্রা তপ্তমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা ছাদের এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর বলিল, 'কতক্ষণ এখানে এসেছ?'

তন্দ্রা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। 'নন্দা, আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। হয়তো কাল সকালে উঠে আর আমায় দেখতে পাবি না। সখি, তোর কাছে যদি কখনও অপরাধী হই, ক্ষমা করিস।'

নন্দা রাজকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছি সখি, ও কথা বলতে নেই। চল, নীচে চল। কাজললতা যে প'ড়ে রইল, আমি নিচ্ছি। চুলের কাঁটাও খ'সে পড়েছে দেখছি! সখি, উতলা হয়ো না; তোমার ভাগ্যদেবতা তোমায় নিয়ে হয়তো একটু পরিহাস করছেন, দেবতার পরিহাসে কাতর হ'লে কি চলে?'

শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুভরা স্বরে তন্দ্রা কহিলেন, 'নন্দা, আজ রাত্রে একা শোব, তুই যা। আর দেখ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সেই বর্বরটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, তুই নিস।' মনে মনে বলিলেন, 'অদল-বদল।'

নন্দা জিভ কাটিয়া চোখে আঁচল দিল, 'ওমা ওকি কথা! আমি যে তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই।'—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

*   *   *

রাত্রি দ্বিপ্রহরের যাম-ঘোষণা থামিয়া যাইবার পর, রাজকুমারী তন্দ্রা প্রাসাদের গুপ্তপথ দিয়া পরিখা পার হইয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহার বরতনু বেষ্টন করিয়া আছে রাত্রির মতই নিবিড় নীল একটি ঊর্ণা।

নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে একটি তরুণ সুদৃঢ় হস্ত আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কেহ কথা কহিল না; দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল, তরুণ সুদৃঢ় হস্তধারী তন্দ্রাকে একটির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিল; তারপর এক লম্ফে অপরটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে দুই কৃষ্ণকায় অশ্ব ছুটিয়া চলিল, পৌণ্ড্রভুক্তির সীমান্ত লক্ষ্য করিয়া।

দণ্ড কাটিল, প্রহর কাটিল, কত নক্ষত্র অস্ত গেল। সম্মুখের শুকতারা বিস্ময়াবিষ্ট জ্যোতিষ্মান চক্ষুর মত জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

দিগন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে প্রভাত হইল; তখন বল্গার ইঙ্গিত পাইয়া অশ্বযুগল থামিল। কুমারী তন্দ্রা মুখের নীল ঊর্ণা সরাইয়া পাশে অশ্বারোহী মূর্তির পানে চাহিলেন। দৃষ্টিবিনিময় হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে একটি তরুণ কন্দর্প। পক্ক দাড়িমের মত তার দেহের বর্ণ। পেশল অথচ পেশীবদ্ধ দেহ, মুখে পৌরুষ ও লাবণ্যের অপূর্ব মেশামিশি। নবজাত গুম্ফের নীচে একটু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমারী তন্দ্রার চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন, এ যে তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর!

সহসা অনুতাপে তন্দ্রার হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্যপুত্র, আমার ছলনা ক্ষমা কর। আমি নন্দা নই—আমি তন্দ্রা।'

তরুণ কন্দর্প হাসিলেন, গুম্ফে ঈষৎ তা দিয়া সুধামধুর স্বরে কহিলেন, 'ইসে—সেডা না জানাই কি চুরি কৈরা আন্‌ছি? রাজকুমারী, তুমি বড়ই চতুরা, কিন্তু আমার চৈক্ষে যদি ধুলাই দিতি পারবা তো তোমারে বিয়া করতি আইলাম কিয়ের লাইগা?'

তন্দ্রা চমকিত হইলেন; বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া স্খলিত স্বরে কহিলেন, 'তুমি—তুমি কে?'

যুবক কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'আরে কচু—সেডা এখনো বোঝবার পার নাই? আমি চন্দ্রানন মাণিক্য—ইসে—প্রাগ্‌জ্যোতিষের যুবরাজ। হ—সৈত্য কইলাম।'

*   *   *

দুইটি অশ্ব অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি মন্থর গমনে পৌণ্ড্রবর্ধনের পথে ফিরিয়া চলিয়াছে। তন্দ্রার করতল চন্দ্রাননের দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ। তাঁহার স্খলিতবেণী মস্তক মাঝে মাঝে যুবরাজের বাম স্কন্ধের উপর নত হইয়া পড়িতেছে।

তন্দ্রা কহিলেন, 'যুবরাজ, কী সুন্দর তোমার ভাষা, যেন মধু ঝ'রে পড়ছে! কত দিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব?'

চন্দ্রানন তন্দ্রার মণিবন্ধে একটি আনন্দ-গদগদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ইসে—আগে বিয়া তো করি, তারপর এক মাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগোর ও কচুর ভাষা এক মাসে ভুইলা যাইতে পারবা না?'

সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা বলিলেন, 'পারমু।'

শ্রাবণ ১৩৪৪

কান্তি চৌধুরী বলিলেন ঃ

ছেলেরা আজকাল দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলে। ভুল করে। ভগবান দিয়েছেন জিনিস, রাখলেই কাজ দেবে—এ কথাটাও তো মনে রাখা উচিত।

আমরা বলিলাম, আপনিও তো দাড়ি কামান।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, আমি কামাই দায়ে প'ড়ে। তোমাদের তো আর তা নয়। দেখছ তো কি বেয়াড়া দাড়ি আমার, যেমন কড়া, তেমনি বাড়। সকালে বিকেলে দুবার ক'রে ক্ষুর চালাই, তাতেও নিস্তার নেই। অথচ এই দাড়ির জন্যেই একবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।

অনেক দিন আগের কথা। কলেজ ছেড়ে সদ্য বেরিয়েছি। জলপাইগুড়ির ওপর দিকে এক গ্রামে গেলাম, বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী হয়ে।

বিকেলবেলায় গিয়ে সেখানে পৌঁছলাম। গোধূলি-লগ্নে বিয়ে। মেয়ের বাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে আমাদের বাসা দিয়েছিল। বিয়ে সারা হয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন বাসায় এসে জুটলাম, রাত তখন এগারোটা প্রায়।

বিয়ে-বাড়িতে ও সময়ে কারু ঘুমোবার কথা নয়। দলবল বেশির ভাগই তাস বা পাশা পেড়ে বসল। আমার ওসব আসে না, আমি ফরাশের একপাশে শুয়ে শুয়ে ডিটেকটিভ নভেল খুললাম। সব জায়গাতেই কাজের বাড়িতে দুএকটা ছেলে জুটে যায়, যারা হয়তো বিশেষ কোন আত্মীয় নয়, অথচ খেটেখুটে চৌচাপটে সমস্ত কাজকম্ম ক'রে দিচ্ছে। এমনই একটি ছেলে ওখানেও দেখলাম। তার নাম হরিদাস, পদবীটা ভুলে গেছি। আমাদের মতন হবে বয়স, পাতলা দোহারা হাসিখুশি মানুষটি। আর কি অসাধারণ পরিশ্রম করতে পারে, সে একটা দেখবার বস্তু। গিয়ে অবধি দেখছিলাম, সমস্ত জায়গায় সমস্ত কাজে চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই সব কাজে বলছে, ডাক হরিদদাসকে। বিয়ে-বাড়ির হ্যাপার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের তদারকও সেই এসে এসে ক'রে যচ্ছিল।

আমি চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি, হরিদাস এসে হাজির। বললে, কি হচ্ছে?

বললাম, একটু লেখাপড়া করছি। সময়টা কাটাতে হবে তো!

হরিদাস বইখানা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলে। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বললে, ইংরিজী—এসব বুঝিও না ছাই। আপনাদেরই জীবন সার্থক। আচ্ছা, আপনি পড়ুন, আমি যাই।

আমি বললাম, বসুন না, পালাবার তাড়া কেন!

সে বললে, তাড়া অবশ্য আপাতত কিছু নেই, ঘন্টাখানেক এখন ছুটি আছে। কিন্তু থেকে তো খালি আপনার পড়াটাই নষ্ট করব।

আমি বললাম, ভারি তো নভেল পড়া। সময় কাটছিল না ব'লে, তাই। নইলে শুয়ে শুয়ে বই পড়া আমার পোষায় না।

হরিদাস হাসলে। বললে, কেন মিছে বিনয় করছেন! বই পড়া আপনাদের পোষায় না তো কি পোষায় আমাদের!

আমি বললাম, বিনয় করি নি, সত্যিই এ আমার ভাল লাগে না।

হরিদাস বললে, কি ভাল লাগে তা হ'লে?

আমি বললাম, আমার কাজ হচ্ছে ডানপিটেগিরি ক'রে বেড়ানো। সাঁতার কুস্তি নৌকো-বাওয়া জানোয়ার-মারা—এই ক'রেই তো কাটাই।

হরিদাস বললে, এতগুলো পরীক্ষা পাস করেছেন বুঝি এই ক'রেই!

আমি বললাম, পরীক্ষা পাস করতে মুরোদ লাগে না, লাগে মুখস্ত। সে সবাই করতে পারে।

হরিদাস হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, আরও একটা জিনিস লাগে—পয়সা। সেটা সবার থাকে না।

বুঝলাম, না জেনে তার মনে কোথাও একটু দুঃখ দিয়ে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, আচ্ছা, আপনাদের এদিকে কি রকমের জীবজন্তু পাওয়া যায়?

হরিদাস বললে, কি জীবজন্তু? শিকারের?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

হরিদাস বললে, আপনার বন্দুক আছে? এনেছেন?

আমি বললাম, বন্দুক আছে বটে, তবে সঙ্গে আনি নি।

সে বললে, আনলেন না কেন?

আমি বললাম, বাঃ, এসেছি বিয়ের বরযাত্রী, একদিনের জন্যে। একটা বন্দুক নিয়ে আসব কি করতে? লাভের মধ্যে লোকে দেখে বলবে, চাল মারছে।

হরিদাস বললে, বন্দুক আনেন নি তবে আর জানোয়ারের খবর শুনে কি করবেন? পাওয়া যায় অবিশ্যি অনেক রকমই—চিতা, ভালুক, হরিণ। তারপর বললে, কালই যাবেন আপনারা, না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কাল বিকেলে। আপনাদের দেশটা দেখা হ'ল না। আমার আবার বাতিক আছে, যেখানেই যাই, জায়গাটা একটু ঘুরে না দেখে ছাড়ি না। তা এখানে এসে অবধি তো ঘরেই ব'সে কাটল। যা বুঝছি, কালকেও বেরোনো হবে না।

হরিদাস বললে, আর বেরোবেনই বা কোথায়! অজপাড়াগাঁ, দেখবার মত কিছুই নেই।

আমি বললাম, তবু? আচ্ছা, অনেক জায়গায় তো পাড়াগাঁয়ে পুরোনোকালের রাজবাড়ি মন্দির-টন্দির থাকে। এখানে সেসব কিছু নেই?

হরিদাস বললে, দেখতে তো পাই না। তারপর একটু ভেবে বললে, এক থাকবার মধ্যে আছে বুড়োশিবের মন্দির, সে এখান থেকে প্রায় ছ ক্রোশ। পথটা অবশ্য খুবই সুন্দর, ঘন বনের মধ্য দিয়ে সরু পথ চ'লে গেছে, দুধারে মস্ত মস্ত গাছ—ভারি চমৎকার লাগে যেতে। আমি অনেকবার গেছি।

আমি বললাম, তা হ'লে চলুন না, কাল সকালে উঠে সেইটেই দেখে আসি। কোথায় সেটা, কোন্ গ্রামে?

হরিদাস বললে, গ্রামে নয়, বনের মধ্যে। এখান থেকে প্রায় সিধে উত্তর দিক। কিন্তু আজকাল তো যাওয়া মুশকিল, বর্ষাকালে কেউ যায় না।

আমি বললাম, কাদার জন্যে বললেন? তাতে আটকাবে না, কাদা ভাঙতে খুব পারি। আর গাড়ি পাওয়া যায় না?

হরিদাস বললে, এদেশে গাড়ি মানে টমটম। কিন্তু আজকাল গাড়ি চলবে না, যদি কাদা হয়ে থাকে, চাকা ব'সে যাবে। বনের মধ্যে অবশ্য কাদা প্রায় হয় না, তবু বলা তো যায় না কিছু।

আমি বললাম, ব'য়ে গেছে, না হয় হেঁটেই যাব। ছ ক্রোশ মানে তো বারো মাইল? ঘন্টায় তিন মাইল করেও যদি হাঁটি, তাতেও চব্বিশ মাইলে আট ঘন্টা। ভোর চারটেয় উঠে বেরোলে একটার মধ্যে বাড়ি ফেরা যাবে।

হরিদাস বললে, সত্যি যেতে চান?

আমি বললাম, নিশ্চয়। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ছাতের রংই যদি খালি দেখব, তার জন্যে আদ্দুর ব'য়ে আসবার দরকার? ছাত তো বাড়িতেই দেখা যায়।

হরিদাস বললে, হেঁটে নয়, যেতে হ'লে যেতে হয় ঘোড়ায়। তা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমি বললাম, ঘোড়া পাওয়া যায়?

হরিদাস বললে, ঘোড়া মানে কি আর আরবী ঘোড়া। দিশী টাট্টু।

আমি বললাম, তা হোক, কাজ তো চ'লে যাবে। আপনি ব্যবস্থা করুন।

হরিদাস বললে, বেশ। কিন্তু এখন এত রাত্রে ব্যবস্থা করা যাবে না, কাল সকালে। বেরোতে কিন্তু বেলা হয়ে যাবে তা হ'লে।

আমি বললাম, হ'লই বা। ঘোড়া তো ছুটবেও মানুষের চেয়ে বেশি। তা হ'লে সেই কথা রইল। মনে রাখবেন।

হরিদাস চ'লে গেল।

পরদিন সকালে হরিদাস ঠিক এসে হাজির। বললে, ঘোড়া তৈরি।

আমি বললাম, আমিও। কোথায় ঘোড়া?

হরিদাস বললে, গাঁয়ের মধ্যে ঘোড়ায় চাপে না, লোকে রাজপুত্তুর বলে। ঘোড়া আছে গাঁয়ের বাইরে একজনের,—আমাদের পথেই পড়বে। এইটুকুন হেঁটে গিয়ে ওখান থেকে নিয়ে নোব।

বেশ কথা। পথে ক্ষিদে পাবে ব'লে খানিকটা রুটি আর চিনি খবরের কাগজে মুড়ে রেখেছিলাম। সেইটি হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘোড়ায় চেপে গ্রাম ছাড়িয়ে যখন বনের সীমানায় পৌঁছলাম, বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা। দুর্গা ব'লে বনের ভেতর ঢুকে পড়লাম দুজনে।

অপূর্ব ঘোড়া। তারা কদমে চলে না, হেঁটেই চলে, খুব তাড়াহুড়ো দিলে দুলকি অবধি ওঠে।

আমি বললাম, ও হরিদাসবাবু, এ কি রকম ঘোড়া আপনাদের দেশের?

হরিদাস বললে, এই রকমই। এরা তো মানুষ বয় না বেশি, টমটম টেনেই বেড়ায়। তাই চলতিও এমনই হয়ে যায়।

আর খানিকদূর গিয়ে বুঝলাম. ঘোড়ায় সে চলন তাদের দোষ নয়—গুণ, ঠেকে-শেখা বিদ্যে। কাঁচা মাটির রাস্তায় কদম চলে না, তায় আবার বর্ষাকাল, পেছল রাস্তা। ঘোড়া তাই বুঝেই সাবধান হয়ে চলে।

বনের দৃশ্যটা সেখানকার সত্যিই চমৎকার, দেখবার মত। দুধারে দেখতে দেখতে চলেছি, ঘোড়াও আপন খুশিতে হেঁটে চলেছে। ওদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল নেই।

বনের মাইল দুই আন্দাজ ভেতরে ঢুকে দেখি, আর এক বিপদ। বর্ষাকালে এ পথে লোকজন চলে না—জল পেয়ে সমস্তটা পথ জুড়ে এক হাত উঁচু ঘাস গজিয়েছে। সেই ঘাসে ঘোড়ার পা জড়িয়ে যায়। ঘোড়া মোটে জোরে চলতে পারে না।

যতই তাকে তাড়া দিই, সে ততই গজেন্দ্রগমনে চলে। পথ ছেড়ে বনের মধ্যে দিয়ে যাব সে উপায়ও নেই, চারা গাছের জঙ্গল চারদিকে। আমি বললাম, দূর ছাই এর চাইতে পায়ে হেঁটে আসাই ভাল ছিল।

হরিদাস বললে, না। পায়ে হেঁটে এলে এতক্ষণে কবার সাপের কামড় খেতে হ'ত তার ঠিক আছে?

বছরখানেক হ'ল ব্যাঙ্গালোরের জঙ্গলে সেই শঙ্খচূড়ের ছোবল খেয়ে এসেছি। সেই কথা মনে প'ড়ে গেল। বললাম, থাক, সাপের কামড়ে প্রাণ দেবার সখ নেই। কিন্তু এভাবে গেলে তো পৌঁছতেই সন্ধ্যে হবে।

হরিদাস বললে, সন্ধ্যে না হ'লেও, বিকেল হবে ঠিকই। তার চেয়ে আসুন ফেরা যাক। এই কটা মাস বাদে শীতকালে তখন আসবেন, বেশ ভাল ক'রে সব দেখিয়ে দোব।

আমি বললাম, ফিরে যাব? ঘাসের ভয়ে? সে কথা আমার কুষ্ঠিতে লেখে না। আজ যদি নাই ফিরতে পারি, সেখানে রাত কাটানোর জায়গা নেই?

হরিদাস বললে, জায়গা আর কি. সেই মন্দিরের ভেতরে ব'সেই রাত কাটাতে হবে। এমন অনেকে থাকেও। হয়তো অসময়ে গিয়ে আটকা প'ড়ে যায়, মন্দিরে রাত কাটিয়ে পরদিন ফিরে আসে।

আমি বললাম, তবে আর কি। চলুন এগিয়ে, যা থাকে বরাতে। ফেরাটেরা হবে না।

হরিদাস বললে, চলুন।

চললাম।

আরও মাইল দুই।

কিন্তু যতই যাই, ঘোড়ার পা ততই আর চলতে চায় না। হরিদাসকে বললাম, ঘোড়াটা যেন খোঁড়াচ্ছে মনে হয়। নালটাল খুলে গেল না তো?

হরিদাস বললে, আমারটাও খোঁড়াচ্ছে। দুটোরই নাল একসঙ্গে খুলতে পারে না। একটু সাফ জায়গা পেয়ে দেখতে হবে কি হ'ল।

খানিকদূর গিয়ে খোলা জায়গা মিলল, সেখানটায় কি জানি কেন ঘাস গজায় নি। ঘোড়া দাঁড় করিয়ে নেমে তার পায়ের দিকে চেয়েই চক্ষুস্থির! দুটি ঘোড়ার আটখানি পাই ক্ষুর থেকে হাঁটু অবধি চার ইঞ্চি ক'রে মোটা হয়ে গেছে—ইয়া লম্বা লম্বা জোঁকে চামড়া একদম ঢাকা।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, ওরে সব্বনাশ!

হরিদাস বললে, হেঁটে আসতে চেয়েছিলেন না? হেঁটে এলে এতক্ষণ থাকতেন কোথায়?

আমি বললাম, আর যেথাই হোক, ইহলোকে নয়। কিন্তু এখন উপায়?

হরিদাস বললে, উপায় করছি, দাঁড়ান।

ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে হরিদাস পকেট থেকে দেশলাই বার করলে। কিছু টাটকা শুকনো পাতা কুড়িয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছে জড়ো ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমাকে বললে, ঘোড়ার মুখ ধ'রে রাখুন, দৌড়ে না পালায়।

আগুন জ্ব'লে উঠল, আঁচ লেগে জোঁকগুলো ঘোড়ার পা ছেড়ে টুপ টুপ ক'রে খ'সে পড়তে লাগল। ঘোড়া কিন্তু একটুও লাফালে না। দেখে বুঝলাম তারা বরং আয়েসই পাচ্ছে। জোঁকে ধরলে ভয়ানক চুলকোয় কিনা। আগুনের তাতে আরাম লাগে।

জোঁক ছেড়ে গেল, এবার রক্ত বন্ধ করার পালা। ঘোড়ার সব কখানা পা ব'য়ে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্ত বন্ধ না হ'লে ঘোড়া মারা পড়বে। অথচ কি দিয়ে বন্ধ করি! জোঁকের কামড়ে দিতে হয় চুন; কিন্তু আমরা কেউ পান খাই না. চুন সঙ্গে নেই। হরিদাস ছেলেটার দেখলাম, বুদ্ধি অনেক দিকে খেলে। বললে, চিনি আছে না আপনার মোড়কে?

আমি বললাম, তা আছে। কিন্তু চিনি খাবেন কেন হঠাৎ?

হরিদাস বললে, আমি নয়, ঘোড়া খাবে। বার করুন।

চিনি নিয়ে হরিদাস ঘোড়ার পায় চাপড়ে চাপড়ে লাগিয়ে দিলে। ক্রমে রক্ত অনেকটা বন্ধ হ'ল। তখন খানিকটা কাদামাটি নিয়ে খুব করে সে ঘোড়ার পায়ে মেখে দিলে, হাঁটু পর্যন্ত। বললে, কাদা ফুঁড়ে আর ছিনে জোঁক ঢুকতে পারবে না। ভাগ্যিস রগ কাটে নি কোথাও। তা হ'লে আর এতে কুলতো না। ঘোড়াকে সুস্থ ক'রে আবার চললাম। কিন্তু

ঘোড়াকে আর দৌড় করানো গেল না। হরিদাস বললে, তাড়াহুড়ো ক'রে লাভ নেই, জোরে চলতে গেলেই আবার রক্ত ছুটবে।

ভাল কথা। বেলা ওদিকে বারোটা বাজে; আদ্ধেক পথ জোর এসেছি। আমি বললাম, এ রেটে গেলে তো পৌঁছতেই রাত হবে।

হরিদাস বললে, তা হবে না; আর খানিকটা পর পথ ভাল আছে।

কিছুদূর এগিয়ে সত্যিই একটু ভাল পথ পাওয়া গেল। ভাল মানে আর কিছুই নয়, পাহাড়ে জমি সেখান থেকে শুরু হয়েছে, কাদা আর ঘাস দুটোই কম। ঘোড়াও যেন একটু স্বস্তি পেলে; নিজে থেকেই একটু চাল বাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু বিপদ যেন সেদিন আমাদের সঙ্গে আড়ি ক'রেই লেগেছিল।

বেলা তখন প্রায় তিনটে, মন্দির আর মাইলখানেক দূরে।

সামনে একটা বাঁক, বাঁকের পর থেকে রাস্তাটা একদম সোজা চ'লে গেছে।

হরিদাস বললে, সেই সোজা রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে একেবারে মন্দিরের দোর-গোড়ায়।

ধীরে ধীরে আমরা যাচ্ছি। ঘোড়ারও পরিশ্রম হয়েছে, আমাদেরও কাহিল অবস্থা, তাড়াতাড়ি করবার মত উৎসাহ কারুরই নেই। আগে আগে যাচ্ছে হরিদাস, পেছনে আমি।

বাঁকটা ফিরেই হরিদাস রাশ টেনে ঘোড়া থামালে। বনের মধ্যে এক জায়গায় তাকিয়ে বললে, এই সেরেছে।

আমিও তার পাশে গিয়ে থামলাম। বললাম, কি হ'ল আবার?

হরিদাস আঙুল দিয়ে এক জায়গায় দেখিয়ে বললে, দেখছেন? দেখলাম, সে জায়গাটায় গাছের চারাগুলো সব ভাঙা, কয়েকটা গাছের গুঁড়ির বাকল উঠে গেছে, যেন ভারী জিনিস তার ওপরে ঘষা হয়েছে। দেখে বললাম, কি, হাতী?

হরিদাস বললে, তার চেয়ে ভীষণ জীব। গণ্ডার।

গণ্ডার! উত্তম প্রস্তাব। পকেটে হাতিয়ারের মধ্যে একখানা পেন্সিলকাটা ছুরি। বললাম, গণ্ডার আছে এখানে, বলেন নি তো?

হরিদাস বললে, থাকে না। ওপরকার তরাই থেকে মাঝে মাঝে নেমে আসে।

আমি বললাম, মানুষ মারে?

হরিদাস বললে, পেলে কি আর ছেড়ে দেয়। পালের ভেতর যেগুলো গুণ্ডা, সেইগুলো তাড়া খেয়ে পাল ছেড়ে নেমে আসে কিনা। মানুষ ঘোড়া গরুর দেখা পেলেই হ'ল, আর রক্ষে নেই।

আমি বললাম, এখন উপায়? দেখে তো মনে হচ্ছে, এ দাগ অল্পক্ষণ আগেকার। দেখছেন না, গাছের গায়ে এখনও কষ শুকোয় নি।

হরিদাস বললে, ওটা হচ্ছে গণ্ডারের গা ঘষার দাগ। দাগ দেখেই বুঝতে পারছেন, কতখানি উঁচু জীব।

আমি বললাম, কাছাকাছি আছে নাকি কে জানে।

হরিদাস বললে, খুব কাছে নেই। তা হ'লে ঘোড়ারা গন্ধ পেত। তবুও এখানে আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই। ঘোড়াকে ছোটান, লাগান চাবুক।

সারাদিনের মধ্যে চাবুকটাকে কাজে লাগাই নি। এবার লাগালাম। চাবুক খেয়ে ঘোড়া ছুটল। দশ মিনিটের মধ্যে এসে মন্দিরের সামনে থামল।

হরিদাস বললে, এবার নিশ্চিন্ত। যদি এখানে এসেই পড়ে, মন্দিরে ঢুকে পড়া যাবে। আর এলে ঘোড়াও গন্ধ পাবে, ব্যারোমিটার খাড়াই রইল।

মন্দিরের সামনে একটা বেলচারা। তার গায়ে ঘোড়া বেঁধে দুজনে নেমে পড়লাম।

হরিদাস বলেছিল ঠিকই। রাস্তাটা সোজা উত্তরদিকে চ'লে এসেছে, আর মন্দির

দক্ষিণমুখো—দেখে মনে হয়, যেন রাস্তাটা সোজা এসে মন্দিরেই ঢুকে পড়েছে। তাতে মন্দিরের মেঝেও মোটেই উঁচু নয়, রাস্তা থেকেই সোজা মন্দিরে ঢুকে পড়তে হয়। সিঁড়ি বা রোয়াকের বালাই নেই।

মন্দিরের সামনে ছোট একটুখানি উঠোন, বোধ হয় পূজো দিতে যারা আসে তারাই সাফ ক'রে ক'রে রাখে। পাশে পেছনে গভীর জঙ্গল।

মন্দিরটা দেখে তার বয়স ঠাহর করতে পারলাম না। গায়ের পলস্তারা খ'সে পড়েছে, ইট দেখা যাচ্ছে। পাতলা ইট, দেড় ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। মন্দিরটির ছোট্ট, চৌকো; পুরোনোকালের খড়ের চালের মত তার ছাতটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। মজবুত গড়ন, আজকাল ও রকম গড়নই হয় না। মন্দিরে একটি মাত্র দরজা, তার কবাট নেই। দরজাটি হাত সাড়ে-চার খাড়া, হাত আড়াই চওড়া। জানলাটানলা কিছু নেই। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখলাম, ঠাকুরটি আরও চমৎকার। আবছা আলোয় ভাল দৃষ্টি চলে না; দেশলাই জ্বেলে দেখলাম, মন্দিরের ঠিক দোরের সোজা মেঝেয় খাত কেটে কুণ্ড বানানো হয়েছে, তার মাঝখানে দেবমূর্তি। নাক-মুখ-হাত-পা-ওয়ালা প্রতিমা নয়—গোল একটি পাথরের কুঁদো। তার গায়ে শুকিয়ে আছে সিদুর বিভূতি চন্দনের দাগ; চার পাশে বেলপাতা আর ফুলের স্তূপ, শুকিয়ে প'চে গন্ধ ছাড়ছে।

দেখে বললাম, শিবমূর্তি তো চন্দন সিঁদুর কেন?

হরিদাস বললে, ঐ তো মজা। এর নাম বুড়ো শিব, কিন্তু আসলে এটি যে কি দেবতার মন্দির কেউ জানে না। ভক্তদের অসুবিধে নেই, যে যা মনে ক'রে খুশি হয়, সে তেমনই ক'রে এর পূজো করে। কেউ দেয় শিব ব'লে বেলপাতা, কেউ দেয় শক্তি ব'লে জবাফুল, কেউ দেয় নারায়ণ ব'লে তুলসী। ইনি আপত্তি করেন না, সক্কলের পূজোই সমান খুশি হয়ে খেয়ে যান। সেদিক থেকে ইনিই খাঁটি দেবতা—একেবারে নির্বিকার নির্গুণ ব্রহ্ম। খান না কেবল একটি জিনিস—এখানে জীববলি হয় না।

আমি বললাম, কিন্তু মন্দিরে পূজারী পুরুত কাউকে তো দেখছি না।

হরিদাস বললে, ঐটি হচ্ছে এখানকার আর একটি বিশেষত্ব, এ মন্দিরের পুরুত নেই। এখানে তো দেখছেনই নিবিড় বন, জনমানব এখানে থাকে না। মন্দির সারা বছর খোলাই প'ড়ে থাকে, লোকজন যার যখন ইচ্ছে আসে, পূজো দিয়ে যায়। কোন জাতের বাছবিচেরও নেই, নিয়ম-পদ্ধতিরও কড়াক্কড়ি নেই।

মন্দির তো দেখা হ'ল, এবার প্রাণ বাঁচাবার পালা। ক্ষিদেয় তখন পেট চুঁইচুঁই করছে। বাণ্ডিল খুলে রুটি চিবোতে বসলাম। খাব, ব'লে চিনি এনেছিলাম, সে লেগেছে ঘোড়ার পদসেবায়। বাকি ছিল শুকনো রুটি, তাই কোন রকমে চিবিয়ে গলাধঃকরণ ক'রে পিত্তি ঠাণ্ডা করলাম। তারপর চিন্তা, এবার ফেরা যায় কি ক'রে!

ঘড়ি দেখলাম, চারটে বেজে গেছে। পথে সেই গণ্ডার, তায় অন্ধকারে পথ হারাবার ভয়। বাঘ ভালুকও বেরোনো অসম্ভব নয়। অতএব সে রাত্রে ফেরবার কথা উঠতেই পারে না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ওসব জায়গায় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে হয় না, একেবারে ধক ক'রে সব অন্ধকার হয়ে যায়। বনের নীচে আলো এমনিই কম থাকে কিনা।

ঘোড়া দুটিকে হারালে চলবে না, তখন তাদের ওপরেই ভরসা। ঘোড়াদের টেনে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে এলাম। ক্ষুদে মন্দির, এতগুলো জীবের জায়গা হওয়াই মুশকিল। মন্দিরের দু দিকে তাদের ছেড়ে দিলাম, আর এক দিকে আমরা দুজনে গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়লাম। ঘুমোলে হবে না, বনের মধ্যে কখন কি জন্তু এসে হাজির হয়, কে জানে।

আমি বললাম, হরিদাসবাবু, দুজনেই জেগে থেকে লাভ নেই, পালা ক'রে ঘুমিয়ে নিন। সারাদিন ধকলটা তো কম যায় নি শরীরের ওপর দিয়ে।

হরিদাস হেসে বললে, ধকল তো আজ এক দিন নয়, কদিন ধ'রেই যাচ্ছে। কিন্তু ঘুমোতে হবে না, ভয় নেই।

আমি বললাম, কিন্তু খালি খালি জেগে ব'সে থাকবেন কি ক'রে?

হরিদাস বললে, কিচ্ছু ভাবতে হবে না, সে যাদের রাখবার তারাই জাগিয়ে রাখবে দেখবেন।

খানিক পরেই টের পেলাম, তার কথা মিথ্যে নয়। অন্ধকার হতে না হতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে আমাদের ছেঁকে ধরলে।

উঃ, সে কি মশা—যেন কেউ মুঠো ভ'রে ভ'রে মশা গায়ে মুখে ছুঁড়ে মারছে। আর মশাও এই এতবড় এতবড়। সর্বাঙ্গ চাপড়াতে চাপড়াতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাত ব্যথা হয়ে উঠল, তবু পরিত্রাণ নেই।

হরিদাস বললে, বৃথা নিজের হাতের থাপ্পড় খাচ্ছেন কান্তিবাবু, মেরে আপনি দশ বচ্ছরেও শেষ করতে পারবেন না। তার চেয়ে আমি যা বলি তাই করুন।

তার কথামত শার্টটাকে খুলে পেন্টুলুন ক'রে পরলাম, প'রে ধুতিটাকে দুভাঁজ ক'রে গায়ে মাথায় জড়িয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলাম। হরিদাসও তাই করলে।

ঘুমের দফা তো সারা; সারারাত ব'সে ঢুলছি, আর থেকে থেকে ঘড়ি দেখছি, রাত আর কত বাকি। ঘড়িটার রেডিয়াম ডায়াল, তাই চাদরের ভেতরে ব'সেও দেখা যাচ্ছিল। দেশলাই জ্বালতে হ'লেই হাত বার করতে হ'ত।

এমনই ক'রে কোন রকমে সে রাত কাটল। সকাল হতেই হরিদাস বললে, আর দেরি নয়, এবার টেনে ছুট লাগান। ভাল তেরোস্পর্শে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম মশাই, আপনি লোকটাই অপয়া।

শুকনো রুটি যেটুকু বাকি ছিল গিলে নিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলাম।

আমার আগে আগে হরিদাস, তার হাত কুড়িক পেছনে আমি। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে দুজনে চলেছি। কোথা দিয়ে দুশমন বেরিয়ে পড়ে ঠিক কি।

কালকের সেই জায়গাটাতে এসে আমাদের বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল। হরিদাস বললে, এইটুকু পেরোতে পারলে হয়। গণ্ডাররা অনেক সময় একই জায়গায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়—জায়গা সহজে ছাড়তে চায় না।

হরিদাস বাঁকের মুখে, পেছনে আমি। আমার চোখ পাশে বনের দিকে। হঠাৎ সামনে থেকে হরিদাস চেঁচিয়ে উঠল, কান্তিবাবু, গাছে উঠুন শীগগির।

চেয়ে দেখি সর্বনাশ। হরিদাস মাথার ওপরকার এক গাছের ডাল ধ'রে ঝুলছে, আর তার ঘোড়া চোঁচা দৌড়ে পালাচ্ছে।

কি হ'ল বোঝবার আগেই আমার ঘোড়াও থেমে দাঁড়াল, অস্থির হয়ে লাফালাফি শুরু করল, থামাতে পারি না। হরিদাস ঝুলতে ঝুলতেই চেঁচিয়ে বললে, বাঁচতে চান তো ডাল ধরুন, ডাল।

আমার তখন ভাববার সময় নেই। ঘোড়া ওদিকে দুই পায়ে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে, প'ড়ে যাই আর কি। চোখ বুজেই ওপর দিকে হাত বাড়ালাম, একটা গাছের ডাল হাতে ঠেকল, সেইটাকেই দুহাতে ধ'রে ঝুলে পড়লাম। ঘোড়া তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর তারপর বাঁক ঘুরে দেখা দিলে গণ্ডার।

তার চেয়ে বড় গণ্ডার দেখি নি এমন নয়, কিন্তু অমন হিংস্র মূর্তি আর দেখি নি। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জায়গাটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুললে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে একবার আমার ঘোড়াটাকে তাড়া করলে, কিন্তু সে তখন নাগালের বাইরে। তাকে ধরতে পারবে না বুঝে গণ্ডার ফিরে এল। আমরা যেখানটায় ঝুলছি সেইখানেই ঘোরাঘুরি শুরু করলে। রাগে ক্ষেপে উঠেছে, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

হরিদাস ততক্ষণে ডাল বেয়ে গাছের ওপর উঠে গেছে। আমাকে বললে, দোল খেয়ে উঠে পড়ুন। দেরি করবেন না।

আর দেরি করবেন না! আমার তখন অবস্থা কাহিল। গাছে চড়তে আমি দক্ষ কোন কালে নই : দোল খেয়ে উঠে পড়া সে যতটা সহজ ভাবে, আমার কাছে মোটেই তত সহজ নয়। তায় আবার কপালগুণে আমি ধ'রে ফেলেছি এক চারাগাছের ডাল, আমার সওয়া দু মণ ওজনের ভারে সে গাছ নুয়ে পড়েছে আর লকলক ক'রে কাঁপছে, হাত ঠিক রাখাই মুশকিল। তার ওপর আবার সোনায় সোহাগা, গাছের গুঁড়িটি আমার পেছন দিকে।

হরিদাস বললে, ভাবছেন কি কান্তিবাবু, উঠে পড়ুন।

আমি ঝুলতে ঝুলতেই প্রাণপণ চেঁচিয়ে বললাম, উঠব কি ক'রে?

হরিদাস বললে, কব্জি ঘুরিয়ে পেছন ফিরুন, ফিরে পা তুলে ডালে বাধিয়ে দিন।

তার কথামত ঘুরেটুরে কোনমতে পেছন তো ফিরলাম। তারপর একখানা হাত বাড়িয়ে সামনে আর একটা ডাল ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় গাছের গুঁড়িকে এক ধাক্কা।

গণ্ডার ছুটে এসে গাছের ওপর পড়েছে। সমস্ত গাছটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে আমারও হাত গেল ফসকে, ধপাস ক'রে আমি প'ড়ে গেলাম।

পড়বি তো পড় একেবারে গণ্ডারের পিঠের ওপর। প'ড়েই মনে হ'ল মাটিতে পড়লে আর রক্ষে নেই। ভাগিস উপুড় হয়ে পড়েছিলাম, হাত পা ছড়িয়ে কোন রকমে টাল সামলে টিকে গেলাম। তারপর কোন রকমে উঠে তার পিঠে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলাম।

হাতীর পিঠটা থলথল করে, আর ক্রমাগত দুলতে থাকে, তাই হাতীর খালি পিঠে বসাই যায় না। গণ্ডারের এক সুবিধে, তার চামড়াটা টাইট আর খসখসে, পিছলে পড়ার ভয় থাকে না। কিন্তু ধন্য বলতে হবে তার চামড়াকে। অত বড় জীবটা পিঠের ওপর রয়েছি, গণ্ডার যেন টেরই পেলে না।

রাগে সে তখন ফুলছে। একবার এদিকে খানিকটা ছুটে যায়, আবার ফিরে ওদিকে ছোটে, কখন বা এক জায়গায় গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, আর মুখ তুলে বাতাস শোঁকে। বুঝলাম সে আমার গন্ধ পেয়েছে, কিন্তু গন্ধটা কোন্ দিক থেকে আসছে ঠিক করতে পারছে না। ভাগ্যগুণে চমৎকার জায়গা পেয়ে গেছি ; পিঠের ওপরে আমি আছি সেখানে তার চোখ যায় না। এখন যদি কোন রকমে পিছলে মাটিতে প'ড়ে যাই তবে আর রক্ষে নেই। এই জানোয়ারের হাতে পাঁচ মিনিটও প্রাণ বাঁচবে না।

গণ্ডারের ঘাড়ের চামড়া দুভাঁজ হয়ে থাকে, সেই ভাঁজের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে খিমচে ধ'রে প্রাণপণে সেঁটে ব'সে রইলাম।

প্রায় ঘন্টা দুই ধ'রে গণ্ডার সমানে লাফালাফি করলে। তারপর পথের মাঝখানে ঠায় মেরে দাঁড়িয়ে গেল। নড়ে না চড়ে না, খালি মুখ তুলে তুলে এক একবার বাতাস শোঁকে।

সে জায়গাটা ফাঁকা, মাথার ওপর গাছপালা কিছু নেই।

হরিদাস ওদিকে এডাল ওডাল ক'রে আমার যতটা সম্ভব কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে। মুখে বলেছিল, আমরা মুখ্যু, দেখলাম সেটা তার নেহাৎ বিনয়। লেখাপড়া হয়তো না জানতে পারে, কিন্তু তার বুদ্ধি খেলে না এমন বস্তুই নেই। মাথার ওপর এসে বললে, কান্তিবাবু, মশায়, কেমন আছেন? বেশ বাহনটি পেয়ে গেছেন দেখছি।

কিছুতে ঘাবড়ায় না বিপদের মুখে এ রকমের সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমার মনটা খুশি হয়ে উঠল। বললাম, বাহন তো ভালই, তবে বাগ মানতে চাইছে না, এই যা।

হরিদাস বললে. মানবে, মানবে, ক্রমশই মানবে। দুটো চারটে দিন যাক. তারপরই দেখবেন পোষ মেনে এসেছে। কি বলিস রে!

আমি বললাম, পোষ মানাবার মন্তরটাই যে জানি না।

হরিদাস বললে, মন্তর আর কি। একটু যত্ন ক'রে দানাটানা খাওয়াবেন. আর গলার

কাছটা মাঝে মাঝে চুলকে দেবেন। ওটা ভারি পছন্দ করে।

আমি বললাম, দানাই যে নেই।

হরিদাস বললে, কেন, রুটিগুলো কি হ'ল? সব সাবড়েছেন?

বললাম, সব।

হরিদাস বললে, তা হ'লে আর কি করবেন, ছেড়ে দিন, চ'রে খাক। তবে সাবধান, দেখবেন যেন প'ড়ে না যান। হাতছাড়া হয়ে গেলে কিন্তু আর ফিরে পাবেন না, দামী মাল।

আমি বললাম, রাজাসন যখন পেয়েছি একবার, মাটিতে পারতপক্ষে পা ছোঁয়াচ্ছি না। কিন্তু এর পরের অবস্থা?

হরিদাস বললে, সে পরের কথা পরে। আপাতত দুচার ঘন্টার মধ্যে ও নড়ছে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমি বললাম, নড়বে না?

হরিদাস বললে, না। ওদের ধারণা, না নড়ে-চ'ড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষ ওদের চিনতে পারে না, গোলাপফুল ব'লে ভুল করে। তাই অমন ঠায় দাঁড়িয়ে গেছে, মানুষ না জেনে কাছে এলে তখন মারবে। আপনি তা হ'লে ব'সে থাকুন, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।

আমি বললাম, ঘুমোবেন মানে?

সে বললে, ঘুমোব না তো কি করব ব'সে ব'সে। দেহ আর টানছে না, হাতেও কাজ নেই।

আমি বললাম, যদি প'ড়ে যান?

সে বললে, প'ড়ে অমনই গেলেই হ'ল? কাপড় দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিচ্ছি ডালের সঙ্গে।

আমি বললাম, বেশ তো স্বার্থপর লোক মশাই! আমার বুঝি ঘুম পাচ্ছে না?

সে বললে, কি করব। আপনাকে তো বলেছিলাম উঠে আসুন। তা না, আপনি গেলেন গণ্ডার ধরতে। তা যাক, এখন যা বলি শুনুন। গণ্ডার আবার যখন চলবে, মাথার ওপর ডাল পেলেই তাই ধ'রে গাছে উঠে পড়বেন, বুঝলেন?

আমি বললাম, বলা তো সোজা, করে কে। গাছে কি চড়েছি নাকি কোন জন্মে।

হরিদাস বললে, ঠেকায় পড়লে সবই পারে। গণ্ডারেই কি আগে চড়েছিলেন? যাক, আর বকাবেন না মশাই, আমি ঘুমোলাম। আর দেখবেন, ইতিমধ্যে যদি বাহন পোষ মানে, একা ফেলে যেন বাড়ি চ'লে যাবেন না। বিপদের সঙ্গী ব'লে মনে ক'রে ডেকে নেবেন কিন্তু।

সত্যি দু মিনিটের মধ্যে তার নাকের ডাক কানে এল। ধন্য ছেলে। এদেরই বাঁচা সার্থক।

সারাটি দিন একই ভাবে কাটল। গণ্ডার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পিঠের ওপর আমিও তেমনিই ঠায় ব'সে।

হরিদাস গাছে ব'সে ঘুমোচ্ছে, আর এক একবার জেগে আমার সঙ্গে একটু গল্প করছে।

এর মধ্যে আমি একবার বললাম, আচ্ছা, বাড়ি থেকেই বা আমাদের খুঁজতে কেউ এল না কেন?

হরিদাস বললে, হয়তো বুঝেছে, আমরা এতক্ষণ বাঘের পেটে গেছি, খুঁজতে এসে আর লাভ নেই।

সমস্তটা দিন কাটল। আবার সন্ধ্যে হয়ে এল। ক্ষিদেয় অনিদ্রায় উৎকণ্ঠা তখন সমস্ত শরীর মন যেন অবশ হয়ে গেছে। দুদিন ধ'রে স্নান নেই, কামানো নেই, সারাটা গা আর মুখে যা জ্বলুনি ধরেছে, সে অসহ্য। তার ওপর রাত হতেই আবার কালকের মত মশা। এবার যেন আরও বেশি। সে তবু ঘরের মধ্যে ছিল। এ একেবারে খোলা বন—চারিদিকের হাওয়ায় মশার ডাকে ঝমঝম ক'রে শব্দ হচ্ছে। গণ্ডারের গায়ে ব'সে রস মেলে না তার।

জানে, কাজেই সমস্তটা আক্রমণ যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। তাড়াবার চেষ্টা করব যে, হাত ছাড়বার উপায়ও নেই।

হরিদাস ওপর থেকে বললে, ও কান্তিবাবু, মশায় খাচ্ছে না তো?

আমি বললাম, বেড়ে আছেন মশাই। আপনাকে খায় না?

হরিদাস বললে, দোতলায় মশা থাকে না। আসুন না উঠে।

বললাম, আসছি। আপনি একটু চা করতে বলুন ততক্ষণ।

ব'সে আছি ব'সে আছি, আর ব'সে ব'সে ঝিমুনি আসছে। তিন দিন ধ'রে বিশ্রাম নেই, কত আর সয়। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি, কাঁটা যেন আর নড়ে না।

রাত তখন দশটা প্রায়, আমি চোখ বুজে ঝিমোচ্ছি। হঠাৎ হ্যাঁক ক'রে এক বিকট আওয়াজ আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি। কি হ'ল বোঝবার আগেই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলাম, গণ্ডারের পিঠে মুখ গুঁজে। থুতনিতে যা একটা গুঁতো খেলাম, মনে হ'ল যেন ভেঙেই গেল হাড়। উঠে ব'সে থুতনিতে হাত বোলাচ্ছি, ওপর থেকে আওয়াজ এল, কি হ'ল, ও মশাই?

বললাম, কি জানি ভূমিকম্প বোধ হয়।

হরিদাস বললে, ভূমিকম্প নয়, হাঁচি। বাহনের নাকে মশা ঢুকেছে। নাকটা একটু চুলকে দিন, নইলে আবার হাঁচলে প'ড়ে যাবেন।

বললাম, নাক হাতে পাচ্ছি না। আপনি একটু দিয়ে যান না দয়া ক'রে।

হরিদাস বললে, কাল সকালে দোব'খন, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।

আবার ব'সে আছি। গণ্ডারের বুদ্ধি ছিল বলতে হবে, আর হাঁচলে না। ঐ ঝাঁকুনি আর দুচারটি হ'লেই গিয়েছিলাম।

রাত ক্রমে পুইয়ে এল। মাথার ওপর গাছপালা নেই, চেয়ে দেখলাম, আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

দিন হলেও তবু বাঁচা যায়। আলো আরও একটু বাড়ল। বনের তলায় তখন একটু একটু দৃষ্টি চলে। ডেকে বললাম, ও হরিদাসবাবু!

হরিদাস ওপর থেকে বললে, ঘুমুচ্ছি, ডাকবেন না। আপনার খবর কি, ঘুমটুম বেশ হ'ল?

বললাম, হ'ল একরকম।

হরিদাস বললে, বাহন কি বলছে?

বলতে বলতেই হঠাৎ গণ্ডারেরও যেন ঘুম ভাঙল। কি তার হ'ল কে জানে, হঠাৎ চার পা তুলে সে তিড়িং ক'রে এক লাফ মারলে, তারপর চোঁ-চা নাক-বরাবর দৌড় মারলে। আমি প্রাণপণ ক'রে তার পিঠের ভাঁজ খামচে ধরলাম। হরিদাস চেঁচিয়ে বললে, হুঁসিয়ার, হাত ছাড়বেন না।

গণ্ডার অত জোরে ছুটতে পারে আগে জানতাম না। মাথা নীচু ক'রে মুখটা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে সে সোজা রাস্তা ধ'রে ছুটেছে। পিঠের ওপর আমি ব'সে আছি, আর মাঝে মাঝে দুধার থেকে সরু সরু গাছের ডাল চাবুকের মত শপাং ক'রে এসে গায়ে লাগছে।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই মন্দিরের কাছে এসে পড়লাম। গণ্ডার তখনও মাথা নীচু ক'রে ছুটছে, সামনে মন্দিরটা তার প্রায় চোখেই পড়ে নি। হঠাৎ আমার মনে হ'ল, হয়তো বাঁচবার উপায় হ'ল। মনে মনে বললাম, দোহাই বাবা বুড়ো শিব, এবার বাঁচলে বুঝব তোমার মাহাত্ম্য।

বাবা বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য ছিল। তিনি তার প্রমাণ দিলেন।

গণ্ডারের গোঁ বিখ্যাত জিনিস। সেই গোঁ গণ্ডার নিজেও সামালাতে পারলে না, পথের শেষেই মন্দিরের দোরে—সোজা সে দোর দিয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়ল।

আমি পেছন দিকে লাফিয়ে পড়লাম, প'ড়েই আর ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে টেনে দৌড়

লাগালাম। খানিকটা এসে দেখি, হরিদাস দৌড়ে আসছে। আমাকে দেখেই সে একবার থমকে দাঁড়ালে, তারপর ছুটে এসে দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, বাঁচালেন মশাই, আত্মহত্যাটা আর করতে হ'ল না।

আমি বললাম, কেন?

সে বললে, কেন, বোঝেন না? আপনাকে আমিই বুদ্ধি দিয়ে নিয়ে এসেছি, এর পরে আর লোককে মুখ দেখাতাম কি ক'রে!

দেখলাম, তার দুই চোখে জল ভ'রে এসেছে।

আমি চেয়ে আছি দেখে তার খেয়াল হ'ল, চোখ মুছে একটু হেসে বললে, বাহন কোথায় গেল?

বললাম, মন্দিরে ঢুকে শিবপূজো করছে।

হরিদাস আমার পিঠ চাপড়ে বললে, বাহাদুর! থাক ওইখানে বেটা প'চে। মন্দিরের ভেতরে জাম হয়ে গেছে তো? এখন বুদ্ধি ক'রে পেছন হেঁটে বেরোতে পারে তো বেরোবে না হয় ওইখানেই ম'রে থাকবে। চমৎকার ফাঁদ হয়েছে।

আমি বললাম, এবার বাড়ি চলুন।

হরিদাস বললে, আমি তো তবু ঘুমিয়েছি, আপনি চলতে পারবেন? তার চেয়ে এক কাজ করুন না, গাছে চ'ড়ে একটু ঘুমিয়ে নিন।

আমি বললাম, আর ঘুমোয় না। চলুন আমি যেতে পারব।

সেই বনের পথে ছুটতে ছুটতে আছাড় খেতে খেতে দুজনে ফিরলাম। প্রায় চার পাঁচ মাইল এসে দেখা হ'ল মস্ত একটা দলের সঙ্গে। তারা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

তাদের সঙ্গে বাড়ি এসে পৌঁছলাম। এসে দেখি, আমি নিখোজ ব'লে দলবল সবাই সেইখানে আটকে রয়েছে। সেই রাত্রেই বাড়িমুখো রওনা হলাম।

হরিদাস ছেলেটার আর খবর পাই নি। বেঁচে আছে কি মরেছে, তাও জানি না। কিন্তু বড় চমৎকার লেগেছিল তাকে। বন্ধু করতে হয় তো ঐ রকম লোককে।

আমরা বলিলাম, কিন্তু আপনি যে বললেন, দাড়ির জন্যে প্রাণ বাঁচল, তা হ'ল কই?

কান্তি চৌধুরী চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি শুনলে তবে এতক্ষণ ধ'রে? নাঃ, তোমাদের কিছু বলাই ঝকমারি। মাথার ভেতর একেবারে কিচ্ছু নেই, আস কেন আমাকে মিছিমিছি বকাতে?

আমরা কাতর হইয়া বলিলাম, সব যদি বুঝব তবে আর আপনার কাছে শুনতে আসব কেন, নিজেরাই তো বুঝে নিতে পারতাম। বলুন না।

কান্তি চৌধুরী প্রীত হইয়া বলিলেন, বেশ, শোন। গণ্ডার দৌড়ে গিয়ে মন্দিরে ঢুকল ব'লেই তো বেঁচে গেলাম? কিন্তু বল তো, গণ্ডার অমন ক'রে দৌড় দিলে কেন?

আমরা বলিলাম, বুঝি না।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, গণ্ডারের পিঠে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম, মুখে ছিল দুদিনের দাড়ি, সেই দাড়ির খোঁচা লেগে। তা হ'লে দাড়ির দরুনই বেঁচে গেলাম বলব না?

আমরা বলিলাম, কিন্তু আপনি প'ড়ে গেলেন রাত দশটায়। আর গণ্ডার দৌড়োল সকালবেলা?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দৌড়োয়। এ কি তোমাদের ফিনফিনে কলেজে-পড়া চামড়া পেয়েছ? এর নাম গণ্ডারের চামড়া, এতে রাত দশটায় খোঁচা লাগলে টের পেতে ভোর ছটাই বাজে।

ভাদ্র ১৩৪৬

মহাভারত-কথা

সম্বুদ্ধ

অষ্টাদশ দিবসে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষ হইল। যোদ্ধৃভাবে মহাসমর নিরস্ত হইল। বিজেতা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্বজনসম্মতিক্রমে হস্তিনাপুরীর সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।

দীর্ঘকাল তিনি রাজ্যভোগ করিলেন। তিনি দিগ্বিজয় করিলেন, অশ্বমেধ করিলেন, এবং আরও বহু বহু মহাকর্মানুষ্ঠানের অন্তে সশরীরে স্বর্গযাত্রা করিলেন। তাঁহার সেই মহাজীবনের মহাকাহিনী মহামুনি ব্যাসদেব গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ব্যাসদেব চারণধর্মী কবি। মহাভারতের কাহিনী মূলতঃ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের কাহিনী। সে কাহিনীর আদিপর্ব উদ্যোগপর্ব সমরপর্ব এবং উত্তরকালের দিগ্বিজয়-পর্ব তিনি যাদৃশ ধৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন, রাজাশাসন-পর্ব তাদৃশ করেন নাই।

ব্যাসদেব কর্তৃক অনুক্ত ভারত-কাহিনীর একটি অধ্যায় এই নিবন্ধে বর্ণিত হইল।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির বর্ণক্লিন্ন ভারতভূমিকে সর্বথা সুসংবদ্ধ ও সুসন্নিবিষ্ট করিতে মনোযোগী হইলেন। ভাগ্য তাঁহার অনুকূল, এক্ষণে প্রকৃতকালও তাঁহার সহায় হইল। শত্রুপক্ষ সমূলে নির্জিত ও উৎপাটিত। যুধিষ্ঠির বিদ্বান ও জ্ঞানপ্রবীণ। মহাবল ভ্রাতৃচতুষ্টয়, মহাকৌশলী শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথ রাজন্যবর্গ তাঁহার অনুগত। মহাজ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহার নিত্যসহচর। তিনি রাজধর্মে পারদর্শী, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও জিতধী বলিয়া বিখ্যাত, সৌম্যমূর্তি সৌম্যপ্রকৃতি সৌম্যভাষী বলিয়া বিজ্ঞাত। রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে এই সমস্তই তাঁহার সহায়ক হইল। স্থান কাল ও পাত্রভেদে তোষণ, শোষণ, পোষণ ও শাসন, এই নীতি-চতুষ্টয়ের যথোচিত প্রয়োগ দ্বারা তিনি অচিরাৎ সসাগরা জম্বুদ্বীপকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। এই বিচিত্রা মহাভূমির সর্বত্র শান্তি ও সাম্যের বাণী প্রসারিত হইল।

কেবল ইহাই নহে। যাহা কোন রাজা কোনদিন করে নাই, করিবে না—ধর্মান্তরপরায়ণ ম্লেচ্ছ প্রজাবৃন্দের প্রীতিবিধান-মানসে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় রাজ্যকে খণ্ডিত করিলেন ; পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে দুইটি বৃহৎ ভূভাগ স্বীয় শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে ম্লেচ্ছজাতির স্বকীয় আবাসভূমি বলিয়া ঘোষিত করিলেন। আর্যেতর জাতিদিগের মধ্যে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। দানশূর সমদর্শী ধর্মরাজের নাম ও কীর্তি দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

নিয়ত বিরাম ও বিশ্রামবিহীন হইয়া যুধিষ্ঠির রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতিসাধনে যত্নবান হইলেন। ভারতের মহিমা প্রচার, মৈত্রী ও বাণিজ্য বিস্তার ও ধনাগমের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও স্বয়ং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন ; কদাচ বা স্বরাজ্যে থাকিয়া বিদেশাগত রাজন্য ও রাজদূতগণকে স্বাগত জানাইলেন। দিকে দিকে তাঁহার খ্যাতি, দেশে দেশে তাঁহার সমাদর। ভারতের কেন, পৃথিবীরই কোন রাজা বা শাসক এতাদৃশ বিপুলা কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

কেবল বিদেশে নহে, স্বদেশেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার তুলনা ছিল না। তাঁহার উচ্চারিত সামান্য বাক্যও কণ্ঠে কণ্ঠে সংগৃহীত ও ধ্বনিত হয়, তাঁহার প্রতিটি নির্দেশ ও বাণীকে রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা আপ্তবাক্যতুল্য জ্ঞান করে, তিনি পথে বাহির হইলে তাঁহার

দর্শনলাভমানসে অসূর্যম্পশ্যা কুলবালা কুলবধূগণ উন্মুক্ত রাজপথে দৃশ্যমানা হন, রাজ্যের সকল শিশু স্বতঃ তাঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে।

ভ্রাতা ও রাজন্যবর্গকে যুধিষ্ঠির বিশেষ বিশেষ কর্তব্যে নিযুক্ত করিলেন। পররাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব স্থাপন ও রক্ষা করিতে হইলে বহুদর্শী ও বহুভাষী হইতে হয়, অতএব সে কর্তব্যটি তিনি স্বীয় স্কন্ধেই ন্যস্ত রাখিলেন। ভীমবল ভীমসেন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন, মন্ত্রণাসভায় স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পরেই তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইল। অর্জুন ও তাঁহার বিকল্পে শ্রীকৃষ্ণ, সেনাবাহিনীর ভার প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বরাজন্যসভায় কোন দৌত্য বা আলোচনা আবশ্যক হইলে তাহার ভারও শ্রীকৃষ্ণের উপরে অর্পিত হইল—বাগ্মিতায় ও বাক্-কৌশলে তাঁহার তুল্য আর কেহই ছিল না।

সর্বভূতে সমদর্শী যুধিষ্ঠির ঘোষণা করিলেন, তাঁহার রাজ্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, তুল্য যোগ্যতাশালী সকলেই তুল্য মর্যাদার অধিকারী হইবে। অভিজাত ও অনভিজাতের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সামাজিক মর্যাদা-বিভেদ হ্রাস পাইল। জাতি, ধর্ম, ভাষা বা প্রদেশ-ভেদে আদর-ভেদ লুপ্ত হইল। সকলেই সমান, সকলেই তুল্যাধিকারী। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অব্যাহত হইল। প্রত্যেকের আনন্দ-উৎসবে ও অনুষ্ঠানে যাহাতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য স্থির হইল, প্রত্যেকের প্রতি পর্বদিনে সমগ্র প্রজা ও রাজপুরুষগণ কর্ম-বিরতি উপভোগ করিবেন। ভাদ্রপদের কৃষ্ণা-অষ্টমী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকও ওই তিথিতেই হইয়াছিল। অতএব প্রতি বৎসর উক্ত তিথিটি সর্বজনীন জাতীয় উৎসব ও সমারোহ-দিবস বলিয়া গণ্য হইল। যুধিষ্ঠিরের শাসন-প্রতিষ্ঠা, আগামীকালের দেশবাসীর নিরাপদ জীবন ও সমৃদ্ধির সূচনাস্বরূপ ; অতএব তাঁহার নিজস্ব জন্মতিথিটি রাজ্যের সর্বত্র শিশু-মহোৎসবের দিন বলিয়া ধার্য হইল।

এবংবিধ ভূয়িষ্ঠ সদ্বিধান প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইল। তাহারা সকলে একবাক্যে কহিল, ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের পরে আর কোন রাজা এরূপ সুশাসক ও সুখ্যাত হন নাই। জম্বুদ্বীপে রামরাজ্যের পুনরাবির্ভাব হইল বলিয়া তাহারা আনন্দে অধীর হইল। তাহারা জানিত না রামরাজত্বে একাধিপত্য ছিল রামচরণাশ্রিত বানর-সেনার।

রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের অবসানে ভীমসেন নিবেদন করিলেন, তিনি কর্ম হইতে অবসর চাহেন, তীর্থযাত্রা করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ, কেন তোমার এই অকাল নির্বেদ? আমি কি কোন কারণে তোমার অপ্রীতি বা অপ্রত্যয়ের ভাজন হইয়াছি?

ভীমসেন দুই কর্ণ স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, এরূপ উক্তি শ্রবণ করাও পাপ। আপনার সমালোচনা আমার দ্বারা সম্ভবে না, এবং আপনার চরিত্রও ত্রুটি-বিচারের অতীত। আমি অব্যাহতি চাহিতেছি, কারণ এই নিষ্কর্ম কর্মজীবন আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি আজন্ম যোদ্ধা, ভীষণ রণক্ষেত্রে ভীষণ গদা স্কন্ধে বিচরণ করাকেই চিরদিন সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। এই সুখরাজ্যে সর্বত্র শান্তি ; আপনি নিরপেক্ষ সর্বাঙ্গীণ শান্তির উদ্গাতা। এই নীতি সর্বথা প্রশংসনীয়, কিন্তু আমার পক্ষে ইহা দুষ্পাচ্য। রণক্ষেত্রের পরিবর্তে গৃহকোণে, গদার পরিবর্তে লেখনী সঞ্চালন করিয়া আমার দিন কাটিতেছে। ব্যায়ামাভাবে আমার বাহু শীর্ণ ও কটিদেশ ক্ষীণ হইতেছে। আমি বৃকোদর, দ্রুত বৃষোদরে পরিণত হইতেছি। রণ-হুঙ্কারের পরিবর্তে জৃম্ভনধ্বনি মাত্র আমার কণ্ঠে নির্গত হইতেছে। এই অবস্থা অসহনীয়!

কেন? এই সেদিন-মাত্র তুমি বিদ্রোহী হয়-দ্রবপতিকে পরাভূত করিয়াছ, তাহার অতি-তেজস্বী সেনাপতি রেজভীঃকে নির্জিত ও বন্দী করিয়াছ।

ওই একটিমাত্র। গণ্ডূষমাত্র সকৃৎপানে কি অগস্ত্যের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়? তাহাতে তৃষ্ণার

বৃদ্ধিমাত্র। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না। যতদিন আমার প্রয়োজন ছিল, আমি নির্বিচারে কর্তব্য পালন করিয়াছি। এই সুখরাজ্যে আমি অর্থহীন। আমি যুদ্ধ জানি, সুখশয্যা চিনি না। আমার নয়নদ্বয় নিশাজাগরণক্লান্ত, আমার মধ্যদেশ বাতবেদনা-কাতর। দয়া করুন, এই আলস-শয়ন হইতে আমাকে মুক্তি দিন।

যুধিষ্ঠিরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সস্নেহে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন, তোমার ব্যথা আমি বুঝিয়াছি। বেশ, বল, কি তোমার অভিপ্রায়?

ভীম কহিলেন, আমার নিকট হইতে এই কর্মভার ফিরাইয়া লউন। আমি নিরুদ্দেশ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইব।

কোথায় যাইবে?

তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তীর্থে তীর্থে কিছুদিন ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প আছে, হয়তো দেশান্তরেও যাইব। আর, এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া যদি পরিতৃপ্ত না হই, হয়তো স্বেচ্ছায় যমপুরীর পথেই চলিয়া যাইব।

সে কি কথা! না না, তাহা যাইও না। আমরা সকলে এইখানে রহিলাম, তুমি একাকী যমালয়ে যাইবে কি!

গেলামই বা। বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে, বহুবার বহু যাত্রায় আমি অগ্রগামী হইয়াছি। পূর্বগামী সেনাস্বরূপ আমি গিয়া নবতর দেশ আবিষ্কার করিয়াছি, নিষ্কন্টক করিয়াছি, আপনারা পরে গিয়া তথায় নির্বিঘ্নে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। হিড়িম্ব, বক প্রভৃতি রাক্ষসবৃন্দ এইরূপেই নিহত হইয়াছিল। তাহারই না হয় পুনরাবৃত্তি হইবে—আমি অগ্রে যমলোকে পৌঁছিয়া আপনাদিগের জন্য স্থান রচনা করিয়া রাখিব। আর বাধা দিবেন না, আমাকে বিদায় দিন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন, সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, দিলাম।

ভীমকর্মা ভীমসেন রাজসভা হইতে অবসৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে প্রতিবেশী নবসৃষ্ট ম্লেচ্ছরাজ্য, ও রাজ্যমধ্যস্থ অনার্য-প্রদেশে মহা উৎসব পড়িয়া গেল। স্নিগ্ধ-প্রকৃতি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে একমাত্র ভীমসেনকেই তাহারা ভয় করিত।

দীর্ঘ দশবৎসর কাল যুধিষ্ঠির নিষ্ঠাভরে রাজ্যপালন করিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির আগমন ও সমাবেশের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাদিগের শিল্প-কৌশলে দেশের সর্বত্র বৃহৎ বৃহৎ কর্মশালা ও শক্তিসঞ্চারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সর্বক্ষেত্রে নবীনতর কর্মোদ্যম ও সমৃদ্ধির সূচনা দেখা যাইতে লাগিল।

একাদশ বর্ষের প্রান্তে পৌঁছিয়া যুধিষ্ঠির ক্লান্তি অনুভব করিলেন। প্রজাবর্গ একান্তভাবে তাঁহারই মুখাপেক্ষী, অমাত্যবর্গ সমস্ত কার্যে কেবল তাঁহারই নির্দেশ চাহিয়া বসিয়া থাকেন। একা তিনি কত পারিবেন? ধর্মপুত্র, তথাপি তিনি মানবী-সন্তান। প্রথম বয়সে সুখ-লালিত রাজপুত্র, মধ্যবয়সে বনবাসে ও রণক্ষেত্রে নানাবিধ অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্র বহন করিয়াছেন, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার সে উদ্যমের গতি স্তিমিত হইয়া আসিল। গণনা করিয়া দেখিলেন, বয়স সপ্ততির রেখা স্পর্শ করিয়াছে।

তখন তিনি একদিন ভ্রাতা ও অমাত্যবর্গকে একত্র আহ্বান করিলেন। কহিলেন, আমি কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করিতেছি, অবসর গ্রহণ করিতে চাহি। তোমরা আমার কার্যভার গ্রহণ কর।

তাঁহারা সমস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, আপনি কি দোষে আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমাদের দোষ নাই। আমিই ক্লান্ত, জরায় আক্রান্ত। শক্তির অবসানেও দুর্বল হস্তে দণ্ডধারণ করিয়া থাকার অর্থ হয় না, তাহাতে রাজ্যের হানি। আমি কিছুই ত্যাগ করিতেছি না, কিঞ্চিৎ অবসর মাত্র চাহিতেছি। আর এই অবসরও চিরদিনের

জন্য নহে, সাময়িক মাত্র। বিশ্রামান্তে পুনরায় তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব, পুনরায় কর্মভার স্বীকার করিব। আমি এই জাতির সেবক, চিরদিন তাহাই থাকিব।

ভ্রাতারা তর্ক করিলেন না। দেবী দ্রৌপদীও সম্মতি দিলেন। কিন্তু অমাত্য ও রাজপুরুষগণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যুধিষ্ঠির না থাকিলে তাঁহাদিগের সমূহ প্রমাদ। যুধিষ্ঠির নিরতিশয় স্নিগ্ধস্বভাব ও ক্ষমাশীল। প্রকাণ্ড-পরিমাণ অন্যায় বা কর্মে অবহেলা করিলেও তিনি মৃদু-ভর্ৎসনার অধিক দণ্ডবিধান করেন না; তাহাও করেন অতি সসংকোচে—যেন তিনি স্বয়ংই অপরাধী। এমন মৃদু বিচার, অন্যায় ও কর্তব্যহানির এমন নির্বিচার ক্ষমা, আর কাহার নিকটে মিলিবে? আর কে আছেন, যিনি সমস্ত অপবাদ অভিযোগ নিজে স্বীকার করিয়া লইবেন তথাপি আশ্রিত অনুচরদিগকে সর্ববিধ শাস্তি ও নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবেন? হায়, যুধিষ্ঠির না থাকিলে এত সুখের রামরাজত্বেরও এইখানেই ইতি!

পূর্ণ সপ্তাহকাল যাবৎ উভয়পক্ষে বিতর্ক ও মিনতি বাক্যের স্রোত বহিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির বারংবার করুণকণ্ঠে কহিলেন, আমার অবস্থাটা বুঝুন, আমাকে কি মারিয়া ফেলিবেন?

রাজপুরুষগণ ততোধিক করুণকণ্ঠে কহিলেন, তবে আপনিই আমাদিগকে মারিয়া ফেলুন। আপনি যদি না থাকেন, তবে আমরা আর কয়দিন।

এই অশ্রুবর্ষণের প্রতিযোগিতায় অবশেষে তাঁহারাই জয়ী হইলেন, কারণ তাঁহারা বহু, যুধিষ্ঠির একক। তাঁহাদিগের অগণিত নয়নের অজস্র অশ্রুপ্লাবনে একাকী যুধিষ্ঠিরের দুইটি মাত্র নয়নের দুইটি মাত্র অশ্রুবিন্দু কোথায় ভাসিয়া গেল। যুধিষ্ঠির তর্কে ভঙ্গ দিলেন। সম্ভবতঃ ইহাদিগের ক্রমাগত ও নিয়মিত স্তববাক্যে মোহিত হইয়াছিলেন। কহিলেন, বেশ, যাইব না।

তখন সেই রাজপুরুষগণ কহিলেন, কিন্তু আপনি শ্রান্ত, এ কথাটি অবিস্মরণীয়। আপনি আমাদিগের উপরোধ রক্ষা করিয়াছেন, আমরাও আপনার আবেদনপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিব। ক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যুধিষ্ঠিরকে দুই মাস কালের জন্য বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হইবে। হিমালয়পৃষ্ঠে স্বনির্ঝর মন্দাকিনী-কুলুকুলিত স্নিগ্ধ উপত্যকাভূমিতে তিনি বিশ্রামার্থে গমন করিবেন, তথায় পর্বতপৃষ্ঠের নির্মল বনশোভা ও রাষ্ট্র-কচালানভিজ্ঞ সরলচিত্ত পর্বতবাসীদিগের সাহচর্যে মনের ক্লান্তি অপনোদন করিবেন, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অমাত্য ও সচিববর্গ সেই স্থলে তাঁহার নিকটে নির্দেশ প্রার্থনা করিতে যাইবেন। অথবা হয়তো তিনিই মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনবোধে মর্তভূমিতে অবতরণ করিবেন।

উপত্যকাভূমিতে সর্বসুখপ্রদ গৃহ নির্মিত হইল। যুধিষ্ঠির মহা সমারোহে তথায় উপনীত হইলেন। দুই মাসকাল তিনি সেই গৃহে বাস করিলেন। সেই সময়ের মধ্যে বহু সচিব ও রাজপুরুষ বহু সূত্রে তাঁহার সহিত পরামর্শ বা নির্দেশ প্রার্থনা ব্যপদেশে বিনাব্যয়ে হিমালয়ভ্রমণ সারিয়া লইলেন। একাধিকবার তাঁহাকেও পর্বতবাস হইতে নিম্নভূমিতে ছুটিয়া আসিতে হইল। বিশ্রাম-বিহীন বিশ্রাম ভোগের অন্তে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই বিশ্রাম-ছলনার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ক্লান্তিভার কতদূর অপনোদিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অন্যের অসাধ্য। কিন্তু এই ঘটনা হইতে পরবর্তীকালে বহুতর অনিষ্টের সূত্রপাত হইল।

যুধিষ্ঠির সর্বত্র সমাদৃত; তাঁহার প্রকৃতির জন্যও বটে, নীতির জন্যও বটে, সকলের সম্মাননীয়। তিনি সকলকেই মিত্রজ্ঞান করেন, কাহাকেও বৈরনেত্রে দেখেন না, আঘাত পাইয়াও প্রত্যাঘাত করেন না। পরস্পর মর্মান্তিক বৈরভাবাপন্ন রাজগণও প্রত্যেকে এককভাবে যুধিষ্ঠিরের বন্ধু বলিয়া গণ্য। তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বৈর কেহ করিতে চাহিলে

সে ব্যক্তি জগৎসমক্ষে স্বতঃই ধিকৃত হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় এযাবৎ কেহ তাঁহার বা তাঁহার রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করে নাই।

কিন্তু তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন, কর্মভার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, এই বার্তা বিদ্যুদ্বেগে দিগ্বিদিকে প্রচারিত হইল। রাজ্যের বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে সকল অনিষ্টবুদ্ধি এতকাল বিপদের ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিল, তাহারা অকস্মাৎ উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রতীরে অবস্থিত কেবল রাজ্যে অন্তর্দ্রোহ দেখা দিল।

তথাকার অমাত্যমণ্ডলী প্রজাবর্গের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কর্মনীতি সর্বাংশে যুধিষ্ঠিরের মনঃপূত নহে, তথাপি প্রজাগণের ইচ্ছানুক্রমে তিনি তাঁহাদিগের পদাভিষেক স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অমাত্যগণও রাজ্যশাসনে নানাবিধ নূতন প্রণালী ও সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রজাবর্গ অকস্মাৎ সেই অমাত্যমণ্ডলীর কার্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অমাত্যগণ কহিলেন, তাঁহাদিগের বিরোধীপক্ষগণই কৌশলে প্রজাকে উত্তেজিত করিতেছে। তাঁহারা দ্রোহ দমনের চেষ্টা করিলেন, ফলে বিসংবাদ আরও বৃদ্ধি পাইল।

রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্যোগ যখন তীব্র হইল, যুধিষ্ঠির তৎপর হইয়া প্রজাবর্গের নিকটে এক বাণী প্রেরণ করিলেন। বলিলেন, এই অমাত্যবর্গ তোমাদেরই দ্বারা নির্বাচিত। তোমরা যদি ইহাদিগকে না চাহ, কাহাকে চাহ, বল। প্রজারা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে তৃপ্ত হইল, তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণকে একবাক্যে নূতন অমাত্য বলিয়া নির্বাচন করিয়া লইল। যুধিষ্ঠিরের নামের প্রভাব তখনও এইরূপ প্রবল ছিল।

পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে নবগঠিত ম্লেচ্ছরাজ্য। তাহারা ক্রমাগত সীমান্তপ্রদেশ আক্রমণ করিত, নানাবিধ উপদ্রব সৃষ্টি করিত। ম্লেচ্ছদিগের জন্য পৃথক রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় স্বরাজ্যকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে উভয়পক্ষই প্রজাবর্গকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অতঃপর ম্লেচ্ছভূমি হইতে সমস্ত আর্যসন্তানকে আর্যভূমিতে লইয়া আসা হইবে, আর্যরাজ্যে অবস্থিত সকল ম্লেচ্ছ তাহাদিগের নিজস্ব রাজ্যে চলিয়া যাইবে, পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী জনগণ নিয়ত একত্র বাস করিবার ফলে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি এতাবৎকাল হইতেছিল, তাহা নিরাকৃত হইবে, এই আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই কলহক্লান্ত আর্যগণ দেশবিভাগে সম্মত হইয়াছিল।

ম্লেচ্ছগণ নানাবিধ বলে ও কৌশলে তত্রত্য আর্যসন্তানগণকে বিপর্যস্ত ও বিতাড়িত করিতে লাগিল, তাহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতভূমিতে আসিয়া আশ্রয়ভিক্ষু হইল; কোনমতে ভিক্ষামুষ্টি দান করিয়া যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিলেন, এবং ক্রমশঃ রাজ্যের সর্বত্র ইহাদিগকে ভূমি ও কর্ম দিয়া শনৈঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। আর্যভূমিতে অবস্থিত ম্লেচ্ছগণ কিন্তু যে যেমন ছিল রহিয়া গেল, তাহাদিগকে বিতাড়নের কোন উদ্যমই যুধিষ্ঠির করিলেন না। বিভেদনির্বিশেষে সমদর্শন ও প্রজাপালনই তাঁহার রাজধর্ম ছিল। ইহাতে ম্লেচ্ছগণ আশ্বস্ত, আর্যদিগের একাংশ অসন্তুষ্ট এবং ম্লেচ্ছরাজ্যের আর্যদ্বেষী শাসকবৃন্দ উল্লসিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, আঘাত করিলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে প্রত্যাঘাত করিবেন না। অতএব ম্লেচ্ছসেনা ক্রমশঃ রাজ্যের সীমান্তদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির কখনও বা শান্তির প্রার্থনাবাণী প্রচার করিয়া ক্ষুব্ধ প্রজাকে শান্ত রাখিলেন, কখনও ম্লেচ্ছদিগের অধিকৃত বা প্রদাবিত ভূমিখণ্ড ও গ্রাম তাহাদিগকেই ছাড়িয়া দিয়া বৃহত্তর আক্রমণের সম্ভাবনাকে কথঞ্চিৎ ঠেকাইয়া রাখিলেন। এই মহত্ত্বের মূল্য ম্লেচ্ছরা বুঝিল না: তাহারা সাক্ষাতে তাঁহাকে মহানুভব বলিয়া স্তুতি করিত। কার্যোদ্ধার করিত, স্বগৃহে বসিয়া

তাঁহাকে বৃহন্নলাগ্রজ নামে আখ্যাত করিত।

এই ব্যাপার প্রথমাবধিই চলিতেছিল, কখনও মন্দবেগে কখনও বা তীব্রতর গতিতে। এক্ষণে, যুধিষ্ঠিরের বৈকল্য-স্বীকৃতির পর হইতে ম্লেচ্ছদিগের বিক্রম বাড়িল। সীমান্তরেখা ও সীমান্ত-চুক্তি বারংবার ও বিনা দ্বিধায় লঙ্ঘিত হইতে লাগিল।

উত্তর দেশে, হিমালয়ের পরপারে খর্বনাসা ও তির্যকদর্শী চৈনিক জাতির বাস। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষে তাহাদিগের রাষ্ট্রপ্রধান যুধিষ্ঠিরের সহিত মৈত্রীকামনায় জম্বুদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন, উভয় রাষ্ট্রপতির ও উভয় রাষ্ট্রের গভীর সম্প্রীতি ও নীতিসাম্যের বহুল প্রমাণ সাড়ম্বরে নিখিল বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের হিমালয়-প্রবাসের বিবরণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, চীনদেশেও সে বার্তা পৌঁছিয়াছিল। অচিরাৎ একদিন সংবাদ আসিল, চৈনিক সেনা হিমালয়-গিরিবর্ত্ম পার হইয়া ভারতের সীমান্তরেখা লঙ্ঘন করিয়াছে, দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং আরও ভূয়িষ্ঠতর ভূভাগ সহ সমগ্র হিমালয়-গিরিপ্রদেশকে তাহাদিগের রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই সংবাদে ভারতের জনতা উদ্বেল হইয়া উঠিল। স্বীয় দেশের অঙ্গহানি কেহই স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতে চাহে না। ম্লেচ্ছরাজ্যের জন্য বিস্তীর্ণ দেশখণ্ড ছাড়িয়া দিয়াও বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায় নাই। চীন-প্রধান অল্পদিন মাত্র পূর্বে এই রাজ্যে ভ্রমণ এবং বহুবিধ ভাষা ও ভঙ্গীসহকারে মৈত্রী-বাক্য বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার এই আকস্মিক রূপ-পরিবর্তনকে একান্তরূপেই লবণ-স্বাদ-বিস্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। এই অকৃতজ্ঞতা ও মিথ্যাচরণে ভারতের জনতা বিক্ষুব্ধ হইল। অপিচ, আর্যজাতি নাসা-গৌরবদীপ্ত; খর্বনাসা চৈনিকগণ এমন অবলীলাক্রমে তাহাদিগের নাসা মর্দন করিয়া দিল, এই চিন্তা তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে তাহাদিগকে শান্ত রাখিলেন, স্বয়ং উপযাচক হইয়া চীনাধিপতির সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন। কহিলেন, যুদ্ধে কি ফল। যুদ্ধ করিয়া কি হয় তাহা তো কুরুক্ষেত্রেই সম্যক্ দেখিয়াছি। কুরুক্ষেত্রের পূর্বে আমি আলাপ আলোচনা দ্বারা কলহের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলাম। দুর্যোধন তাহাতে স্বীকৃত হইলে এমন করিয়া কৌরবের বংশনাশ হইত না। যুদ্ধে কাজ নাই, আসুন মীমাংসা করি; আপনারা কতটুকু চাহেন?

চীনাধিপতি পুনঃপুনঃ পত্রালাপে ও বিলম্বিত সাক্ষাৎকারে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অসহায় যুধিষ্ঠির তাহাতেই স্বস্তিবোধ করিলেন। ইতিমধ্যে চৈনিক সেনা তাহাদিগের অধিকৃত অঞ্চলে সমর-সম্ভার-বহনক্ষম বৃহৎ বর্ত্ম নির্মাণ করিতে লাগিল, রণসম্ভার-ভাণ্ডার ও দুর্গ নির্মাণ করিতে লাগিল, যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরও হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ইহার উত্তরে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রেমপ্রমাদপূর্ণ প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

এই সকল ব্যাপারে রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা ক্রমশঃ শিথিল হইল। ইহার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজ্যরক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া রাজপদ পরিত্যাগ করেন ও স্বর্গপ্রবেশকামনায় হিমালয়ের পথে মহাপ্রস্থান করেন। সে কাহিনী ব্যাসদেব স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বশে ভারতের সমস্ত প্রদেশ একত্র গ্রথিত ছিল তাহার মূলসূত্র ছিন্ন হইল। এবং তাহার ফলে একীকৃত ভারতভূমি অচিরাৎ শতধা বিদীর্ণ ও বহুসংখ্যক পরস্পর-বিদ্বেষী ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ব্যাসদেব সে দুঃখের কাহিনী প্রাণ ধরিয়া বিবৃত করিতে পারেন নাই, তাই মহাপ্রস্থান বর্ণনার দ্বারাই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহার সহস্র বর্ষ পরে, পাশ্চাত্ত্য ম্লেচ্ছজাতির

শাসনে ভারতভূমি পুনরায় একত্র গ্রথিত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের শাসনকালের দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত আমরা বর্ণনা করিয়াছি। ত্রয়োদশ বর্ষের একটি বৃহৎ ঘটনার বিবরণ দ্বারা এই কাহিনী সমাপ্ত করিব।

ম্লেচ্ছ ও চৈনিক জাতির সহিত যে সংঘাত, তাহা বৈদেশিক। তাহাতে পীড়া জন্মে, কিন্তু আত্মঘাত হয় না। বরং বহিঃস্থ শত্রুর উপস্থিতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও আন্তরিক সংহতিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া তুলে। এইজনাই এই সকল বিসংবাদ দুখঃদায়ক হইলেও মর্মান্তিক বা সর্বথা মারাত্মক হয় না।

কিন্তু ত্রয়োদশ বর্ষের শেষভাগে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে দেশের অভ্যান্তরেই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ পাণ্ডবসাম্রাজ্যের বিচ্ছেদ ও ধ্বংসের বীজ সেইখানেই উপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বহুতত্ত্বদর্শীর ধারণা।

জম্বুদ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গদেশ। পূর্ব-উত্তর প্রান্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। পর্বতকীর্ণ উচ্চাবচ দেশ বলিয়া ইহাকে অসমভূমিও বলা হইত।

উদ্যোগপর্বে, যখন পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষ সর্বত্র মিত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, বঙ্গ-দেশ স্বতঃ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষও হয়তো করিত। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহার মৈত্রী যাচ্ঞা করিলেন না। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নিরতিশয় হীনরুচি ও ক্রূরকর্মা বলিয়া বর্ণিত ছিলেন। তাঁহার দুর্নাম-শ্রবণে যুধিষ্ঠির সন্ত্রস্ত হইলেন। এরূপ ব্যক্তি তাঁহার মিত্র বলিয়া পরিচিত হইলে, তাঁহার সে দুর্নাম ও তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত অনুচিত কর্মের দায়িত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিবে। অপিচ, প্রকৃতি-ক্রূরকে নিছক সন্ধির শর্ত বা হিতোপদেশ দ্বারা অনভ্যস্ত সৌজন্যের পথে চালিত করা সম্ভব নহে। কোথায় কখন কোন্ ছলে তাহার প্রকৃতিগত নীচতা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে স্থির নাই। এইসকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষের মৈত্রী তিনি কামনা করিবেন না। প্রস্তাব সাধু। কিন্তু সেই আক্রোশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত স্বেচ্ছায় কৌরবপক্ষ আশ্রয় করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে ভগদত্ত অসীম শৌর্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বাহন মহাহস্তীর সহিত যুদ্ধে স্বয়ং ভীমসেন পর্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য পর্যুদস্ত হইলেন, এবং তাঁহার ষষ্টিসংখ্যক হস্তিবাহিত রথের তাড়নে অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য নিহত হইল। অবশেষে অর্জুনের অস্ত্রে স-হস্তী ভগদত্ত নিহত হইলেন।

যুদ্ধান্তে বিজিত-রাজক প্রাগ্‌জ্যোতিষ যথারীতি পাণ্ডবের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। যুধিষ্ঠির সুষ্ঠু শাসন-মানসে শ্রীনাগেশ-নামক মহাবল ও রণকুশল রাজপুত্রকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের শাসকপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রাজত্বের নবম বর্ষে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্বপ্রান্তস্থিত পার্বত্য নাগভূমি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইল। নাগজাতি অনার্য ও বনবাসী ; অস্ত্রবলে তাহাদিগকে নির্জিত করা অর্জুনাদি বীরগণের পক্ষে আদৌ কঠিন ছিল না। কিন্তু কোমলপ্রকৃতি যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ক্ষমাধর্মী, তাঁহার ক্ষমা-প্রধান নির্দেশে বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত সেনা নিয়ত সংবৃতায়ুধ হইয়া চলিতে বাধ্য হইল। শেষ পর্যন্ত নাগভূমিকে সাম্রাজ্যের অভ্যান্তরস্থ স্বশাসিত অঞ্চল বলিয়া স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠির যুদ্ধের অবসান করিলেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের শেষভাগে এই সন্ধি স্থাপিত হইল।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি নবসৃষ্ট ম্লেচ্ছরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং তদ্দেশবাসী আর্যগণ ক্রমশঃ পিতৃভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া পাণ্ডব-রাজ্যে আশ্রয়ভিক্ষু হইয়াছিল, সে কাহিনী পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের যে অংশ তখনও পাণ্ডবরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা স্বল্পায়তন ও ঊষর। বহিরাগত বিপুলসংখ্যক পূর্ববঙ্গীয়দিগকে স্বচ্ছন্দে ধারণ ও পালন

করিতে পারে, এমত শক্তি তাহার ছিল না।

অপিচ, স্বভূমি হইতে বলাদ্ভ্রষ্ট ও স্বকার্যদ্বারা অর্জিত দুর্দৈবের ভাজন এই পূর্ববঙ্গীয়গণ স্বভাবতঃই অভিমানী ও স্পর্শচেতন হইবে; তাহাদিগকে বহুসংখ্যায় একত্র সমাবিষ্ট হইয়া থাকিতে দেওয়া সুযুক্তি নহে। অতএব যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রেরণ করিতেছিলেন; যেন তাহারা স্বকীয় স্বাজাত্য বিস্মৃত হইয়া উক্ত দেশসকলের সহিত একাত্ম ও ক্রমে তাহার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইরূপে বহু বঙ্গ-দেশীয় উদ্বাস্তু প্রতিবেশী প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত, বহু পূর্বকাল হইতেই বহু বঙ্গবাসী প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে বাসস্থাপন করিয়াছিল; সে দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি-বিধানে তাহাদিগের কৃতিও সামান্য ছিল না।

রাজা, রাজ্যবাসী প্রজার চরিত্রের ও প্রবৃত্তির প্রতীকস্বরূপ। ভগদত্ত ক্রূরকর্মা বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার রাজ্যের প্রজারই চরিত্র তাঁহাতে মূর্তিমান হইয়াছিল। তাহারা পার্বত্যজাতি, কঠিন ও পরুষ আচরণে অভ্যস্ত, এবং প্রস্তরময়ী ভূমির প্রস্তরনিভ স্তন্যে লালিত বলিয়া বুদ্ধিতে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রস্তরতুল্য। যুদ্ধান্তে বিজয়ী যুধিষ্ঠিরের নিকটে তাহারা অগত্যা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাঁহার শাসন ও তাঁহার নীতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ সে নীতিকে তাহারা অন্তরে গ্রহণ করে নাই। উপলাশী উষ্ট্র-পক্ষী কোমল মাখনপিণ্ড গিলিতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের সাম্যনীতি অসমভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না।

পাণ্ডবগণ কর্তৃক ভগদত্ত প্রথমে অবজ্ঞাত ও পরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডবগণের প্রতি বিমুখ ছিল, সে বিমুখতা ক্রমশঃ সমগ্র আর্যসমাজের প্রতিই বিস্তৃত হইয়াছিল। পাণ্ডব শাসিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগদত্তবংশীয় অভিজাতগণ প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ও আর্য-বিদ্বেষী হইয়া রহি~। বাহ্যতঃ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, অন্তরে তাঁহার শাসনকে উপেক্ষা করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। নাগজাতির বিদ্রোহলব্ধ জয়ধ্বনি তাহাদিগের চিত্তে উৎসাহসঞ্চার করিল।

যুধিষ্ঠির বহু বঙ্গীয়কে প্রাগ্‌জ্যোতিষে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রাগ্‌জ্যোতিষ-বাসীদিগের মনঃপূত হয় নাই। অতর্কিতে একদা তাহারা বলহীন ও সহায়হীন বঙ্গীয়দিগের উপরে আপতিত হইল। তাহাদিগের গৃহ ও কুটির অগ্নিদগ্ধ করিল, রুদ্রমূর্তিতে সংহার ও প্রহার করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট কবিল। লুণ্ঠিত ও আহত পলাতকের আর্তনাদে অনাথ শিশু ও ধর্ষিতা নারীর ক্রন্দনে প্রাগ্‌জ্যোতিষের আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হইল। নিরীহ মানবের সেই শান্তির রাজ্যকে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করিয়া স্ব-সৃষ্ট শ্মশানচারী প্রেততুল্য ভগদত্ত-বংশীয়গণ তাণ্ডব-নর্তনে মত্ত হইল। দগ্ধগৃহ ধেনু রক্তাভ মেঘদর্শনে ভীত হয়। বঙ্গীয়গণ একবার পিতৃপুরুষগত জন্মভূমি হইতে বিনা অপরাধে ও বিনা অবসরে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছে। পুনরায় অবিকল তদনুরূপ ধ্বংস ও বিতাড়ন-মহোৎসবের আবির্ভাবে তাহারা বিহ্বল হইয়া গেল; এই আতিথ্যবিমুখ দেশ ত্যাগ করিয়া আশ্রয়লাভ মানসে পুনরায় তাহারা পশ্চিমবঙ্গদেশাভিমুখে পলায়নপর হইল। পিতা পুত্রকে, পুত্র মাতাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল, পশুবৎ কামোন্মত্ত জনতার হস্তে স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ভাগ্যদোষে বুদ্ধিভ্রংশ হয়; মনুষ্যত্ব পুরুষত্বাদি সকল বৃত্তিই মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে।

কিন্তু পলাইতে চাহিয়াও তাহারা যথেচ্ছ পলাইতে পারিল না। উন্মত্ত জনতা তাহাদিগের পথ রুদ্ধ করিল, শকট ও যান ভগ্ন করিল, নিঃসহায় নির্বান্ধব নির্বীর্য পলাতকদিগকে অমানুষিক নির্যাতন করিয়া পৈশাচিক আনন্দ ও উল্লাসে অধীর হইল। একাধিক বর্ষকাল ব্যাপিয়া নিঃশব্দ প্রস্তুতি ও আয়োজনের পরে অকস্মাৎ এই কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতর্কিত ও প্রচণ্ড আঘাতে নিঃসহায় বলহীন আর্যগণ বিহ্বল হইয়া পড়িল। হিতাহিত

জ্ঞানরহিত হইয়া তাহারা প্রাণ ও সম্ভ্রমরক্ষার্থে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। আর্যজাতি প্রাণ অপেক্ষাও নারীর সম্ভ্রমকে মূল্যবান জ্ঞান করিত। দুষ্কৃতকারীগণ নারীধর্ষণেই বিশেষ উৎসাহ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছিল। আর্য নারীর রূপ ও সংস্কৃতি-গৌরব বিখ্যাত ছিল, তাহারা সভ্য, শিক্ষিত ও মার্জিত। তাহাদিগের সম্বন্ধে কতিপয় প্রাগ্‌জ্যোতিষগণের মনে চিরদিনই একটা পাশব লোলুপতা ছিল। কিন্তু সে লোলুপতা এতকাল দূরতঃ লালাস্রাবেই পর্যবসিত থাকিত, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া তাহারা সর্বপ্রকার সংযম ও শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিল। বালিকা হইতে বৃদ্ধা, কেহই তাহাদিগের পশুচিত উন্মত্ততার হস্তে অব্যাহতি পাইল না।

সমগ্র রাজ্যে আর্যজাতীয়গণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেকে নিহত আহত ও অন্যথা বিধ্বস্ত হইল, অনেকে পলায়নপর হইল, অনেকে পশুধর্মী মানবের হস্তে পতন অপেক্ষা বন্যজন্তুর সহবাস শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়া অরণ্যে পর্বতে আত্মগোপন করিল। যাহারা পারিল না তাহারা প্রতিমুহূর্তে প্রাণসংশয় বা ততোধিক লাঞ্ছনা গণনা করিয়া কম্পিত কলেবরে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল।

আহত ও অনাহত পলাতক আর্যগণ ক্রমশঃ বঙ্গদেশে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইল। তাহাদিগের দুর্দশা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বঙ্গবাসী জনগণ বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইল, ইহার নিরাকরণ ও প্রতিবিধান চাহিয়া তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষস্থিত রাজপুরুষ ও রক্ষী-বাহিনী উৎপীড়িতদিগকে রক্ষা করিতে আদৌ প্রয়াসী হয় নাই ; বরং শরণার্থীদিগকে অবজ্ঞা ও উপহাসে জর্জরিত করিয়াছে ; বহুক্ষেত্রে তাহারা স্বয়ং দুষ্কৃতকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া লুণ্ঠন ও ধর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রয়োজনবোধে স্বাস্থ্য ও শক্তিমান আর্য পুরুষগণকেই ধৃত ও অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে— যেন দুষ্কৃতকারীগণ তাহাদিগের সম্পত্তি ও স্ত্রীগণের প্রতি অবাধে যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারে, এরূপ কাহিনীও শ্রুত হইল। বঙ্গদেশীয় জনতা, বঙ্গদেশীয় রাজপুরুষগণ রুদ্ধরোষে অধীর হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কিছু করিবার শক্তি ছিল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষ পৃথক রাজ্যখণ্ড। সাম্রাজ্যের সংবিধান অনুসারে, তথায় শান্তি স্থাপনের বা বিপন্ন উদ্ধারের জন্য স্বকীয় সেনা বা শান্তিরক্ষক প্রেরণের অধিকার বঙ্গদেশের ছিল না। তাঁহারা কেবল যথাশক্তি প্রয়াস করিয়া আগত শরণার্থীদিগকে শুশ্রূষা ও গুড়-চিপিটকাদি আহার্য দ্বারা কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখিলেন। যাহারা তখনও দুর্বৃত্ত-কবকবলিত তাহাদিগকে রক্ষা বা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

তখন অন্য উপায় না পাইয়া, বঙ্গদেশীয় জনতা ও বঙ্গদেশীয় শাসকবৃন্দ, রাজধানী হস্তিনাপুরীতে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বার্তা প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগের প্রার্থনা, যুধিষ্ঠির স্বয়ং উপদ্রুত অঞ্চলে তাঁহার বাহু প্রসারিত করুন, শৃঙ্খলা স্থাপন ও দুর্গতদিগকে নির্ভয় করুন।

বার্তা পাইয়া যুধিষ্ঠির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। নানাবিধ পরস্পরবিরোধী চিন্তা ও সংশয় তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

তাঁহার তৎকালে বয়স একসপ্ততিবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। দেহ জরাক্রান্ত, কেবল মানসিক শক্তিবলে তাহাকে কথঞ্চিৎ কার্যক্ষম রাখিতেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান ভরসাস্থল ছিলেন মহাবল ভীমসেন, তিনি আর নাই। অর্জুন আছেন, কিন্তু তিনি যৌবনধর্মী, সংশয়ক্ষেত্রে সর্বথা নির্ভরযোগ্য নহেন।

এই ঘটনা, ইহা কেবল মামুলীক বিশৃঙ্খলামাত্র নহে। রাজনীতির বহু সূক্ষ্মতর ও জটিলতর প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত। সবিশেষ চিন্তা না করিয়া পদক্ষেপ বিপজ্জনক হইবে।

প্রজার উপরে উৎপীড়ন হইতেছে। উৎপীড়িত প্রজার রক্ষণ অবশ্যই রাজধর্ম। কিন্তু

উৎপীড়িত বঙ্গীয়দিগকে রক্ষা করিবার আশু উপায়, উৎপীড়ক প্রাগ্‌জ্যোতিষদিগের উপরে প্রত্যুৎপীড়ন। তাহাও উৎপীড়নই বটে। প্রথমক্ষেত্রে উৎপীড়ন করিতেছে অন্যে, রাজা নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উৎপীড়ন করিতে হইবে। তাহা প্রজাপালননীতির প্রতিকূল কিনা, সেকথা বিবেচ্য। অপিচ উপদ্রুত বঙ্গীয়গণ সংখ্যায় অল্প, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সংখ্যাবহুল। অল্প-সংখ্যককে রক্ষা করিবার ছলে বৃহত্তর সংখ্যাকে উৎপীড়ন করা বিধেয় কিনা, তাহাও বিবেচ্য। দুইটি অনিষ্ট যখন পরস্পর-বিরোধী হয়, তখন বৃহত্তর অনিষ্টকে এড়াইবার জন্য ক্ষুদ্রতর অনিষ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়াই রাজধর্ম।

কেবল রাজধর্ম নহে, কূটনীতির দিক হইতেও চিন্তা করিতে হইবে। বঙ্গীয়গণ অল্প, দুর্বল। তাহারা রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। রক্ষিত না হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হইবে, হয়তো সম্যক বিনষ্ট হইবে। তাহাতে রাজার অপবাদ বটে। কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও প্রবল। সে দেশ তাহাদিগেরই স্বদেশ। শাসন করিতে গেলে তাহারা রুষ্ট হইবে, তাহাতে সমূহ বিপদের শঙ্কা। ক্ষুদ্রতর অভিযোগ হইতে অব্যাহতির জন্য বৃহত্তর বিপত্তিকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করা সমীচীন নহে। অল্পের জন্য যে বহুকে হারাইতে ইচ্ছুক হয়, সে বিচারমূঢ়, ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি। অতএব, কূটনীতির দিক হইতে বিচার করিলে এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

অথচ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকাও বিপজ্জনক। উৎপীড়িত হতাশ্বাস প্রজা মৃত্যু-নিঃশ্বাসের সহিত অক্ষম বা রক্ষণ-বিমুখ রাজাকে ধিক্কার দিয়া মরিবে। সে ধিক্কার অন্যত্র ব্যাপ্ত হইয়া বহুতর কণ্ঠে বহুশঃ প্রতিধ্বনিত হইবে। তাহাতে দেশে ও বিদেশে সমূহ মর্যাদাহানি। সে সম্ভাবনাকে আহ্বান করা সমীচীন নহে।

বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবশেষে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহার যাবতীয় চিন্তা ও সংশয় নিবেদন করিয়া পরিশেষে কহিলেন, সখে, আমার মনে হইতেছে, তুমি স্বয়ং একবার গিয়া স্বচক্ষে অবস্থা সমীক্ষণ করিয়া আসিলে ভাল হয়। তোমার আহরিত বার্তা ও বিবরণ দৃষ্টে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করা সহজ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, শুনিয়াছি, প্রাগ্‌জ্যোতিষ অতি মনোরম স্থান, তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মুনিজনমনোহারী। আমি কখনও দেখি নাই, এই ব্যপদেশে একবার ভ্রমণ করিয়া আসিতে আপত্তি নাই। সখা অর্জুনকে কি সঙ্গে লইয়া যাইব?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, না। অর্জুন বীর, কিন্তু যুবাপ্রকৃতি,অকস্মাৎ উত্তেজিত হইতে পারে। ক্ষেত্র জটিল, সতর্ক হইয়া পদক্ষেপণ আবশ্যক। সম্যক্ অবস্থা না বুঝিয়া অর্জুনকে সেখানে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। আপাততঃ তুমি একাই যাও।

শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিঃপথে প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপনীত হইলেন, এবং দিবসত্রয় পরিভ্রমণান্তে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে একান্তে লইয়া কহিলেন, কি দেখিলে বল।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্, তোমার বুদ্ধি কুশাগ্র, তোমার দৃষ্টি বহুদূরপ্রসারী। তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ, অকস্মাৎ সে দেশে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

কারণ? তাহারা তো প্রজা?

বঙ্গীয়গণ? অবশ্যই। কিন্তু তাহারা ম্লেচ্ছকিলসেবনাৎ শিলীভূতপৃষ্ঠ ; কিছু কিল নূতন করিয়া খাইলে তাহারা মরিবে না। আর একান্তই যদি মরে, সে ক্ষতি অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, মহামারীতে বা জলোচ্ছ্বাসে মরিলে কি করিতে পারিতাম?

তাহারা দুর্বল, ক্ষুব্ধ হইলেও প্রত্যক্ষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ প্রবল, এবং সাম্রাজ্যের প্রতি সম্যক্ ভক্তিমান নহে। ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা বিশেষ অনিষ্টের হেতু হইতে পারে।

কি প্রকারে?

প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমারেখার এক বিস্তৃত অংশ ম্লেচ্ছরাজ্যের সংলগ্ন। বর্তমান বিশৃঙ্খলা-সাধনে বহুতর ম্লেচ্ছ প্রাগ্‌জ্যোতিষগণের সহকারী হইয়াছিল, ইহার অলঙ্ঘ্য প্রমাণ আমি পাইয়া আসিয়াছি। কঠোর হস্তে শাসন করিতে গেলে প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সে শাসনকে অগ্রাহ্য করিবে বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে কিনা তাহা চিন্তনীয়; এবং বিদ্রোহী প্রাগ্‌জ্যোতিষভূমি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। মনে হয়, এইরূপ আশা মনে লইয়াই ম্লেচ্ছগণও এই কার্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। এই ঘটনা আকস্মিক নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল, এবং বহুদিন ধরিয়া অল্প অল্প করিয়া ক্রমে বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছ প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

সে কি! আর্যসাম্রাজ্য ছাড়িয়া বিধর্মী ম্লেচ্ছদিগের সহিত মিলিত হইবে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের ধর্মজ্ঞান কি এতই লুপ্ত হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ স্মিতমুখে কহিলেন, তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, তুমি যদি প্রয়োজনানুরোধে প্রজারক্ষণরূপ রাজধর্ম বিস্মৃত হইতে পার, তাহারা তো শিক্ষারহিত বর্বর মাত্র।

যুধিষ্ঠির নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন, কেবল ম্লেচ্ছ নহে। দক্ষিণে পশ্চিমে ম্লেচ্ছ, উত্তরে চৈনিক সেনা সীমান্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষে সাম্রাজ্যের বাহু শিথিল হইয়াছে, জানিবামাত্র তাহারা সে দেশকে কবলিত করিতে প্রয়াসী হইবে। ম্লেচ্ছগণ আর্য হইতে ভিন্নধর্মী মাত্র; চৈনিকগণ ধর্মদ্বেষী, নাস্তিক! স্বদেশেও তাহারা সর্ববিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছে। চৈনিক বা ম্লেচ্ছ যদি প্রাগ্‌জ্যোতিষ অধিকার করে ও সাম্রাজ্যের দ্বারদেশে আসিয়া বসে, তাহাদের সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা। অতএব এক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বঙ্গীয়কে অগত্যা বিস্মৃত হওয়াই একমাত্র পন্থা। সমগ্র ভারতভূমির কল্যাণ সর্বাগ্রে চিন্তনীয়, তাহার তুলনা ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের আবেগোচ্ছ্বাস তুচ্ছ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিব।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে গোপন প্রকোষ্ঠে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে।

সভা একান্ত ক্ষুদ্র। পাণ্ডব-ভ্রাতৃচতুষ্টয়, দেবী দ্রৌপদী, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব।

সভার সমক্ষে যুধিষ্ঠির সমস্ত লব্ধ বিবরণ ব্যক্ত করিলেন; এবিষয়ে তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা ও শঙ্কার উদয় হইয়াছে, তাহাও বিবৃত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সংগৃহীত তথ্যাদি নিবেদন করিলেন; কূটনীতির দিক হইতে তিনি যে সিদ্ধান্ত ও নিষ্ক্রিয় কর্মপন্থার পক্ষপাতী, তাহাও সবিশেষ যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করিলেন।

উভয়ের বিবৃতির অবসানে যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ, ভ্রাতৃগণ, দেবী দ্রৌপদী, এ বিষয়ে আপনাদিগের মতামত ও পরামর্শ আমি প্রার্থনা করি।

ধীমান নকুল ও সহদেব একবাক্যে কহিলেন, দেব, আমরা আপনার নিয়ত বশবর্তী। আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই আমাদিগের অভিমত।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস, তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ, জিতধী। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

সতাং হি সন্দেহ-পদেষু বস্তুষু
প্রমাণম্ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ।

অতএব এক্ষেত্রে তোমার আর্য-অন্তর হইতে যে সিদ্ধান্ত স্বতঃ উদ্গত হইবে, তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ও আচরণীয়।

অর্জুন কহিলেন, দেব, আমার একটি নিবেদন। ম্লেচ্ছরাজ্য হইতে বিতাড়িত ও বিস্রস্ত

বঙ্গীয়গণকে আপনিই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরে আপনিই তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষ তাহাদিগের অপরিজ্ঞাত দেশ, তত্রত্য অধিবাসীগণ বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি সম্যক্ বন্ধুভাবাপন্ন না হইতে পারে, এই সংশয় তাহারা তৎকালে ব্যক্ত করিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইতেছে। বলুন, ইহা কি সত্য নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সত্য।

অর্জুন কহিলেন, তাহাদের সেই আশঙ্কা এক্ষণে সত্যে পরিণত হইয়াছে! প্রাগ্জ্যোতিষগণ তাহাদিগকে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে, ছলেবলেকৌশলে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে ব্রতী হইয়াছে। আপনি যে আশ্বাস সেই বঙ্গীয়গণকে দিয়াছিলেন, তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহা কি আপনার রাজমর্যাদারও হানিকর নহে? এবং তাহা যদি হয়, তবে সেই মর্যাদা রক্ষার্থেই কি আমরা বদ্ধপরিকর হইতে, প্রাগ্জ্যোতিষগণকে সম্যক্ শাসন করিতে বাধ্য হইতেছি না?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখে, রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বর্জন করিতে হয়। কূটনীতির অনুরোধে ক্ষুদ্র মর্যাদাবোধকেও প্রায়শঃ বিস্মৃত হইতে হয়।

অর্জুন কহিলেন, হা ধিক্। জরাগ্রস্ত জ্যেষ্ঠ স্বীয় রাজকর্তব্য পালনে সাহসী হইতেছেন না; সেই দুর্বলতাকে কূটনীতির নামে শাকাবৃত করা হইতেছে! ইহা দেখিবার জন্য আমি কেন বাঁচিয়া আছি। হায়, কেন কর্ণের একাঘ্নী-আঘাতে আমার প্রাণ বিনির্গত হইল না। হে কৃষ্ণ, তুমিই না একদা স্বজন-নিধন-পরাঙ্মুখ অর্জুনকে 'ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ বলিয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত করিয়াছিলে?

কৃষ্ণ অম্লানমুখে কহিলেন, করিয়াছিলাম. কারণ তৎকালে তাহাই প্রয়োজন হইয়াছিল। এক্ষণে সেই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ শ্রবণ কর—

'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'।

অর্জুন কহিলেন, তবে কি ইহাই বুঝিব, সেই ভাগাহত প্রজাগণের রক্ষার্থে আমাদিগের কিছুই কর্তব্য নাই? হে অগ্রজ, আপনার নিন্দা কখনও শ্রবণ করি নাই; আজ কি আমাকে নিজ মুখে আপনাব নিন্দা করিতে হইবে? গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের হস্তে বন্দী চিরশত্রু দুর্যোধনকে উদ্ধার করিতে আপনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজ স্বীয় প্রজাকে রক্ষা করিতে আপনি পরাঙ্মুখ হইতেছেন? এ কি সেই আপনি? না আপনার বেশধারী অন্য কেহ আজ রাজার আসনে উপবিষ্ট?

যুধিষ্ঠির নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী দেবী দ্রৌপদী সভাস্থলে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার রোষদীপ্ত আননচ্ছটায় সভাগৃহ উদ্ভাসিত হইল।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ফাল্গুনী, ক্ষুব্ধ হইও না; জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ছদ্মবেশে অন্য কেহ ভাবিয়া ইঁহাকে অবমাননা করিও না। ইনিই সেই যুধিষ্ঠির। সত্যসন্ধ, মানবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। জীবনযুদ্ধে সর্বদা স্থির থাকিতে পারেন বলিয়া ইঁহার যুধিষ্ঠির নাম; এই অবিচলতা সেই নামেরই সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে। ভুল করিও না, মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইনি সাধারণ মানবের দুঃখদৈন্যে নির্বিকার থাকিতে পারেন—নরলোকে ও বড়লোকে অনেক তফাত।

মহারাজ যুধিষ্ঠির! ভাবিয়াছিলাম কথা বলিব না, এই অপুরুষোচিত মন্ত্রণায় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহার সহচারী পাপের অংশভাক্ হইব না। তুমি কথা বলিতে বাধ্য করিলে।

মহারাজ, তুমি ধর্মরাজ, সত্যসন্ধ। যাহাকে কোন কারণে একবার ধর্ম বলিয়া জানিয়াছ, কোনকালে কোনক্রমে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হও না, ইহাই তোমার গর্ব। আজ তোমার সে গৌরব কোথায়? প্রজাপালনে যে ব্রতকে জীবন-প্রারম্ভে বরণ করিয়া লইয়াছিলে, যে ব্রত পালনের সুযোগ লাভের জন্য বংশনাশী মহাসমরে ব্রতী হইয়াছিলে, আজ কোথায় গেল

তোমার সে ধর্মপালন? কিংবা হয়তো ইহাই তোমার ধর্মনিষ্ঠা—অপরাধীকে ক্ষমা করাই তো ক্ষমাধর্মের পরম প্রকাশ!

মহারাজ, ধিক্ তোমাকে। তুমি সত্যসন্ধ, এই খ্যাতি আশৈশব শ্রবণ করিয়াছি। অতর্কিতে উচ্চারিত মাতৃসত্য হইতে তুমি পাছে ভ্রষ্ট হও, এই বিবেচনায় আমি বিনা দ্বিধায় পঞ্চপত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। আমাকে পণে জয় করিয়াছিলেন ফাল্গুনী, তাঁহার সম্পর্কে তুমি আমার গুরুস্থানীয়। তথাপি আমি বিচলিত হই নাই। পঞ্চপত্নীত্বের গ্লানি ও অবমাননা চিরদিন আমার সহচারী হইয়া থাকিবে ; যুগে যুগে দেশে দেশে ইতরজনের মুখে আমার নাম বক্রহাস্যের সহিত উচ্চারিত হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াও আমি কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধাপ্রকাশ করি নাই। মহারাজ, আজ কোথায় রহিল তোমার সেই সত্য-সন্ধিৎসা?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখি, ক্ষুব্ধা হইও না, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আজীবন অতন্দ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিয়াছেন। আজ যদি তাঁহার সকৃৎ-স্খলন হইয়াই থাকে, তবুও কি তাহা ক্ষমণীয় নহে?

দ্রৌপদী কহিলেন, না। প্রজাপালনে অতন্দ্র ছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই স্খলন অধিকতর মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছে। প্রত্যাশা যেখানে নাই, সেখানে হতাশা নাই, যাহার সামর্থ্য নাই, সে স্বতঃই অক্ষম। যে সামর্থ্য থাকিতেও অক্ষমতার সাধনা করে, সে জ্ঞানপাপী, সর্বথা নিন্দনীয়। আর, স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছে, তুমি তাহার মধ্যে অনধিকার চর্চা করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখি, তুমি আত্মবিস্মৃতা হইতেছ। ধর্মরাজকে ও আমাকে এইরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবে, ইহা তোমার নিকটে প্রত্যাশা করি নাই।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমাকে সখী-সম্বোধন না করিলে বাধিতা হইব। কৃষ্ণসখী বলিয়া পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করিতাম। আজ আপনাকে কৃষ্ণসখী বলিয়া মনে করিতে, তোমার মুখে সখী সম্বোধন শুনিতে আমি গ্লানি বোধ করিতেছি। ধিক্! কৃষ্ণ, তুমিই কি সেই কৃষ্ণ, যিনি কৌরব-সভায় দুঃশাসনকর্তৃক অবমানিতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, যিনি দুরাচার শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন, যিনি পরপীড়নপরায়ণ জরাসন্ধের বধে উদ্যোগী হইয়াছিলেন? না, তুমি তাহার ছায়ামাত্র, রাজলক্ষ্মী-রাক্ষসীর গ্রাসজীর্ণ উদ্গারাবশেষমাত্র। নচেৎ, কোথায় আজ তোমার সেই চক্র, যাহার দ্বারা আমাকে বস্ত্র যোগাইয়াছিলে? আমার প্রজা-রমণীর লজ্জা অপহৃত ধূলি-লুণ্ঠিত হইতেছে, তাহারা 'হা মধুসূদন' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, তাহাদিগের সম্ভ্রম-রক্ষায় তুমি উদাসীন কেন? না কি বুঝিব, তোমার লজ্জাহারিত্ব কেবল সখীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত, অন্য নারীর লজ্জা-নিবারণে তোমার কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন নাই? তাহা হইলে, ধিক্ আমাকে যে সেইদিন একাকী আমার বন্ধুকে দীনবন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, অসঙ্কোচে ও কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহার হস্তে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ বুঝিতেছি, দীনবন্ধু-বেশী একক-সখীর বন্ধুর সেই সাহায্য স্বীকার করা অপেক্ষা আমার চরম লাঞ্ছনা হওয়াও বরণীয় ছিল। সে লাঞ্ছনা দৈহিক লাঞ্ছনামাত্র হইত ; তোমার সাহায্য আমার মনের লাঞ্ছনার হেতু হইয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি মহারাজ। জগতের সকল বস্তু, সকল চিন্তার উপরে, রাজাই তোমার অভীষ্ট দেবতা। কৌরবসভায় যেদিন লাঞ্ছিতা হইয়াছিলাম, তুমি নির্বিকার দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছিলে। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, তাহা তোমার অসীম চিত্ত সংযমের প্রমাণ। ভাবিয়া স্বামীগর্বে স্ফীতা হইয়াছিলাম। হা, আজ বুঝিতেছি, সংযম নহে। তাহা তোমার উদাসীন্য মাত্র ছিল। তুমি রাজ্য লোলুপ, রাজপদের মহিমাই তোমার একমাত্র কাম্য। আমার লাঞ্ছনা দেখিয়া যদি বিচলিত হইতে, উষ্মা প্রকাশ করিতে, হয়তো কৌরবগণ অপ্রসন্ন হইত, আপোসে রাজ্যাংশ লাভের জন্য তুমি যে তদ্বির করিতেছিলে তাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্ট হইত। এই জনাই আমার অপমানে আর্তনাদে তোমার অক্ষিপল্লব কম্পিত হয় নাই ;

ভীমসেন রোষে গর্জন করিয়া উঠিলে তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিয়াছিলে।

আজও তুমি সেই রাজমহিমা-মুগ্ধ রাজা। তোমার প্রজা ধর্মনাশভয়ে, ইতরহস্তে চরম লাঞ্ছনার ভয়ে, আর্তনাদ করিতেছে, তুমি নির্বিকার হইয়া বধিরত্বের সাধনা করিতেছ ; পাছে কোন কারণে দুষ্কৃতকারীগণ তোমার উপরে অপ্রসন্ন হয়, পাছে তোমার রাজভোগ-সম্ভাবনা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

তোমাকে ধিক্কার দিব না, তোমার প্রতি উচ্চারিত ধিক্কার স্বয়ং ধিকৃত হইবে। কিন্তু প্রশ্ন করি, নিজের পত্নীর মর্যাদা তোমার স্বকীয় ধন, তাহার বিনাশ তুমি সহ্য করিতে পার, সহ্য করিয়া মহত্ত্বের মিথ্যা-গৌরব অর্জন করিতে পার। কিন্তু প্রজা তোমার সর্বথা রক্ষণীয়। রমণী পুরুষের রক্ষণীয়া। আর্তব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের রক্ষণীয়।

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত, ইত্যুদগ্রঃ
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ"

বলিয়া, ক্ষত্রকুলতিলক রাজা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে। হে ক্ষত্রিয়রাজ, আজ কোথায় তোমার সেই গর্ব? আর্তব্যক্তিকে, রমণীকে, প্রজাকে সর্বথা রক্ষা করাই পরম রাজধর্ম। সে ধর্মে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কোন্ লজ্জায় তুমি রাজাসনে বসিয়া রহিয়াছ? নামিয়া আইস। মহারাজ ভরত-প্রতিষ্ঠিত, মহাবীর ভীষ্ম-রক্ষিত ওই মহা-সিংহাসনকে কলঙ্কিত করিও না।

হায়, আজ কোথায় মধ্যমপাণ্ডব মহাবল ভীমসেন! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণরত পাপমতি দুঃশাসনের বজ্রমুষ্টি তাঁহার হুঙ্কারে শিথিল হইয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধে, তাঁহারই আশ্বাসে সেদিন আমি আত্মঘাতিনী হই নাই। আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া তিনি সেই সভাক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়াছিলেন ; দুঃশাসনের বক্ষরক্তে রঞ্জিত হস্তে আমার মুক্ত বেণী বন্ধন করিয়া, দুর্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার পাঁচজন স্বামীর মধ্যে তিনিই পুরুষ নামের যোগ্য ছিলেন।

সেই একবার নহে। বিরাটের পুরীতে দুর্মতি কীচক আমার প্রতি লুব্ধ হইল। সভার সমক্ষে, তোমার সমক্ষে, আমাকে পাদপ্রহারে ভূপাতিত করিল। তুমি নীরব হইয়া রহিলে। উত্তেজিত হইলে দ্যূতক্রীড়ার চাল ভুলিয়া যাইবে, এই আশঙ্কাই তোমার মনে প্রবল ছিল।

কিন্তু ভীমসেন আমার সে অপমান বিস্মৃত হন নাই। সেই রজনীতে একক সমরে মহাবল ও ক্রূরকর্মা কীচককে তিনি বধ করিলেন ; তৎপরে তাঁহার তুল্য-বলশালী ঊনশত ভ্রাতাকে বধ করিলেন। হা, আজ কোথায় সেই বৃকোদর, কোথায় সেই অমিতবল লৌহমানব বল্লভ! তিনি থাকিলে আজ আমাকে এরূপে নিষ্ফল আর্তনাদ করিতে হইত না। আমি পঞ্চপতিসনাথা ; কিন্তু এরূপ পৌরুষ-রহিত পতির পত্নীত্ব অপেক্ষা আজন্ম বৈধব্যও আমার শতগুণে অধিক সহনীয় হইত।

মহারাজ, তোমার মহিষী বলিয়া গৌরব করিতাম। আর সে গৌরব করিব না। তোমাকে দোষ দিই না। তুমি আজন্ম দ্যূতাসক্ত, সমস্ত জীবন দ্যূত-ক্রীড়াই করিয়া গেলে। রাজা, ভ্রাতা, পত্নী, সকলেই বারংবার তোমার সেই দ্যূতের পণ হইয়াছে। কিন্তু রাজ্য লোভে তোমার সে দ্যূতক্রীড়া ; আজ রাজলক্ষ্মীকেই তুমি সেই দ্যূতের পণ করিলে।

তুমি যাহাই হও, আমি তোমাকে পতি বলিয়া জানিয়াছি, আমি আজও তোমার অনুগতা ধর্মপত্নী। তোমার বিরুদ্ধাচরণ আমি করিব না। কিন্তু তোমার ওই ধর্ষিতা-দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত রাজসিংহাসনের অংশভাগিনী হইতে আর আমাকে আহ্বান করিও না, এই আমার মিনতি। ধিক্ এ রাজা, ধিক্ আমি এ রাজ্যের রাণী।

মহারাজ, তোমার পত্নী-পরিচয়ে ইহজীবন কাটাইলাম ; আমাকে ক্ষমা করিও, যদি ইহজন্মের পরেও আর তোমাকে পতি বলিয়া মান্য করিতে অক্ষমা হই। আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইও না। আমি তোমার মত মহাপুরুষ নহি, আমি দুর্বলা নারীমাত্র। নারীর আর্তনাদে আমার চিত্ত মথিত হয়, একদা স্বয়ং দুর্বৃত্ত-হস্তে লাঞ্ছিতা হইয়াছিলাম বলিয়াই সকল নারীর

লাঞ্ছনাকে নিজের লাঞ্ছনা বলিয়া মনে করি। মহারাজ, তুমি রাজশ্রীর স্বামী হইয়াছ, জীবনব্যাপী দ্যূতক্রীড়াবলে লব্ধ সেই মহিষীকে লইয়া সুখে কালাতিপাত কর। আমাকে আর ডাকিও না, আমি তোমার সহিত স্বর্গবাসও করিতে চাহি না। ভাগ্যক্রমে যদি এমন দিন আসে, তোমার সহিত যদি সশরীরেও স্বর্গের পথে যাত্রা করিতে হয়, সেদিন যেন আমি পথেই পড়িয়া মরি, তোমার সঙ্গে তোমার পত্নী-পরিচয়ে যেন স্বর্গের দ্বারে প্রবেশ করিতে বাধ্য না হই, বিধাতার চরণে ইহাই আমার পরম প্রার্থনা রহিল।

দ্রৌপদীর স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ তীব্র ও উচ্চ হইয়া গগনস্পর্শী হইল, কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইল। সে স্বরবিস্তার নিস্তব্ধ হইবার পূর্বেই দেবী অসমপদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

নির্জন গৃহে ক্রন্দন-বিহ্বলা দ্রৌপদী কক্ষতলে লুণ্ঠিতা হইতেছিলেন।

বঙ্গদেশীয় প্রতিভূগণ দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে ভয়ে ডাকিলেন, দেবি!

দ্রৌপদী উত্তর দিলেন না।

প্রতিভূ-প্রধান কহিলেন, দেবি, আমরা এক্ষণে কি করিব?

দ্রৌপদী কথা কহিতে পারিলেন না। মুক্তবেণী মস্তক আর্তবেগে সঞ্চালিত করিয়া বুঝাইলেন, আমি জানি না—আমি জানি না।

প্রতিভূ কহিলেন, দেবি, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। আমাদিগকে একটি বাণী দিন।

দ্রৌপদী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অশ্রুতে আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া কহিলেন, কি দিব?

বাণী।

কি বলিব?

যাহা হউক।

কি বলিব। আমার বলিবার কিছু নাই, তাহা কি এতক্ষণেও বুঝ নাই?

দ্রৌপদীর কণ্ঠ অশ্রু-বিকৃত হইল; আমি অসহায়া, পথের ভিখারিণী অপেক্ষাও হীনা। তোমাদিগকে কোন্ আশ্বাসবাণী আমি দিব? আমাকে ক্ষমা কর।

বঙ্গদেশীয় প্রতিভূ অধ্যবসায় অতুল্য। কহিলেন, তথাপি দেবি, যাহা হয় একটু কিছু বলিয়া দিন। আমরা ফিরিবামাত্র তাহারা জানিতে আসিবে কি বাণী লইয়া আসিলাম। তাহাদিগকে কিছু তো বলিতে হইবে।

দ্রৌপদীর নয়ন শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন, কি বলিব?

যাহা আপনার অভিরুচি।

বলিয়া কি হইবে?

আমরা সেই বাণীকে আপনার অভিমত বলিয়া প্রচার করিব; আপনার উপদেশ বলিয়া পালন করিব।

দ্রৌপদী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নয়নদ্বয় প্রখর হইল। কহিলেন, পারিবে?

অবশ্য পারিব। বলুন দেবি। বলিয়া প্রতিভূ ঝটিতি লেখনী ও ভূর্জপত্র বাহির করিলেন। কহিলেন, বলুন দেবি, নির্যাতিত, অবহেলিত বঙ্গবাসীর প্রতি কি আপনার নির্দেশ?

দ্রৌপদী কহিলেন, নির্বংশ হও।

ভাদ্র ১৩৬৭

থামতে জানা

বিরূপাক্ষ

একবার সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কোন এক জলসা শুনতে যাবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতে থাকেন।

শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে বললেন, না ভাই দিলীপ. ও সব কালোয়াতী গানটান আমি বুঝি না—তুমিই যাও।

দিলীপকুমারও নাছোড়বান্দা। কেবল বলতে থাকেন, দাদা, এ সেরকমের জলসা নয়। ঘরোয়া ব্যাপার—এখানে যে কালোয়াতটি আসবেন তিনি একজন খুব উঁচুদরের গুণী, আপনি তাঁর গান শুনলে মোহিত হয়ে যাবেন। চমৎকার গান, একবারটি শুনেই আসবেন নয়, চলুন।

শরৎচন্দ্র সব শুনে একটু চিন্তিতভাবে বলে উঠলেন, হুঁ তুমি যা বলছ দিলীপ, সবই বুঝলুম—গুণী লোক, গানও গায় ভাল, কিন্তু থামে তো?

দিলীপকুমার ও উপস্থিত কয়েকজন এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের এই প্রশ্নটি হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা অনেক কিছু শিখেছি কিন্তু কোথায় থামতে হয় সেইটেই শিখি নি। আমাদের গান থামে না, বক্তৃতা থামে না, উপদেশ থামে না, গালাগালি তো থামতেই চায় না—এ এক জ্বালা!

আমরা ছেলেবেলা থেকে উপদেশ শুনতে আরম্ভ করলুম—তা আর থামল না। গুরুজনরা আমাদের ভাল করবার জন্যে এত উপদেশ বিতরণ করলেন যে সমস্ত করণীয় কার্য ভুলে গেলুম। এ যেন গভর্ণমেন্টের নিত্য নতুন আইন পাস ও তা অনুসরণের নির্দেশ—সমস্তগুলো ধারা মুখস্থ থাকলে সুপ্রিমকোর্টের জজ হওয়া যায়, নইলে পদে পদে আইন লঙ্ঘন করে দশ-পনেরো বছর হাজতবাস করতে হয়। এই করো না, তাই করো না, এই কর, তাই কর বলতে বলতে আমাদের আর কোন কিছু করতে হল না, একেবারে কাজের বার হয়ে গেলুম। তাঁরা যদি উপদেশ একটু স্বল্পমাত্রায় দিতেন—উপকার হত। মাত্রা বাড়াতেই বিপদ হয়ে গেল।

এঁদের পর আরম্ভ হল মাস্টারমশাইদের উপদেশ, তারপর অফিসের কর্তাদের, তারও পরে বন্ধুদের। সর্বশেষে বাড়ির লোকদের। কেউ কখনও থামলেন না—এঁদের সকলের হাত এড়িয়ে একটু গড়ের মাঠে গিয়ে যে দুদণ্ড নিশ্চিন্তে হাওয়া খাবেন তারও জো নেই; সেখানে মনুমেন্টের তলায় লাউডস্পীকার খাটিয়ে নেতাদের দুর্ধর্ষ নির্দেশ শুনতে শুনতে মাথা-টাতা সব ঘুলিয়ে যাবে।

তার ফলে কাজকর্ম ছেড়ে হয়তো ধর্মঘট করে বসে রইলেন—শেষে নাকখত দিয়ে আবার কেঁচোর মত অফিসে ঢুকুন, আর আগে যাঁরা বাবা দাদা বলে সবিনয়ে বাত-চিত করতেন, পরে তাঁদের কাছ থেকে সম্বন্ধীসুলভ আপ্যায়ন লাভ করে পশ্চাতে ঠোক্কর খেয়ে চিত হয়ে গড়াগড়ি খান!

অথচ এ দুর্ভোগ হয় না, যদি যথাক্রমে থামবার আর্টটা সকলের জানা থাকে। হুমহাম করে তম্বিতম্বা পর্যন্তই ভাল—কিন্তু গুম করে লোকের পিঠে কিল বসিয়ে দেবেন না কখনও,

তা হলেই সর্বনাশ! প্রতিপক্ষকে কখনও কিলের ওজন বুঝতে দিতে নেই। বাকযুদ্ধ করে কেল্লা ফতে করুন কিন্তু খবরদার নিজে থেকে কখনও সত্যি যুদ্ধ করতে যাবেন না—মারা পড়বেন। কিন্তু মজা এমন যে একবার আবেগ এলে তার বেগকে ঠিক তালমাফিক থামাবার কায়দা দেশবাসীর জানা নেই।

কোনদিকের কথা বলব? আমরা বন্ধনকে স্বীকার করি না কিনা—সবেতেই মুক্ত, তাই কোনকিছু বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকব কেন? কথা ছেড়ে দিন—যেখানে কোন কথাই নেই, সেখানে শুধু আ—আ করেই আড়াই ঘন্টা আমরা চালিয়ে দিতে পারি। থামতে বয়ে যাচ্ছে!

এই কলকাতা শহরে বিরামবিহীন ভাবে তিন দিন তিন রাত হাফ্-আখড়াই গানের আসর বসেছে নিজের চোখে দেখেছি। একবারও গান থামল না। সূর্য তিনবার উঠল, তিনবার ডুবে গেল, আখড়ার লোকেদের হাঁ বন্ধ হল না; গেয়েই চললেন। একদল ওঠে তো সঙ্গে সঙ্গে আর একদল বসে পড়ে, যেন বাঙালীর নেমন্তন্ন বাড়ি, ফার্স্ট ব্যাচের খাওয়ার পর সকড়ি তোলবারও টাইম দেয় না, সেকেণ্ড ব্যাচ হুড়মুড় করে উঠে পড়ে—কোন বিরতির অবকাশ নেই।

পঞ্চাশ বছর আগেও এদেশে থিয়েটার চলত সারারাত ধরে। ভোরের দিকে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে দর্শকদের, চড়চড় করে রোদ উঠে গেল, তখনও আলিবাবার নাচ চলছে। আবার এর মধ্যে মজাও দেখেছি, নিমীলিতচক্ষু নিদ্রাকাতর সঙ্গীকে ধাক্কা মেরে তাঁর বন্ধু দর্শক বলছেন, এই চোখ চা না—দেখ না, বেশ ভাল সখীদের নাচ হচ্ছে। সে বেচারী ঈষৎ চক্ষুটি খুলেই আবার বুজে ফেললে ও হাই তুলতে তুলতে বলে উঠল, ও আর দেখব কি? বেটারা সব বাদ দিয়ে দিয়ে এখন প্লে করছে। বলেই কাঁধটা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে দিয়ে কেতরে পড়ল।

আশ্চর্য! কোম্পানিও থামবে না—এঁরাও টিকিটের পয়সা উসুল করবার জন্যে থিয়েটারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বসে থাকবেন। কোথাও কারুর থামা পড়ার যো নেই!

যদি বলেন, ওসব আগের যুগে হত, লোকের রসবোধের সূক্ষ্মতা তখন আসে নি, এখন প্রগতির যুগে ওসব চলত না। তা হলে আমি এর উত্তরে প্রগতিবাদীদের জিজ্ঞাসা করব যে, যে-পাড়ায় মশাইরা থাকেন সে কি চৌরঙ্গীর ওপর না আর কোথাও সাহেব-পাড়ায়?

উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম বা মধ্য কলকাতার কোথাও কি কখনও থাকেন নি? পাল-পার্বণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কি কখনও হয় নি আপনাদের চত্বরে? সকাল ছটা থেকে রাত সাড়ে বারোটার আগে পুলিস আইন দেখিয়েও ফুলিশদের ভাড়া-করা লাউডস্পীকারের বিদিকিচ্ছিরি আওয়াজ থামাতে পেরেছেন?

আগে তবু বাড়ির হাতার মধ্যে উঠোনে বা দালানে রস জ্বাল দেওয়া হত, এখন দেড় মাইল দূরে থাকলেও যে ভেয়ান বসে তাতে মাথা টনটন করিয়ে দেয়, দেখেন না?

আসলে থামার আর্ট কেউ জানে না এদেশে।

আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক কিছুতে বাড়ি ছাড়লেন না, বাড়িওয়ালা আদালতের পেয়াদা এনেও ভাড়াটেকে ওঠাতে পারলেন না। শেষে যে ব্যবস্থা করলেন, তাতে শুধু সেই ভাড়াটে নয়, আমরা আশেপাশে যেসব লোক অন্য বাড়িতে ছিলুম তারাও পাড়া ছেড়ে পালালুম।

মশাই, এক ডজন গলা-ভাঙা লোক জড় করে ছিয়াত্তর না আটাত্তর ঘন্টা অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা হল। ওঃ, সে অসহ্য! থামাবে কে? ধর্মের ব্যাপার, পুলিসের আওতার বাইরে—কাছাকাছি মসজিদ, চার্চ, হাসপাতাল কিছু নেই, অতএব প্রাণ ভরে নাম গাও! সেই নামের ঠেলায় লোকেরা স্ব স্ব পিতৃদেবের নাম বিস্মৃত হয়ে গেছলো সে সময়।

একটু থাম্—রামঃ! বললে আবার বেশী মাতন শুরু হয়। অখণ্ড কীর্তন কি না, থামলেই বৈকুণ্ঠের সুতো ছিঁড়ে যাবে, অতএব চালাও! এইভাবে কেত্তন চলে, দোলের সময়

বাড়ির পাশে থানা থাকলে খচখচ ঘচমচর ঠেলায় কর্ণকুহর বধির করে ছেড়ে দেয়—থামবার নাম কেউ করে না। সবই ভগবানের উদ্দেশে তো পাঠানো। ভগবান যদি এই আসুরিক চিৎকার শুনেও নিজের বাসা ছেড়ে না পালান, তা হলে 'থ্যাঙ্ক গড' বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের।

ঋষিরা বলেছেন, চরৈবেতি—আরও এগিয়ে চল বাবা, থেম না, তবেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু আমরা সেদিকে না এগিয়ে যত বিদঘুটে ব্যাপারের দিকে যদি সর্বদা এগোতে থাকি, তা হলেই যে সর্বনাশ! অনেক ব্যাপারে থেমে যাওয়াটা যে নিতান্ত আবশ্যক—এটা বোঝানো যায় কী করে?

শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউই তো বোঝেন না। বক্তা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বিশেষ অধ্যাপক বা কাগজের সম্পাদক হলে তো কথাই নেই—থামবার নাম করবেন না।

লোকে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে মেঝেতে পা ঘষল, তারপর ঘনঘন বেমক্কা জায়গায় করতালি দিতে শুরু করল, আসনের অর্ধেক খালি হয়ে গেল—তবু হুঁশ নেই! পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান শ্রোতাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে তিনি মহাপ্রস্থান করবেন। ভবিষ্যতে আর কোন লোক এসে যে দুটো জ্ঞানের কথা বলে আপনার মাথার ফাঁক ভরাট করে যাবেন সে সুবিধে তাঁরা দেবেন না।

একবার একটি ইংরিজি কাগজে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল—তার দুটি অংশ। প্রথম অংশে দেখা গেল—একটি বিরাট হল, লোক গিজগিজ করছে আর একজন বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। দ্বিতীয় অংশে পরিচিতি লেখা রয়েছে, "দু ঘন্টা পরে"—সেই বক্তাই বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, পাশে শুধু একটি লোক বসে আছেন। সমস্ত হল খালি, শূন্য চেয়ারগুলি শুধু পড়ে আছে। পরিশেষে বক্তা পরিতাপের সুরে বলে উঠলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল কেউ জ্ঞানের কথা শুনতে চায় না, মানুষকে ভাল কথা বলতে গেলে সে পালায়, কিন্তু সেরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা যে একেবারে নেই তা বলতে পারি না, এখনও ভাল কথা শোনবার জন্য লোক রয়েছেন—নইলে, আমার পাশে এই এতক্ষণ একটি ভদ্রলোক ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন কেন? আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা পর্যন্ত পালিয়ে গেছেন কিন্তু ইনি হল পরিত্যাগ করেন নি, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে থেকে একটি আদর্শ শ্রোতার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেলেন, সেজন্য তাঁকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না।

তখন দ্বিতীয় বক্তা গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 'ডোন্ট ফরগেট স্যার, আই অ্যাম্ দি নেক্সট্ স্পীকার' অর্থাৎ আমি আপনার পরের বক্তা এইটে ভুলে যাবেন না।

আমার মনে হয় এর পরে কার্টুনে আর একটি অংশ আঁকা উচিত ছিল। "তিনঘন্টা পরে"—দ্বিতীয় বক্তা বক্তৃতা করে চলেছেন, তিনি চেয়েও দেখছেন না যে তাঁর পাশে প্রথম বক্তা দাঁতমুখ ছরকুটে অজ্ঞান হয়ে চেয়ারে ঢ'লে পড়েছেন—একটি লোকও তাঁর চোখেমুখে জল দেবার জন্য উপস্থিত নেই।

বাস্তবিক কয়েকজনের কাণ্ডজ্ঞানহীন বিরাম-বিহীন বক্তৃতাপ্রবাহ মানুষকে অস্থির করে তুলতে পারে।

নারী পুরুষ কেউ কম যান না। বাড়িতে মহিলাদের দেখুন—সকাল থেকে কাকচিল বসবার জো নেই। চাকর, ঝি, ছেলেপুলে, কর্তা কাউকে ভাগে কম দেবেন না—স্বয়ং বীণাপাণি মহারাণীদের কণ্ঠে ভর করে জলতরঙ্গে ঝালা বাজিয়ে চলেছেন। এই হল না, ওই করলে না, একে দেখলে না, সেটা আনলে না, ওঁর জন্যে হাড়মাস ভাজা হয়ে গেল ইত্যাদি ভাল ভাল কথা কত শুনবেন শুনুন!

মহিলাদের এই অবিশ্রান্ত বকা একটা রোগ। প্রাতঃকাল থেকে রাত্তিরে যতক্ষণ না আড় হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন, ততক্ষণ বকার বিরাম নেই।

সম্প্রতি একটি বিলিতি কাগজে পড়লুম যে কোন এক কুমারী চুয়ান্ন ঘন্টা অবিশ্রান্ত বকে

কথা-বলার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। *অবশ্য এ একটা এমন কিছু নয়—আমাদের নারীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এলে ঠাকরুণকে তিনবার ইংলিশ চ্যানেল পার করিয়ে দিত। এ বিষয়ে* আমাদের মেয়েদের হারাবে, এটা ভাবতেও পারা যায় না।

তবে আমি কেবল ভাবি উক্ত মহিলাটির যিনি স্বামী হবেন, কিংবা হয়েছেন, তিনি যদি রামকালা না হন, তা হলে বেশীদিন ঘর-সংসার করতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। এটা বললুম এইজন্য যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি।

আমাদের এক ভবপিসী—পিসেমশাই সম্ভবতঃ তাঁর বচনের চোটে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেই বিধবা মহিলাকে বত্রিশ বছর আমাদের বাড়িতে দেখেছি। প্রাতঃকাল ভোর চারটের সময় উঠে কলে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন, তারপর গঙ্গাস্নানে চেঁচাতে চেঁচাতে চললেন, ঘন্টাদুয়েক পরে রাস্তায় চিৎকার করতে করতে ফিরলেন, সারাদিন লোকজন বাড়ির বৌ-ঝি প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া করে, রাত্তিরে ভাইপোদের আপিস থেকে ফেরার পর, প্রত্যেকের কুচ্ছো জানিয়ে, রাত বারোটা নাগাদ শুলেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বিড়বিড় করে বকতেন। এঁর বিবরণী খবরের কাগজেবেরুলে, বোধ হয় একাদিক্রমে গালাগালি দেওয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করার জন্য, আজকের দিনে কোন প্রতিযোগিতায় একটা মোটা রকমের পুরস্কার পেয়ে যেতেন।

অবশ্য শুধু পিসিরাই এরকম ব্যাপারে দোষী নয়, দু-চারজন পিসেমশাইও এদেশে আছেন যাঁদের বাচনিক সুধাবর্ষণের ফলে পৃথিবী অন্ধকার দেখতে হয়।

অত কথা ছেড়ে দিন—পরনিন্দে, পরের কেচ্ছা, বিশেষ যদি আবার তার সঙ্গে নারী জড়িত থাকে তা হলে লোকের কাছে তা খুব শ্রুতিমধুর লাগে, কিন্তু তারও পরিমাণ ঠিক না থাকলে যে মারপিট হয়ে যায়, এও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

পাড়ায় চায়ের দোকানে সেধোবাবু আর কেঁদোবাবু বলে দুটি ভদ্রলোক সকাল সন্ধ্যে বসে বসে আড্ডা জমাতেন—কী ভাব উভয়ের! দুজনে যাকে বলে হরিহর আত্মা। বয়েস উভয়েরই পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে তবু এ বয়সে দুজনের মধ্যে সর্বদা প্রীতির টাগ্-অব্-ওয়ার্ চলত।

সেধোবাবুর শরীর খারাপ হলে কেঁদোবাবুর শরীর ম্যাজম্যাজ করত, আবার কেঁদোবাবুর সর্দিতে গলা খুসখুস করলে, সেধোবাবুর কাসি বেড়ে যেত। একজন কোনদিন একটু আসতে বিলম্ব করলে, অপরজন দোকানী-প্রদত্ত হুঁকোয় একটা টান মেরেই অপরের শরীরগতিকের খবর নিতে হনহন করে তার বাড়ির দিকে ছুটে যেতেন। এ হেন বন্ধুদের মধ্যেও একদিন শুধু এক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির ফলে, ছাতা পেটাপিটি হয়ে যাবার উপক্রম হল ও পরে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। অথচ যে-জিনিসটাকে উপলক্ষ করে ব্যাপারটা ঘটল তা উভয়ের কারুরই স্বার্থবিরোধী ছিল না—শুধু একঘেয়ে ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি পরস্পরের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। সোধোবাবুর পাড়ায় কোন এক ভদ্রলোক নাকি চটে গেলেই তাঁর স্ত্রীকে ঠেঙাতেন—এই সংবাদটি সোধোবাবু যেদিন বেশ রসিয়ে কেঁদোবাবুকে বললেন, সেদিন তিনি সেটি বেশ উপভোগ করেছিলেন। ঠেঙানো, ঠেঙানোর কারণ, স্ত্রীর চরিত্র, স্বামীর চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু সংবাদ নিয়ে রীতিমত খুশীও হয়েছিলেন নিশ্চয়—নইলে সেধোবাবুর প্রাত্যহিক বক্তৃতার মধ্যে এটি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হল কি করে?

প্রত্যহ এই ব্যাপার শুনতে শুনতে কেঁদোবাবু ক্রমশঃ অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করার চেষ্টা করতেও ত্রুটি করলেন না। তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখলেই বেশ গম্ভীর ভাবে খবরের কাগজ পাঠে মনঃসংযোগ করতে লাগলেন—সেধোবাবু কিন্তু খুঁটি ছাড়েন না—উক্ত নারী-পুরুষের নব নব কেচ্ছা শুনিয়ে চলেছেন।

কেঁদোবাবু একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বলেও ফেললেন, দূর ভাই, ছাড়ান দে ও-সব

কথা, অন্য কথা পাড়্।

তাতেও সেধোবাবুর কোন অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করা গেল না। পরিশেষে বন্ধুকে দূর থেকে আসতে দেখলে কেঁদোবাবু পালাতে শুরু করলেন, কিন্তু এক পাড়ায় থেকে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন? দেখা হতে লাগল আর কেচ্ছা শুরু হল—বুয়েছ কি না...

দিন পনেরো তাঁর হাত এড়াতে কেঁদোবাবু হাজারীবাগ পালিয়ে গেলেন, কিন্তু ফিরে আসতেই সেধোবাবু পাকড়ালেন তাঁকে। একটা দুটো অন্য কথা বলেই, বুয়েছ কেঁদো, তুমি তো ছিলে না, এতদিন তাই সব মজার কাণ্ড বলতে পারি নি...কাল রাত্তির দশটার সময়, আবার বুয়েছ কিনা, বৌটাকে ধরে দিলে ঠেঙানি!

কেঁদোবাবু খেপে উঠে ছাতাটা বাগিয়ে ধরে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, বেশ করেছে, ও তার বউকে ঠেঙিয়েছে, তোর বাবার কি? তোর বউ থাকে, তুই ঠেঙাগে যা। খবরদার, সেধো, ফের যদি ওই কথা আর তুলেছিস, তা হলে এই ছাতির বাঁট দিয়ে তোর মাথার ঘিলু আমি বার করে দেব—হাঁ।

বাস্! সেই থেকে জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

দেখুন, যথাসময়ে থামতে না জানলে অপরের কেচ্ছা শোনাও কী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। ঠিক সময়ে থামবার কৌশল না জানলে বিপদ ঘটবেই।

চতুর্দিকে আমাদের এত বিপদ ঘনিয়ে আসছে কেন? কারণ, আমরা থামতে জানি না। নাচ, গান, হুজুগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, মহাপুরুষদের শ্রাদ্ধ, গালমন্দ কিছুই বাদ পড়ছে না—অবাধ, নিরঙ্কুশ, স্বাধীন ও অশ্রান্ত ভাবে আমরা একটা বিষয় নিয়েই অবিরাম মোচ্ছব চালিয়ে যাচ্ছি---থামবার নাম নেই আমাদের।

কিন্তু থামা দরকার। রসিক মাত্রই কোথায় থামতে হয়, ঠিক জানেন। ভগবানকে বলা হয়, রসো বৈ সঃ, তিনি রসস্বরূপ, প্রকৃত সুরসিক। তার প্রমাণ—যথাসময়ে তিনি আমাদের নাচনকোঁদন ও আস্ফালনকে একেবারে জন্মের মত থামিয়ে দেন। নচেৎ আমাদের অবিরত মুখভেঙানি দেখতে ও শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনতে শুনতে মানুষ বোধ হয় পাগল হয়ে যেত।

ভাদ্র ১৩৬৭

বিবর্তনবাদ

কেবলরাম গাজনদার

ধন্য তুমি ডারউইন, ধন্য তব বিবর্তনবা
ধন্য তব পাণ্ডিত্য অগাধ!
প্রচারিলে মহাসত্য, পশুপক্ষী উদ্ভিজ্জ প্রস্তর
চলিয়াছে নিরন্তর
নিম্নস্তর হীন জন্ম হ'তে
শ্রেষ্ঠতর পথে;
শাখী হয় শাখামৃগ, পাখী হয় বাঘ,
সপুচ্ছ চমরীদেহ লভিতেছে ছাগ,
ব্যাঙাচি হতেছে ব্যাঙ, ব্যাঙ হয় হাতী—
রাজহংস হইতেছে পাতি—
নবাব হইতে যথা শ্রেষ্ঠ তার নাতি!—
বানর হতেছে নর, মানুষ দেবতা—
বিরাট তালিকা আছে কত লিখিব তা—
ধূলি ঝুলি ঢুলি কুলী বুলি গুলী যত
বাক্যে আয়তনে বর্গে বাড়িছে নিয়ত
কমে না কখনো—একতিল
শ্লীল বেড়ে হতেছে অশ্লীল।
অভাব বাড়িছে নিত্য স্বভাব চঞ্চল,
সরিষা প্রমাণ ফুটা হতেছে প্রবল—
তিলে তিলে পাকাইছে তাল;
ঘুঁষে ঘুঁষে ফুলিতেছে গাল
পেট হয় ভুঁড়ি—
যোড়শী যুবতী বৃদ্ধা পার হ'তে কুড়ি
এমনি সর্বত্র হেরি বিবর্তনবাদ
অপূর্ব সংবাদ।
কিন্তু সব চেয়ে হেরি ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চ 'পরে
স্বরাজ্য অম্বরে
তেজবান্ জ্যোতিষ্কেরা ম্লান হ'য়ে আসে
পরবর্তী তেজীয়ান্ জ্যোতিষ্কের পাশে।
সাহিত্য-যাত্রার মঞ্চে একই ইতিহাস
বঙ্কিম রবীন্দ্র মধু দীনবন্ধু কীর্তি হ'ল ফাঁস
কোন্ তলে তলাইয়া গেল যে তাহারা।—
যেমতি সাহারা
লুকায়েছে নিজ গর্ভে উত্তাল জলধি
গিরি নদ-নদী,

তেমতি আজিকে যত ধুরন্ধর সাহিত্যিক দল
নির্মম অটল
তেজপুঞ্জ-সূর্যতেজ রবীন্দ্র বঙ্কিমে—
'মেঘনাদ' মধু আর দীনবন্ধু 'নিমে'
আবরিল ধূমপুঞ্জ তেজে—
লেপে মুছে একাকার হইল সবে যে—
বঙ্কিমে ফেলিল পুঁতে ফণীন্দ্র, সুরেন—
গিরিশ ও দীনবন্ধু দোঁহে মরিলেন
অপরেশ-শাণিত ফলকে—
ঝলকে ঝলকে
উগারি কবিত্বপ্রভা রবীন্দ্রকে এতটুকু করে দিল আজ-
ভিক্টোরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ পাশে যথা তাজ
প্রেমেন্দ্র নজরুল আর অচিন্ত্য মহান—
বুদ্ধদেব জ্বল্-জ্বলায় মান—
কত আর কব—
সুশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ তেজে অভিনব
উঠিলেন অভ্রভেদী হ'য়ে
অবনীন্দ্র নন্দলাল গেল হায় ব'য়ে।

থাক্ শিল্প কাব্য-কথা থাক্—
হয়েছি নির্বাক—
পলিটিক্সে ভারতের উন্নতি হেরিয়া—
দশ-হাত বার হস্ত ফুলে উঠে হিয়া!
নরোজী গোখ্‌লে রাসু অরবিন্দ তিলকের কাল
অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের কিবা ছিল হাল!
সুরেন্দ্র প্রভৃতি সবে হয়েছেন কেঁচো
শাঁখচুন্নী হস্তে যথা পেঁচো।
কংগ্রেস জ্বলিত আগে টামটেমি প্রদীপের মত,
নেবে নেবে ভয় যে সতত
স্বরাজীর ঘৃতে আজ জ্বলিতেছে সুমহান তেজে
বিদেশী ইংরেজে তাঁরা মহানন্দে ভেজে
করিছেন মুড়ি
ইংরেজী গুমোর ফাঁক ফেঁসে গেছে যত জারি জুরি-
কংগ্রেস-মণ্ডপ-তলে জোড়-হস্ত দাঁড়ায়াছে তারা—
গরু বৎস-হারা!

ভারত কংগ্রেস আজ বাঙলার ক্রীড়ার পুত্তলি
স্বরাজ্য-ফণ্ডের থলি

আত্মহারা কাহার সিন্দুকে—
বিশ্বাস করি কি মোরা বলে যা নিন্দুকে—?
সুরেন্দ্র বিপিন মতি অরবিন্দ শিশির যেখানে
আনন্দ উমেশ চিত্ত বক্তৃতা বাখানে
সেথা আজ থরে থরে উঠিয়াছে মহারথী কত—
বসন্ত প্রতাপ শ্রীশ বিধান (?) প্রমথ
জব্বর নজরুল
শশিকান্ত স্থূল—
হ্যাংলাবিজয় আর হেমন্ত কাঙাল
যতীন্দ্র বাঙাল
খাঁখাঁ মরুভূমি মাঝে শ্রীদেবেন্দ্র খাঁ—
দেখে শুনে হইয়াছি হাঁ—

পুরাতন কাল হ'ল গত,
মেম্বর ফলের ভারে আজি অবনত
কংগ্রেস পাদপ কিবা শোভিছে সুন্দর—
মোর হইয়া চাঁদা দেয় স্বরাজীর চর—
মোর ভোট—তাও দেয় তারা—
ধন্য তুমি ডারউইন ধন্য তব বিবর্তন ধারা—
ধন্য জেম সেন
সন্তোষ কুমারী ধন্যা—আরিফ হোসেন
জয় তু শঙ্কর—
মানুষ দেবতা হয়, মানুষ বানর—
অর্থগুণে গো-স্বামীও মানুষের নেতা—
শৈলাবাসে স্বরাজীর অঙ্কশায়ী শ্বেতা—
ধন্য বঙ্গ দেশ,
চক্ষেতে বাঁধিয়া ঠুলি ঘানি টানে বেশ।

কার্তিক ১৩৩৩

তিনি

রূপকথা

পরিমল গোস্বামী

তিনি আসিতেছেন। একটা হুলুস্থূল ব্যাপার। শহরের লোকের তিন দিন রাত্রে ঘুম নাই, দিনে ভাল করিয়া খাওয়া হয় না—কাজে মন বসে না। এরূপ ভয়ঙ্কর উত্তেজনা হইলে কি খাওয়া যায় না ঘুমানো যায়। ১১ই ভাদ্র তিনি আসিবেন, আজ ১০ই, শহরময় শিশু যুবক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেরই ভয়—তিনি আসিলে পাছে তাঁহার যত্নের ত্রুটি হয়। উত্তর শহরে বিরাট দল গঠন করা হইয়াছে, কথা হইয়াছে তিনি সেখানেই উঠিবেন। হাওড়া স্টেশনে বেলা ১০।টায় যে গাড়ি আসিবে সেই গাড়িতে তাঁহার আসিবার কথা। গাড়ি হইতে তিনি নামিবামাত্র তাঁহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করা হইবে ইহা লইয়া আজ পনেরো দিন ধরিয়া তর্ক বিতর্কের আর শেষ নাই। কেহ বলিতেছে ফুলের মালা গলায় পরাইয়া আটশত বালিকা অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাহিবে—কেহ বলিতেছে তিনি ট্রেন হইতে নামিবামাত্র একশত একটি কামান আওয়াজ করিতে হইবে। আর একদল তর্ক তুলিয়াছে, কামান কোথায় পাওয়া যাইবে—ওরকম অসম্ভব কথা আমরা শুনিব না—আমরা একশতটি জয়ঢাক বাজাইতে চাই। এ তর্কের শেষ না হওয়াতে স্থির হইল—সকলের কথাই রাখিতে হইবে, ফুলের মালাও গলায় উঠিবে—কামানও ছাড়িতে হইবে, জয়ঢাকও বাজিবে। আবার কথা উঠিল, কামান কোথায় পাওয়া যাইবে। কামানের দল হইতে একজন চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—যেখান হইতে হউক কামান যোগাড় করিতেই হইবে—না হইলে মান থাকিবে না।

জয়ঢাকের পক্ষ হইতে একজন বলিল—আমরা উহা লইয়া মাথা ঘামাইতে পারিব না, আমাদের কাজ আমরা করিয়া যাইব। কামান জোটে ভাল, না জোটে জয়ঢাক বাজিবে। মালার দলের একজন বলিল, আমাদেরও সেই কথা—কামান যদি না পাওয়া যায় মালা গলায় উঠিবেই।

কামানপক্ষীয় ইহা শুনিয়া বলিল—আমরা সে ভার লইতেছি, আমাদের কামানের আওয়াজ লইয়া তোমাদের মাথা ব্যথার কারণ দেখি না।

একথায় আশ্বস্ত হইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলিলেন,—তাহা হইলে তোমাদের উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি?

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়।

অভ্যর্থনা সমিতিতে প্রায় দুইশত লোক যোগ দিয়াছিল, ইহাদের আলোচনা শেষ হইবামাত্র এক কোণ হইতে প্রায় পঁচিশজন লোক চিৎকার করিয়া উঠিল, আমরা এ প্রস্তাব মানিব না।

সভাপতি অবাক হইয়া বলিলেন—তোমরা কে হে? তখন চিৎকারকারীদের মধ্যেকার একজন উঠিয়া বলিল—আমরা দক্ষিণ শহর হইতে আসিয়াছি। আপনারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উত্তর শহর হইতেই সকল বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতেছেন—আমরা দক্ষিণ শহরের লোকেরা কি ভাসিয়া আসিয়াছি? বসিয়া বসিয়া এতক্ষণ দেখিতেছিলাম, আপনাদের অহঙ্কার বড় বেশি হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ চলিবে না। আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া যদি আপনারা উত্তর শহরের লোকেরাই কেবল স্টেশনে যান তাহা হইলে আমরা সমস্ত পণ্ড করিয়া দিব, সে কথা আগেই বলিয়া রাখিতেছি।

উত্তর শহরের সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে আমাদের কাজ পণ্ড করিবে?

দক্ষিণ শহরের পঁচিশজন প্রতিনিধি সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আমরা যুদ্ধ করিব। আমাদের দলে পঞ্চাশ হাজার ভলান্টিয়ার আছে, যদি রাজি থাকেন আজ বিকালেই আরম্ভ করি।

উত্তর শহরের সভাপতি দেখিলেন উহারা যেরূপ ভাবে শাসাইতেছে তাহাতে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইতে পারে। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, কিছু দরকার নাই, তোমাদের কথা শুনিতে আমি রাজি আছি।

এই কথার পর সহজেই দুই দলের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল। ঠিক হইল উত্তর এবং দক্ষিণ শহরের সকলেই অভ্যর্থনা সমিতিতে যোগ দিতে পারিবে। উত্তর শহর ফুল এবং জয়ঢাক—দক্ষিণ শহর হার্মনিয়ম এবং গান করিবার জন্য সাড়ে তিন শত বালিকা যোগাড় করিবে। ইহা ছাড়া তিনি উত্তরেও যাইতে পারিবেন না, দক্ষিণেও যাইতে পারিবেন না—উত্তর দক্ষিণের মাঝামাঝি হ্যারিসন রোডের ধর্মশালায় উঠিবেন। আরো কথা হইল—স্টেশন হইতে ধর্মশালা পর্যন্ত সমস্ত পথে কার্পেট বিছাইয়া দিতে হইবে এবং দক্ষিণ শহরের পীড়াপীড়িতে ঠিক হইল সমস্ত পথ গ্যাস এবং বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত করিতে হইবে—দিনের বেলা বলিয়া খাতির করা চলিবে না।

আলোচনা চলিতেছে ইতিমধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, আসল কথাটাই চাপা পড়িয়াছে—তাঁহাকে আনা হইবে কিসে?—স্টেশন হইতে কি ট্যাক্সিতে আসিবেন? এই কথা শুনিবামাত্র সভার মধ্যে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই এক কথা—তাই তো, তিনি আসিবেন কিসে? অনেক গবেষণা হইল, অনেক তর্ক হইল—পূরা এক ঘন্টা ঝগড়া হইল—এবং সকলের শেষে উত্তর শহরের লোকদের মধ্যে মতভেদ হইয়া মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। তাহাদের একদল বলিল একশত ঘোড়ার গাড়িতে আনিতে হইবে—আর এক দল বলিল ফুল দিয়া সাজানো মোটর গাড়িতে আনিতে হইবে। সাধারণ ভাবে তর্কযুদ্ধই চলিতেছিল, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটা অত্যন্ত খিটমিটে স্বভাবের লোক থাকিয়াই সব মাটি করিল। সে তর্ক করিতে করিতে হঠাৎ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গালে এক চড় বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী অজ্ঞান হইয়া পড়িল—তখন মার মার করিয়া সেই আঘাতকারীকে সকলে মিলিয়া মারিতে লাগিল। সে কি ব্যাপার!—সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কাহারো মাথার ঠিক নাই শেষে অতি কষ্টে দক্ষিণ শহরের দল আক্রান্ত লোকটিকে একপাল লোকের চাপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া দেখিতে পাইল যে-লোকটা অপরাধী সে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে—এখন সকলে মিলিয়া যাঁহাকে মারিতেছিল তিনি উত্তর শহর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বেচারা নির্দোষ—উত্তেজনার মুখে মারাত্মক ভুল হইয়া যাওয়াতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে।

সভাপতিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া আর উপায় ছিল না। একটা আহত লোককে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া কঠিন কাজ নহে, কিন্তু তিনি যখন আসিবেন তখন কি করিয়া তাঁহাকে ধর্মশালায় আনা যাইবে ইহার কোনো মীমাংসা হইল না। সভাপতি আহত হওয়াতে উত্তর শহর নীরব হইয়া গেল। দক্ষিণ শহরের লোকদের মধ্যে চোখের ইসারা চলিতে লাগিল—একজন চুপে চুপে আর একজনকে বলিল, দাদা, এইবার আমাদের সুযোগ—এ সুযোগ অবহেলা করিও না। পাঁচ মিনিট পরামর্শ করিয়া দক্ষিণ শহরের প্রতিনিধিরা ঠিক করিয়া ফেলিল তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া আনিতে হইবে, কারণ এত বড় মহৎ লোককে পশু কিংবা হাওয়া গাড়ি বহন করিবে ইহা কিছুতেই হইতে পারে না।

* * *

আজ ১১ই ভাদ্র। শহরের উত্তেজনা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—রাজপথে কাতারে কাতারে লোক জড়ো হইয়াছে। ভাদ্র মাসের আকাশ—পালা করিয়া বৃষ্টি এবং রৌদ্র জনতার শিরে বর্ষিত হইতেছে কিন্তু কাহারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ কলিকাতার পক্ষে

এক স্মরণীয় দিন। সকলেরই মনে বিস্ময় এবং উল্লাস জাগিয়া উঠিয়াছে। পকেট-কাটাগণ এই সুযোগে নির্বিবাদে দুই হাতে লোকের পকেট কাটিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ি ঘোড়া ট্রাম বাস সব বন্ধ—ভীড়ের ভিতর কাহারো চলিবার উপায় নাই। 'আজ ১০।টায় তিনি আসিবেন—হাওড়া স্টেশনে লোকে লোকারণ্য—গঙ্গার পুল ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। শত শত লোক মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে। একশতটি জয়ঢাক আসিবার কথা ছিল কিন্তু কলিকাতার সমস্ত জয়ঢাকওয়ালা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাওড়া স্টেশনে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। আজ দক্ষিণ শহরের জয়জয়কার। এক সঙ্গে চারিজন লোকের ঘাড়ে উঠিয়া তিনি ধর্মশালায় আসিয়া পৌঁছিবেন। কিন্তু স্টেশন হইতে ধর্মশালা কতটুকু পথ? দক্ষিণ শহরের লোকের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? সমস্ত শহরের লোক তাঁহাকে একটু দেখিবার জন্য আজ পনেরো দিন হইতে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে, দর্শন পিপাসায় তাহাদের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহারা কি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না? তাহাদের পিপাসা কি মিটিবে না? ইহা কখনো সম্ভব নহে। তিনি স্টেশন হইতে আসিয়া হ্যারিসন রোড—চিৎপুর রোডের সঙ্গম স্থলের নিকটে যে ধর্মশালা আছে সেখানে উঠিবেন বটে, কিন্তু সোজা পথে তিনি আসিবেন না।

তিনি স্টেশন হইতে প্রথম স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়া আলিপুর খিদিরপুর হইয়া কালিঘাট যাইবেন। সেখান হইতে টালিগঞ্জ হইয়া বালিগঞ্জে আসিবেন, তার পর সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় রসারোড চৌরঙ্গী ধর্মতলা হইয়া শিয়ালদহে আসিবেন। সেখান হইতে হ্যারিসন রোড দিয়া কলেজ স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট হইতে ওয়েলিংটন স্ট্রীট, সেখান হইতে পুনরায় ফিরিয়া সমস্ত বৌবাজার স্ট্রীট প্রদক্ষিণ করিবেন। তারপর সেখান হইতে ছাতাওয়ালা গলির ভিতর হাসুং চাং নামক একজন চীনাম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া ক্যানিং স্ট্রীট হইয়া চিৎপুরের পথে বাগবাজার যাইবেন। বাগবাজার স্ট্রীট হইতে সার্কুলার রোডে পড়িয়া বরাবর শিয়ালদহে আসিবেন এবং আবার হ্যারিসন রোড দিয়া কলেজ স্ট্রীটে এবং সেখান হইতে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া শ্যামবাজারে আসিবেন। তারপর শ্যামবাজার হইতে বেলগাছিয়া মেডিকাল কলেজের সম্মুখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়া পুনরায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইয়া গ্রে স্ট্রীটে পড়িবেন। সেখান হইতে চিৎপুর রোডে আসিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ একবার বীডন স্ট্রীটটা ঘুরিয়া আসিবেন। বীডন স্ট্রীট দেখা শেষ হইলেই চিৎপুর দিয়া সোজা ধর্মশালায় গিয়া উঠিবেন। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ করিতে তিন দিন লাগিবে এবং এই তিন দিনে তিনি ক্রমান্বয়ে তিনশত লোকের ঘাড়ে উঠিবেন। এবং তিনশত লোকেও যদি অকুলান হয় তাহা হইলে আরো তিনশত অতিরিক্ত লোক তাঁহাকে বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। গত রাত্রি হইতে এই ছয় শত লোক ঘাড়ে ক্রমাগত নানারূপ তেল মালিশ করিয়া আসিতেছে।

হাওড়া স্টেশন। বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। সকাল হইতে যতগুলি গাড়ি স্টেশনে আসিয়াছে তাহার যাত্রীগণ কেহই প্রবল ভীড় ঠেলিয়া স্টেশনের বাহিরে যাইতে পারে নাই—প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহ মনে করিতেছে ভালই হইল, তাঁহাকে দেখিবার এমন শস্তা এবং সহজ সুযোগ তো আর মিলিত না। আবার কেহ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুখ চোখ বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—গাল পাড়িয়া যে একটু মনের জ্বালা মিটাইবে সে উপায় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই প্রহার খাইতে হইবে,—রকম-সকম দেখিয়া এটা তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল।

সুখে হোক দুঃখে হোক সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। সুতরাং কাহারো সুখের সময়, কাহারো দুঃখের সময় কাটিয়া গিয়া ১০।টা বাজিয়া গেল। যাহারা প্ল্যাটফর্মের ধারে গিয়া পড়িয়াছিল পুলিস আসিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া দিল—গাড়ি এখনি আসিয়া পড়িবে। ঐ যে গাড়ি দেখা যায়—এঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিতেছে। লক্ষ

লোকের হর্ষ-ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। ঠেলাঠেলি এবং উত্তেজনায় কত লোক চাপা পড়িয়া জখম হইল, কত লোক মরিয়া গেল তাহা দেখিবার সময় কাহারো ছিল না।

গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। ভলান্টিয়ারগণ অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে তাঁহার কামরার দরজা খুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি কি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে—পতিতকে উদ্ধার করিতে সত্যই আসিলেন? আর কোনো সন্দেহ নাই তিনি সত্যই আসিয়াছেন। ঐ যে দেখা যাইতেছে। ঐ যে তিনি,—মাথায় জটা, মুখে দাড়ি, হাতে চুরুট, পরনে বাঘছালের হাফপ্যান্ট, পায়ে বুট জুতা। ঐ যে তাঁহার হাত ব্যাগ নামিল—উপরে লেখা রহিয়াছে "Glass with Care." গায়ে কিছুই নাই, দাড়ি কোমর পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে—উহাই সমস্ত বক্ষঃস্থল ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মুখ চোখের রং ঘোর লাল—দেখিবামাত্র মনে একই সঙ্গে ভয় এবং ভক্তি সঞ্চার হয়। কি উন্নত শির, কি বলিষ্ঠ দেহ-গঠন আর কি জ্যোতির্ময় চাহনী!

তিনি নামিবামাত্র তাঁহার পায়ের ধূলা লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ভীড়ের চাপে কেহই নীচু হইয়া পা ছুঁইতে পারিতেছে না। অথচ পায়ের ধূলা না লইতে পারিলে এত পরিশ্রম, এত আড়ম্বর সব বৃথা হয়। ধূলা লইতেই হইবে। একজন বলিষ্ঠ এবং জোয়ান ভক্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণপণ শক্তিতে পাশের লোকগুলিকে ঠেলিয়া দিয়া হঠাৎ তাঁহার পা ধরিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। একটি লোকের সাষ্টাঙ্গ প্রণামের দরুন যে জায়গাটা ফাঁকা হইল সেইখানে আরো একজন হঠাৎ তাঁহার আর এক পা ধরিয়া শুইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া কাছে যত লোক ছিল সকলেই একে একে সটান শুইয়া পড়িল। পাশে তো আর জায়গা ছিল না কাজেই পরে যাহারা পায়ের ধূলা লইবার জন্য আসিল তাহারা সকলেই পর পর পিঠের উপর শুইতে লাগিল। তাঁহার পা আর স্পর্শ করা যায় না—কিন্তু ভক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন কোনো দিকেই খেয়াল থাকে না। যাহারা তখনো দাঁড়াইয়াছিল তাহারা মনে করিল শোয়া লোকগুলিই প্রকৃত ভক্তি দেখাইতেছে—আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না।

ইহা মনে হইতেই তাহাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। তখন এক যোগে হৈ হৈ করিতে করিতে সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। লোকের মনে তখন আগুন জ্বলিতেছে—তাহাদের আবেগ থামায় কাহার সাধ্য? তিন মিনিটের মধ্যে সেখানে শোয়া-লোকের একটা পাহাড় রচিত হইল। সে দৃশ্য কি অপরূপ! ঝুড়ির মধ্যে ইলিশ মাছকে যেমন চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সাজাইয়া রাখা হয়, ইহারাও অনেকটা সেই ধরনে তাঁহাকে ঘিরিয়া হাওড়া প্ল্যাটফর্মে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিল। তিনি মাঝখানে দাঁড়াইয়া—কিন্তু শায়িত মানুষের গাদা ভেদ করিয়া কাহার দৃষ্টি তাঁহার কাছে পৌঁছিবে? যাহারা স্তূপের উপর উঠিতে পারিল না তাহারা অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। স্তূপের উপর শুইয়া পড়িতে তাহাদের যে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে। ইচ্ছা পূরা মাত্রায়ই ছিল, শুধু উপায় ছিল না। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরে যে টিনের ছাউনি আছে স্তূপের উচ্চতা প্রায় তত দূরই পৌঁছিয়াছে—মাঝখানে সামান্য কয়েক ফুট ফাঁকা আছে বটে কিন্তু টিন রৌদ্র-তাপে এত গরম হইয়া উঠিয়াছে যে সেখানে কাহারো থাকা অসম্ভব। উপরের লোকগুলিরই যদি এই অবস্থা তাহা হইলে সকলের নীচের স্তরের লোকগুলি এত লোকের চাপে বাঁচিয়া আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কিন্তু ইহার পরেই যে ঘটনাটি ঘটিল তাহাতে সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়াছে।

পায়ের ধূলাপ্রার্থী শোয়া-লোকগুলির এইরূপ স্বার্থপর ব্যবহারে বাহিরের লোকগুলি অত্যন্ত চটিয়া গিয়া স্তূপ ভাঙিয়া দিবার জন্য জোর পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন সরস-চরিত্রের লোক বলিল, আমি সব গণ্ডগোল মিটাইয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া সে স্তূপের নীচের লোকগুলির পায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য কাহারো পা একটু নড়িল না! ইহাতে সে মর্মাহত হইয়া চিমটি কাটিতে লাগিল, কিন্তু কোনো সাড়া নাই। লোকটি

অবাক হইয়া পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একজনের পায়ের নীচে একটা জ্বলন্ত কাঠি ধরিল—তথাপি কোনো সাড়া মিলিল না। সকলে বুঝিতে পারিল উহারা আর বাঁচিয়া নাই। তখন বিবেচনাশূন্য হইয়া উহারা স্তূপের উপরকার লোকগুলির পা ধরিয়া টানিয়া নামাইতে লাগিল। লোকগুলি "ধূলা পাই নাই" "ধূলা পাই নাই" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে নীচে পড়িতে লাগিল। তিন চারিশত লোককে যখন হিড় হিড় করিয়া টানিয়া সরাইয়া দেওয়া হইল তখন দেখা গেল তিনি স্থির দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিয়া আছেন। মনে হইল যেন স্টেশনের ঘড়ি দেখিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র আবার আনন্দকোলাহল আবার জয়ধ্বনির ফোয়ারা ছুটিল। কতগুলি লোক চিৎকার করিয়া বলিল ঐ দেখ ঐ দেখ তিনি পোশাক বদলাইয়া ফেলিয়াছেন—পরনে সে বাঘছালের হাফপ্যান্ট নাই, পায়ের বুটজুতা কোথায় গিয়াছে, তৎপরিবর্তে সিল্কের পাঞ্জাবি, গেরুয়া রঙের ধুতি এবং পেটেন্ট লেদারের সেলিম জুতা পরিয়াছেন। কেবল মাথার জটাগুলি ঠিক রহিয়াছে। একজন আন্দাজ করিল ভক্তেরা পায়ের ধূলা পাইবার জন্য টানাটানি করিয়া পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং পা মনে করিয়া বাঘছালের হাফপ্যান্ট ধরিয়া টানাটানি করাতে সেটাও আর রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার সুটকেস পাশেই ছিল, স্তূপের নীচের লোকগুলি মরিয়া যাইবার পর যখন তাহাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল তখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি পোশাক পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন।

আজ ১৫ই ভাদ্র। ১১ই তারিখ হইতে ১৪ই পর্যন্ত তিনি কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়াছেন। যে ছয়শত লোক ঘাড়ে তেল মালিশ করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছিল তাহাদের সকলেই একে একে তাঁহাকে বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে উত্তর শহরের দুই শত এবং দক্ষিণ শহরের চারি শত লোক মিলিয়া ছয় শত বাহক পূরা হইয়াছিল। এদিক দিয়া দক্ষিণ শহরই জয়লাভ করিয়াছে।

কিন্তু আজ ১৫ই ভাদ্র। আজ বিরাট সভা। তিনি আজ সভায় উপস্থিত থাকিবেন. আসলে তাঁহার জন্যই এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে। কলিকাতা এবং মফঃস্বল মিলিয়া যাহাতে ১০ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গড়ের মাঠে সভার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

বিকাল চারিটার সময় তিনি সভায় উপস্থিত হইবেন, কিন্তু সকাল হইতেই কাতারে কাতারে ময়দানের দিকে লোক চলিতেছে। সমগ্র বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত এরূপ দৃশ্য কেহ দেখে নাই। সকলে বলাবলি করিতেছে মোহনবাগান-ডারহাম খেলাতেও এরূপ ভীড় কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। খেলা তো খেলা মাত্র, উহার বেশি কিছু নহে—কিন্তু যাহা সকল খেলার উপরে—যাহার উপরে লোকের বিপুল ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে—যাঁহাকে দেখিলে কতখানি পুণ্য লাভ হইবে কেহ তাহা কল্পনা করিতে পারে না—তাহার সঙ্গে খেলার তুলনা?

তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মনুমেন্ট হইতে বিদ্যুতের পাখা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তিনি আসনে বসিয়া হাওয়া খাইতেছেন। আজ তাঁহার চক্ষু অর্ধ নিমীলিত। শুনা যাইতেছে ছাতাওয়ালা গলিতে ঢুকিয়া হাসুং চাংএর সঙ্গে দেখা করিবার পর হইতে তাঁহার জ্যোতির্ময় বিস্ফারিত আঁখি অর্ধেক বুজিয়া গিয়াছে।

সভার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। উত্তর শহরের সেই সভাপতি যিনি হাসপাতালে ছিলেন, তিনি আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। দক্ষিণ শহরের লোকেরা খাতির করিয়া তাঁহাকেই অদ্যকার সভার সভাপতি করিয়া দিয়াছে। সভাপতি দাঁড়াইয়া মাইক্রোফোনের কাছে মুখ দিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বেতার যন্ত্রে যাহাতে "তাঁহার" বক্তৃতা এবং সভার যাবতীয় আলোচনা সমস্ত বাঙালী শুনিতে পারে এই বিবেচনা করিয়াই সভাস্থলে মাইক্রোফোন স্থাপন করা হইয়াছে। বিরাট সভার প্রত্যেকেই যাহাতে বক্তৃতাদি নিখুঁত ভাবে শুনিতে পারে তাহার জন্য অনেকগুলি "লাউডস্পীকার" বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলকথা কোনো দিকেই

কোনো ত্রুটি দেখা যাইতেছে না,· কেননা আজ রামা-শ্যামা-যদু-মধু নহে, আজ সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন তিনি।

সভাপতি বলিতে লাগিলেন—

আজ যাঁহার জন্য এই সভা তিনি কে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া রস-ভঙ্গ করিবেন না। আমি নিজেও জানি না তিনি কে। তিনি চিরকাল আছেন—এবং চিরকাল থাকিবেন—মাঝখানে আমরা সাধারণ লোকেরা নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইব—পিছনে কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাইব না। অতএব তিনি "কে" এই অনাবশ্যক প্রশ্নটি তুলিবার কোনো দরকার নাই। তাঁহার নিকট হইতে যতটা পারি গ্রহণ করি—ইহাই আমাদের এখনকার সর্বপ্রধান কর্তব্য। গ্রহণ করিব এইটিই বড় কথা—কি গ্রহণ করিব কেন গ্রহণ করিব এই সব যুক্তিহীন প্রশ্ন আজ চাপা পড়ুক।

আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, তিনি ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের দিকে মিটমিট করিয়া চাহিতেছেন,—ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি আজ কেবল ফুটবলের পরিণতি সম্বন্ধেই যাহা কিছু বলিবেন। হয়ত তিনি বলিবেন বৃহৎ জিনিস মাত্র গোলাকার হইয়া থাকে। আকাশের সূর্য চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই গোলাকার—এবং ফুটবল গোলাকার। ইহাতে কি বুঝা যায়? কি বুঝা যায় তাহা অবশ্য আপনারাও জানেন না আমিও জানি না—জানিলে এই সভার কোনো প্রয়োজনই হইত না। আমরা কিছু জানি না বলিয়াই তিনি আসিয়াছেন—আমরা নির্বোধ বলিয়াই তিনি দেখা দিয়াছেন—অথবা এরূপও হইতে পারে তিনি ফুটবল সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া রেলোয়ে এঞ্জিনের সঙ্গে দেশ-নেতার কতখানি মিল আছে এবং কোন কোন বিষয়ে মিলের অভাব আছে ইহাই ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন এ সমস্তই আমার অনুমান মাত্র, কারণ চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারার বিদ্যা আমি কখনো শিখি নাই। এই পর্যন্ত বলিয়াই সভাপতি বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চটাপট্ হাত তালি পড়িতে লাগিল।

হাত তালির পালা শেষ হইলে দক্ষিণ শহরের দলপতি উঠিয়া বলিলেন—এই মাত্র সভাপতি মহাশয় যাহা অনুমান করিলেন তাহার সহিত আমার অনুমানের ঘোর অনৈক্য আছে। আমি শীঘ্রই আপনাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছি।

এই কথা বলিয়া দক্ষিণ শহরের দলপতি "তাঁহার" কাছে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখচোখ অতি নিপুণ ভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুইজনের মুখের দূরত্ব রহিল পাঁচ ইঞ্চি। ইহাতে নিকটস্থ ভদ্রলোকেরা বিপদ আশঙ্কা করিয়া খুব ভয়ে ভয়ে সে দিকে তাকাইয়া রহিল। দক্ষিণ শহরের দলপতি যদি তাঁহাকে এই ভাবে অকারণ অপমান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে তাহারা মারিয়া ফেলিতেও ইতস্তত করিবে না· কয়েকজন ব্যায়াম সমিতির সভ্য এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিল।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ ভয়ঙ্কর কিছু করিবার দরকার হইল না, কারণ দলপতি চট্ করিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—তিনি কি বলিবেন আমি তাহা যথার্থ অনুমান করিয়াছি। পূর্ববর্তী বক্তা যাহা বলিয়াছেন তাহা মূল বিষয়ের চামড়াও ভেদ করে নাই—কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, আপনারা লক্ষ্য করিবেন—তাহা চামড়া ছাড়াইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। বন্ধুবর বলিয়াছেন তিনি ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন অতএব ফুটবল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। ইহার চেয়ে অন্তঃসারশূন্য কথা আর হইতে পারে না। তাকাইয়া থাকাই যদি দেখা হইত তাহা হইলে তো আমরা সকলেই দেখি। আমরা সকলেই তো তাহা হইলে দার্শনিক! কিন্তু ইহা অত্যন্ত সহজেই বুঝা যাইবে যে আমরা দার্শনিক নহি। তাহা যদি হইতাম তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দশা কেন? আমরা দার্শনিক নহি ইহা যখন একপ্রকার স্থির হইয়া গেল,—তখন কোন্ কথাটিকে আর রোধ করা যায় না? কোন্ কথাটি একেবারে শরৎ কালের আকাশের মত অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে বোঝা যায়? সে কথাটি কি

এখনো আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? তিনি যে একজন ঘোরতর দার্শনিক ছাড়া আর কিছু নহেন এ কথা কি এখনো আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না? দেখুন, আমি খুব সহজেই প্রমাণ করিয়া দিলাম যে তিনি একজন দার্শনিক। এখনো আপনারা আমার কথা চুপচাপ মানিয়া যান—তাহা না হইলে সর্বনাশ হইবে। আমার সামান্য কথাতেই যাহা প্রমাণ হইল তাহার জন্য অন্য প্রমাণ উপস্থিত করা আমি নীচতা এবং অতি জঘন্য স্বার্থপরতা বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু তথাপি আপনাদের তুষ্টির জন্য আমি যে-কোনো কাজ করিতে রাজি আছি। অর্থাৎ মুহূর্তেই আমি আরো একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সে দৃষ্টান্ত আমার হাতের কাছেই আছে। তাঁহার কাছে ঐ যে হাত-ব্যাগ রহিয়াছে উহা খুলিলেই আমরা দেখিতে পাইব উহার ভিতরে এই বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত প্ল্যান এবং অতি নিপুণতার সহিত প্রস্তুত একটি ভবদর্শনের ছক রহিয়াছে। আমার কথা সত্য হইলে এ ব্যাপারটাও সত্য হইতে বাধ্য। এই দেখুন, আমি এই ব্যাগ খুলিতেছি। এই বলিয়া দক্ষিণ-শহরের দলপতি ব্যাগ আনিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া দেখিতে পাইলেন তিনি ব্যাগ শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। দলপতি ইহার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ব্যাগের দিকে হাত বাড়াইলেন—তিনিও তৎক্ষণাৎ উহা অন্যদিকে সরাইয়া হাঁটুর নীচে চাপা দিলেন। ব্যাগ সরাইবার সময় তাহার ভিতর হইতে ঝন ঝন করিয়া আওয়াজ হইল—উপরে লেখা ছিল "Glass with care" সে কথাটা দলপতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, আমি তো সামান্য মানব। আপনাদিগকে এখন একটি ভয়ানক কথা বলিব। আমি যাঁহাকে সামান্য দার্শনিক বলিয়া খাড়া করিয়াছি, তিনি সে সব কিছুই নহেন, তিনি দেবতা। তিনি মানবজাতিকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য হাতব্যাগে অমৃত বহন করিয়া আনিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি বক্তৃতা দিবার পর আমাদিগকে অমৃত পান করাইবেন। আপনারা যাঁহারা অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে চান, তাঁহারা দয়া করিয়া বসিয়া থাকুন, সভাভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কেহ উঠিয়া যাইবেন না।

এই কথার পর একজন বৃদ্ধ উঠিয়া বলিলেন—বাবা, অনন্তজীবন পাইতে আপত্তি নাই কিন্তু আমার একটি কথা রাখিবে কি? আমি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একটি বিবাহ করিয়াছিলাম তাহার দরুন যে স্ত্রীটি পাইয়াছিলাম সে আজও বাঁচিয়া আছে। অমৃত পান করিলে আমার উপায় কি হইবে? সে তো যথাসময়ে মরিয়া যাইবে কেবল আমিই কি অনন্ত কাল ধরিয়া তাহার স্মৃতি বহন করিয়া কাটাইব? তাহার চেয়ে এক ফোঁটা অমৃত আমার গিন্নীর জন্য যদি বরাদ্দ কর তাহা হইলে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি। দেখ যদি অসুবিধা হয় তাহা হইলে থাক, আমি সভা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ প্রায় তিন লক্ষ লোক তাহাদের মতামত জানাইবার জন্য এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সভার এক কোণ হইতে একটা ভীষণ কোলাহল আরম্ভ হইল। সহস্র লোকের কণ্ঠস্বর যেন একটি লাইন ধরিয়া ক্রমশঃ সভাপতির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। সকলেই অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দশ মিনিট পর সভাপতি দেখিতে পাইলেন একটা বলিষ্ঠ-দেহ খর্বাকৃতি চীনাম্যান একটা কাপড়ের প্যাকেট লইয়া ভীড় ঠেলিয়া মনুমেন্টের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এইবার "তিনি"ও উহাকে দেখিতে পাইলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। "তাঁহার" অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল, তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাত ব্যাগটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া তবলা বাজাইবার ভঙ্গিতে ব্যাগ বাজাইতে লাগিলেন। আঙুলের প্রতি আঘাতে ভিতর হইতে ঠুং ঠাং আওয়াজ হইতে লাগিল। যাহারা পূর্বে লক্ষ্য করে নাই তাহারা লক্ষ্য করিল ব্যাগের উপরে লেখা রহিয়াছে Glass with care.

চীনাম্যান হন হন করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহার স[illegible] যে

কাপড়ের বাণ্ডিল ছিল তাহার এক দিকে লেখা আছে হাসুং চাং ; ইহা দেখিয়া সকলেই হাসুং চাংকে নমস্কার করিল। হাসুং চাং সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমার সাহায্যে তিনবার তুড়ি দিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ হাসুং চাং-এর দিকে চাহিয়া অনুরূপ তুড়ির সাহায্যে তাহার উত্তর দিলেন। তাঁহার তুড়ির ইঙ্গিত পাইবামাত্র হাসুং চাং বাঘের মত চারি পাশের লোকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া এক একজন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যে বাণ্ডিল খুলিয়া ফেলিল। বাণ্ডিলের ভিতর কালো রঙের বারো হাত লম্বা এবং চওড়া একখণ্ড মোটা কাপড় ছিল। সেই কাপড় দিয়া হাসুং চাং ফস করিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া দিল। এবং তড়িৎবেগে সে নিজেও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। কেবল দেখা গেল কালো কাপড় মাঝে মাঝে নড়িয়া উঠিতেছে এবং শোনা গেল ভিতরে কাঁচের গেলাসের আওয়াজ হইতেছে। আধ ঘন্টাকাল বাহিরের লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন আকাশ ঘোর কালো হইয়া উঠিয়াছে—সেই বৃদ্ধ লোকটি বলিলেন, তিনি জীবনে কখনো এরূপ গুরুতর মেঘ দেখেন নাই। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। তারপর দশ লক্ষ লোকের ছুটাছুটি এবং চিৎকার, কোথায় রহিলেন তিনি, আর কোথায় রহিলেন হাসুং চাং। বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া দলে দলে লোক "তাঁহাকে" ঘাড়ে করিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কোথায় তিনি?—ঐ যে ঐ যে তিনি এবং হাসুং চাং আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় মরিয়া পড়িয়া আছেন! এবং পাশে পড়িয়া আছে চীনা-মদের তিনটি বোতল কতকগুলি ঔষধ এবং দুইটি পাইপ।

এ সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। চারি লক্ষ লোক সমস্বরে বলিল—হায় হায়। অন্য চারি লক্ষ লোক বলিল—হো হো হো হি হি হি। বাকী দুই লক্ষ লোক নীরবে সভা ত্যাগ করিয়া গেল।

হায় হায়-এর দল প্রচার করিল—তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন—এই হাসুং চাং বন্ধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া সমস্ত অমৃত দখল করিতে আসিয়াছিল, সে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে—এবং অমৃত পান করিতে গিয়া মাত্রাধিক্যবশত নিজেও মরিয়া গিয়াছে।

হোহো হিহির দল প্রচার করিল, ওসব কিছু না। তিনি কিছু দিন হইতে হাসুং চাং-এর নিকট হইতে চণ্ডু খাইতে শিখিয়াছিলেন—আজ চণ্ডু এবং মদ এক সঙ্গে খাইতে গিয়া কোনো অজ্ঞাত কারণে দুইজনেই মারা গিয়াছেন।

হায় হায়-এর দল জিজ্ঞাসা করিল—তিনি কে, এবং হাসুং চাং কে?

হোহো হিহির দল বলিল—তাঁহার পেটের উপরকার দাগ দেখিয়া বুঝিলাম তিনি কাশীর বিখ্যাত গুণ্ডা আটিয়া সিং। চীনাটাকে চিনি না।

হায় হায়-এর দল বলিল, মিথ্যা কথা, এবং মহামানব সম্বন্ধে এ একটা হীনতম জঘন্য অপবাদ।

অতঃপর হাসুং চাং হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া হায় হায়-এর দল "তাঁহাকে" ঘাড়ে করিল, এবং হোহো হিহির দল হাসুং চাংকে ঘাড়ে করিল। দুই দল একসঙ্গে শ্মশানে রওনা হইল, এবং দুই দল একসঙ্গে গান ধরিল, প্রথম দল গাহিতে লাগিল—কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব—

দ্বিতীয় দল গাহিতে লাগিল—বাগিচায় বুলবুলি তুই—। তৃতীয় দল এসব কিছুই করিল না—তাহারা পরদিন ওয়েলিংটন স্কয়ারে সভা করিয়া রিজল্যুশন পাস করিল যে আত্মা দেহ-ঘটিত মৃত্যু-অবসানে পর পর সাতটি নভস্তরে বাস করিয়া ভগবানে লীন হয়।

ভাদ্র ১৩৪০

কনে

"ভাস্কর"

১

নিকুঞ্জবাবুকে পটলডাঙা অঞ্চলে সকলেই চেনে। কলিকাতায় তাঁহার পাঁচখানি বাড়ি। চারিখানি একেবারেই ভাড়া দেওয়া আছে। সবচেয়ে ছোট যেখানি, সেখানিরও অধিকাংশ ইট, কাঠ, টিন এবং চট, এই চারি প্রকারের পার্টিশন দ্বারা নানাভাগে ভাগ করিয়া ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশের তিনখানি ঘরে স্বয়ং, মাতৃহীনা একমাত্র পুত্র এবং একটি স্কন্ধারূঢ় ভাইপোকে লইয়া বাস করেন। পাড়ার লোক তাঁহাকে কৃপণ ইত্যাদি বলে, আবার শ্রদ্ধা-ভক্তিও করে।

পুত্রটি মাঝারি, অর্থাৎ সব বিষয়েই মাঝারি। আকারে মাঝারি, বর্ণে মাঝারি, বুদ্ধিতে মাঝারি, পড়াশুনায় মাঝারি, স্বাস্থ্যে মাঝারি। কিন্তু স্বভাবটির জন্য সে বাড়িতে এবং বাড়ির বাহিরে সকলেরই একান্ত আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে। ভাইপোটি কিন্তু খুব স্মার্ট। সমবয়সী হইলেও সে সর্বদাই তাহার জেঠতুতো ভাইটিকে নাবালক বলিয়াই মনে করে এবং সর্বদা সর্ববিষয়ে তাহাকে আদেশ ও উপদেশ দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। উভয়েরই মনটি ভাল। সুতরাং সমস্ত বিষয়েই ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন স্বভাব সত্ত্বেও উভয়ে উভয়কে অন্তরের সহিত ভালবাসে। এবার তাহারা দুইজনেই বি. এ. পাস করিয়াছে। পুত্রটি দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স পাইয়াছে, ভাইপো ডিসটিংশনে পাস করিয়াছে।

নিকুঞ্জবাবুর ইচ্ছা, পুত্রের বিবাহ দিয়া বহুদিনের শূন্য গৃহ পূর্ণ করেন। ভাইপো বলেন, এখুনি বিয়ে কিসের? বি. এ. পাস ক'রে বিয়ে করা আজকাল উঠে গেছে। জেঠা মহাশয় বলেন, আমি সেকেলে লোক, সেকেলে মতেই ছেলের বিয়ে দোব। ছেলে স্বয়ং কিছুই বলে না। তাহার মত মাঝারি ; বিয়ে হ'লে মন্দ কি? না হয় তো ব'য়েই গেল।

ঘটক আনাগোনা করিতে লাগিল। ঘর পছন্দ হয় তো মেয়ে পছন্দ হয় না, মেয়ে পছন্দ হয় তো ঘর পছন্দ হয় না। জেঠামশায়ের হয়তো মত হয়, ভাইপো বাঁকিয়া বসেন। ভাইপোর যদি পছন্দ হয়, জেঠামশায় বলেন, ওসব মেয়ে আমার বাড়িতে মানাবে না। ছেলে সব শোনে, কিন্তু জোর করিয়া কিছু বলে না।

একদিন ঠিক হইল, শ্যামপুকুরে একটি মেয়েকে দেখিতে যাইতে হইবে। ছেলে বলিল, তোমরাই আজ যাও, আমি যাব না। ভাইপো পাড়ার একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, চল, মেয়ে দেখে আসি। সঙ্গে একখানা নোটবুক নে। সব ডিটেলস চটপট টুকে নিবি, বুঝলি? আর শোন, একটা মাপবার ফিতেও নিস পকেটে।

বন্ধু বলিল, এই আমি আসছি কাপড়টা বদলে।

২

ওদিকে শ্যামপুকুরে একটি ছোট গলির মধ্যে, একখানি ছোট দোতলা বাড়ির নীচের তলায়, সামনের ঘরখানি একটু ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। গড়ে মাসে দুই তিন বার এরূপ করা হইয়া থাকে। কারণ, মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিতে তো আসিবেই। চারিখানি চেয়ারের মাঝে একটি কাপড়-ঢাকা টিপয়। পাশে একখানি তক্তাপোশ, তাহার উপর শতরঞ্জি এবং একখানি রঙিন সুজনি। দুইটি বিভিন্ন আকারের তাকিয়া—

পরিষ্কার ওয়াড়-পরানো। দেওয়ালের গায়ে যথারীতি কয়েকখানি ফোটো, কয়েকখানি বাঁধানো উলের কাজ, এবং একখানি ইংরেজী-বাংলা-মিশানো ক্যালেণ্ডার। ভিতরের দিকের দরজার পাশে, পর্দার নীচে একটি কালো কুকুর আধ ইঞ্চি জিব বাহির করিয়া ঝিমাইতেছে। কনের দাদা এবং পিসতুতো ভাই, কনের সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পিসতুতো ভাইটি একটি ছোট ফুলদানি আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম আগন্তুকদের জন্য নানারূপ আহার্যের ব্যবস্থা করা হইত। দুই তিন রকম ফল, দুই এক রকম ঘরে তৈয়ারি ছানা বা ক্ষীরের খাবার, দুই এক রকম নোনতা খাবার, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, লুচি, হালুয়া, আলুর দম, মাছ বা তরকারির চপ, আর তাহার সঙ্গে চা, শরবৎ, সিগারেট প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, এই রেটে চলিলে শুধু জলখাবার যোগাইতেই কন্যাপক্ষকে ফতুর হইতে হইবে। অনেকবার এমনও হইল যে, সমস্ত আয়োজনের পর শোনা গেল, কোন একটা তুচ্ছ অজুহাতে, যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা কেহই আসিলেন না। সুতরাং এখন আর অতদূর বাড়াবাড়ি করা হয় না। উপস্থিতমত, কিছু নোনতা আর মিষ্টি খাবার এবং চা, ইহারই ব্যবস্থা আছে। পরে উভয় পক্ষের আগ্রহের তারতম্য অনুসারে আদর-আপ্যায়নের মাত্রাও কম বেশি করা যাইতে পারিবে।

কনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। সে কিছুতেই সাজিতে চায় না। যাহা পরিয়া সে কলেজে যায়, তাহা ছাড়া আর কিছুই পরিবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর শুধু শাড়িখানি বদলাইতে এবং কানে দুল পরিতে রাজি হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঠিক কলেজের পোশাকেই আছে। নীচু-গোড়ালি স্ট্র্যাপ-দেওয়া জুতা, পুরা-হাতা অ্যান্টি-টন্‌সিল-কলার-ওয়ালা ব্লাউজ, আধ-এলো খোঁপা আর সরু কয়গাছি চুড়ি। অনেক বলিয়া কহিয়া বউদির লকেট-হারগাছিও পরানো হইয়াছে। স্নো, পাউডার, রুজ, লিপস্টিক—কিছুই ব্যবহার করিতে রাজি করা গেল না। দেখিলেই অভিনেত্রী বলিয়া ভুল করিবার কোন আশঙ্কাই রহিল না।

৩

জেঠামহাশয়, ভাইপো এবং বন্ধু যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। কনের দাদা এবং পিসতুতো ভাই দরজার কাছেই ছিলেন। তাঁহারা সবিনয় অভ্যর্থনা জানাইয়া আগন্তুকদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলেন। যথারীতি কুশলপ্রশ্নাদির পর চা এবং জলখাবার আনা হইল। ভাইপো এবং বন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারগুলি নিঃশেষ করিলেন। জেঠামহাশয় অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর একটি সন্দেশের এক কোণ হইতে একটি টুকরো ভাঙিয়া লইয়া মুখে দিলেন।

চা-পান শেষ হইতেই ভাইপো বলিলেন, এবার তা হ'লে মেয়েটিকে—

জেঠামহাশয় বলিলেন, দেখুন, বেশি পাউডার-টাউডার মাখাবেন না। মানে—আমরা সেকেলে লোক কিনা—

কনের পিসতুতো ভাই 'আজ্ঞে, ওসব সেকেলেরাই বেশি মাখে' বলিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই বোনটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তক্তাপোশের উপরে একপাশে বসাইয়া দিলেন। মেয়েটি আগন্তুকদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোটা দুই তিন নমস্কার করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

জেঠামহাশয় বলিলেন, তোমার নামটি কি মা?

মেয়েটি। বনলতা।

জেঠামহাশয়। বেশ নামটি, সেকেলেও নয়, আবার একেলেও নয়।

ভাইপো। কি পড়?

:ম। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

ভা। আই. এ. না আই. এস. সি.?

মে। আই. এস-সি.।

জে। একটু এদিকে এস তো মা। দেখি তোমার চুল।

পিসতুতো ভাই। (চুল খুলিয়া) এর চুল খাসা।

ভা। (বন্ধুর প্রতি) দেখি ফিতেটা। (ফিতা দিয়া চুল মাপিয়া) লেখ, চুল—চুয়াল্লিশ ইঞ্চি।

জে। আচ্ছা মা, দেখি তোমার পা দুখানি।

পি.-ভা। (পায়ের উপর হইতে শাড়ির পাড় সরাইয়া) এই দেখুন।

ভা। (ফিতা দিয়া মাপিয়া, বন্ধুর প্রতি) লেখ, পনেরো ইঞ্চি।

বন্ধু। পনেরো ইঞ্চি পা, বলিস কি?

জে। মা, তোমার মামাবাড়ি কি শিলিগুড়ি?

ভা। (বন্ধুর প্রতি) আরে ম'ল, পনেরো বর্গ-ইঞ্চি—ছয়-বাই-আড়াই।

ব। তাই বল।

জে। আচ্ছা মা, তুমি রাঁধতে পার?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

জে। কি কি রাঁধতে পার, বল তো?

মে। সুক্ত, ভাজা, চচ্চড়ি, ঘন্ট, ছ্যাঁচড়া, ডাল, মুড়িঘন্ট, কালিয়া, টক, চাটনি. ফ্রাই, চপ, কাট্‌লেট, পোলাও, কোর্মা, লুচি, হালুয়া, রুটি পরটা, খিচুড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, গজা, নিমকি, শিঙাড়া, সাবু, বার্লি, গ্ল্যাকসো,—

জে। থাক, ওতেই হবে। (ভাইপোর প্রতি নিম্ন স্বরে) আমাদের বাজার-বরাদ্দ তো সাড়ে-সাত-আনা। (কনের প্রতি) আচ্ছা মা, তুমি স্তব-পাঠ করতে পার?

মে। হ্যাঁ।

জে। একটু শোনাও তো।

মে। জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

জে। বেশ। আচ্ছা, বল তো, পূজো করতে কি কি লাগে?

মে। কুশাসন, জল, গোবর, কোশা, কুশি, ফুল, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য, শঙ্খ, ঘন্টা, প্রদীপ, পুঁথি, পুরুত, দক্ষিণা, চরণামৃত, সন্দেশ, দই—এই সব।

ভা। বেশ। আচ্ছা, বল তো, উপাসনা করতে কি কি লাগে?

মে। ছাপা-চামড়ার স্যাণ্ডাল, ফরাসডাঙার ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, সোনার চশমা, কাঁচা-পাকা দাড়ি, টাক, এক শত জন ছাত্র এবং এক শত জন ছাত্রী।

ব। বেশ। আচ্ছা, তুমি শেলাই করতে পার?

মে। হ্যাঁ। (পিসতুতো ভাইয়ের দিকে চাহিতেই তিনি বাড়ির ভিতর গিয়া একটি বড় বোঁচকা লইয়া আসিলেন)

পি.-ভা। এই দেখুন, এসব ওর হাতের জিনিস।

দেখা গেল তাহার মধ্যে চটের উপর উলের কাজ-করা আসন, কার্পেটের উপর উল দিয়া লেখা কবিতা, ডি. এম. সি. সূতা দিয়া ফুল পাতা আঁকা রুমাল, এমব্রয়ডারি করা টেব্‌লক্লথ, সায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, উলের মাফলার, উলের সোয়েটার, ছিটের ফ্রক, ইজের, লংক্লথের ফ্রিল দেওয়া বালিশের ওয়াড়, জানালার পর্দা প্রভৃতি রহিয়াছে।

এসব দেখিয়া জেঠামহাশয় তো অবাক। সবিস্ময় হাসি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা এতটুকু বয়সেই এত শেলাই শিখেছ?

ভাইপো বলিয়া উঠিলেন, আজকালকার মেয়েরা ওসব শিখেই থাকে।

সেকেলে জেঠামহাশয় অগত্যা অধিক বিস্ময়-প্রকাশ ও প্রশংসা চাপিয়া গেলেন।

বন্ধু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। এবার বলিলেন, আচ্ছা তুমি ছবি আঁকতে পার?

জে। ছবি কি আর সবাই আঁকতে পারে?

ব। আজকালকার মেয়েরা সব পারে।

জে। আচ্ছা মা, তুমি কি ছবি আঁকতে পার?

মে। একটু একটু পারি। পেন্সিল আর জল-রঙ দিয়ে অনেকগুলো ছবি এঁকেছি। এবার ভাবছি, অয়েল-পেন্টিং শিখব।

ভা। আচ্ছা, তোমার চিত্রকলার ভাবটা কি অবনীন্দ্রীয়, না নন্দলালীয়?

মে। দুইই। আর তার সঙ্গে একটু হেমেন্দ্রীয় আর একটু টমাসীয় ভাবও আছে।

ভা। বেশ, বেশ। আচ্ছা, তুমি মাটির কিংবা প্লাস্টারের মূর্তি গড়তে পার?

মে। অল্প অল্প পারি। পাল মশায়ের কাছে প্রায় এক বৎসর শিক্ষানবিসী করেছি।

ব। আচ্ছা, তুমি কবিতা লেখ?

মে। (একটু হাসিয়া) কখনও কখনও।

পিসতুতো ভাই এই সময় উঠিয়া গিয়া একখানি খাতা লইয়া আসিলেন। খাতাখানি কবিতা ভরা। জেঠামহাশয় খাতাখানি লইয়া খুলিয়াই বলিলেন, বাঃ, হাতের লেখা তো বেশ—মুক্তোর মত। বন্ধু মহাশয় জেঠামহাশয়ের হাত হইতে খাতাখানি লইয়া কয়েকটি পৃষ্ঠার উপর চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, কবিতাগুলি তো বেশ।

ভা। আচ্ছা, তোমার কাব্যভাবটা কি মাইকেলীয়, না রবীন্দ্রীয়—মানে সেকালীয়, না একালীয়?

মে। লেখা দেখেই তো বুঝতে পারছেন।

ব। ঠিক ধরতে পারছি না। ভাষাটা প্রায় মাইকেলীয়, ভাবটা প্রায় রবীন্দ্রীয়, ছন্দটা রজনী-সেনীয়, আর আদর্শটা মনে হচ্ছে কুমুদ-মল্লিকীয়।

মে। তা হবে।

জে। তোমাদের ওসব কাব্য-কবিতার কথা এখন থাক। আচ্ছা মা, তুমি গান গাইতে পার?

মে। (ঘাড় হেলাইয়া) হ্যাঁ।

ভা। কি কি ধরনের গান গাইতে পার?

মে। সাধারণ সব রকমই একটু একটু পারি। যেমন, ক্লাসিকাল, মডার্ন, রবীন্দ্রীয়, রামপ্রসাদী, হিন্দী, গজল, বৈঠকী, বোলপুরী, সভা-উদ্বোধনী, প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনী, চাঁদা-আদায়ী—

জে। বেশ, বেশ। আচ্ছা মা. তুমি কীর্তন গাইতে পার?

মে। হ্যাঁ। কীর্তন, হরিসংকীর্তন, সংকীর্তন, কালীকীর্তন এই সব।

ভা। (জেঠামহাশয়কে, নিম্ন স্বরে) একটা কীর্তন গাইতে বলুন না।

জে। আচ্ছা মা, একখানা কীর্তন আমাদের শোনাবে?

মেয়েটি পিসতুতো ভাইয়ের দিকে চাহিল। তিনি বলিলেন, একটা গান গেয়ে শুনিয়ে দাও।

এই কথা বলিয়া উঠিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে একটি হারমোনিয়ম আনিয়া মেয়েটির পাশে রাখিলেন। একটু থামিয়া, এদিক ওদিক একটু চাহিয়া মেয়েটি হারমোনিয়মে সুর দিল এবং একটু পরেই মিষ্ট স্বরে গাহিতে আরম্ভ করিল—

গান (সুর মনোহরসাঁই)

সুখের লাগিয়া কলেজে পশিনু
সকলি ব্যরথ ভেল।

হেদুয়া তড়াগে সিনান করিতে
সরদি লাগিয়া গেল।।
সখি, কি মোর করমে লেখি—
সহজ ভাবিয়া সায়েন্স লইনু
ভীষণ কঠিন দেখি।।
বেথুন ছাড়িয়া স্কটিশে আসিতে
পড়িনু পীরিতি-জালে।
না পেনু অনার্স না হইনু পাস
এই কি ছিল রে ভালে।।
যতন করিয়া পিছলি পড়িনু
মোটর-চাকার পাশে।
তবুও নিঠুর ফিরে না তাকাল
বিলেত পালাল শেষে।।
কত না আশায় দীরঘ দিবস
হোস্টেলে কাটিয়া গেল।
বুনিনু শুধুই স্বপনের জাল
সফল নাহিক ভেল।।

জে। বেশ, আচ্ছা মা, এগুলো কি তোমার নিজের কথা?

মে। কি যে বলেন! আমি কি কখনও স্কটিশে পড়েছি?

জে। বাঁচালে মা, বাঁচালে।

ব। আচ্ছা, তুমি কি কি বাজনা বাজাতে পার?

মে। হারমোনিয়ম, এস্রাজ, সেতার, বেহালা, বাঁশী, ক্লারিওনেট, জলতরঙ্গ, তবলা, সানাই, কাঁসি, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, পিয়ানো—এই সব।

জে। বেশ, মা বেশ।

ভা। (জেঠামহাশয়কেই, নিম্ন স্বরে) নাচতে পারে কি না—একবার জিজ্ঞেস করুন না।

জে। আচ্ছা মা, তুমি নাচতে পার?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

ব। (উৎসাহিত হইয়া) কি কি নাচ জান?

মে। বল, ব্যালেট, বাঈ, রবীন্দ্রীয়, প্রাচ্য, গুজরাটী, গুরুসদয়ী, ব্রতচারী, সাঁওতালী, মণিপুরী, মৈথিলী, কথাকলি, দ্রাবিড়ী, সিংহলী, হরেন-ঘোষী, উদয়শঙ্করী, ফার্স্ট-এম্পায়ারী, কাঠি, পোয়ে, ছউ—এই সব।

নাচের তালিকা শুনিয়া জেঠামহাশয়ের চক্ষু তো কপালে উঠিয়াছে। বন্ধুও পরম বিস্মিত ও তৃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ফার্স্ট-এম্পায়ারবিশারদ-ভাইপোর ভাবটা এই—এ আর এমন আশ্চর্য কি! তিনি নিম্ন স্বরে জেঠামহাশয়কে বলিলেন, জিজ্ঞেস করুন তো, বালিনীজ নাচ জানে কি না।

জেঠামহাশয় নিতান্ত অগত্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা জিজ্ঞেস করছে, তুমি বালিনীজ নাচ জান কি না।

মে। হ্যাঁ। বালিনীজ, জাভানীজ, সুমাত্রানীজ, সেলিবেশনীজ আর মালয়নীজ—এগুলো শেখা হয়ে গেছে। এখন গ্রেটার-ইণ্ডিয়ানীজ শিখছি।

ভা। বেশ, বেশ।

জে। (ভাইপো এবং বন্ধুর প্রতি) নাও, সবই তো শুনলে। আর কিছু তো নেই জিজ্ঞেস করবার?

ভা। না, আর কি জিজ্ঞেস করব? (মেয়েটির প্রতি) আচ্ছা, তুমি সাঁতার কাটতে পার?

মে। পারি।

ব। আচ্ছা, তুমি সাইকেল চড়তে পার?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

ব। লাঠি খেলতে পার?

মে। ছোট লাঠি শিখেছি, বড় লাঠি এখনও শিখি নি।

ব। ছোরা?

মে। অল্প অল্প পারি।

জে। নাও, এবার ওকে ছেড়ে দাও। সবই তো হ'ল।

ভা। (জেঠামহাশয়কে, নিম্ন স্বরে) জিজ্ঞেস করুন না, ঘোড়ায় চড়তে পারে কি না।

মে। (প্রশ্নটি শুনিয়া) দার্জিলিঙের ঘোড়ায় চড়েছি।

ভা। বেশ।

জে। আচ্ছা মা, এইবার এস।

মেয়েটি হাত তুলিয়া দুই তিনটি ছোট নমস্কার করিয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং পিসতুতো ভাই তাহাকে ধরিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে পা বাড়াইলেন। এমন সময়ে ভাইপো বলিয়া উঠিলেন, দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না।

পিসতুতো ভাই। না না, মনে করবার কি আছে? কি জিজ্ঞেস করছেন?

ভা। আচ্ছা, তুমি সুপুরি কাটতে পার?

মেয়েটি 'পারি' বলিয়াই বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার পায়ের ধাক্কা খাইয়া দরজার নিকট কুকুরটি 'ঘেউ' করিয়া উঠিল।

ব। (পিসতুত ভাইকে) দেখুন, একটা কথা, কিছু মনে করবেন না।

পি. ভা। না না, মনে করব কেন? বলুন।

ব। মেয়েটিকে আর একবার একটু আনতে হবে।

পি. ভা। কেন বলুন তো?

ব। দেখুন, নাকটা আর দাঁতগুলো ভাল ক'রে দেখা হয় নি।

পি. ভা। এতক্ষণ এখানে ব'সে ছিল, এত কথা বললে, গান করলে, তবু আপনাদের নাক আর দাঁত দেখা হ'ল না?

ব। দেখেছি, তবে—মানে, ভাল ক'রে দেখা হয় নি।

পি. ভা। আচ্ছা, নিয়ে আসছি।

পিসতুতো ভাই মহাশয় বাড়ির ভিতর গিয়া মেয়েটিকে আবার লইয়া আসিলেন।

ভা। (ফিতা লইয়া, নাক মাপিয়া) লেখ, ১.৬ ইঞ্চি।

ব। লিখেছি। (মেয়েটির প্রতি) আচ্ছা, একটু হাস তো। মেয়েটি হাসিল কি না বোঝা গেল না। তবে ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইতেই বন্ধু বলিলেন, যাক, ওতেই হবে। তারপরে নোটবুকে লিখিলেন, দাঁত ভাল।

পি. ভাই। আপনাদের কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে?

জে। না, আমাদের আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।

পিসতুতো ভাই মহাশয় বোনটিকে লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।

কনের দাদা বেশি কথা বলেন না। এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই। এবার সভয়ে এবং সসম্ভ্রমে জেঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়েটি কি আপনাদের পছন্দ হ'ল?

জেঠামহাশয় অতি উৎসাহে বলিতে যাইতেছিলেন, খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তাঁহার

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ভাইপো বলিলেন, দেখুন, হঠাৎ তো মত দেওয়া যায় না। বাড়ি গিয়ে ভেবে চিন্তে দেখি, যদি আমাদের পছন্দ হয়, তা হ'লে একদিন মেয়েরা দেখতে আসবেন। মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েরাই ভাল বোঝে, বুঝলেন কি না। তারপর মেয়েদের যদি পছন্দ হয়, তখন ছেলে নিজে এসে দেখবে। আজ তো আর ভাল ক'রে দেখা হ'ল না, এটা একটা প্রিলিমিনারি দেখা, বুঝলেন কি না।

পিসতুতো ভাই বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া যথোচিত আপ্যায়ন দ্বারা অভ্যাগতদিগকে বিদায় দিলেন।

৪

মেয়েটি বাড়ির ভিতরে আসিয়াই হার, চুড়ি, জুতা, জামা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসতুতো বউদি কাছে আসিতেই তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল। পা দিয়া ধাক্কা দিয়া টুল, চেয়ার, মোড়া, যাহা সামনে পাইল, তাহাই দূরে ফেলিয়া দিল। দেওয়াল হইতে ছবি, ক্যালেণ্ডার, আয়না প্রভৃতি টানিয়া ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। ব্যাপার দেখিয়া বাড়ির সকলে ছুটিয়া আসিয়া ধরিতে গেলে চড়, লাথি, কিল প্রভৃতি দিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সকলে মিলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। পিসতুতো বউদি বলিলেন, কেন এমন হ'ল? ও তো কখনও এমন করে না। দাদা সভয়ে বলিলেন, হিস্টিরিয়া না তো?

ইতিমধ্যে বনলতা খাটের একপাশে উঠিয়া বসিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, হ্যাঁ, হিস্টিরিয়া। কেন হিস্টিরিয়া হবে না? আমাকে তোমরা কি ভেবেছ? আমি কি হাঁস, না মুর্গি, না খরগোশ, না ঘোড়া? আমার নাক মাপবে, চুল মাপবে—এত বড় আস্পর্ধা? শুধু তোমাদের অপমানের ভয়ে আমি চুপ ক'রে ছিলুম। ফের যদি এমন ইডিয়টের দল বাড়িতে ডেকে আন তো, আমি আত্মহত্যা করব। মনে থাকে যেন।

বনলতা বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। পিসতুতো বউদি কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বনলতার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দেখা গেল। বউদি আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিলেন।

৫

এদিকে জেঠামহাশয় বাড়ি ফিরিয়াই অপেক্ষমান আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া বৈঠক জমাইয়া বসিলেন। বলিলেন, খাসা মেয়ে। এমন সর্বগুণসম্পন্না লক্ষ্মী লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।

ভা। জেঠামশায়ের সবতাতেই একটা আ-দেখলে ভাব। আজকাল অমন মেয়ের অভাব কি? তবে হ্যাঁ—মেয়েটি ম-ন্-দ নয়—এ কথা বলা যেতে পারে।

ব। যাই বলুন, এ মেয়ে হাতছাড়া করা হবে না।

জে। ঠিক বলেছ, এমন মেয়ে কিন্তু আর পাওয়া যাবে না।

আত্মীয়। তা হ'লে এই অঘ্রাণেই, কি বল?

ভা। এত ব্যস্ত কি? আরও দু চারটে দেখা যাক, মেয়েরা দেখুন, ছেলে নিজে দেখুক, দেনা-পাওনার কথা হোক, তবে তো?

জে। অত-শতর মধ্যে আমি নেই। মেয়ে পছন্দ হয়েছে, বাস্। ছেলের মত? ওর মত হবে, তা আমি লিখে দিচ্ছি। মোট কথা, এ মেয়ে হাতছাড়া করা হবে না। দেনা-পাওনা? সেজন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না।

আত্মীয়। ভায়া যে দাতাকর্ণ হয়ে উঠলে?

জে। ঠাট্টা রাখ। এই অঘ্রাণেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, আপনারা তার উদ্যোগ করুন। আমি একটা দিন দেখে মেয়েকে আশীর্বাদ ক'রে আসব।

৬

পাঠকবর্গকে বিশেষত পাঠিকাবর্গকে, একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। এমন একটা সর্বগুণসম্পন্না মেয়েকে আই. সি. এসের সঙ্গে বিবাহ না দিয়া লেখক ইহাকে একটা মাত্র বি. এ. পাস বেকার ছেলের সঙ্গে একটা কালচারহীন পরিবারে বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া ইঁহারা হয়তো শক্‌ড হইবেন। কিন্তু লেখক নিরুপায়। প্রজাপতি মহাশয় তো পাঠকবর্গের খাস তালুকের প্রজা নন যে, তাঁহাদের মন যোগাইয়া চলিবেন! তা ছাড়া, কোন আই. সি. এস. বম্বে আসিয়া নামিলেই, ই. আই. আর. এবং বি. এন. আরের প্রত্যেক স্টেশনে এবং হাওড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বালিগঞ্জ পর্যন্ত ধনী কন্যা-পিতৃগণের যে 'কিউ' রচিত হয়, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা বনলতার আত্মীয়স্বজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রজাপতির বর্তমান ব্যবস্থায় শক্‌ড হইলে চলিবে না। আত্মীয়স্বজনের পরিচারিকাবৃত্তি, অনশনক্লিষ্ট মাস্টারিবৃত্তি, ধাত্রী ও অভিনেত্রীর বৃত্তি যাঁহাদের কাম্য নয়, তাঁহাদিগকে প্রজাপতির সহিত একটা সম্মানজনক আপোষ করিতেই হইবে।

৭

নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে বেশ একটু পরিবর্তন হইয়াছে। ভাড়াটিয়ারা সব একে একে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়িটা আমূল সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। নীচের দোকানঘর ভাঙিয়া গ্যারেজ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে একখানি চকচকে খুকী গাড়ি শোভা পাইতেছে। রেডিও লওয়া হইয়াছে।

বেকার পুত্রের বেকারত্ব ঘুচিয়াছে। নিকুঞ্জবাবু একটি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের মোটা শেয়ার পুত্রের নামে কিনিয়া তাহাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করিয়া দিয়াছেন।

একদিন পুত্র বাড়ি আসিয়া দেখেন, বনলতা কাগজ পেন্সিল লইয়া একটা আঁক করিতেছে। পুত্র বলিলেন, কি হচ্ছে?

ডেসিম্যালের বিয়োগ করছি।

ডেসিম্যালের বিয়োগ?

হ্যাঁ।

মানে?

মানে, ১·৯ - ১·৬ = ·৩।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তোমার নাক মাইনাস আমার নাক—ইকোয়াল টু পয়েন্ট থ্রী।

আচ্ছা, দেখি ভেরিফাই ক'রে, উত্তর ঠিক হ'ল কি না।

যাও।

পৌষ ১৩৪৭

শালা

"বনফুল"

সামান্য মনুষ্য নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা,
হে শ্যালক, হে স্বভাব-শালা।
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহু বার দেখেছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয়মালা।।
বহুবার করে গেছ অকিঞ্চন-চিত্ত পরশন
সভামঞ্চে নেতৃবেশে, হে শ্যালক, সৌম্যদরশন,
প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষণ
সে বাণীর জ্বালা
বহু করতালি যোগে প্রাণ মন করি ধরষণ
কর্ণ দুটি করিয়াছে কালা!
হে শ্যালক, হে স্বদেশী শালা।।

কখনও বা শ্মশ্রু-গুম্ফে আম্বরিয়া ও চাঁদবদন,
জটা-মৌলি গুরু-বেশে অ' দেছ গৈরিক বসন,
(নির্ভেক নির্ভীক কভু!) সানুগ্রহে ভক্তের সদন
করিতেছ আলা
আত্মার অঙ্গুষ্ঠ রূপ, গীতা, গান, বিজ্ঞান-বচন,
বিতরিছ উপদেশ-মালা,
হে শ্যালক, হে ধার্মিক শালা।।

কুর্দনে, নর্তনে লাস্যে লক্ষজনে লাগাইয়া তাক
কখনো সিনেমা-পটে, হে রসিক, সভঙ্গী সবাক
গুণ্ডা-বেশে, কবি-বেশে, কাঁপাইছ সেই চোখ নাক
একই ছাঁচে ঢালা!
পিতৃধন ধ্বংস করি' ছাত্র ছাত্রী দেখিছে অবাক
নাবালকে ভাঙ্গিতেছে তালা,
হে শ্যালক, হে আর্টিস্ট শালা।।

উৎসর্গিয়া আপনারে কখনও বা শিল্প-পাদ-মূলে
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তার সমাপিছ সর্ব-দ্বিধা ভুলে!
সার্থক ধরেছ তুলি! ক্রমাগত রং গুলে গুলে
হে শিল্প-দুলালা,
কণ্ডুয়নী-উন্মাদনা আন্দোলিয়া তুলিতে অঙ্গুলে
আঁকিছ নিতম্ব-স্তন-মালা!
হে শ্যালক, হে পটুয়া শালা।।

নির্লিপ্ত উদো-র পিণ্ড গিলাইয়া সন্ত্রস্ত বুধোরে
সাহিত্য রচনা করি' শুনাও তা ক্ষেন্তি বা ভূতোরে,
কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি, গামছা-বাঁধা ক্ষুধার্ত উদরে
রসনায় লালা!
কন্টিনেন্টালি ঢঙে ডাক দাও কামারে, ছুতোরে,
বক্ষে চাপি ধর বস্তি-বালা!
হে শ্যালক, হে বাস্তব শালা।।

কখনও উকীল-বেশ! (মূর্খ জনে কহিবে বঞ্চক!)
অনর্থ-কে অর্থ-যোগে নানা সর্তে করিছ সার্থক!
কখনও দালাল তুমি, কখনও বা মহা চিকিৎসক
কভু বাড়ি-বালা,
কংগ্রেসে, মন্দিরে মঠে সর্ব ঘটে হে পরম বক,
নানা পুষ্পে ভরিতেছ ডালা।
হে শ্যালক, হে শিকারী শালা।।

অনবদ্য তব কণ্ঠ কভু শুনি বিচিত্র ভঙ্গীতে
বেতারে, বৈঠকে, মাঠে, সভাস্থলে, রেকর্ড-সঙ্গীতে ;
কর্ণের পটহ ভেদি ধৈর্যসীমা চাহে যে লঙ্ঘিতে
প্রাণ ঝালাপালা।
শ্মশানে, মশানে, রণে, পরাজয়ে, বিজয়ে, সন্ধিতে,
চলিয়াছে বেসুরো বেতালা
হে শ্যালক, হে ওস্তাদ শালা।।

হে মোর আসল শালা, হে প্রাকৃত, নির্জলা, নির্ঘাৎ
তোমারে বলিনি কিছু (ভাষা খুঁজে পাইনি অর্থাৎ)
ভাবিলেই তব কথা শিরে রক্ত চড়ে অকস্মাৎ
অঙ্গে ধরে জ্বালা,
জুতা-হস্তে ছুটে যাই!—কাছে গেলে শিথিল সে হাত,
মুখে তব মধু হাসি ঢালা!
হে শ্যালক, হে আদৎ শালা।।

দেশের দশের অর্থ শত হস্তে করিয়া লুণ্ঠন,
ভব্যতারে নগ্ন করি সভ্যতার খুলিয়া গুণ্ঠন,
কভু হাস, কভু কাঁদ, কভু তব মৃদুল কুন্থন
একই সুরে ঢালা।
"অর্থ চাই, অর্ঘ্য চাই, বৃদ্ধি চাই ওহে জনগণ,
তৃপ্তি নাই আনো ছালা ছালা।"
হে শ্যালক, হে কৌশলী শালা।।

অপরিচয়ের মাঝে থাকো তুমি অ-শ্যালক বেশে
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা-মূর্তি বাহিরায় এসে।

আত্ম বন্ধু পরিজন কাছে গিয়ে দেখি হায় শেষে
শালা—সব শালা!
দিন যায় ক্রমে দেখি শালা-সাগরেতে এসে মেশে
দুনিয়ার যত নদী নালা—
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা।।

চৈত্র ১৩৪১

চিঠি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবারের চিঠির সঞ্চালক (সম্পাদক + পরিচালক) মহাশয়
সমীপেষু,

মহাশয়গণ,

কিছুদিন হইতে আপনারা Salaism (শালাইজম) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু ওদিকে যে কম্যুনিজম আসিতেছে তাহার খোঁজ রাখেন কি? জানি ধন-বিভাগে আপনাদের ভয় নাই, কারণ আপনারা যে ধনে ধন্য তাহা কমিবার নহে। কিন্তু কম্যুনিজমের জন্য সাহিত্যিক হিসাবে প্রস্তুত হইতে হইবে তো? Comrade শব্দের কিছু অনুবাদ করিয়াছেন? তবেই দেখুন, তিনি আসিয়া পড়িলে কোন ধ্বনিতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন? Comrade শব্দটি অত্যন্ত মুখরোচক, স্মরণমাত্রে জিহ্বা সজল হইয়া ওঠে, কিন্তু ওটা যে বিদেশী। এই ভারতভূমে যেখানে মহামানবের সাগরতীরে শিখহূনদল পাঠান মোগল একদেহে হ'ল লীন সেই যেখানে হুঁ-হুঁ-হুঁ (হাত-তালি) ইত্যাদি, সেখানে আর যাহা বিদেশী চলে চলুক, বিদেশী শব্দ তো চলিবে না। তবে কিছু ভাবিয়াছেন কি? আপনারা না ভাবিলেও মনে রাখিবেন জাগ্রত ভগবান হে। তিনি আমার মুখ দিয়া একটি দৈবী বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। এই বাণীর প্রেরণায় সেদিন আমি ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকির মত ঠিক তমসার তীরে নয়, বেলেঘাটার খালের ধারে ঘুরিতেছিলাম, বিশ্বাস না হয় পাঁচু গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই দৈবাৎ-প্রাপ্ত দৈবী বাণীকে আর গোপন রাখিব না, বলিয়াই ফেলি; ইহা আমাদের চির পরিচিত **শালা**, একেবারে খাঁটি ভারতীয় শব্দ, আদি ও অকৃত্রিম, এমনকি হস্তদ্বারা পর্যন্ত স্পৃষ্ট নহে। মহাশয়গণ, Comrade শব্দের পরিবর্তে এই খাঁটি ভারতীয় শালা কি চলে না? ইহার কতকগুলি সুবিধা আছে—

(ক) ইহা খাঁটি ভারতীয় মাল, অর্থনীতির ভাষায় যাহাকে বলে Indegenous Production। বিদেশের কোনো প্রভাব ইহাতে নাই।

(খ) এই শব্দ প্রয়োগে হিন্দু মুসলমান ভেদের কোনো প্রশ্ন উঠিবে না। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু শিখ জৈন বৌদ্ধ পারসীক মুসলমান খৃষ্টান সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমি স্বয়ং একদা প্রসিদ্ধ জয়স্বাল সাহেবকে ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিবাবুর সহিত আলাপ করিবাব সময় 'সালে' শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলাম। ইহা বোধ হয় আমাদের পরিচিত শালারই বিহারী সংস্করণ। মনে করুন তো সেই গৌরবময় দিন, যেদিন হিমাদ্রি হইতে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত শালা শালা গর্জনে ধ্বনিত স্মাত হইয়া উঠিবে সেদিন কি—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ (পুনরায় হাত-তালি)।

(গ) ইহাতে এমন একটি মধুর স্নিগ্ধ পরকে-আপন-করা আত্মীয়তার ভাব আছে, যাহা আপনাদের কমরেড শব্দে নাই। এই শব্দ-মন্ত্রে মুহূর্তে পর আপন হয়, এমনকি অনেক সময় অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবার অনুমতি পর্যন্ত অপেক্ষা করে না।

কাজেই যেদিক দিয়াই বিচার করুন শালা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আপনারা শনিবারের চিঠির প্রসিদ্ধ সঞ্চালক, আপনারা এই শালা-তত্ত্ব ছাপিতে রাজি হইয়াছেন, কাজেই ইহার প্রাথমিক পরীক্ষাটা আপনাদের উপর দিয়াই হইয়া যাক।

ধরুন যদি কোনো সভার প্রারম্ভে সভাপতি ঘোষণা করেন, অদাকার এই মহতী সভায়

যেখানে (ফরমুলাটির জন্য বসুমতীর বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য) আমাদের প্রিয় বন্ধু শালা শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় কিছু বলিবেন! একবার ভাবুন তো—কি আর ভাবিবেন, যাহা ঘটিবে তাহা অভাবনীয়। আবার ধরুন নিখিল ভারতীয় শালা সঙেঘর সম্পাদক মহাশয় যদি কমিটির অধিবেশনে বলেন অদ্যকার এই অধিবেশনে দেশে মুক্তধনের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রিয় বন্ধু শালা শ্রীপরিমল গোস্বামী একটি বিশিষ্ট প্রস্তাব করিবেন। অথবা শালা-ism এর আদি প্রবর্তক শালা "বনফুল" সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভা অলঙ্কৃত করিবেন! অহো সে কি গৌরবময় দিন!

কেমন নেহাৎ মন্দ শোনাইল কি? আশা করিতেছি অচিরাৎ সেদিন আসিবে, কিন্তু যতদিন জনগণমনঅধিনায়কদের কণ্ঠে এ ধ্বনি ধ্বনিত না হয়, ততদিন

জগৎসভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাত,

শ্রবণ করুন,

জয় শালা শ্রীসজনকান্ত কী জয়!
জয় শালা শ্রীপরিমল গোস্বামী কী জয়!!
জয় শালা "বনফুল" কী জয়!!!

অবশেষে আমি অগঠিত নিঃ ভাঃ শালা সঙেঘর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি যে আপনারা এই শালাবাদের প্রাথমিক পরীক্ষা আপনাদের উপরে করিতে দিয়া আন্তর্জাতিক শালা সঙেঘর অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। *

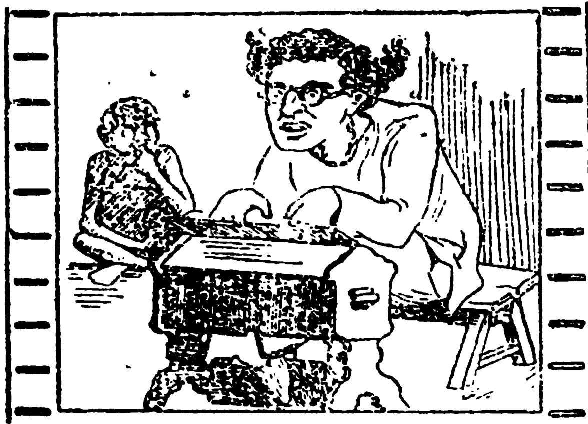
ভাদ্র ১৩৪২

* Comrade-এর বাংলা প্রতিশব্দের জন্য শালা লেখককে ধন্যবাদ।—শ. চি. স.

ব্যঙ্গচিত্র

চিত্র-পরিচয়

বিগত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ৬৮তম জন্মোৎসবসভায় গীতসুন্দর শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় 'সাজাহান' নাটক হইতে পিয়ারা বেগমের "এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি" শীর্ষক করুণ গানটি আবেগকম্পিতকণ্ঠে গিট্‌কিরি দিয়া গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করিয়াছিলেন। পরবর্তী চিত্রগুলি তাঁহারই আবেদন ও দরদের চলচ্চিত্র।



-হুঁ-হুঁ-হুঁ···এ জনমে··। এ পুরিল না—তা··
সাধ ভাল´ঃ বা···গি। ···। ···।



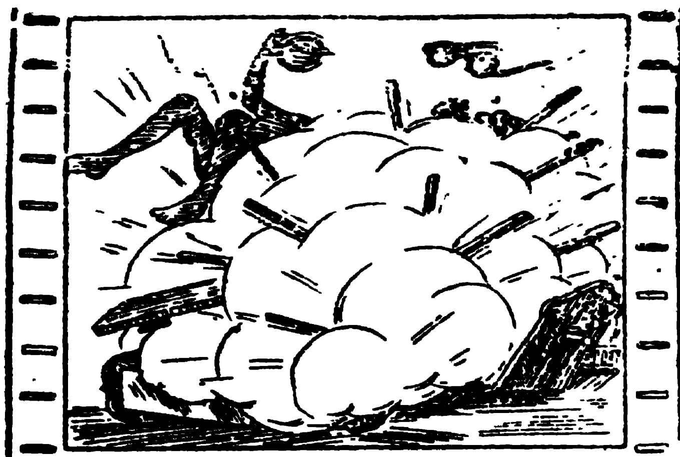
ক্ষুদ্র···অ···। হৃদয়ে,···এ। হায়··
ধরে না···। ···। ···।



হুঁ-হুঁ হউক অসীম…অ…প্রাণ…
অসীম…অসীম ঈ ঈ…।



ঙ ঙ মুচে যাক। …। …।
ঙ-ঘুচে—এ-এ যাক্।



তখন মিটা-ব আশা…। ˚ তথ…অনঁ্
মিটাব—আশা ঃ —!!!—!!



!!! - - - !!! - - !!! - - !!! - - !!! - -



চিত্র-পরিচয়

[১৩৩৫ সনের, জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে, 'সাহিত্য-সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে আমার বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে কয়দিন এই রঙ্গালয়ে নাচিয়া গেলাম, তার স্মৃতিটুকুও ভবিষ্যতে থাকিবে কি না জানি না। তাতে দুঃখ নাই। পুরস্কারের আশা মনে ছিল না, এ কথা বলিতে পারি না ; কিন্তু এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, পুরস্কারের প্রলোভনে সাহিত্যের কারবার করিতে আমি নামি নাই। বাঁশীর ডাক যখন কানে পৌঁছিয়াছিল, কুলের কথা ভাবিতে পারি নাই ; পুরস্কার তিরস্কারের কথা মনে পড়ে নাই;—বাহির হইয়া গিয়াছিলাম।"

এই নাচের স্মৃতি বাংলা সাহিত্য হইতে মুছিয়া গেলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে ভাবিয়া আমরা নরেশবাবুর নৃত্যকে চিরস্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা করিলাম]



পরিচয়

"Logic-এর extremist হতে ভয় পাই এইজন্য যে, শেষটা হয়ত দেখব যে Magic-এর কোণে গিয়ে পড়েছি।"

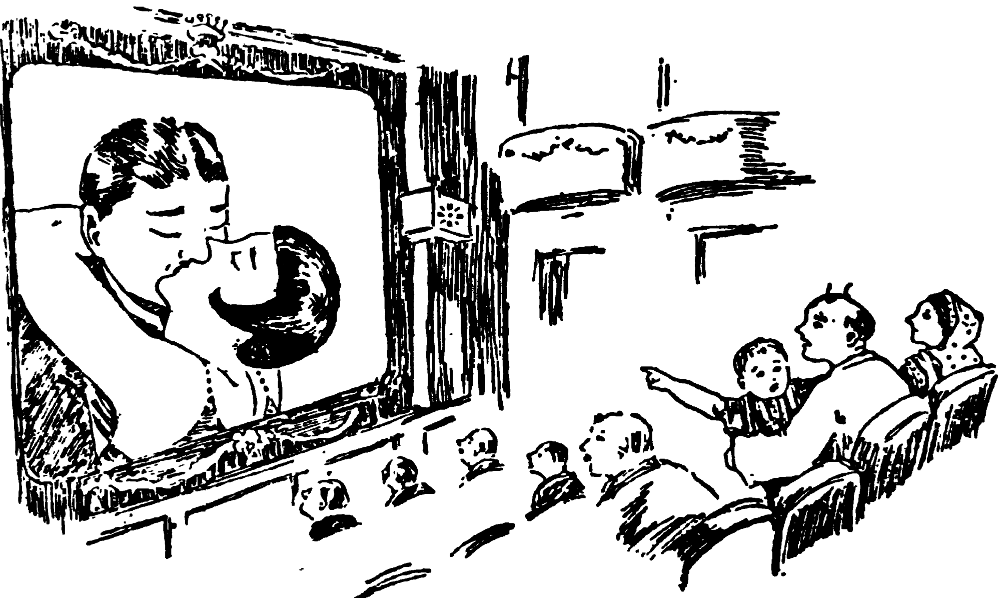
—বীরবল



পরস্ত্রী

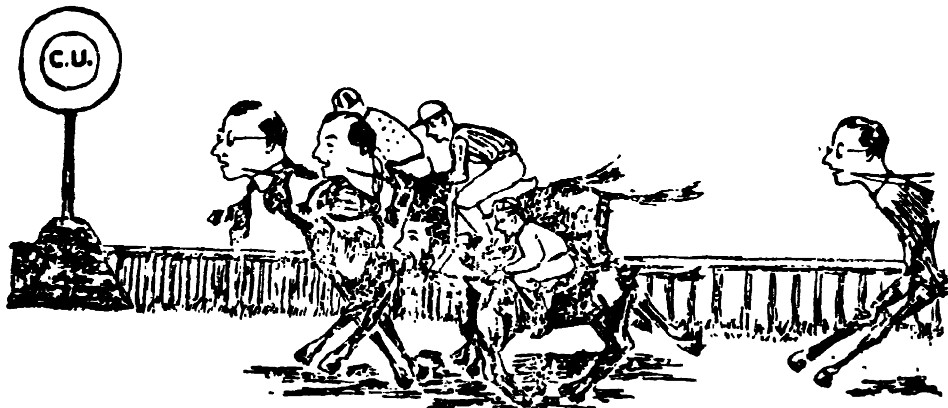
'পরস্ত্রী হবে যেন ধনুকের জ্যা, ছুঁলেই টঙ্ করে বাজবে,
চাবুকের মতন চটপটে, লিক্‌লি:ক—"

'পরিচয়ে'— শ্রীধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়



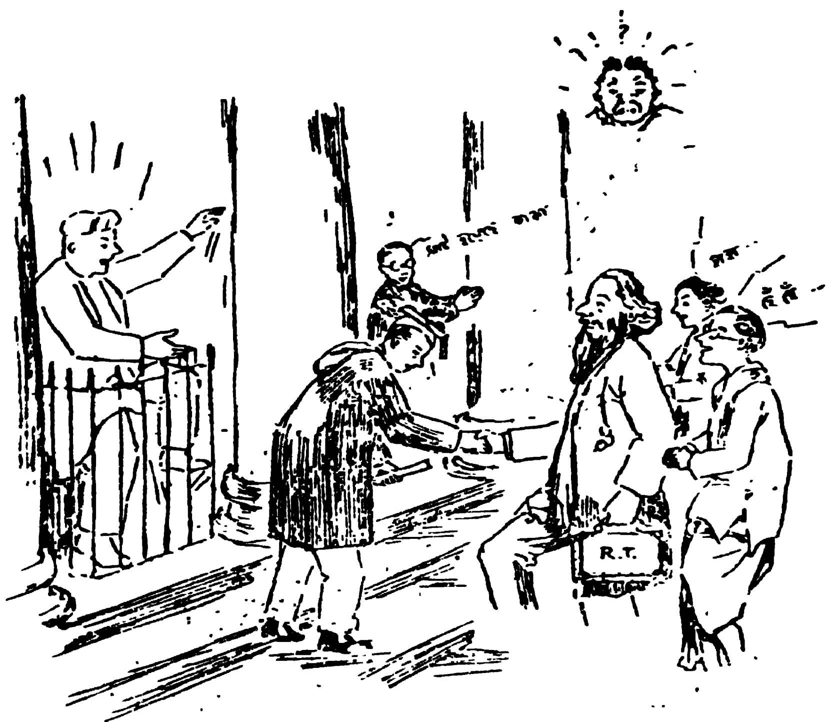
—বাবা, ওকি?

রামতনু রেস



নেকে জিতে গেল খোলন্দাজ,
গলে নেকটাই, নয়নে লাজ
খোলে চাঁটি মেরে দিল বিদায় ;—
বঙ্গরাণী। আসরে, হায়
মোসাহেবদেরই পোয়া বারো—
সেই বড় যার তেল গাঢ়।

রামতনু হাফ-আখড়াই



চেহারা না মিললেও তিনি

তিনি। আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে নিয়ে এই ইত্যাদি-

এনারা। আমি সব ভাষা সব বাক্ নীরব হইয়া যাক্ ইত্যাদি—

পাঁচ হাজারী মনসবদার



—চিত্রাঙ্গদা আজ থাক স্যার, 'দুই আর দুইয়ে চার'
আর 'ছিনিমিনি'র একটা তুলনামূলক—
—ও-দুটোই 'শেষের কবিতা'র চুরি!

এবার ফিরাও মোরে





অন্ন চাই, আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু।

চলচ্চিত্র

ক্ষুদে কর্তা



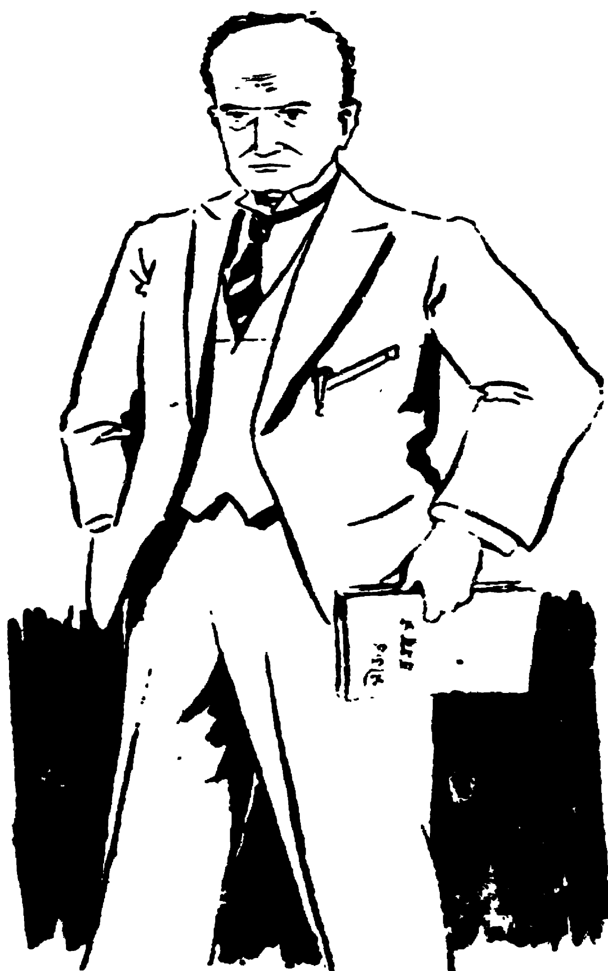
বীর বলে, দেখ তুমি, ঠেঙিয়ে তাড়াই,
মরা বুড়ো যারা চেপে বসিয়াছে ঘাড়ে,
মুকুরে দেখিয়া কবি দাড়ির খাড়াই,
কাষ্ঠ-হাসি হাসে ; তার নাড়ী বুঝি ছাড়ে!
কহে কবি, মোরই আর আছে কত দিন!
বীর বলে, শোধিতেছে শ্বশুরের ঋণ।

বিফোর দি ওয়ার



"শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্য সম করিব পান—"

অন্তর এবং বাহির যদি এক হইত



মিঃ আই. সি. ব্যানার্জি (অব কীরসিংহ)

অন্তর এবং বাহির যদি এক হইত



বৈষ্ণব শ্রীমধুসূদন

'ময়ুরপঙ্খী তনু
ময়ুরের মত পেখম মেলেছে,
দেখিয়া উতলা হনু।'
—শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



নানা রঙের দিনগুলি

পরিমল গোস্বামী

আমরা যে-কালের ভিতর দিয়ে চলি, তা অত্যন্ত কাছে থাকে ব'লে তাকে আমরা দেখি না। বোধ হয় অব্যবহিত বর্তমানকে সম্পূর্ণ ক'রে চিনতে পারা মনের ধর্মই নয়। তার দুখানি মাত্র পা, অথচ কাল তিনটি, তাই তিনটি কালে সে সমান ভাবে পা ফেলতে পারে না। যদি কেউ পারে তবে জানা যাবে সে ব্যাকরণের পাতা খুলে ব্যাকরণের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে আবদ্ধ হয়ে আছে। ব্যাকরণের বাইরে যে তিনটি কাল তার উপরে মনের গতি পেণ্ডুলামের গতি। পেণ্ডুলাম তার গতিসীমার দুই প্রান্তে একবার ক'রে থামে, মধ্যপথে কখনো থামে না।

লিখতে ব'সে প্রথমেই এই কথাগুলো মনে আসছে, কারণ অতীতে যে কয়েকটি বছরের কথা মনে আনতে চেষ্টা করছি, এখন মনে হয় তাদের সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে পাচ্ছি। তখন পারি নি।—তখন, অর্থাৎ যে সময় সে কালের মধ্যে বর্তমান ছিলাম।

সে দিনের স্মৃতি মনে রোমাঞ্চ জাগায়। আজকের এই মন ও দৃষ্টি নিয়ে সেই দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গিয়ে সেই কালকে একটু আদর ক'রে আসতে ইচ্ছে হয়।

অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেই যে মানুষ বেশি বাস করে তার আর একটি প্রমাণ দিয়ে থাকেন গণৎকার। কেউ হাত দেখে, কেউ কোষ্ঠী দেখে, মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে চলেছেন। বর্তমান তাঁর কাছে তুচ্ছ, কারণ বর্তমানের জ্ঞানের উপর কারও দাবি নেই। গণৎকারও তাই সাধারণ মানুষের মতো দ্বিকালদর্শী। আমিও তাই। ত্রিকালদর্শী হ'লে ঋষি হতে পারতাম।

১৯৩৩-৩৪-৩৫-৩৬ সনের সেই দিনগুলি—যা সোনার খাঁচায় রইল না, অথচ যা হারিয়ে যায় নি।

গণৎকার ব'সে আছেন ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটের দোতলার একটি প্রশস্ত ঘরে।

সুরেশ বিশ্বাস। এ কালের কেউ তাঁকে চেনে না, চেনবার উপায়ও নেই, তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে লুপ্ত করেছেন ইহকালের দৃষ্টির আড়ালে।

সুরেশ বিশ্বাস হাতের রেখা দেখছেন। সজনীকান্তের হাত। অতিকায় অতিপুষ্ট আঙুলসম্বলিত হাত।

"আপনার আরও কয়েক বছর গণ্ডগোল আছে—তারপর দিন আসছে উন্নতির—ভীষণ উন্নতি সামনে—কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

সজনীকান্ত হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন মৃদু মৃদু, তবু কথাটা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে।

একটু দূরে কিরণ রায় টেবিলে মনোযোগ দিয়ে প্রুফ দেখছেন হট্টগোলের মধ্যে। জনারণ্যে কিরণকুমার একা।

ডক্টর সুশীলকুমার দে হাত এগিয়েছেন সুরেশ বিশ্বাসের দিকে।

"ঢাকার চাকরি ছাড়তে হবে—You will have to fly away from Dacca!"

এখনও সে ধ্বনি কানে বাজছে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত।

বিলেত যাওয়া আবার ঘটবে অল্পদিনের মধ্যে। নিশ্চয় ঘটবে।

সাড়ে তিন বছরের ঘটনা, যে কথাটি যখন মনে আসছে পর পর লিখে চলেছি। চলন্ত ছবি। এক-একটি ছবি ঘিরে কত রঙ, তা শুধু আমার মনের মধ্যেই উজ্জ্বল।

অসুখবিলাসী প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের যে-কোনো তুচ্ছ অসুখের কথা নিয়ে কিরণেব সঙ্গে ঘন্টাখানেক ধরে আলাপ চালাচ্ছেন।

এক পাশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী ইংল্যাণ্ডে একটি বিশেষ জাতীয় ফার্ন গাছ আছে কি না তা নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছেন। সামনে ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন এক খণ্ড খোলা প'ড়ে আছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ক্রমশঃ-প্রকাশিত 'অভিশাপ' উপন্যাসের কিস্তি অতি বিলম্বে এনেছেন। তা নিয়ে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অভিশপ্তের মত বসে আছেন নীরবে। পাশে তাঁর অনুচর কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, মুখে স্মিত হাসি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিতান্তই তরুণ যুবক, চেহারায় উদাসীন বাউলের ভাব। বেপরোয়া লেখক। লিখছেন প্রচুর। নতুন প্রতিভা আবিষ্কারে সজনীকান্তের ইনটুইশন দেখে অবাক হই।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মধুর কণ্ঠে সরস গল্প জমিয়ে তুলেছেন। পরম উপভোগ্য মুহূর্তগুলি উড়ে চলেছে পাখা মেলে।

হ্রস্বদেহ বজ্রকণ্ঠ প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে শিল্পী অরবিন্দ দত্তের তুমুল তর্ক চলছে। এ তর্কের কোনো হেতু নেই। তর্কের জনাই তর্ক। আর্ট ফর আর্টস সেক।

মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের প্রতি বড়ই ক্ষুব্ধ। তাঁর সমালোচনা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। বলছেন—খুব দম্ভের সঙ্গে—"রবীন্দ্রনাথ একটি লাইন ইংরেজী লিখতে জানেন না।" এবং আরও কত কি, লেখবার মত নয়।

তাঁকে সামনে পেলে রক্তপান করেন এই রকম ভাব।

পাশের ঘরে ঢুকছেন কজন। নলিনীকান্ত সরকারের গান হবে। মাসিকপত্র অফিসে গান! অতএব একটা ঘরে খিল বন্ধ হল। দেহতত্ত্বের গান সব "A" মার্কা। রচনানৈপুণ্যে পুরস্কার পাবার উপযুক্ত।

বড় ঘরটাতে অন্তত পঁচিশজন বসে তর্কবিতর্ক চলছে।

নবাগতের প্রশ্ন—"সজনীবাবু কোথায়?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"বড়ই দরকার ছিল।"

"ঘন্টাখানেক পরে এলেই দেখা পাবেন।"

আধ ঘন্টা পরে পাশের তালাবন্ধ ঘর (গণপতি চক্রবর্তীর ইলিউশন বক্স!) থেকে আর এক দরজার খিল খুলে সজনীকান্তের আবির্ভাব।

বাইরে যান নি তিনি। ওটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। নইলে ভিড়ের মধ্যে সম্পাদনা বা লেখার কাজে কিছু অসুবিধা হ'ত।

সুরেশ বিশ্বাস গল্প জমিয়ে বসেছেন। "নীরদ চৌধুরী কেমন জানেন? মস্ত বড় পণ্ডিত। সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন সব জানেন। ভূগোলের জ্ঞান অদ্ভুত। সমস্ত দেশের খবর ইঞ্চি ইঞ্চি হিসেবে বলে দিতে পারেন। ইউরোপের কোন্ গ্যালারিতে কোন্ বিখ্যাত ছবি আছে তা বলে দিতে পারেন। তবে তাঁর সামান্য একটু ত্রুটি আছে।—তিনি লিলুয়ার বেশি দেশ নিজ চোখে দেখেন নি।"

সুরেশ কম্পোজিটর প্রুফ হাতে ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন, "বাবুরা সব লেখক হয়েছেন, একটা বানান ঠিক ক'রে লিখতে শেখেন নি।" ইত্যাদি।

অশোক চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। খুদুদা তিনি সবার। আড্ডা জমানোয় নোবেল প্রাইজ

পাবার উপযুক্ত। রবীন্দ্রকাব্যের নতুন অনুবাদ শোনাচ্ছেন, "ওগো তুমি কোথা যাও— O cow, where do you go." অথবা "যৌবন নিকুঞ্জে In the bowerless jow forest" অথবা "তিমির আড়ালে— Behind the whale"।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অশরীরী, একেবারে শেলীর স্কাইলার্ক—স্থূলত্ব কিছু নেই, সবখানি আবেগ আর উচ্ছ্বাস। সব কাজ তাঁর ইন্‌স্‌পায়ার্ড। সুন্দর কিছু পেলেই গদগদ ভাব। মধুর কণ্ঠ, গীতধর্মী সুর, সেই সুরের কাছে সত্য মিথ্যা সব একাকার। অবিনাস্ত চুল--দেখলেই মনে হয় দুনিয়া চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে এই খবরটি তাঁর মুখে এখুনি শুনতে পাব।

ঘোর গরম, পাখার হাওয়া তুচ্ছ মনে হচ্ছে। এমনি সময় পাখা বন্ধ ক'রে দিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সিগারেট যোগাড় করেছেন, সেটিকে পুরো খেতে হবে আরাম ক'রে। পাখার হাওয়ায় অকারণ বেশি পুড়ে যায়। তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠ। অবিচলিত, আত্মস্থ, আপন বিষয়ে সচেতনহীন। গ্রাম্য বালক যেন। উত্তেজনাহীন রাগদ্বেষহীন।

বিভূতিবাবু বলছেন ব্যবসা করবেন। তার ফলে এক তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। এই ঘটনাকে একটু প্রলম্বিত করে "প্ল্যান" গল্পটি লিখেছিলাম। সেটি 'বঙ্গশ্রী' জ্যৈষ্ঠ (১৩৪০) সংখ্যায় ছেপেছিলেন সজনীবাবু।

এর বছর দুই আগে যখন এই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হই নি, তখন হ্যারিসন রোডের ট্রামে যেতে যেতে এক নকল রবি ঠাকুরকে দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। গায়ের রঙ ফরসা হ'লে আসল বলে ভুল হত।

চেহারাটা মনে রেখেছিলাম, মনে রাখবার মত বলে।

সেই নকল রবীন্দ্রনাথেকে দেখলাম এই 'বঙ্গশ্রী'র আসরে। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। লেখেন, ছবি আঁকেন, অভিনয় করেন।

ইতিপূর্বে বাইরে যাঁকে সামান্য চিনেছি, একে একে সবাইকে দেখি 'বঙ্গশ্রী'র আসরে।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে শনিরঞ্জন প্রেসের টাইপ-ঘরের বিপরীত ঘরে আমি নিজে যখন ১৮ পয়েন্ট কম্‌প্রেস্‌ড টাইপের মত বাস করছি, তখন এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাসূত্রে আলাপ হয়। হ্রস্বদেহ, গম্ভীর মানুষ। বাড়িতে দেহচর্চা করেন। লোহার রিঙ ঝোলানো আছে কড়িকাঠে। কারলাইলের গোঁড়া ভক্ত, তাঁর ছবি টাঙানো আছে ঘরে।

কিছুদিন আগে ভাগলপুর থেকে বনফুলের কয়েকটি ছন্দে লেখা গল্প সংগ্রহ করে এনেছি। "জনার্দন জোয়ার্দার" ছাপা হচ্ছে 'শনিবারের চিঠি'তে। তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছি। গম্ভীর লোকের উপর কৌতুক কাহিনীর কি প্রতিক্রিয়া হবে জানতাম না।

সুট-পরা নিখিলচন্দ্র দাস গল্পের শেষ অংশ শুনে মেঝেতে গড়াতে লাগলেন। সে কি দৃশ্য! আমি তো স্তম্ভিত।

তার পরদিন আবার এসেছেন।

"ঐ কবিতাটার শেষ কটা লাইন আবার পড়ুন তো।"

আমি আবার পড়লাম।

পুত্র জনপ্রিয় জনার্দনকে ধরে পিতা গর্জন করছেন আর মারছেন। প্রচুর মার খেয়ে—

"স্কিপ করে
জনার্দন প্রণমা পিতায়
সার্কাসি কায়দায়
স্যালিউট করি
গেল সরি।"

আবার নিখিলচন্দ্র দাসের কোট-প্যান্টের ভাঁজ ভাঙল, ধুলোমাখা হলেন আপাদমস্তক।

তাঁকেও দেখলাম 'বঙ্গশ্রী' অফিসে, প্রথমে গম্ভীর মূর্তিতে, পরে মার মূর্তিতে; হাসিয়ে

দিলে আর রক্ষা ছিল না। নলিনীকান্ত সরকার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র থাকলে সেদিন রক্তপাত হত।

কিছুদিন পরে এবং কিছুদিনের জন্য তিনি ও সজনীকান্ত পরস্পর সুখ-দুঃখের ভাগী হলেন।

শিল্পী যামিনী রায় এসে বসেছেন। ব্যাখ্যা করছেন তাঁর আপন শিল্পভঙ্গী। শিল্পী অতুল বসু, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হরিপদ রায় আসছেন নিয়মিত।

বনফুল সিনেমা দেখে জ্যানেট গেনরকে উদ্দেশ ক'রে কবিতা লিখে টেলিফোনে শোনাচ্ছেন কিরণকুমারকে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন মুঙ্গের থেকে। আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে। আবিষ্কার করলাম পনেরো বছর আগে আমরা একই কলেজে একই ক্লাসে এবং সেকশনে পড়েছি। কেউ কাউকে চিনতাম না, 'বঙ্গশ্রী' অফিসে বসে পরিচয় হ'ল। কেউ কাউকে কখনো দেখেছি বলেও মনে হ'ল না।

ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী আবৃত্তি শোনাচ্ছেন সবাইকে অবাক ক'রে। স্মৃতি এবং কণ্ঠ দুই-ই চমকপ্রদ। অপরের ফুসফুস নিয়ে কারবার, কিন্তু তাঁর নিজের অন্তরটা আর সবারই কাছে উন্মুক্ত থাকত।

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য আসতেন কদাচিৎ। সব রকম বিষয়ে লেখায় ওস্তাদ। আর আসতেন উকিল জ্ঞান রায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কবি জগদীশ ভট্টাচার্য, বাসবেন্দ্র ঠাকুর, ঝুনো কবি কৃষ্ণধন দে।

কবি হেমচন্দ্র বাগচী শান্ত মধুর ভাবে এসে বসতেন। প্রকাণ্ড ব্যাগে গান্ধীজী, উড়িষ্যার মন্দির এবং অসহযোগ আন্দোলনকে পুরে নির্মলকুমার বসু আসতেন প্রসন্ন হাসিমুখে।

সকল বিষয়ে সকল বিধিনিষেধভঙ্গকারী সজনীকান্ত খামখেয়ালিতে সবাইকে হার মানাতেন। দল ধ'রে হঠাৎ অফিসের সময় ডায়মণ্ড হারবার যেতে হবে। সজনীকান্ত সহকারী কিরণকে বলছেন, "সঙ্গে না গেলে চাকরি খেয়ে দেব।"

শিক্ষক মনোজ বসু, 'নবশক্তি' সম্পাদক সরোজকুমার রায় চৌধুরী, কর্মযোগী যোগানন্দ দাস, দুর্ধর্ষ গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক কলহপ্রিয় গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী —সবাই আসছেন, যাঁর যখন খুশি। চলচ্চিত্রের মত নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় ক'রে চলে যাচ্ছেন।

আশ্চর্য আড্ডা। লেখক, শিল্পী, শিল্প-রসিক, সাহিত্য-রসিক—যাঁরই দুখানা পা সচল তাঁকেই দেখা যাচ্ছে সেখানে। বেলা একটা থেকে ভিড় জমছে। সংখ্যা বাড়ছে ক্রমে। ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুকুমার সেনকে দেখা যাচ্ছে বিকেলের দিকে, কখনো দুপুরে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত নন, কিন্তু সজনীর উৎসাহে সৃজনী উৎস খুলছে আশ্চর্য দ্রুত।

কিছুমাত্র ক্ষমতার পরিচয়ও দৃষ্টি এড়ায় না সজনীকান্তের।

তাঁর গুণগ্রহণের ভাষা ছিল "ওয়াণ্ডারফুল!" যা শুনতেন, সব ওয়াণ্ডারফুল। এ জন্য কোনো কোনো লেখকের অধঃপতন ঘটেছে সন্দেহ নেই, সময়কালে অপ্রিয় সত্য বললে হয়তো লেখকের উপকার হত। কিন্তু তবু বলব ওই 'ওয়াণ্ডারফুল' কথাটি পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছিল ব'লে আজও অনেকে সাহিত্যের পথে চলেছেন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে।

সজনী-কেন্দ্রিক 'বঙ্গশ্রী'কে ঘিরে কি বিচিত্র ভিড় কি বিচিত্র সম্ভাবনা!

সজনীকান্তের চরিত্র ছিল রহস্যময়। তিনি কখনো তাঁর শেষ দেখতে দিতেন না। প্রতি পদে বিস্মিত হয়েছি। অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে রহস্য বাড়াতেন। অনেক জটিল সমস্যার কি ক'রে যে সহজ সমাধান খুঁজে পেতেন তা আজও জানি না।

সেদিনের আড্ডায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা স্বীকার করবেন, একটি চরিত্রের এই

রহস্যময় বৈচিত্র্যই সেদিনের ছিল সর্বপ্রধান আকর্ষণ। ভাল লেগেছিল সে বৈচিত্র্য।

ভীরুতা দেখি নি কখনো।

অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা দেখি নি কখনো, তা সে নিজের জন্যই হোক বা আশ্রিতের জন্যই হোক।

'বঙ্গশ্রী' থেকে সরে যাবার বেলাতেও সেই অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ সম্পাদক সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনায় চরম যোগ্যতাই দেখিয়েছিলেন। 'বঙ্গশ্রী' প্রথম শ্রেণীর কাগজ হয়েছিল। সম্পাদনার আঙ্গিক বা কৌশল বিষয়ে আমি তো তাঁর কাছে প্রায় সবটাই ঋণী।

এই 'বঙ্গশ্রী'কে কেন্দ্র ক'রে যে শক্তি গড়ে উঠেছিল তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আজ কি হতো বলা যায় না। 'বঙ্গশ্রী' খুব বড় কাগজ হত অবশ্যই, কিন্তু সুরেশ বিশ্বাসের ভবিষ্যদ্বাণী যে ফলতে পারত না তাতে সন্দেহ নেই।

আঠারো বছর হ'ল 'বঙ্গশ্রী'র কাল গত হয়েছে। তখন যে সব পুত্র জামাতা পিতা সেখানে একত্র হয়েছিলেন, এখন তাঁদের প্রায় সবাই পিতা শ্বশুর বা পিতামহের স্থান নিয়েছেন। শুধু স্মৃতির মধ্যে সেই কাল আজ বেশি উজ্জ্বল, বেশি রোমাঞ্চকর।

আশ্বিন ১৩৬২

গ্রন্থাকারে পরিত্যক্ত রবীন্দ্রনাথের হাস্য ও ব্যঙ্গ কৌতুক

সজনীকান্ত দাস

১২৯১ বঙ্গাব্দ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই বৎসরের ৮ই বৈশাখ কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করেন এবং স্বর্ণকুমারী দেবী উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশোকে সাময়িকভাবে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন। এই কালে কয়েকটি ধর্মমূলক সাময়িক পত্রের প্রকাশে বাংলা সাময়িক সাহিত্য নীতিশাস্ত্র-ধর্ম-সংক্রান্ত কলহ-বাদানুবাদে মুখর হইয়া উঠে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক (১ম প্রকাশ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮) এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যব্রাহ্মগণ পরিচালিত 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে (প্রথম প্রকাশ ৩ বৈশাখ ১২৯০) তো খিটিমিটি লাগিয়াই ছিল। ১২৯১ সালের বৈশাখে মাসিক 'ব্রাহ্মজীবন', শ্রাবণে বঙ্কিমের পৃষ্ঠপোষকতায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় মাসিক 'নবজীবন' এবং বঙ্কিম-জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'প্রচার', ভাদ্রে ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পালের সহায়তায় গগনচন্দ্র হোম সম্পাদিত মাসিক 'আলোচনা' এবং আশ্বিনে শান্তিপুর হইতে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত (হিন্দুধর্ম প্রসারকল্পে) মাসিক 'আর্যবন্ধু' বাহির হইল। 'নবজীবন' ও 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যাতে যথাক্রমে "ধর্ম-জিজ্ঞাসা" ও "হিন্দুধর্ম" প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রিয়বন্ধু আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "দুঃখিত" করিলেন। ১২৯১ ভাদ্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন। শ্রাবণ মাস হইতেই 'নবজীবন' 'সঞ্জীবনী' ও 'বঙ্গবাসী'তে কলহ শুরু হইয়াছিল। 'সঞ্জীবনী'তে "র" আদ্যাক্ষরযুক্ত লেখকও এই কলহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন : "আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি বোধ হয় মনে মনে খুশি হইলেন ; মৃতকল্প আদি সমাজের মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করা যায় ভাবিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথকে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নির্বাচিত করাইলেন (১২৯১ আশ্বিন)। যুবক রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকপদে অধিরূঢ় হইয়া নিজ কর্তব্য অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন...." ['রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড ২য় সং, পৃ. ১৫০]

শোকবিমূঢ় নিষ্ক্রিয় রবীন্দ্রনাথ হাতে কাজ পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহী ও উগ্র ভাবাপন্ন হইয়া নব্যহিন্দুদের সহিত ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কবি ও লেখকের পক্ষে যুদ্ধ মানেই মসীযুদ্ধ। 'সঞ্জীবনী'তে প্রথম প্রকাশিত ১ম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমলে'র "পত্র। শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু" (১২৯১?) হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৯৯ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লেখা 'সোনার তরী'র "হিং টিং ছট" পর্যন্ত বহু কবিতা একদিকে যেমন এই মসীযুদ্ধের ফল, অন্যদিকে তেমনি 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র গোড়ার দুইটি রচনা "রসিকতার ফলাফল" (১২৯২ বৈশাখ 'ভারতী') এবং "ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য" (১২৯২ বৈশাখ 'বালক') এবং সমগ্র 'হাস্য-কৌতুক' বইখানিও (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ হইতে ভাদ্র ১২৯৪-এর মধ্যে রচিত) সেই কলমের লড়াইয়ের ফসল। "দামু-চামু" সংক্রান্ত ২১ স্তবকের কবিতাটি রবীন্দ্র-

সাহিত্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। প্রভাতকুমার 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (১ম খণ্ড ২য় সং পৃ. ১৭২) শেষের ১৫ (৭-২১) স্তবকের ৩টি স্তবক পরিত্যাগ করিয়া ১২টি স্তবক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। আমি এখানে কবিতাটির প্রথম ৬ স্তবক এবং প্রভাতকুমার-পরিত্যক্ত ১৩, ১৭ ও ১৮ স্তবক মোট ৯টি স্তবক পুনর্মুদ্রিত করিয়া এই যুগের পাঠকদের সম্পূর্ণ কবিতাটি দেখিবার সুযোগ করিয়া দিলাম :

১। দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)

২। কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত রাজার ধন মাণিক ছেলের
মুখে ফুটচে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)

৩। দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)

৪। দামু বলেন "দাদা আমার"
চামু বলেন "ভাই,"
"আমাদের দোঁহাকার মত
ত্রিভুবনে নাই!"
(আমার দামু আমার চামু!)

৫। গায়ে পড়ে গাল পাড়চে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতার ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম!
(দামু আমার চামু!)

৬। দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু—
(দামু আমার চামু!)

১৩। মনু বলেন "ম'নু আমি"
বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
রৈল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)

১৭। আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
আহার করচে ক'সে,

তরিবৎটা শিখলেনাক
বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)

১৮। এস বাবু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)

'ভারতী ও বালক' ১২৯৪ আষাঢ়ে প্রকাশিত "হেঁয়ালিনাট্য" [পিতাপুত্র রবীন্দ্রনাথের রচনা হওয়া সত্ত্বেও 'হাস্য কৌতুকে' স্থান পায় নাই; ইহাতে আর্যামির বিরুদ্ধে খোঁচা নাই তবে উচ্চশিক্ষিত নব্যবঙ্গের ভাষা ও নীতিবোধের বিরুদ্ধে কঠিন শ্লেষ আছে। এতখানি ইংরেজী প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদে'র ললিত চাটুজ্জে ছাড়া আর কাহাকেও দিয়া করান নাই। লেখাটি 'ভারতী ও বালক' হইতে নীচে উদ্ধার করিয়া দিলাম :

হেঁয়ালিনাট্য

বৈকুণ্ঠ, তস্য পুত্র খগেশ এবং অন্যান্য পাঁচজন।

বৈ। আমার ছেলের কি বুদ্ধি! প্রায় আমারই মত। যখন তর্ক করে মুখের কাছে দাঁড়ান যায় না! বাবা খগেশ, অনেক লোক উপস্থিত আছেন, এইখেনে একবার তর্ক কর্তে আরম্ভ কর দেখি!

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) তা হলে পালাতে হয় বুঝি।

খগেশ। আচ্ছা রাজি আছি। এখন কাকে ওড়াতে হবে। কাকে রাখতে হবে বলে দাও!

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) আপনাকে আর বাবাকে রেখে বাকি সকলকে উড়িয়ে দাও!

বৈ। বাবা, যেটা হাতের কাছে পাও সেইটেই ওড়াও। ইহকাল ওড়াও, পরকাল ওড়াও।

খ। তা হলে রোস বাবা, আগে dinnerটা খেয়ে নেওয়া যাক, তার পরে খেয়ে দেয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে রয়েবসে চুরুট টানতে টানতে চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরামে উড়িয়ে দেব, যারা যারা উপস্থিত থাকবে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

বৈ। That's right খগেশ! আপনারা সকলেই দেখচেন, আমার খগেশ কেমন sensible। ওর মাথায় কোন রকম nonsense নেই। যেটা real এবং immediate want তার প্রতি ওর প্রথম নজর—তার পরে সেটা satisfied হলে পরে কাগজের চুরুটের মত জগতের ডগায় তর্কের দেশলাই ধরিয়ে ওটাকে quietly বসে বসে ধোঁয়া করেই ওড়াও বা ছাই করেই ফেল তাতে আরাম বই কারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

খ। হাঃ হাঃ হাঃ, বাবা has put the matter very well indeed. আমি দেখেছি বাবা যেমন clearly and with great precision একটা proposition lay down কর্তে পারেন, এমন there are very few men who—

বৈ। সে আর তোমার বলবার দরকার নেই। I know that. আর কিছু না, এর secret হচ্ছে clear head এবং proper training। আমাদের দেশের লোকের ঐ দুটো জিনিসেরই বিশেষ অভাব and in consequence none of them has the least idea how to think out a subject.

খ। And I must confess তুমি আমার বাবা হওয়াতে আমার ঐ এক মস্ত advantage হয়েছে, certainly I possess a clear head, আর তার জন্যে আমি তোমার কাছে really greateful আছি বাবা।

অন্য পাঁচজন। বাপ-বেটার কি বিনয়।

খ। Nonsense! বিনয়! আচ্ছা এস এই বিষয়ে একটা settle করা যাক! I don't believe in বিনয়। It must be either hypocrisy or ignorance, যারা really clever they know they are clever and why should they not make it known to other people! Now come বিনয় কাকে বলে, let us have a definition of it.

অন্য পাঁচজন। (মাথা চাপড়াইয়া) Clear head নেই। খগেশ বাবু, তোমার বাবার মত বাবা আমাদের ছিল না। বিনয়ের definition আমাদের ঠাহর হচ্চে না!

বৈকুণ্ঠ। ওহে ও যজ্ঞেশ্বর, শুনে যাও শুনে যাও, আমার ছেলে খগেশ এদিকে তর্ক কর্তে আরম্ভ করেছে—It's a treat to hear him argue। (খগেশের পিঠ চাপড়াইয়া) Go on খগেশ।

যজ্ঞে। আজ আমাদের ওখেনে খেতে গেলে না যে!

খগেশ। (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) Now come কেন খেতে যাব!

যজ্ঞে। কথা ছিল যে।

খ। কি কথা ছিল ভাল করে analyze করে দেখা যাক। তুমি আমাকে বল্লে খগি কাল আমাদের বাড়ি খেতে যাবে কি? আমি বল্লুম "হাঁ" ভেবে দেখ it was no promise। তুমি simply একটি fact জানতে চেয়েছিলে এবং তখন যেটা likely answer বোধ হল সেইটেই তোমাকে বল্লুম। মনে কর if you had asked me খগি, কাল তুমি কি কালো মোজা পরবে, and if I happened to have answered হাঁ, এবং আজ যদি আমি কালো মোজা না পরতুম, what then! কিন্তু তুমি যদি বলতে—

যজ্ঞে। বুঝেছি খগেশ, আর কাজ নেই।

খ। কাজ আছে। তুমি না কি হঠাৎ এসে একটা wrong statement করে সকলের মনে একটা vague impression create করে দিয়েছ যে আমি আমার promise রাখিনি তারি absurdity আমি প্রমাণ করে দিতে চাই! Now to the point—তুমি আমাকে next question জিজ্ঞাসা করলে "কখন আসবে?" আমি বল্লুম "তা বলতে পারিনে আমি ঘড়ি ধরে কাজ করিনে।" তুমি একটা further question জিজ্ঞাসা করলে আমি তার এক indefinite উত্তর দিলুম—and the last question was "তুমি কি খাবে? মাংস না ডাল ভাত?" আমি বল্লুম "যা পাব তাই খাব।" There it ended, এর থেকে কি কি প্রমাণ হচ্চে দেখা যাক—

যজ্ঞে। রক্ষে কর বাপু আমার বাড়িতে যে তোমার পা পড়েনি সে আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে।

অন্য পাঁচজন। পা পড়েনি বলচেন কি, মাথা পড়েনি বলুন—আপনার নেমন্তন্নের মধ্যে যদি ওঁর clear headটা হঠাৎ গিয়ে পড়ত সে ত কামানের গোলা পড়ত, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা সশঙ্কিত হয়ে উঠত। Clear head অতি ভয়ানক জিনিস! বিশেষ সভাস্থলে।

যজ্ঞে। তা ঠিক বলেছেন।

বৈ। (পিঠ থাবড়াইয়া) তুমি বলে যাও না খগেশ। থামলে কেন। বেশ বলছিলে।

খ। যার এক পাতা logic পড়া আছে সে কখনো deny কর্তে পার্বে না যে—

য। তোমার যা বলবার বল, আমরা চল্লুম।

বৈ। কেন কেন?

যজ্ঞে। ভদ্র সমাজে নিমন্ত্রণে বা বন্ধুবান্ধবের সভায় ভদ্রলোকেরা গল্প সল্প করে, আমোদ করে, আলোচনা করে, কিন্তু পারতপক্ষে তর্ক করে না। যারা কথায় কথায় তর্ক উঁচিয়ে খোঁকিয়ে আসে, তাদের এক রকম সঙ্কীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে বটে কিন্তু তারা ভদ্র নয়।

বৈ। কিন্তু ideaর precision—

খ। Preception-এর clearness,

বৈ। Exepression-এর luminous lucidity.

খ। The sense of utter futility of all fog and fallacy—

যজ্ঞে। ও সবই থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে তার্কিকতা নামক তীক্ষ্ণ ও নর্তনশীল জিহ্বাগ্রভাগ সগর্বে সকলকে প্রদর্শন করবার জন্যে সর্বদা বের করে উঁচিয়ে রেখে দিতে হবে ভদ্রসমাজে তার কোন আবশ্যক নেই।

খ। "ভদ্রসমাজের" definition কি?

বৈ। And what is "তর্ক।"

খ। জিহ্বাই বা কি? What is the analogy?

বৈ। এবং "আবশ্যক" কাকে বলে?

খ। তোমার idea of "সর্বদা"ই বা কি রকম!

সকলে। আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়।

খ। দেখেছ বাবা, একটা proposition-এর মধ্যে string of inaccuracies!

বৈ। Want of precision and proper training! [সমাপ্ত]

'হাস্য-কৌতুকে'র "একান্নবর্তী" নামক কৌতুকনাট্যটি "হেঁয়ালিনাট্য" শিরোনামায় ১২৯৪ সালের বৈশাখের 'ভারতী ও বালকে' বাহির হয়। ইহা প্রথমাংশ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া পুস্তকে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে :

"দৌলত। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না। একান্নবর্তী পরিবার সম্বন্ধে সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বলতে লাগলুম, সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে নিষেধ করবার কেউ রইল না। শেষকালে দুজন ছোকরা এসে দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেদিন এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবার কথাই তো। তা আপনি কী বলেছিলেন।

দৌলত। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগের উপায় একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবননির্বাহ হয় সেখানে স্বার্থের কোনো প্রয়োজনই হয় না। খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে—তারা সকলেই বলছে, দুঃখের বিষয় দৌলত বাবুর পরিবার কেউ নেই, তিনি একলা। (দীর্ঘনিশ্বাস)"

মূলে ছিল :

"দৌ। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন বক্তৃতা করা কি সহজ? একান্নবর্তী পরিবার প্রথা সম্বন্ধে আমি যতই ভাবতে লাগলুম আমার উৎসাহ ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, সভায় দাঁড়িয়ে ততই আমি অনর্গল বলতে লাগলুম সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে আমাকে নিষেধ করবার কেউ রইল না। অবশেষে দেখলুম শোনবার লোকও বড় একটা কেউ নেই, সেজের বাতিগুলো শুভ্র অশ্রুধারায় বিগলিতকলেবর হয়ে ক্রমেই অন্তিমের নিকটবর্তী হতে লাগল। কিন্তু আমার বাগ্মিতা-শিখা সমান ভাবেই জ্বলতে লাগল; শেষ কালে দুজন ছোকরা এসে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বাড়িতে ফিরে এসে আমার কালাচাঁদ খানসামাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জোর করে বসিয়ে বাকি বক্তৃতাটুকু তাকে শুনিয়ে তবে রাত্তিরে একটু ঘুম হয়। সে দিন আমার এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবারই কথা। তা আপনি কি বলেছিলেন?

দৌ। আমি বলেছিলেম যে দেশে একান্নবর্তী পরিবার নেই সে দেশের লোকেরা সকাল সকাল মারা পড়ে, কারণ ব্যামো হলে তাদের সেবা করবার কেউ থাকে না। অকালমৃত্যু যে কি শোচনীয় ঘটনা তা আমি সকলকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেম। আমি বল্লেম "দেখ ভাই, তোমার যে শিশু সন্তানটি সবেমাত্র বাবা বলতে, হামাগুড়ি দিতে এবং দাড়ি ধ'রে টানতে

শিখেছে আজ হঠাৎ যদি ফিরে গিয়ে দেখ সে হাত পা খিঁচিয়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে প'ড়ে রয়েচে তা হলে তোমার মনে কি রকম ভাবের উদয় হয়?"

যুবক শ্রোতাদের ডেকে বল্লুম "হে যুবক, এখনি যদি তোমার বাড়ি থেকে একটি দূত ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে তোমাকে খবর দেয় যে তোমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মুখকমল দিয়ে অনবরত রক্ত উঠচে, তার কমলায়ত লোচন দুটি একেবারে উল্টে গিয়েছে, এবং তার কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠ থেকে ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হচ্চে না, তা হলে তুমি কি কর!" এই যেমন বলা অমনি পাঁচ সাতটা লোক এসে আমার গলা চেপে ধর্‌লে। আমার উন্মত্তকারী বক্তৃতা শুনে তাদের যে কতদূর পর্যন্ত আবেগ উপস্থিত হয়েছিল তাদের দৃঢ় মুষ্টির প্রভাবে আমি অত্যন্ত স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। সেখেনে আর অধিক কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এসে কালাচাঁদকে ঘুম থেকে জাগিয়েই আমি বল্লুম "হে সভাপতি এবং হে কালাচাঁদ, হঠাৎ যদি এখনি তোমার বাড়ি থেকে চিঠি আসে যে, তোমার যুবক জামাইটি কাল ভোরের বেলায় ওলাউঠো হয়ে হিম হয়ে মরে গেছে এবং তোমার ১২ বৎসরের মেয়েটি বিধবা হয়েচে তা হলে তুমি কি কর!" কালাচাঁদ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে—আমিও খানিকক্ষণ আর কথা কইতে পারলুম না। আমার নিজের বক্তৃতা-শক্তির প্রভাবে আমার নিজের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, আমি অনেকক্ষণ মুখ নত করে চুপ করে কেবলিই অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলুম। কালাচাঁদ তার পর দিনই আমার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গিয়েচে। একান্নবর্তী পরিবার না থাকা এতই শোকাবহ, এতই মর্মবিদারণকারী, এতে হৃদয় এতই ভীত, স্তম্ভিত, চকিত এবং বিস্ফারিত এবং বিদ্রাবিত হয়। কানাই কি বল?

কা। আজ্ঞে তা হয় বটে। আমার এখনই হচ্চে।

দৌলত। কেবল তাই নয় কানাই। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগ শিক্ষার একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার। এরূপ পরিবারে পরের অর্থেই অধিকাংশ লোকের জীবন নির্বাহ হয়, স্বার্থের কোন সম্ভাবনা বা আবশ্যক থাকে না। চতুর্দিকের খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে গেছে—তারা সকলেই বলেচে দুঃখের বিষয় দৌলত বাবুর পরিবার কেউ নেই তিনি একলা! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ)

কা। আহা, এমন মহৎ ব্যক্তিরও এমন দশা হয়!"

১২৯২ হইতে ১২৯৪ সালের মধ্যে এই 'হাস্য-কৌতুকে'র দ্বন্দ্ব পরিসমাপ্ত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ খাঁটি সাহিত্যিক 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র সূত্রপাত ১২৯৮ সালে—'ভারতী ও বালক' এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায়। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক হাস্যকর সাহিত্যিক গবেষণা, ১২৮২ সালে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র প্রকাশে বাংলাসাহিত্যে ন্যাকামি ও হা-হুতাশের বন্যা এবং 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার ছোটগল্পের বিষয়বস্তু লইয়া মনান্তর রবীন্দ্রনাথকে এইকালে যথেষ্ট পীড়িত ও উদ্বেজিত করিয়াছিল। তাহাব ফলেই আমরা 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র "প্রত্নতত্ত্ব", "লেখার নমুনা", "সারবান সাহিত্য" ইত্যাদি রচনা পাইয়াছি। "মীমাংসা" শীর্ষক রচনায় প্রেম-পাগলদের প্রতি যে কশাঘাত আছে ১২৯৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা "ভারতী ও বালকে" প্রকাশিত "নিষ্ফল চেষ্টা" ও "সফলতা দৃষ্টান্ত" রচনা দুইটিতে বিদ্রূপ তদপেক্ষা বড় কম নাই। রচনা দুইটি "মীমাংসা" অপেক্ষা নিকৃষ্ট তো নহেই, আমাদের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট। কিন্তু 'ব্যঙ্গকৌতুক' পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় এই দুইটি রচনা যে কেন বাদ পড়িয়াছে জানি না। সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকিবে। পরবর্তী সংস্করণ 'ব্যঙ্গকৌতুক' এই দুইটির স্থান করিয়া দিবার অনুরোধ-(শ্রীপুলিনবিহারী সেনের দরবারে) সহ এখানে আটযট্টি বৎসর পরে সেগুলি পুনর্মুদ্রণ করিলাম। যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য। কিন্তু হতাশ আদেখলা

প্রেমিকেরা তেমনি আছে। কাজেই প্রায় ত্রিপাদ শতাব্দীকাল পরে এ যুগের পাঠকও যে কৌতুকবোধ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিষ্ফল চেষ্টা

অনেকগুলি বাঙ্গলা পদ্য, বিশেষতঃ গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া আমার সর্বদাই কি-যেন কে-যেন কখন-যেন-কেমন-যেন-কি-যেন-কি-ময় হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কোনরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।

আপিসের ছুটি হইলে পদব্রজে পথে বাহির হই ; মনে করি, একেবারে উদাস হইয়া কি-যেন হইয়া যাইব ; কিন্তু দেখিয়াছি ঠিক নিয়মিত সময়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক টানিতে বসি—মনের কোন যায়গায় কোন রূপ বিহ্বলতা অনুভব করি না।

বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ পরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোন ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সঙ্গীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চুণ খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

যে দিন চাঁদ উঠে সে দিন মনে করি, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকা যাক, দেখি তাহাতে কিরূপ ফল হয়। বেশিক্ষণ একভাবে থাকিতে পারি না। অনতিবিলম্বে ঘুম আসে।

বাতায়নে গিয়া বসি। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া আসে, আস্তাবল হইতে গন্ধ পাই এবং প্রতিবেশিনীগণ অসাধুভাষায় পরস্পরসম্বন্ধে স্ব স্ব মনোভাব উচ্ছ্বসিতস্বরে ব্যক্ত করিতে থাকে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত কোন প্রকার স্বপ্নই টিকিতে পারে না।

সেখান হইতে উঠিয়া একাকী ছাতে গিয়া বসি। আপিসের ময়রা, ইন্সিওরেন্সের টাকা, ধোবার কাপড় দিতে বিলম্ব, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় অসংলগ্নভাবে মনে উদয় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোন বিস্মৃত মুখচ্ছবি, কোন পূর্বজন্মের সুখস্বপ্ন মনে পড়ে না।

দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে এবং স্বপ্ন আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!

আমি বেশ আছি, আরামে আছি, নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনরূপ কষ্ট হয় না এ কথা একবার যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি নীরব চিন্তা সর্বাপেক্ষা গভীর চিন্তা, নীরব বেদনা সুর্বপেক্ষা তীব্র বেদনা, এবং নীরব কবিতা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চোখে যে সহজে অশ্রুজল পড়ে না ওয়ার্ডসওয়ার্থ আমার হইয়া তাহার জবাব দিয়া গেছেন।

আসল কথা, আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই একটি করিয়া "কে-যেন" "কি-যেন" আছে, অথবা ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; আমার আর সমস্ত আছে কেবল সেইটা নাই।

আমি কি করিব? কি করিলে আমার বুক ফাটিবে, সুখ থাকিবে না, আশা ফুরাইবে। হাসিব কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানে; আমোদ করিতে ছাড়িব না কিন্তু সে কেবল অদৃষ্টকে সবলে উপেক্ষা করিবার জন্য। আপিসে যাইব, কিন্তু সে কেবল কাজের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে।

এক কথায়—কি করিলে একটি "কে-যেন" একটি "কি-যেন" পাওয়া যায়!—

সফলতার দৃষ্টান্ত

হরি হরি! আমার কি হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে!

তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি!

কিছু দিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক অঙ্গুলি এই চাঁপা গুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পার কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনো লাগিয়া আছে? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালবাসা, হরি হরি কত প্রেম!

রোজ মনে করি আজ দেখিব—এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব—এবং মরিব।

কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না!

কেমন করিয়া ধরিব! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ হৃদয়, তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া?

কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই—অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই—একদিন প্রত্যুষে উঠিলাম।

দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে!"

সে তৎক্ষণাৎ কহিল "বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম!"

আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "প্রবঞ্চনা করিস না রে জগা, সত্য করিয়া বল্—এ তোড়া তোকে কে দিল!"

সে কহিল "প্রভু এ আমি নিজে বানাইয়াছি!"

আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম—"আমার মাথা খাইস জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল্!"

মালাকর অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা সহকারে সে উৎকল-উচ্চারণমিশ্রিত গ্রাম্য ভাষায় কহিল—"প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারি স্বহস্তের রচনা।"

বুঝিলাম সে কিছুতেই সেই অজ্ঞাতনাম্নীর নাম প্রকাশ করিবে না।

আমি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অপরিচিত অনামিকা—আমার সেই জন্মান্তরের বিস্মৃতনামা প্রিয়তমা তোড়াটি প্রস্তুত করিয়া মালীর হাতে দিতেছেন এবং অশ্রুগদগদ কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন—"এই তোড়াটি গোপনে তাঁহার ঘরে রাখিয়া আয় জগা, কিন্তু আমার মাথা খাস, আমার মৃতমুখ দর্শন করিস জগা, আমার নাম তাঁহাকে শুনাইস না, আমার কথা তাঁহাকে বলিস না, আমার পরিচয় তাঁহাকে দিস না, আমার হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই থাকুক, আমার জীবনের কাহিনী জীবনের সহিতই অবসান হইয়া যাক।"—

জগা ত চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তোড়াটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম, দুটি একটি কণ্টক বক্ষে বিঁধিল—বুকের রক্তের সহিত ফুলের শিশির এবং ফুলের শিশিরের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিল। হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কি হইল। কি যেন আমাকে কি করিল! কে যেন আমাকে কি বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি! কেবল যেন এই তোড়াটি—এই কয়েকটি ক্রোটনের পাতা, এই শ্বেত গোলাপ এবং এই গুটিকতক দোপাটি—আমার কাছে চিরজীবনের মত কি যেন কি হইয়া রহিল এবং এখন হইতে যখনি জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পায়! জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণের আর একটি পরিত্যক্ত রচনা হইতে সংবাদপত্র ও সংবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব নিম্নে অংশতঃ উদ্ধৃত ১৪টি পংক্তিতে এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে :

"খবর ব'য়ে বেড়ায় ঘুরে খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত বেড়াইনাকো খবর খুঁটে।
এত ধূলো, এত খবর কলকাতাটার গলিতে!
নাকে চোকে খবর ঢোকে দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবরগুলো মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকে ত জানই বাছা! আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা' বলি, তার অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে ভোরের বেলা পূব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক গে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবুসা।
কল্পতরুর তলায় থাকি নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি মেওয়া ফলে সবুরে।"

রচনাটি "চিঠি" শিরোনামায় ১২৯২ ফাল্গুনের 'বালকে' প্রথম বাহির হয়। তাহার পরে সংবাদপত্র, সংবাদ ও সাময়িকপত্র সম্বন্ধে অজস্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে রবীন্দ্ররচনা কণ্টকিত হইয়াছে। প্রথম বিদ্রোহকেই এইখানে স্থান দিলাম। বহু বৎসর পরে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে উপরে-উদ্ধৃত-অংশ-বর্জিত-ভাবে "চিঠি" কবিতাটি "পরিচয়" নামে প্রকাশিত হয়।

ভাদ্র ১৩৬৭

স্বীকারোক্তি

আশাপূর্ণা দেবী

জলসা লাগাচ্ছ? জলসা?

গিরীশ সিংহী তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, ভাল ওস্তাদ আনাতে পারবে? না, কি তোমাদের ওই বিনুনি-ঝোলানো দুটো মেয়ের পিঁউ পিঁউ শোনাবে?

এ ভঙ্গির সামনে নিজেকে কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হয়, যে উৎসাহ নিয়ে খবরটা দিতে এসেছিলাম, সেটা মিইয়ে যায়। বলি, আনছি তো কয়েকজনকে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বাঙালীর ব্যাপার করছি কিনা। গাইয়ে কিছু পাচ্ছি, তবে যন্ত্রসঙ্গীত-টঙ্গীতে তেমন ভাল— বাঙালীর মধ্যে—

দপ করে জ্বলে উঠলেন গিরীশ সিংহী, বললেন, শোন নি, তাই বলছ। ব্রজরাজ গোস্বামীর সেতার শুনেছ? ব্রজরাজ গোস্বামীর? না, কি নামই শোন নি?

থতমত খেয়ে বলি, নাম শুনেছি, সেতার শুনি নি।

শোন নি, সে তো বুঝতেই পারছি। শুনলে আর ভুলতে পারতে না। বুঝলে হে, সে ভোলবার জিনিস নয়। চোখ বুজে একবার মনে করলেই মনে হয় যেন ঝনঝন করে কানে বাজছে।

কিন্তু এত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এত জলসার ঘটা চারদিকে, কই, আসতে তো দেখি না কোথাও?

গিরীশ সিংহী উদাসভাবে বলেন, তা হবে। আমিও তো আজকাল আর যাই না কোথাও। মেয়েটা গিয়ে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি ওসব। তারই ভয়ানক ঝোঁক ছিল, ওর জন্যেই সর্বত্র ছুটতে হত।

চট করে কথা যোগায় না মুখে। পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে আমি বলি, কোথায় থাকেন ব্রজরাজ গোস্বামী, বলতে পারেন?

আমি কোথা থেকে বলব? আমাদের মুরারিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। ভেবেছিলাম গানবাজনার আসরে আর যাব না, তবে ব্রজরাজের সেতারের ব্যবস্থা যদি করতে পার, শেষ জীবনে না হয় একবার—

কথাটা শেষ করলেন না গিরীশ সিংহী।

ছুটলাম গিরীশ সিংহীর ভাইপো মুরারির কাছে।

মুরারি বলল, একেবারে নীট ঠিকানা আমি দিতে পারব না, তবে শুনেছি উনি এখন আর কলকাতায় থাকেন না।

কলকাতায় থাকেন না!—আমার কণ্ঠে বোধ করি রীতিমত হতাশার সুর বেজে থাকবে।

মুরারি সদয় কণ্ঠে বলল, আচ্ছা দাঁড়ান, এক কাজ করুন। ব্রজরাজ গোস্বামীর ভাইপো থাকে কালীঘাটে, তার ঠিকানাটা দিচ্ছি আপনাকে, ওখানে গিয়ে খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। আগে আগে অনেক গিয়েছি, এখন সংসারে জড়িয়ে পড়ে বুঝলেন কি না—ইয়ে— আপনাদের জলসার একটা টিকিট পাব তো? ভারী শখ ছিল, বুঝলেন কিনা—

বুঝলাম সবই।

ছোট্ট একটু চিরকুট হাতে করে কালীঘাটের এক পচা গলিতে ছুটলাম রাখালরাজ

গোস্বামীকে খুঁজে বার করতে। আমারও কেমন জেদ চেপে গেছে। ভাবছি কেমন সেই সেতারী, যার জন্যে গিরীশ সিংহীর মত লোক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চান!

পেলাম রাখালরাজকে, ব্রজরাজের ঠিকানাও পেলাম। কলকাতায় থাকেন না, থাকেন রাজপুরে। ছোট রেলে চেপে যেতে হবে।

তা হোক।

এ রকম একটা ফাংশান-উদ্ধার, পাঁচটা কন্যাদায়-উদ্ধারের সামিল, এ তো জেনে বুঝেই হাত দেওয়া।

ভোরের ট্রেনে রওনা দিলাম আমি আর নীলকণ্ঠ। ট্রেনে উঠেই মনে হল, বাঃ! কলকাতার এত কাছে এমন পল্লীশ্রী! এলেই তো হয় মাঝে মাঝে! অকারণে কোন ছুটির দিন পকেটে আনা-কতক পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়া! বৈশাখের ভোরের মত এমন মনোরম সময় বছরে বোধ করি আর নেই।

নীলকণ্ঠের ভাব লেগেছে, ও গম্ভীরভাবে বলে, সত্যিকার শিল্পীদের সতিাই কলকাতায় থাকা উচিত নয়। কেন যে আমরা শহর শহর করে মরি!

থার্ড ক্লাস ট্রেন। জনা চার-পাঁচ চাষাভূষো-ক্লাসের লোক ছাড়া সহযাত্রী আর কেউ নেই। কাজেই গল্প চলতে থাকে ইচ্ছেমত। খবরের কাগজখানা সঙ্গে এনেছিলাম, পাট খোলাই হল না।

ব্রজরাজ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে।

আসতে চাইবে কি না কে জানে!

কি জানি কত দক্ষিণা চেয়ে বসবে!

অ্যামেচার কি না জিজ্ঞেস করা হল না মুরারিকে!

পাগল হয়েছ, এ যুগে আবার অ্যামেচার বলে কিছু থাকে নাকি? ওই প্রথম দু-চার দিন, নাম করে নেওয়া পর্যন্ত।

অতঃপর এ আলোচনাও চলতে থাকে, ভদ্রলোক দেখতে কেমন, বয়স কত, কি রকম স্বভাব! এবং কি ভাবে প্রস্তাবটা করা যাবে!

এসব ব্যাপারে একজন চেনাশোনা লোক সঙ্গে আনা উচিত।—নীলকণ্ঠ ঘোষণা করে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, উচিতবোধটা আর জন্মে দিতে হবে না তোমাকে, জানা আছে সবাইয়ের। মুরারির ধরনধারণ দেখলি তো, বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না।

পথ শেষ হল।

পথে পা দিয়ে দেখলাম সময়টা আর মনোরম নেই। রোদ উঠেছে বিলক্ষণ। তাতও ফুটেছে খুব।

নাও, এখন কাকে জিজ্ঞেস করবে কর। যা দেখছি দেশের অবস্থা। জনবিরল রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল নীলকণ্ঠ, যে এতক্ষণ শহরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল।

তবু লোক আসছে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

সবাইকে জিজ্ঞেস করতেই ইচ্ছে করে না। কাউকে কাউকে বলি, ওহে শুনেছ, এখানে ব্রজরাজ গোস্বামী থাকেন? জান তাঁর বাসা?

বলা বাহুল্য আশাপ্রদ উত্তর মেলে না।

অবশেষে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর, সূর্য যখন প্রায় মাথায় চড়ে বসেছেন, এক ব্যক্তি নিশানা দিল: উই যে গাছের ফাঁকে নতুন দালান-কোঠাখানা দেখছেন, উই বাড়ি গোঁসাইয়ের।

তাকিয়ে দেখলাম।

দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। সত্যি বলতে কি, এ দেশে নেমে অবধি নতুন বাড়ির চেহারাই দেখি নি।

নীলকণ্ঠ গম্ভীরভাবে বলল, যতই হোক, শহরের লোক, রুচি মার্জিত, এদের মত করে থাকতে পারে কখনও?

যা দেখছি, মোটা দক্ষিণা হাঁকবে।

দরজা ভেজানো ছিল, তবু কড়া নাড়লাম।

নারীকণ্ঠে সাড়া এল, কে!

নীলকণ্ঠ মাথায় হাত দিয়ে বলল, সেরেছে! মেয়ে গলা! তার মানে বাড়ি নেই।

থাম্ দিকি!...একবার শুনুন।

এবারে একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন; শ্যামল রঙ, দীর্ঘাঙ্গী, মুখে একটা দৃপ্তভঙ্গি! সাধারণ শাড়ি সেমিজ পরা। তবে সেগুলি ফরসা, সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে যেটা প্রায় দুর্লভ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা নেই, তবে সিঁথির সিঁদুরটা জ্বলজ্বলে।

নীলকণ্ঠকে পিছনে ঠেলে রেখে সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম, ব্রজরাজ গোস্বামী থাকেন এখানে?

মহিলাটির চোখে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎশিখা জ্বলে উঠল, বললেন, কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

কলকাতা থেকে। আমরা একটা জলসার আয়োজন করছি, যদি উনি দয়া করে—আমরা এসেছি—কালীঘাটের রাখালরাজবাবুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে, উনি এঁর ভাইপো হন তো?

হুঁ।

ইনি বুঝি এখন বাড়ি নেই?

মহিলাটির চোখে আর একবার দেখলাম সেই শিখা, তার পরই গম্ভীরভাবে বললেন, কোথাও নেই। তিনি মারা গেছেন।

মারা গেছেন!—সর্পদষ্টের মত না কি বলে, সেই ভাবে মুহূর্ত কয়েক তাকিয়ে থেকে বলি, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা ব্রজরাজ গোস্বামীর কথা বলছি, ভাল সেতার বাজান—

মহিলাটি এবার নম্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি আমি। তিনি মারা গেছেন।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করি। ওর চোখেও সেই সন্দেহ, মহিলাটি কি অপ্রকৃতিস্থ?

সসঙ্কোচে বলি, কিন্তু রাখালরাজবাবু তো কই বললেন না কিছু—

সে হয়তো জানে না, কে কার খবর রাখে বলুন?

নীলকণ্ঠ আমার পিছন থেকে আঙুলের খোঁচা মারে, অর্থাৎ সরে পড়। ব্যাপার স্বাভাবিক নয়।

তবু আমি হেস্তনেস্ত দেখতে চাই। আরও নম্র আরও বিনীত কণ্ঠে বলি, আচ্ছা, উনি আপনার কে হন? মানে ইয়ে—কে হতেন?

মহিলাটি হঠাৎ হেসে ওঠেন—রীতিমত খিলখিল হাসি। হাসি থামলে বলেন, সে জেনে লাভ? তাতে তো আর মরা মানুষটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না?

হাসি দেখে নিঃসংশয় হওয়া গেল।

আচ্ছা, নমস্কার।—বলে পালিয়ে এলাম।

নীলকণ্ঠ বলল, বদ্ধ পাগল।

তাই মনে হচ্ছে! দূর, ভাল ফ্যাসাদে পড়া গেল। এ শখ না করলেই হত!

আহা, এ ধারে ও-ধারে আর কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখো না?

কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব? প্রশ্ন করতেই ইচ্ছে হবে, এমন লোক কোথা?

এদিকে রোদে মাথা পুড়ছে, জামাটা একবার করে ঘামে ভিজছে, একবার করে রোদে শুকোচ্ছে।

খানিক দূর নিরুদ্দেশ লক্ষ্যে ঘুরতে ঘুরতে নীলকণ্ঠ বলে, এই দেখ্, ওইখানে একটা সুরকির কলের মত কি চলছে মনে হচ্ছে, দেখ্ দিকি কাউকে যদি পাস জিজ্ঞেস করবার মত!

এগিয়ে গিয়ে এই প্রথম নীলকণ্ঠকে একটু প্রশংসা করতে পারলাম। সত্যিই ভদ্রলোক-গোছের কে একজন দাঁড়িয়ে।

নমস্কার করে বললাম, মশাই, একটা খবর দিতে পারেন?

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

বলতে পারেন এখানে ব্রজরাজ গোস্বামী থাকেন কি না? সেতারী ব্রজরাজ গোস্বামী?

ভদ্রলোক খোয়া-ভাঙাইয়ের দিকে এক চক্ষু নিবিষ্ট রেখে অগ্রাহ্যভরে উত্তর দিলেন, থাকেন। কি দরকার?

আমরা একটা জলসার ব্যাপারে এসেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য! আচ্ছা, জানেন ওঁর বাড়িতে কেউ পাগল আছেন?

পাগল! পাগল মানে?

মানে বোঝাই তো শক্ত হল। একজন একটা বাড়ি দেখিয়ে দিলে! গেলামও, এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, তিনি তো মারা গেছেন। অথচ—

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, কোন্ বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন?

ওই তো যা দেখিয়ে দিল। নতুন লাল রঙের বাড়ি। ও বাড়ি নয়?

নতুন লাল রঙের বাড়ি?

হঠাৎ ভদ্রলোককে কেমন উত্তেজিত দেখাল, আরক্ত মুখে বললেন, ব্রজরাজের কথা কি বলেছে? মারা গেছে?

কি জানি মশাই, ভদ্রমহিলা তো বললেন তাই। অথচ কাল ওঁর ভাইপোর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি কিছু বললেন না। ভদ্রমহিলার মাথার দোষ আছে বলেই মনে হল। হাসিটাও কেমন অস্বাভাবিক।

মাথার দোষ আছে? মাথার দোষ? ইয়ার্কি না কি?

আরও উত্তেজিত দেখাল ভদ্রলোককে, বললেন, আপনারা কষ্ট করে কলকাতা থেকে এলেন আর সে কিনা একটা মিথ্যে খবর দিয়ে ভাগিয়ে দিল আপনাদের? এই রোদে তেতে-পুড়ে এসেছেন! চলুন চলুন। একটু শরবত কি ডাব—

সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বলি, না না, ওসব কিছু দরকার নেই। আপনি শুধু যদি একটু দয়া করে বলে দেন ওঁকে কোথায় পাওয়া যাবে—

দেশটা কি পাগলেরই—

এই সামান্য কথাটায় ভদ্রলোক যেন হঠাৎ দপ করে নিবে গেলেন।

আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে মিনিট খানেক অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন অন্যমনস্কের মত, তারপর শান্ত ভাবে বললেন, শুনুন, ওঁকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ঠিক খবরই পেয়েছেন আপনারা, উনি মারা গেছেন। হ্যাঁ, মারা গেছেন।

বৈশাখ ১৩৬৩

নবজীবন-স্রোত

"বনফুল"

শ্রীযুক্ত রামবৃছ সিং শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন। পরিচয় বেশী দিনের নয়, কারণ উভয়েই অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকুরি ব্যপদেশে এই শহরে আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ভাড়াটে-রূপে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুযোগও ছিল না। দুইজন দুই বিভিন্ন আপিসে চাকরি করেন। একজন পোস্ট-অফিসে, একজন রেলে। নিজের নিজের আপিস আর সংসার লইয়াই দুইজনকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, প্রতিবেশীর সংবাদ লইবার মত অবসর মিলিত না। ছুটির দিনেও না। ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এতটা ঔদাসীন্য দেখা গেল না। কমলকুমারের দশ বছরের ছেলে অমলকুমার রামবৃছের বারো বছরের ছেলে ছবিলালের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহাদের আলাপ করিবার সুযোগও ছিল। একই স্কুলে একই ক্লাসে ভরতি হইয়াছিল তাহারা।

অমলকুমার একদিন তাহার মাকে বলিল, মা, জান ছবিলাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সে সেভ্‌ন্ বলতে পারে না, বলে—সেভুন। কমলকুমার আয়নার সম্মুখে নানা মুখভঙ্গি করিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন, ছবিলাল কে?

পাশের বাড়িতে থাকে। ওর বাবার নামটাও অদ্ভুত। রামবৃছ—

অমল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কমলকুমার বলিলেন, ও, বুঝেছি। রামবৃছ সিং আমাদের পাশের বাড়িতে আছে না কি?

হ্যাঁ।

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, ওঁর জায়গায় আমাদের বিশ্বেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর চেয়ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোন মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তাও নেই—

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁছিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারান্দা ঝাড়ু দিতেছিল। সে বাংলা বোঝে, রামবৃছবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথাসময়ে উক্ত কথোপকথনটি রামবৃছবাবুর পরিবারে নিবেদন করিল। রামবৃছবাবুও সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত অমৃত-নিষিক্ত হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদ্‌গার তুলিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া—

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মত একটি সংবাদও একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। একজন ফেরিওয়ালা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কিছু চিংড়িমাছ এবং নোনা-ইলিশ তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। তিনি মহাসমারোহে সেগুলি রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রন্ধনকালে সম্ভবতঃ রান্নাঘরের জানালাটি খোলা ছিল, চিংড়িমাছ এবং নোনা-ইলিশের গন্ধ বায়ু-বাহিত হইয়া রামবৃছ সিংয়ের অন্তঃপুরকে আমোদিত করিয়া তুলিল। রামবৃছ তখন রহরকা দাল ও নিমকি সহযোগে মোটা আটার রোটি চর্বণে ব্যাপৃত ছিলেন। গন্ধ পাইয়া তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

দাইকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ঘর মে কোই জানবর মরল বা?

দাই মুচকি হাসিয়া আড়ঘোমটা টানিয়া নিবেদন করিল যে, না, কোনও জানোয়ার মরে নাই, পাশের বাড়ির বাঙালিন বহু মৎস্য রন্ধন করিতেছেন।

রামবৃছ নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে, ছি ছি ছি! ই বাংগালি লোগ আদমি নেই থে, গিধ্ বা। অর্থাৎ বাঙালীরা মানুষ নয় শকুনি, মরা জানোয়ার খায়।

ঠিকা দাইটি কমলকুমারের পত্নীর নিকট এই খবরটিও যথাসময়ে মুচকি হাসিয়া নিবেদন করিল।

আপিস হইতে ফিরিয়া কমলকুমারও সংবাদ শুনিলেন। একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, ও বেটা ছাতুখোর মাছের মর্ম কি বুঝবে?

এ খবরটিও রামবৃছের অবিদিত রহিল না। উভয় পক্ষেই উত্তাপ বাড়িতে লাগিল। তাহা হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল যখন রামবৃছ একদিন শুনিলেন যে, একজন সিনিয়র বাঙালীকে ডিঙাইয়া তাঁহাকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে—এ খবরটি বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজী পত্রিকায় কে. কে. নামক পত্রলেখক প্রমাণসহ বাহির করিয়া দিয়াছেন। রামবৃছ আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইল, কে. কে. কমলকুমার ছাড়া আর কেহ নন। তিনি নিজের ইয়ারমহলে বাঙালীদের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধের আয়োজন কমলকুমারও করিলেন। তাঁহার পুত্র অমলকুমার অতিশয় কম নম্বর পাইয়া কোন ক্রমে ক্লাস-প্রমোশন পাইয়াছিল এবং বাড়িতে আসিয়া বলিয়াছিল যে, শিক্ষকেরা সব হিন্দী ভাষায় পড়ান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া তাঁহারা পার্শিয়ালিটি করিয়া বেহারী ছেলেদের বেশী নম্বর দেন। কমলকুমার ইহা শুনিয়া যে সব ভাষা ব্যবহার করিলেন তাহা রীতিমত সাহিত্যিক ভাষা। গানই বাঁধিয়া ফেলিলেন একটা।

'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের প্যারডি।

বেহার আমার মাসীমা আমার
ধাইমা আমার আমার দেশ
কাহে গে মাইয়া এইসা হালৎ
কাহে গে তোরা এমন বেশ!
একদা যাহার ভোজপুরিয়া
হেলায় দাঙ্গা করিল মাৎ
আজিও যাহার রাজমিস্ত্রি
জেনানি লইয়া পিটিছে ছাৎ
ময়লা ঘাড়ে পানি-পাঁড়ে
খাঁকি কোর্তা মুরেঠা সাজ
তাদেরই বংশে এ কি প্রহ্লাদ
কলম পিষিছে আপিসে আজ!

—এইভাবে সমস্ত গানটারই প্যারডি লিখিয়া ফেলিলেন।

রামবৃছ সিংয়ের বাড়ির সামনের নর্দমায় একদিন জল আটকাইয়া গেল। দেখা গেল মাছের আঁশ ও নাড়িভুঁড়ি আসিয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

রামবৃছ দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, শালা মছলিখোর!

দোলের দিনে রামবৃছের পরিবারবর্গ কাদায় রঙে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া অশ্রাব্য ভাষায় 'হোলি' গাহিতে লাগিল।

কমলকুমার কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্যাটা বেহারী ভূত!

এই ভাবেই কিছুদিন চলিল। হয়তো ববাবরই চলিত ; কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রামবৃছ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানার নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সব কেন?

সে উত্তর দিল, বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক 'নবজীবন'-এর নাম শুনেছেন?

খুব।

তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সম্বর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।

'নবজীবন' কি এখানে এসেছেন?

আরে, তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল নাম কমলকুমার ঘোষ। এখানকার এ. এস. এম.।

রামবৃছের আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল কেবল।

সম্বর্ধনা-সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। শেষ যুবকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কমলকুমার যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তখন রামবৃছ আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়ে—

কমলকুমার ঘাড় ফিরাইতেই রামবৃছ করজোড়ে বলিলেন, পহলেই মায় মাফি মাংতা হুঁ। মুঝে মালুম নহি থা যে আপহি নবজীবন হ্যঁয়। মায় আপকা ভকত হুঁ।

কমলকুমারও হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামবৃছ বলিলেন যে, তিনি যদিও বাংলা বলিতে পারেন না, কিন্তু বাংলা বুঝিতে পারেন। 'নবজীবন'-লিখিত অনেক গল্প তিনি অনুবাদ করিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। কমলকুমার বলিলেন, তাই নাকি? 'স্রোত' নাম দিয়ে আর একজন লেখকও আমার গল্পের চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেখেছি।

রামবৃছ হাতজোড় করিয়া স্মিতমুখে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, মায় সোত হুঁ।

উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

বৈশাখ ১৩৬৩

বাজার-মাহাত্ম্য

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সকালবেলা গড়ের মাঠে হন-হন করিয়া হাওয়া খাইতেছি। হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা একটি বৃক্ষমূলে আসিয়া থমকিয়া গেলাম, একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, হাঁ, আমাদের সতু রায়ই তো বটে। বৃক্ষছায়ায় দৃঢ়-আসনবদ্ধ হইয়া পূর্বাস্যভাবে অর্ধনিমীলিত নেত্রে গভীর ধ্যানস্থ। অতিমাত্রায় শৌখিন পুরুষরূপে সতু রায়ের পাড়ায় প্রসিদ্ধি আছে; আপিস হইতে ফিরিয়া প্রতিসন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়া ব্রিজে তন্ময়তার জন্যও সে পরিচিত; কিন্তু তাহার প্রাতঃকালীন এই নব কৃত্যাঙ্গটি আমার জানা ছিল না। একটু হঠকারের ন্যায় আগাইয়া গিয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়া সতুর তপোভঙ্গ করিয়া দিলাম। সহজাত-প্রবৃত্তিবশেই ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলাম, কি রে সতু, এ সব আবার কবে আরম্ভ করলি রে?

সতু চোখ খুলিল বটে, কিন্তু মুখে কোনও সশব্দ উচ্চারিত বাণী নাই—শুধু গভীরার্থব্যঞ্জক একটি অস্ফুট হাসি। আমি কেমন কাটখোট্টার মতন ভূমিকাবিহীন ভাষণে বলিয়া ফেলিলাম, এই সব বুজরুকি রেখে দে রে সতু; এই বয়সে অনেক করেছিস। এইবারে সকাল হলে একটা থলে হাতে করে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে যা দেখি; কয়েক দিন সকালবেলা বাজারটা করে দেখ্, দেখবি তোর ইহকাল পরকাল উভয় কালেরই খানিকটা সুরাহা হবে।

বলিয়া আমি হন-হন বেগে আর খানিকটা হাওয়া খাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ প্রাতরাশের পর চিত্তটি আমার কেমন প্রশান্ত-প্রশান্ত মনে হইতে লাগিল। সকালবেলা হন-হন করিয়া খানিকক্ষণ বেড়াইয়া আসিবার পর কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ সেবনে আমি লক্ষ্য করিয়াছি, অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্য চিত্তটি কেমন তমসার স্বচ্ছ নীরের ন্যায় টলমল করিতে থাকে। সেই অবস্থায় একা একা বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ধ্যানোত্থিত বন্ধুর প্রতি আজ সকালে 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'! আমি ইহা কি বলিলাম! এখন বুঝিতেছি, যখন বলিয়াছি তখন তেমন কিছুই ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলি নাই, ভিতর হইতে যেন স্বতঃউৎসারিতভাবেই বাহির হইয়াছিল; এখন দেখিতেছি, সহসা যাহা বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহা মন্দ বলি নাই; এখন বিচার-বিশ্লেষণে যাহা পাইতেছি তাহাতে মহাবাক্যই বলিয়াছি।

প্রথমে অস্তিত্বের একেবারে নিম্নস্তরে অবস্থান করিয়া নিতান্ত ব্যবহারিক বুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখুন। দেশ-গাঁয়ের অঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহারা শহরবাসী তাহাদিগকে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে বাজার করিতে হইবে। বাজার করিতে হইলে—হয় স্বয়ং করিতে হইবে, না হয় কাহারও দ্বারায় করাইতে হইবে। যে শ্রেণীর লোকের দ্বারা এই কাজ করাইতে হইত, অর্থনৈতিক বিবর্তনজাত সামাজিক বিবর্তনের ফলে এই জাতিটি সমাজদেহ হইতে আজকাল লুপ্তপ্রায়। সন্ধান করিলে জানা যাইবে, কলে মিলে তাহারা আপনার আমার হইতে এমন কিছু কম কামাই করে না। দ্বিতীয় কথা হইল, আপনি যদি প্রচুর অর্থ এবং সন্ধানশ্রম-ব্যয়ে কাহাকেও যোগাড় করিলেন তবে এক বাজার অবলম্বনেই আপনি তাহা দ্বারা এমনভাবে শোষিত হইতে থাকিবেন যে আর্থিক জীবনে আপনার মারাত্মক রক্তাল্পতার আশু সম্ভাবনা। আপনি সতর্ক সাবধানী হইয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না; তাহার কারণ বাজার-চরিত্রের একটা ক্ষণ-চাঞ্চল্য। আজ যে পটল ছয় আনা দরে কিনিলেন, কাল যে তাহা কেন বারো আনা দরেও সানুনয়ে কিনিতে হইতেছে, এবং পরশু যে তাহা আবার বাজার

হইতে একেবারেই কেন উধাও—এ লীলা-রহস্যের মধ্যে কে আপনাকে প্রবেশ করাইবে? ইহার ফলে দেখা দিতেছে একটি কঠিন পীড়াদায়ক অবস্থা। ভাগ্যগুণে আপনি যদি যথার্থই একটি সৎ-ভৃত্যও লাভ করেন—সকালবেলা বাজারটি ঘরে আসিয়া পৌঁছিলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে বেশ একটা মানসিক অশান্তি বোধ করিতেই হইতেছে—রোজ সকালেই মনে হইতেছে, অদ্য প্রভাতেই কিছু ঠকিলাম। বারো আনা সের দর বলিলে ভাবেন, দশ আনা সের চলিতেছে, সেরে দুই আনা মারিয়াছে; ছয় আনা সের দর বলিলে ভাবিতেছেন, চার আনা সের চলিতেছে, হতভাগা সেরে দুই আনা মারিয়াছে। একটা সংশয় এবং অবিশ্বাস যেন আপনার চিত্তের একটা স্থায়িবৃত্তিরূপে মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিষক্রিয়া করিতে থাকে; তাহাতে আর কিছু না হোক, মন-মেজাজ আপনার খানিকটা খিঁচড়াইয়া থাকিবেই।

এখন সব দিক বিচার করিয়া দেখুন, সকালবেলা থলিটি হাতে হাঁটিতে হাঁটিতে বাজারে চলিয়া গেলেন; খানিকটা একটু দেহ-চর্চাও হইল, দেখিয়া শুনিয়া তাজা মালটিও আনিতে পারিলেন; আর সস্তা যদি তেমন একটা নাও পাইলেন তবু সন্দেহবাই-জাত চিত্তপীড়নের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন; সে লাভটা কিন্তু আমার কাছে নেহাত কম মনে হইতেছে না।

নিজের হাতে থলে লইয়া বাজার করিবার আর একটি মহৎ দিক আছে। সতু রায় বেশ বনেদী ঘরের ছেলে, উচ্চশিক্ষিতও বটে। নিজে থলে হাতে করিয়া বাজার করিবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। আমাদের সমাজজীবনে এইরূপ একটি বৃহৎ সতু রায়ের দল আছে, তাহারা বৃহৎ সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন। মানুষের সভ্যতা-বিবর্তনের ইতিহাসের যে স্তরে আমরা এখন আসিয়া পৌঁছিয়াছি সে স্তরে আর কিছু না হোক, এ কথাটি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি যে, বৃহত্তর সমাজজীবন হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার কাহারও কোনও অধিকার নাই। সমাজজীবনের ক্ষেত্রে যাঁহারা এই ভাবে অবস্থিত যে বৃহৎ জনসমাজ হইতে তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে তাঁহাদিগকে তাই সচেতনভাবে দিনের মধ্যে এমন কিছু করিতে হয় যাহাতে এই অনুভূতিটি জাগ্রত থাকে যে আমিও বৃহৎ জনসমাজের একজন।

সতু রায়ের দলের মনের মধ্যে বেশ একটা দৃঢ় গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছে যে বাজারচারী জীব হইল রামা-শ্যামা-যদু-মধুর দল—তাহারা ছেঁড়া ফতুয়া পরিয়া অলিগলি হইতে বাহির হয়, প্রয়োজন হইলে আধ-ময়লা কাপড়টাকে নির্বিবাদে হাঁটুর উপরে টানিয়া লইতে পারে, পায়ের ছেঁড়া চটিটাকে বাজারের থলেটার মধ্যে ঢুকাইয়া লইতে পারে,—অকারণে অতিমাত্রায় চেঁচামেচি করে, একটি আধলা দাম কমাইবার-বাড়াইবার জন্য অর্ধদণ্ড ধরিয়া দর-কষাকষি করে, নাক-মুখ না ঢাকিয়া গায়ের কাছে আসিয়া সজোরে হাঁচি দেয়, পান খাইয়া যত্রতত্র পিক ফেলে। এই হট্টগোলের গা-ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি সুরুচিসম্পন্ন সতু রায়রা বরদাস্তই করিতে পারে না। ইহাকেই সংস্কৃতিসম্পন্নতার চিহ্ন বলিয়াও সতু রায়দের প্রবল অভিমান। এই স্পষ্টপরিধির মধ্যে সযত্নলালিত যে আমাদের সংস্কৃতি তাহা অতিপেলবতায় দুর্বল ও নিষ্ক্রিয়। ব্যাপকজীবনের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া কখনও সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। এই রামা-শ্যামা-যদু-মধুকে লইয়া যে বিরাট জীবনযাত্রা সতু রায়দের, একটু চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত নিজেদের জীবনযাত্রাকে মিলাইয়া রাখিবার প্রয়োজন মনে করি। আমি যে শুধু আমিই নই—আমিও যে রাস্তায় চলিয়া-যাওয়া দশজনের সহিতই একজন—এই বোধ মানুষকে প্রসারিত পবিত্র করে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে।

অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট ঘরের বাই ছিল। আমরা যাহাকে সৌধ, হর্ম্য, প্রাসাদ প্রভৃতি নামে অভিহিত করি তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যেন সহজাত একটা বিতৃষ্ণা ছিল। ছোট ছোট ঘরে বাস করিবার স্পৃহা তাঁহার কতখানি বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল শান্তিনিকেতনের উত্তরায়নের পাশে উদীচী, শ্যামলী, পুনশ্চ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

শান্তিনিকেতনের প্রথম দিককার দেহলীবাড়িরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যখন উদয়নের পাশে ছোট্ট কাদামাটির বাড়িতে বাস করিতেছিলেন তখন তাহা লইয়া অনেক মহলে অনেক জল্পনা-কল্পনা, অনেক টীকা-টিপ্পনী হইয়াছে। কিন্তু কবির বিশেষ অন্তরঙ্গদের কাছে শুনিয়াছি, ইহা নিতান্তই কবির বিলাস বা খেয়াল ছিল না; ইহার পিছনে ছিল তাঁহার একটা আদর্শের তাগিদ। রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বিধাতার বিশেষ কৃপালব্ধ জীব হিসাবে সাধারণ জনগণ হইতে অনেকখানি দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার তাঁহার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল; তাহার আয়োজনও চারিদিকে ঘনীভূত ছিল কম না। খড়ের ছাউনি দেওয়া কাদামাটির ঘরে বাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেন, এই কাদা-মাটির ঘরে বাস করা অসংখ্য জনসাধারণের সঙ্গে জীবনযাত্রার দিক হইতে বিশ্বকবিরও একটা অচ্ছেদ্য যোগ আছে। এই যোগস্পৃহা বিশ্বকবির আত্মসমাহিতিকেও পরিপুষ্টি দান করিত।

মহাত্মা গান্ধীর আবার রীতিমত চরকাবাই ছিল। তৎকালে ইহা লইয়া শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে টীকা-টিপ্পনী কে কে না করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করাই বরঞ্চ সহজ ছিল। সর্বাপেক্ষা বেশী সমালোচনা শোনা যাইত গান্ধীজীর একটা বিশেষ কথা লইয়া। গান্ধীজী বলিতেন, সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাস্তার কুলি-মজুর আর মসনদের উজির-নাজির সকলকেই চরকা কাটিতে হইবে—অন্ততঃ দিনমানের মধ্যে খানিকটা সময়। এইখানেই বড় প্রশ্ন উঠিত—কেন? যাহারা কিছুই উপার্জন করিতেছে না তাহারা ঘরে বসিয়া খানিকটা চরকা ঘুরাইয়া না-হয় কিছু কিছু রোজগার করুক—সেটা না হয় এমন কিছু খারাপ কথা নয়; কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক তাহার দিনমানের মধ্যে ঘন্টাখানেক সময় তাহার গবেষণাকার্য থামাইয়া রাখিয়া বসিয়া চরকা কাটিবে কোন্ যুক্তিতে? যেটুকু সময় সে চরকার পিছনে নষ্ট করিবে সেটুকু সময় সে তাহার গবেষণা-যন্ত্রের পিছনে নিয়োগ করিলে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের জন্য সে অনেক কল্যাণের পথ উদ্ভাবন করিয়া যাইতে পারিবে। প্রসিদ্ধ এবং পদস্থ রাজনৈতিক—যাহাকে প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় সে-ই বা সকল ভাবনা থামাইয়া দিয়া চরকা লইয়া বসিবে কেন? একজন কুশলী কারিগরই বা তাহার অধিক ফলপ্রদ কাজ থামাইয়া রাখিয়া খানিকক্ষণ চরকা কাটিবে কেন? অতএব মোটামুটি ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, চরকা-প্রচলনের পিছনে অতি সামান্য আছে যুক্তি—বাদবাকিটা বড়লোকের 'বাই'।

এই-জাতীয় সমালোচনা আমরা যখনই করিয়াছি তখন চরকার পিছনে যে একটা অর্থনৈতিক দিক আছে তাহাকে শুধু বড় করিয়া দেখি নাই—তাহাকেই একমাত্র করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু গান্ধীজীর চরকা-আন্দোলনের পিছনে আর একটা দিক ছিল, আমার মতে সেই দিকটাই হইল আসল দিক, তাহা হইল জীবনাদর্শের দিক। জীবনাদর্শের দিক হইতে গান্ধীজী সমাজজীবনের মধ্যে মৌলিক কতকগুলি স্তরভেদের একান্ত পরিপন্থী ছিলেন। সমাজজীবনে একটা অদ্বয়যোগ চাই। মাঠে-ঘাটে-রাস্তায় কলে-কারখানায় দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মেহন্নত করিতেছে যে জনগণ, তাহাদের সহিত জন-গণ-ভাগ্যবিধাতার একটা যোগ থাকিতে হইবে। এই যোগভঙ্গেই কল্যাণবুদ্ধি বিপর্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। ওই চরকা কাটিবার সময়টুকু অন্ততঃ বসিয়া বসিয়া অনুভব করিতে হইবে, দেশের যে কোটি কোটি কৃষি-মজুর গায়ে খাটিয়া দেশের অন্নবস্ত্রের যোগাড় করিতেছে, আমিও তাহাদেরই একজন। কল্যাণ-তপস্যার এইখানেই যোগক্ষেম।

এইজন্যই বলিতেছিলাম যে সমাজের সতু রায়দেরও রোজ একবার বাজার করা ভাল, এবং ভাবিয়া দেখিলাম, ধ্যানস্তিমিত সতু রায়ের ধ্যান ভাঙাইয়া আজ সকালে কথাটা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছি।

ভাবনার ডালপালা বড় সহজে গজায়, মন তখন এক ডাল হইতে অন্য ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভাবিয়া দেখিলাম, বাজার করার আরও কতকগুলি দিক, কতকগুলি সার্থকতা

আছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহামতি অ্যারিস্টটলের 'ক্যাথারসিস' বলিয়া একটা কথা বহুদিন ধরিয়া বহুভাবে শুনিয়া আসিয়াছি। কথাটির অর্থ লইয়া মুনি-মহলে মতিবিভ্রমের আর অন্ত নাই। আমরা মুনি-বিরোধী বলিয়া আমাদের 'সহজমত'। মুখ্যতঃ নাটককে অবলম্বন করিয়াই অ্যারিস্টটল কথাটি বলিয়াছেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সহজমতে সত্যটা এইভাবে দাঁড় করানো যাইতে পারে যে, বাস্তব জীবনে আমরা ভয়-দুঃখ-অসহায়তার যে বিষক্রিয়ায় জর্জর, সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে অভিনয়চ্ছলে বার বার তাহাদের সহিত পরিচয় সেই বিষক্রিয়াকে অনেক পরিমাণে বিরেচিত করিয়া লাঘব করিয়া দেয়। সকালবেলার বাজার করার মধ্যেও এইরূপ একটা বিরেচনপ্রক্রিয়া আছে বলিয়া মনে করি। বৃহৎ ভববাজারের হট্টগোলে নিরন্তর দর-কষাকষি করিয়া ঠকিয়া-জিতিয়া আপনাকে যে হ্যাস্ত-ন্যাস্তে একাকার হইতে হইতেছে—যাহার মধ্যে ঠকিয়া ঠকিয়া আপনার মনস্তাপ বৃদ্ধি—জিতিয়া জিতিয়া আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি—কোনও দিকেই আপনার কোনও শান্তি নাই—ইহার মধ্যে সকালবেলা একবার সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাজারমঞ্চ ঘুরিয়া আসুন—দেখিবেন, খানিকটা পিত্ত-নিঃসরণের ফলে চিত্তস্থৈর্যরক্ষায় ইহা আপনার পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র মনের দুঃখে একবার অহিফেনসেবী কমলাকান্ত সাজিয়াছিলেন। কমলাকান্তরূপে তিনি সংসারকে বর্ণনা করিয়াছেন বড়-বাজাররূপে। বড়-বাজারের গহন-মহিমা! প্রবেশে বিষামৃত দুই-ই আপনাকে আলোড়িত করিবে। সকালে একবার ছোট-বাজারে ঘুরিয়া আসুন—দেখিবেন বড়-বাজারের হট্টগোল আপনাকে তেমন আর হটাইতে পারিতেছে না। ক্রমে অনুভব করিবেন, আপনার ভিতরে আপনার অজ্ঞাতসারেই কেমন একটা দার্শনিক ভাব গড়িয়া উঠিতেছে; মহা হট্টগোলের মধ্যে আপনিও কেমন হাত নাড়িয়া বলিয়া দিতেছেন, 'ঐসা হী হোতা হ্যায়'।

দৃষ্টান্ত দিয়া কথা বলি, নতুবা হয়তো কথাগুলি তেমন জুতসই লাগিতেছে না। ধরুন, কোনও আপিসে কাজ করেন; আপনি দেখিতেছেন, আপিসের কাজকর্ম বলিতে যাহা কিছু তাহা করিবার একটিমাত্র লোক আপিসে আছে—সে লোকটি আপনি। অপরদের মধ্যে কেহ ফচকামি করিয়া সিনেমা-মেয়েদের গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ মুখে এক গাল পান ঢুকাইয়া দিয়া অনুক্ষণ অকারণ পা দোলাইতেছে, কেহ বিড়ি ফুঁকিয়া বাজারদরের সহিত বিধান-সরকার বা নেহরু-সরকারকে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করিয়া উচ্চস্তরের রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কেহ বা মোহনবাগানের ফসকে-যাওয়া 'কিক'টা লইয়া আপনার সম্মুখস্থ টেবিলটিই ফাটাইয়া দিবার চেষ্টায় আছে। আর আপনি একা মানুষ মুখে শব্দটি না করিয়া গাধার মতন ফাইলের পর ফাইল ঘাঁটিয়া দিন দিন অস্থিচর্মসার হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু দুঃখ তো আপনার শুধু এইটুকু নয়—অন্তর্দাহ আপনার চরমে উঠে যখন দেখেন, বৎসরান্তে পদোন্নতি আপনার কিছুই হইতেছে না, পদোন্নতি ধা-ধা করিয়া হইয়া চলিয়াছে ওই লোকগুলির মধ্যেই কাহারও কাহারও—যাহারা আর কিছু না করুক, ঘুরিয়া ফিরিয়া শক্তিমান কেন্দ্রীয় লোকটির কানে 'বড়বাবু বড়বাবু' করিয়া গুনগুন করিতেছে। ইহার প্রতিকারও আপনি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছেন না। তবে এই অন্তর্দাহ বিন্দুমাত্র লাঘব করিবার উপায় কি?

উপায় সেই বিরেচন-প্রক্রিয়া—সকালে উঠিয়া একবার বাজারে যান। আপনি বাজারে ঢুকিবামাত্র এক কাঁড়ি আলু-কুমড়ার পিছন হইতে একটি কালো বেঁটেসেঁটে লোক একগাল হাসিমুখে 'বড়বাবু বড়বাবু' বলিয়া চিৎকার করিয়া বাজার প্রায় মাথায় করিযা তুলিয়াছে। লোকটিকে আপনি দুই চোখে দেখিতে পারেন না, অনেক দিন বাজার করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আপনি সকলকে আপনার সঙ্কল্প জানাইয়া রাখিয়াছেন যে পরের দিন সকালে বাজারে

যাইবার কালে আপনি একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে লইয়া যাইবেন—এবং কপালে যাহাই লিখিত থাকুক—ওই লোকটার ব্রহ্মরন্ধ্রে সেই ডাণ্ডা দ্বারা আপনি একটি আকস্মিক আঘাত করিবেনই। রোজই দেখেন লোকটা আপনাকে 'আসুন বড়বাবু, আসুন' বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ডাকিয়া লইয়া গুচ্ছের পচা বা ওঁচা মাল সযত্নে আপনার থলে ভরিয়া দেয় ; দামেও লোকটা আপনাকে কোনও দিন দু পয়সা ঠকায় বই জিতায় না ; কিন্তু পরের দিন থলেটি লইয়া এদিক-ওদিক করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত সেই লোকটির দোকানের সামনেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কোনও দিন প্রথমেই তাহার দৃষ্টিপথে যদি আপতিত না হইয়া থাকেন আর পাঁচ দোকানের পাঁচটা জিনিস দেখিবার ও দর করিবার অছিলায় আশ-পাশেই কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ; তারপরে একটিবার যখন কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই মোহনধ্বনি, 'আসুন বড়বাবু, আসুন,' তখন আর কি আপনি থাকিতে পারেন! অমনি লাভ-লোকসানের সব কথায় জলাঞ্জলি দিয়া আপনি থলে হাতে আগাইয়া গিয়াছেন। আপনার পায়ে ছেঁড়া চটি, গায়ে ময়লা ছেঁড়া কাপড়-জামা, হাতের থলিটিকেও দুই-একবার তালি দিয়া লইয়াছেন ; আপনাকে কেহ সাদরে উচ্চকণ্ঠে একগাদা লোকের মধ্যে 'বড়বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিলে তো আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের ঠাট্টা মনে করিয়া অসম্ভব রকমে চটিয়া যাইবার কথা ছিল ; কিন্তু পরমাশ্চর্য এই, আপনি একটুও চটেন না, বরঞ্চ আস্বাদন করেন।

আপনি ভাবিতেছেন, এইভাবে আপনি বাজারে গিয়া নিরন্তর শুধু ঠকিয়াই যাইতেছেন ; কিন্তু জিনিসপত্র পয়সাকড়ির দিক হইতে কিছু ঠকিলেও আর এক দিক হইতে যে আপনার একটা মহৎ লাভ ঘটিতেছে! সেই যে আপিসের—অর্থাৎ বড়-বাজারের—বড়বাবু-ঘটিত আপনার অনির্বাণ অন্তর্দাহ—তাহা যে একটা বিরেচন-প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে প্রশমিত হইয়া আসিতেছে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন কি? ছোট-বাজারের বড়বাবু-মহিমা যখন বুঝিতে পারিলেন তখন বড়-বাজারের বড়বাবু-মহিমা আপনা হইতেই আপনার খানিকটা গা-সহা হইয়া গেল।

জীবনে ঠকিয়াছেন নিশ্চয়ই অনেক—আবার ভাবিয়া দেখুন, জিতিয়াছেনও নেহাত কম নয়। যখন যখন ঠকিয়াছেন তখন তখন যেমন মনে হইয়াছে যে নেহাত বিনা দোষে ঠকিলাম, তেমনই যতবার জিতিয়াছেন তাহার কথাও একটু শান্তভাবে ভাবিয়া দেখুন—দেখিবেন অনেক সময়ই একান্ত আকস্মিকভাবেই বিনা গুণে জিতিয়াছেন। উভয়কে মিলাইয়া একটা গড়-পড়তা করিয়া দেখুন দেখিবেন, জীবনটায় হারে-জিতে লাভে-লোকসানে মিলাইয়া মোটামুটি একটা ভারসাম্য রহিয়াছে। এই সত্যটাকেও সকালবেলা বাজারে গিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে বলি।

সংসারে অত্যন্ত সতর্ক এবং হিসাবী লোকও যেমন অনেক আছে, তেমনই অর্ধমুক্তকচ্ছ লোকেরও কিছু অভাব নাই : কিন্তু আমার বিশ্বাস গোটা জীবনের লাভ-লোকসানের কথা যদি ঠিক ঠিক খতাইয়া দেখিবার এবং দেখাইবার উপায় থাকিত তবে দেখা যাইত, আখেরে পরিণাম একই। একদিন বাজারে গিয়া চেনা একটি ঝিঙাওয়ালার কাছে এক সের ঝিঙা চাহিলাম, দাম বাবদ একটি আধুলি তাহার হাতে দিলাম ; সে একটি দু-আনি ফেরত দিল। আমি অন্য কিছু খরিদের জন্য অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছিলাম, একজন অর্ধ-পরিচিত ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, কি দরে কিনলেন মশাই ঝিঙা? আমি বলিলাম, ছ আনা সের। লোকটি একেবারে আস্ত ক্ষেপিয়া যাইবার একটা ভাব দেখাইয়া বলিলেন, তা কিনবেন বইকি মশাই—আপনাদের মত একদল সাধুসজ্জন বাজারে এসে এসেই তো বাজারটাকে এমনি উচ্ছন্নে দিয়ে যান। সব বাজারে ঝিঙে সাড়ে চার আনা—পাঁচ আনা, আপনারা এসেই দাম চড়িয়ে দিলেন ছ আনা। আমি অপরাধী কণ্ঠে বলিলাম, ছ আনার কমে দিত না। তিনি অন্য কোনও কঠিন পদার্থ হাতের কাছে না পাইয়া হাতের উপর হাতটাকেই সশব্দে প্রহার করিয়া বলিলেন, দেবে না মানে কি, আলবাৎ দেবে। আপনি একটু দূরে

দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখুন আমি কি দরে আনি!

সে লোকটি আগাইয়া গেলেন ঝিঙাওয়ালার কাছে। তাঁহার নিকট. দেখিলাম ঝিঙাওয়ালা দর চাহিল সাত আনা সের। তিনি এই মারি কি এই মারি ভাব করিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ব্যাটারা যত বাটপাড় জোচ্চোরের দল! সব জায়গায় দর এক রকম—আর এখানে সবটাই তোদের দ্বিগুণ দর! পুলিস ডাকব—ধরিয়ে দেব সব কটাকে—

ঝিঙাওয়ালাটি দেখিলাম একদমই ঘাবড়াইল না, হাসিয়া বলিল, কি দর আপনি দেবেন কত্তা?

দর? দর দেব ঠিক পাঁচ আনা।

বেশ তো, তাই-ই দিন না, আপনি অত চটছেন কেন?

চটছি তোদের বজ্জাতি দেখে।—বলিয়াই ভদ্রলোক তাঁহার থলেটি বাড়াইয়া দিলেন, ঝিঙাওয়ালাও দেখিলাম হাসিমুখেই এক সের ঝিঙা মাপিয়া থলেতে দিয়া পাঁচ আনার পয়সা গণিয়া লইল।

বিজয়গর্বে ভদ্রলোক 'কি মশাই' বলিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিতেই আমি এড়াইয়া একটু অন্য দিকে চলিয়া গেলাম। তিনি একটু দূরে সরিয়া যাইতেই আমি সক্রোধে ঝিঙাওয়ালার কাছে আগাইয়া যাইতেই সে সব বুঝিয়া ফেলিল, দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, ও-দরের গাহেক আপনি নন কত্তা, ও-দরে আপনাকে দেওয়া যাবে না।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলাম, তার মানে?

আমতা-আমতা করিয়া লোকটা বলিল, মানে কত্তা মাপে হাতের টানে পুষিয়ে নিয়েছি, সাড়ে চোদ্দ ছটাকও গিয়ে টিকবে না। সেই মাপ কি আর আপনাকে দিতে পারি?—উপরে ধম্ম আছে না কত্তা!

মনের খেদ খানিকটা মিটিল। বাজারে খেদই যে মিটিল তাহা নয়, বড়-বাজারের খেদও খানিকটা এমনি করিয়াই মিটিয়াছে। মনে হইয়াছে, সব জুড়িয়া ধর্ম হয়তো একটা আছেই বা! দামে যাহা যেখানে ঘাটতি দিয়াছি, মাপে হয়তো তাহা পোষাইয়া গিয়াছে; এক জায়গায় যাহা ভাল-মানুষির দণ্ড দিয়াছি—নিজের অজ্ঞাতে তাহা আবার হয়তো সবটাই উসুল হইয়া গিয়াছে।

কার্তিক ১৩৬৪

প্রভাত-বর্ণনা

যোগানন্দ দাস

(বস্তি-কাব্য হইতে)

(১)

কাল রাতে মাইফেল হৈল জাহান্নমে হর্‌রাত হৈ হৈ হল্লা,
সরাব চল্‌ল জোর বহুৎ খুব্‌সুরৎ আওরতে করলে জটল্লা।
সূর্যি সে কাণা চাচা ছিল সেই মজলিসে পিয়ালা পিয়ালা পার কর্‌ল,
দম্‌ভর টেনে টেনে নেশায় বেদম হ'য়ে বুঁদ হ'য়ে কোলে ঢ'লে পড়্‌ল।
এদিকে ফজর্‌ হয় কুঁকড়ো খবরদার জোর হেঁকে হেঁকে তাই কইল,
সধাই চাচায় ঠেলে, বেলা বুঝি যায় চ'লে আশ্‌মান্‌ ফর্সা যে হইল।
তর্‌তরে ঘোর নেশা চরণ চলে না হায় গড়িয়ে গড়িয়ে পথে নাম্‌ল,
টল্‌তে টল্‌তে এসে আশ্‌মান্‌-জমীনের মোহানায় থম্‌কেই থাম্‌ল।
একটা যে চোখ সেটা টকটকে লাল তাই কচলিয়ে যত দেখে চায় ফের-
বাহবা বাহা কি ঢং, এ কি রে জাহান্নম?—না না ঐ বোঁটা দেখি মর্ত্ত্যের।

(২)

আশ্‌মানে এক পাশে ঘুম্‌ঘোরে ঊষারাণী ছিল শুয়ে মেলি নীল অঞ্চল,
রাত শেষ হ'লে উঠে বস্‌ল সরায়ে দিয়ে মুখ হ'তে কুন্তল চঞ্চল,
অঙ্গে বসন নাই আলসবিলস আঁখি দিগন্তে আন্‌মনা দৃষ্টি—
হেনকালে ঐ হোথা টলিয়া পড়্‌ল আসি জীবন্ত কোন্‌ অনাসৃষ্টি।
চুরচুরে চাচা যেই লাফ দিয়ে আশ্‌মানে ধাইল হৈয়া পাগল বা,
তাই দেখে ঊষা ছুঁড়ি আঁৎকিয়ে তাড়াতাড়ি এক ছুটে হৈল ভাগলবা।

আষাঢ় ১৩৩৫

নব-সাহিত্য বন্দনা

(গান)

সজনীকান্ত দাস

বেতাল

জয় নবসাহিত্য জয় হে—
জয় শাশ্বত, জয় নিত্যসাহিত্য জয় হে।
জয়, অধুনা-প্রবর্তিত বঙ্গে,
রহ চিরপ্রচলিত রঙ্গে,
কন্টিনেন্ট-উদ্‌ভাসিত জয় হে—প্রবীণ-শিথিল-উপহসিত জয়হে
জয়হে, জয়হে, জয়হে।

জয় পর-পদানত দেশে,
যেথা প্রাণ রয় কায়ক্লেশে,
যুগান্ত-বন্দিত অন্ধকারে, আনিলে আলোক পারাবার হে,
মিথ্যাসম্পদ মাঝে চির-সত্য এ-বিত্ত জয়হে
জয় নব-সাহিত্য জয় হে।

সংস্কার শুচিতার টুটি অর্গল্ বন্ধ,
নিরানন্দ দেশে আনিলে আনন্দ,
সঘনে নড়ে পক্ককেশ শিরে,
করিলে বর্ত্ম পাষাণ-বক্ষ চিরে',
সন্ধানিলে ধূলি-জঞ্জাল চিত্ত—
জয় নব-সাহিত্য, জয় হে।

রাজোদ্যানে রচিলে বস্তি,
স্বস্তি নবসাহিত্য স্বস্তি,
পথ-কর্দমে ধূলি ও পঙ্কে,
ঘোষিলে আপন বিজয়-শঙ্খে,
লাঞ্ছিতা পতিতার উদ্‌ঘাটিলে দ্বার,
সতীত্বে তাহারে কৈলে অভিষিক্ত—
জয় নব-সাহিত্য জয় হে।

শ্রমিকের, ধনিকের, গণিকার, বণিকের—
সাম্যের, কাম্যের, শাশ্বত ক্ষণিকের—
জড় ও পাষাণের ভস্ম ও শূন্য
আস্তাকুঁড়ে যাহা ফেলি উদ্বৃত্ত হে।
সকল অভিনব-সাহিত্য জয় হে।

দোদুল-নিতম্ব কাব্য, কাব্য অচিন্ত্য অভাব্য,
নাকানি-চোবানি পূর্ণ, ফ্রয়েডের কিঞ্চিৎ চূর্ণ,
এলিসেরও পরিশিষ্টে, ক্রিমিলনজী অতি মিষ্টে,
মনস্তত্ত্ববাদমূলক, কাব্যে ছড়াছড়ি যৌন-পুলক,
সংস্কার-খর্বণঃ, চর্বিত-চর্বণঃ
সাহিত্যচিত্তের কণ্ডূতিবর্ধনঃ,
কাব্য-যুবজন নিশীথরঞ্জনঃ
দীন-মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রগঞ্জনঃ
কামক্রোধমদবর্ধক কাব্য বর্ধক-উষ্মা-পিত্ত হে—
জয় নব-সাহিত্য জয় হে।

প্রগতি, কল্লোল, কালিকলম—
অন্তর-ক্ষতেতে লেপিলে মলম,
রসের নব নব অভিব্যক্তি
উত্তরা, ধূপছায়া, আত্মশক্তি—
প্রেম ও পীরিতির নিত্য গদগদ সলিলে অভিষিক্ত,
জয় নব সাহিত্য জয় হে—
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
প্রাচীন হইল রসাতলগত, তরুণ হ'ল নির্ভয় হে—
জয়হে জয়হে জয়হে।

পৌষ ১৩৩৪

সাংখ্য*

"বনফুল"

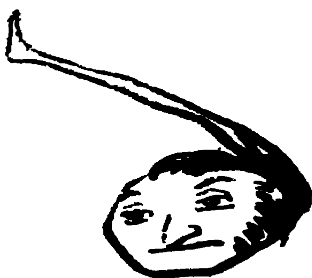
প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই জোর গলায় স্পষ্ট ক'রে,
কপিল প্রণীত সাংখ্য এটা নয়।
তাতে লজ্জিত হবারও কারণ নেই,
যেহেতু আমি কপিল নই, নকুলেশ।
কপিল মুনি এ সম্বন্ধে কি ব'লে গেছেন,
তাও আমার অজ্ঞাত,
ওসব আলোচনা করবার অবসরই পাই নি জীবনে।
আমার জ্ঞান কৃষিতত্ত্ববিষয়ক,
সে তত্ত্ব আহরণ করতে অবশ্য হলধর হতে হয় নি,
[করতালি]
যেতে হয় নি মাঠে।
যেতে হয়েছিল আমেরিকায়—
ডলার এবং পেট্রোলের দেশে।
ডলারি ধাঁচে, প্রেট্রোলি কেতায়, বৈদ্যুতিক আবহাওয়ায়
যে কবিতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি,
তা এ দেশে কাজে লাগল না।
আপনারা কেউ ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না সে বিষয়ে,
কৃষিচর্চামূলক চাকরিও জুটল না একটা।
সুতরাং
অকৃষক-সুলভ রীতিতে
সচিত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয় আমাকে
মাঠে, মঞ্চে, কাগজে।
বস্তুত, বর্তমানে এই আমার পেশা।
'মারাঠা জাতির অভ্যুদয়',
'বাংলা সাহিত্যে আদিরস',
'ফুসফুসের বিকার',
'হিলিয়মের প্রক্রিয়া',
নানা বিষয়ে নানা বক্তৃতা করেছি আমি জনতার ফরমাসে।
ঈশ্বর ব্যক্ত দিয়েছেন একটা—
বলতে পারি অনর্গল।
আজ ফরমাস এসেছে,
সাংখ্য বিষয়ে বলতে হবে কিছু।
বলব।

বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ নকুলেশ লস্করের বক্তৃতা।

কিন্তু প্রথমেই ব'লে রাখছি,
এ বক্তব্য আমারই বক্তব্য;
কপিলের সঙ্গে যদি কিছু মিল হয়,
ধন্য হবে কপিল।
মিল যদি না হয়,
ধন্য হব আমি।
চিত্রিতও করলাম বক্তব্যকে।
কারণ
অচিত্র কোন কিছু বর্তমান যুগে অচল,
দেশলাই-বাক্স থেকে মহাভারত পর্যন্ত
সব সচিত্র হওয়া চাই।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

সংখ্যা থেকেই সাংখ্য।
এবং সে সংখ্যা স্থির নয়।
নিদারুণ অস্থৈর্যে
অনিবার্য গতিতে সে চলেছে অসংখ্যের পানে।
পাচ্ছে এবং হারাচ্ছে আপনাকে,
দৃষ্ট হচ্ছে অদৃষ্ট,
অদৃষ্ট দৃষ্টির সীমানায় আসছে।
সূক্ষ্ম স্থূলে এবং স্থূল সূক্ষ্মে পরিবর্তিত হয়ে ভাবছে,
পরিণত হলাম।
অবাঙ্‌মানসগোচর বাক্যের সাহায্যে বিজ্ঞাপিত করছেন নিজেকে,
আলোর মত স্বচ্ছ যিনি,
মিস্টিসিজমের ভান ক'রে তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট।
বাক্যবাগীশ হচ্ছেন গম্ভীর,
লিরিক এপিক,
এক বহু।
একের চেহারা দেখেছেন কখনও?

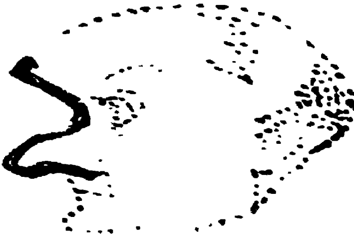


তার নাক মুখ চোখ সব আছে।
সে চেয়ে আছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে,
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তার আশাবাদীর দৃষ্টি।
মুখে হাসি—

অট্ট নয় স্মিত,
আশঙ্কার চেয়ে আশারই আমেজ বেশি তাতে।
একমেবাদ্বিতীয়ম?
হয়তো।
আমার কিন্তু মনে হয়, অদ্বিতীয় হবার সখ নেই ওর।
ওর চোখের দৃষ্টির সে ভাষা নয়।
আপনি দেখেন নি সে দৃষ্টি?
শোনেন নি সে ভাষা?
খুবই স্বাভাবিক।
শুনতে চান? দেখতে চান?
ফিট করুন তা হ'লে মাইক্রোফোন কল্পনার কক্‌লিয়ায়,
লাগান দুরবীন মনশ্চক্ষের রেটিনায়,

[করতালি]

দেখবেন সব সংখ্যাই মূর্তিমান।
দুইকে চেনেন?
দুই মনে হ'লেই যুগল কিছু একটা ভাবা অভ্যেস হয়ে গেছে।
দুই কিন্তু একক।
নাক,
ভীষণদর্শন নাক একটা।
সেই নাকের পেছনে
ঈষদ্দৃষ্ট ডট-ডট-ডটায়িত যে আভাস,



সেই মালিক,
সেই নাচাচ্ছে দুইকে,
অর্থাৎ নাককে।
নাক অবশ্য নানা রকম—
কুঞ্চিত, সন্নত, উদ্যত, অপ্রস্তুত,
কিন্তু সর্বদাই সে নৃত্যপ্রবণ,
এবং নাচাচ্ছে তাকে ওই অদৃশ্য ডট ডট ডট।
লিবিডো বলতে চান তাকে?
আপত্তি করব না,
কেননা আপত্তি করবার মত মালমশলা নেই হাতের কাছে।
বুঝতে পারছেন না?

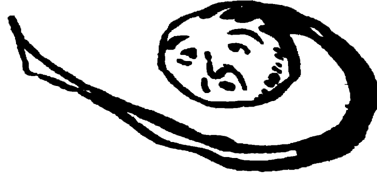
[সভায় কলরব]

ওই আপনাদের লোচন, নয়ন, অক্ষি, চক্ষু—
(বাজে জিনিসটার কি নামাবলীই বানিয়েছেন আপনারা!)

উপড়ে ফেলুন ওটাকে।
তা দিন
মনের ওপর
অন্ধকারে
একমনে।
নীরবে
সঙ্গোপনে
কুস্তি করুন
নিজের বাজে সংস্কারগুলোর সঙ্গে।
দেখতে পাবেন অদৃশ্য জগৎ।
হয়তো তা অবর্ণনীয়,
হয়তো অকথ্য,
কিন্তু অনন্যসাধারণ নিশ্চয়ই।

[ঘন ঘন করতালি]

দেখতে পাবেন,
সভ্যতার বেধড়ক চাপে
তিন বেচারা প্রায় বে-ধড়।
মুণ্ড-সম্বল হয়ে বেঁচে আছে খালি।



দেহটি লিকলিকে সরু, বাঁকা,
মুণ্ডটিকে ভিড়ের মধ্যে উঁচিয়ে রেখেছে ব'লেই ওর খাতির।
তা না হ'লে অনায়াসে ওটাকে ফেলে দেওয়া চলত
ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটে কিম্বা পিঁজরাপোলে।
কিন্তু মুণ্ডধর ব'লে
শুধু যে ও সার্থক তা নয়,
ও অলঙ্কৃত, অহঙ্কৃত, আলিঙ্গিত।

[হিয়ার হিয়ার]

হয়তো অনাগত ভবিষ্যযুগে
দেহহীন মুণ্ড
বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রে
জনতার সমুদ্রে
আপনিই ভেসে থাকতে পারবে।
কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে,
ততদিন উপেক্ষণীয় নয়
ওই লিকলিকে দেহটা।
লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচাটাকে যেমন খাতির করি,

মুণ্ডের খাতিরেও তেমনিই সম্মান করতে হবে
মুণ্ডবাহক দেহকে।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

তিনের তিন দিক নয়,
নানা দিক আছে।
ত্রিনয়ন না হয়েও তা দেখতে পাচ্ছি।
আমি শুধু একটা দিক নিয়ে সামান্য কিছু বললাম।
বাকি সংখ্যাগুলোরও নানা দিক আছে;
প্রত্যেকেরই কিন্তু
একটা দিক নিয়ে আলোচনা করব।
কারণ সময়াভাব।
আদ্যিকেলে বুড়ো—চার।—



গুটিসুটি, জবুথবু, তালগোল পাকানো, কিম্ভূতকিমাকার।
কিন্তু ভীষণ প্রভাব—
চতুর্মুখে, চতুর্বেদে, চতুর্বর্গে, চতুর্বর্ণে, চতুর্যুগে।

[করতালি]

চতুরঙ্গে চরমে উঠে
চার অধ্যায়ে এলিয়ে পড়েছে,
চার ইয়ারী কথায় ফোড়ন দিয়ে
ঢুঁ মারছে চতুর্থ পক্ষে।
রঙ্গ করছে চৌরঙ্গীতে,
চাপা পড়ছে চৌমাথায়,
মরছে না তবুও।
তালগোল পাকিয়ে টিকে যাচ্ছে ক্রমাগত।
চার্চে, চার্বাকে, (এমন কি চার্জেও)
চারের চার।
তাই সম্ভবত বড় বড় রুই কাতলা গিলেছে টোপ
এবং রূপান্তরিত হয়েছে অবলীলাক্রমে
ঝোলে ঝালে অম্বলে,
কোপ্তা কাবাব কাটলেটে।

[ঘড়ি দেখিলেন]

পাঁচের ঐশ্বর্যও অতুল।—



পঞ্চবাণ, পঞ্চমুখ, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চনদ
পঞ্চকন্যা, পঞ্চভূত, পঞ্চপাণ্ডব।
কিন্তু মুখ ওর প্রসন্ন নয়।
ও যেন ক্রমাগত ভাবছে,
কেন ও এক নয়, দুই নয়, তিন নয়, চার নয়,
কেন ও ছয় নয়, সাত নয়, আট নয়, নয় নয়,
কেন ও পাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়!
মুখ বেঁকিয়ে কেবলই ভাবছে তাই।
তাই কি?
হয়তো ও কিছুই ভাবছে না,
ওই ওর রূপ।
কোন ক্রূরমনা গাণিতিকের
বিরক্ত মুহূর্তের সৃষ্টি ও;
কিম্বা হয়তো তাও নয়,
হয়তো ও সুদর্শন,
আমাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিম।
কিন্তু হয়তো ওটা ওর দুরারোগ্য মৌখিক পক্ষাঘাত।
কিম্বা হয়তো—
আর নয়, থামতে হ'ল।
কিম্বা দুর্যোধনের পরামর্শে
পাঁচ পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ করতে পারবে না
কোন দার্শনিক দুঃশাসন।
বিচিত্র-সম্ভাবনা-শ্রীকৃষ্ণ তার সহায়,
ক্রমাগত বেরিয়ে পড়বে নব নব আচ্ছাদন।
পলাণ্ডুকে নগ্ন করতে পেরেছে কেউ কি?

[সভায় পিন-ড্রপ নীরবতা]

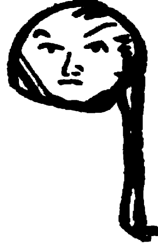
সুতরাং পাঁচ-প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে
ছয়-প্রসঙ্গে আসতে অনুমতি দিন আমাকে।

[কপালের ঘাম মুছিলেন ও হাতঘড়ি দেখিলেন]

ছয় সংখ্যাটি
আমার ব্যক্তিগত বিক্ষোভে বিক্ষত।



ও আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করে নি,
আমিও করব না।
ওর সম্বন্ধে মধুর কিছু বলতে পারব না।
যড়ানন অথবা যড়দর্শনের অবতারণা ক'রে
বাড়াতে পারতাম আমি ছয়ের মাহাত্ম্য,
কিন্তু পারলাম না।
লেখনী রাজি নয়।
ছয় সংখ্যার ওপর কোন রকম রঙ চড়াতে ইচ্ছুক নয় সে
তেরো নয়, ছয় রোল-নম্বর ছিল,
তবু ফেল করেছি ম্যাট্রিক,
ষষ্ঠরাশি অর্থাৎ কন্যারাশিতে জন্ম আমার,
জীবন দুর্দশায় কাটছে,
বিয়ে করেছি ছয়ই জ্যৈষ্ঠ,
উৎপাদন করেছি ছয়টি কন্যা,
আমি চাকরি পাই নি,
ছকড়ি পেয়েছে।
সুতরাং যতই না বাহ্যচক্ষু নিমীলন ক'রে
যত আবেগেই না মনের ওপর তা দিই,
যড়দর্শন, যড়ঋতু, যড়ানন যতই না আবৃত্তি করি,
লেখনী পাদমেকম ন গচ্ছতি,
রসনা নীরস হয়ে উঠছে,
কল্পনার মুখে ভ্রূভঙ্গি।
সুতরাং ছয়ের প্রতি সুবিচার করতে পারব না আমি।
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আরও সমঝদার লোক আছে—
ওইটুকুই ছয়ের ভরসা,
আমারও।
ছয়ের পরেই সাত,
সুতরাং সাতকেও দেখি ছাতার বাঁটে,
সাপের ফণায়।



লম্বগ্রীব বৃহম্মুণ্ড ব্যাপার ব'লে মনে হয়।
ছয়ের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী,
কিন্তু পাঁচের সঙ্গে মিলে দল পাকায়।—
সপ্তরথীতে ছিল।
সপ্ত সমুদ্র?
বাজে কথা।
সমুদ্র সংখ্যাতীত, অভৌগোলিক বিস্তৃতি।
সংখ্যা দিয়ে সমুদ্রকে বাঁধতে চায় যে ভৌগোলিক,
সে রাম-ভৌগোলিক।
কিছুদিন পরে সে হয়তো বলবে
কিম্বা বলেছে,
আকাশ একুশটা।
তার মস্তিষ্কে
সাত সাততে উনপঞ্চাশের হাওয়া বইছে।
সাত ভাই চম্পা?
চম্পাকে চিনি,
খুবই মাখামাখি আছে তার সঙ্গে,

[সকলে উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন]

কেচ্ছাটা তাই চেপে গেলাম,
তা না হ'লে রসকথা শোনাতে পারতাম কিছু।
সপ্তর্ষির কীর্তিও জানি—
বাঙালীর বাচ্চা আমি,
কিছু অবিদিত নেই আমার।
ব্রহ্মার মানসপুত্র ব'লেই জ্বলজ্বল করছেন,
কেরানির ঘরে জন্মালে ফ্যা ফ্যা করতেন।
দুটি উদরান্নের জন্য
অমন ঢের পুলহ-পুলস্ত্য বশিষ্ঠ-অঙ্গিরার দল
কাছা সামলাতে সামলাতে
কেড্‌স পায়ে দিয়ে
ঘর্মাক্ত কলেবরে
খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি নিয়ে
গুঁতোগুঁতি করছে
রাধাবাজারে, খেংরাপটিতে, ক্লাইভ স্ট্রীটে।

সাতের প্রসঙ্গে সাত কাহন শুনতে পাবেন,
যান যদি কোন কৃত-সপ্তপদী ব্যক্তির কাছে,
অর্থাৎ যার উদ্বাহ সম্পন্ন হয়েছে,
কিন্তু উদ্বন্ধন বাকি।
তবু কিন্তু সাতকে যৎসামান্য শ্রদ্ধা করি এসব সত্ত্বেও,
কারণ ও ছয় নয়।
আটের কথা বলতে বাধছে।
ওকে স্বপ্নে দেখেছি সেদিন।
অদ্ভুত রকম বীভৎস স্বপ্ন।
কোন বিজ্ঞ জ্যোতিষী হয়তো
সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এর।
কিন্তু আমি ভাবছি, কি দেখলাম সেদিন?
অষ্টরম্ভা নয়,
আটটা আর্ত বেরাল-ছানা
পথ হারিয়ে কাঁদছে।
কিন্তু সহসা থেমেও গেল তাদের ক্রন্দন,
দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল তারা।
রৌদ্রদগ্ধ আকাশ থেকে
নেমে এল তীক্ষ্ণনখচঞ্চু আটটা শ্যেন,
নিমেষে নিয়ে গেল তাদের ছোঁ মেরে তুলে।
হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।
মনে হ'ল ফিক ফিক ক'রে কে যেন হাসছে!
ফিরে চেয়ে দেখি, আমার চিরশত্রু ছয়।
ভোল বদলে সিক্স হয়েছে,
হাসছে ফিক ফিক ক'রে।
রাগ হ'ল ভয়ানক,
একটা বাখারি প'ড়ে ছিল কাছে,
দিলাম সেটা ছুঁড়ে,
বিঁধল সেটা গিয়ে সিক্সের বুকে,
চট ক'রে হয়ে গেল বাংলা আট।



দেখতে দেখতে সিক্সের ভুঁড়িতে গজালো চোখ,
মানুষের নয়, বেরালের।
গজালো গোঁফ,
ফুটে উঠল তীব্র দৃষ্টি,

সিক্তসৃক্কণী মার্জারের শিকার-লোলুপতা।
ভেঙে গেল ঘুম আতঙ্কে।
চোখ বুজেই শুয়ে শুয়ে আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,
ভগবান,
বিংশোত্তরীতে যার রাহুর দশা,
অষ্টোত্তরীতে তার কি?
ছয়কন্যা-প্রসবিনী সাধ্বী পত্নী ধমক দিয়ে উঠলেন,
মশারিটা ভাল ক'রে গুঁজে দাও ওদিকে।
চোখ খুলে দেখলাম, ছারপোকা মারছেন তিনি বিছানায় ব'সে ব'সে।
গুঁজে দিলাম।
সুতরাং
আর্টের সম্বন্ধে আমার ধারণাও
ঘোরালো রকম ঘোলাটে।
অষ্টধাতুর আংটি প'রে
অষ্টবসুর ধ্যান করলে পরিষ্কার হবে হয়তো।
হয় যদি,
জানাব আপনাদের।
রসনা আমার অক্লান্ত,
ছাপাখানা অবাধ,
কাগজ কালি কলম জুটবেই।
সুযোগ পেলেই
কথার মিকি-মাউস
বেঁটে হয়ে, লম্বা হয়ে, কুঁকড়ে, কুঁচকে,
চ্যাপটা হয়ে, চৌকস হয়ে
লীলায়িত হবে ক্রমাগত।
বস্তুত, না হওয়াটাই আশ্চর্য এ যুগে।

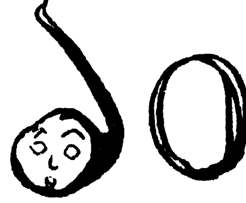
[হাতঘড়ি দেখিলেন]

আর নয়?



একটা কথা কিন্তু বিস্মৃত হ'লে চলবে না—
নয় 'নয়' নয়।
ও রীতিমত আছে।
অস্বীকার্য রকম স্থূল ওর স্থিতি।
তিনই যেন তিরিক্ষে হয়ে দুমড়েছে নিজের দেহটা।

কিন্তু ধারাপাতের বচন ওটা,
আসলে ওর তিরিক্ষে ভাব নয়।
কেমন যেন একটা আড়ি-পাতা ভাব।
ও আড়ি পেতেছে সেই বাসরঘরের বদ্ধ দ্বারে,
যেখানে ওর প্রবেশ নিষেধ,
যেখানে ও একটুর জন্যে ঢুকতে পায় নি,
যেখানে চিরন্তন এক মিলেছে শাশ্বত শূন্যে।
লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে যুগল-মিলন।
ও যুগল-মিলনটাই দেখছে,
যুগল-বিরহটা দেখতে পাচ্ছে না।



দেখতে পাচ্ছে না যে, চক্ষুষ্মান এক হয়েছে দৃষ্টিহারা
এবং নিশ্চক্ষু শূন্যকে খুঁজছে উলটো দিকে মুখ ক'রে।
[নাটকীয় ভঙ্গিতে Exit। শ্রোতারা কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া করতালি দিলেন]

আষাঢ় ১৩৪৬

ভূত-বালক-কথা

"সম্বুদ্ধ"

অস্তি বরিশালভুক্তৌ মৃগঘট্টেতি জনপদঃ। তত্র চ মহাপ্রান্তরে বৃদ্ধবটগাছাশ্রয়ঃ মামদো নাম ভূতঃ।

অস্য বটস্যাধস্তাৎ কাঁটাবুহরীঝোপা বর্তন্তে।* বালকা বুহরীলুব্ধাঃ ভৃশমত্রাগচ্ছন্তি, ইটলগুড়াদিভিস্তদ্বনং তাড়য়ন্তি, ভূতস্য চ বিশ্রামবাধামুৎপাদয়ন্ত। অতোহসৌ ভূতঃ মহাক্রুদ্ধঃ বালকঘাড়বিভাঙিষুরেব কালং নয়তি।

অথৈকদা কাঁটাবুহরীকামঃ কশ্চিদ্বালকঃ গ্রীষ্মমধ্যাহ্নসময়ে তদ্বনং গতঃ। একাকিনমেনমায়ান্তমবলোক্য ভূতশ্চিন্তয়ামাস, অহো মহাবসরো মেহত্র সমুপস্থিতঃ। এতৈর্বানরবৎসকৈরুত্যক্ত এব কালং হরামি। তদদ্যাস্য ভগ্নঘাড়শোণিতেন ক্রোধঃ মে উপশাম্যতু।

ইতি বিচিন্ত্য স ভূতঃ বিকটং ভেংচিতাস্যঃ প্রসারিতবাহুর্বালকমন্বধাবৎ চ অচিরাচ্চৈনং দৃঢ়মুষ্ট্যা পপাকড়।

অথ তদ্বিধং ধৃতঃ স বালকঃ অত্যর্থং ভাতঃ উচ্চৈঃ ক্রন্দিতুমারেভে। ভূত আহ, চুপী ভব। ন চীৎকারৈস্তিলমপি ফলং লপ্স্যসে। ঘাড়ং তেহদ্য ভাঙিষ্যামি।

তদ্ধমকাদ্বিশুষ্কলোচনঃ বালকঃ ফুঁপয়ন্নাহ, কস্মাদ্ভাঙিষ্যসি। কস্ত্বং মে ঘাড়ভাঙতা ইতি।

ভূতেনোক্তম্, ভূতোহহম্। অত্রৈব বটবৃক্ষে নিবসামি। ত্বদ্বিধানামুপদ্রবান্ন কদাপি স্বস্তিং প্রাপ্নোমি।

বালক আহ, অপি মমোপদ্রবাদেব। ভূত আহ, অরে রে চ্যাঙ্গড়—

প্রত্যহং ঘুঘো দুর্বৃত্ত ভক্ষয়সি ধানানি মে।
ধৃতোহসি ঘুঘো দুর্বৃত্ত নয়াম্যদ্য প্রাণান হি তে।।

বালক উবাচ, নৈবৈতৎ যুক্তম্। অস্তি ত তে চক্ষুর্দ্বয়ম্। পশ্যসি এক নাহং ঘুঘুঃ। ন চ ময়া ভক্ষিতানি তে ধানানি। তৎ কথমজ্ঞাতঠিকানস্য ঘুঘোরপরাধান্নিরপরাধস্য মে প্রাণা নীয়ন্তে। নূনং ন ময়াপরাদ্ধম ভবতি।

ভূতেন সঘাড়নাড়মুক্তম্, চালাকির্ন চলিযাতি। জানাসি সম্যক্ ঘুঘুরত্রোক্তমুপময়া, ধানানি চোপময়ৈব। অপি চ, ঘুঘব এব যূয়ম্, যদনুক্ষণমত্রাগত্য মমাধিকারাদ্বুহরাণি ভক্ষয়িত্বা পলায়েধ্বে।

বালক আহ, কিং ময়ৈব ভক্ষিতানি। অহং চেৎ ব্রূয়াম্, অদ্যৈব প্রথমমহমত্রাগতঃ, ন চ একমপি বুহরং মুখে পূর্তুং শক্তস্ত্বয়া বলাদ্ধৃতঃ।

ভূত আহ, তথাপি হন্তব্যোহসি, যতো বহূনামেকঃ বহোরাচরণস্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে। উক্তঞ্চ—

সর্পবিষং প্রাণঘাতী মানবাঃ সর্পঘাতিনঃ।
নির্বিষং গলিতদংষ্ট্রম্ কিং তে ছাড়ন্তি মারিতুম্।।

তীক্ষ্ণা চ মে শোণিততৃষ্ণা। তদ্বৃথা তে তর্কবিস্তারঃ।

ইত্যুক্ত্বা স ভূতস্তং বালকং ঘাড়ং ভাঙ্‌ক্ত্বা নিজঘাণ।

হন্যমানশ্চ বালকঃ সখেদমাহ, ওরে বাপু রে—

* 'বুহরীবুহরস্তুহৈরবৈচীতি বঙ্গপশ্চিমে'।

বুহরাণি ন ভক্ষ্যাণি বুভুক্ষুঃ সাবধানো ভবেৎ।
বরং হি বাজারে ক্রয়ঃ, ন গচ্ছেদ্ভূতজঙ্গলম্।।

অপি চ,

মূঢ়োহহং নাস্মরং যস্মাৎ ন খলস্যাছিলাভাবঃ।
নেকড়েবাঘঃ অহংশ্ছাগং জলাঘুলনছুতয়া।।

তথা চ,

মাংসলোভী ছাগং হন্তি কিং তস্য ছাগক্রন্দনাৎ।
ক্ষুধামৃতে প্রজালক্ষে কিং বা রেশনমন্ত্রিণঃ।।

আশ্বিন ১৩৫৫

সংস্কৃত গাধা

"বনফুল"

জুতো মেরে মেরে ছিঁড়ে গেল জুতো
কয়েক জোড়া,
তবু গাধা হায় গাধাই রহিল
হল না ঘোড়া।
কহিল রজক—"থামুন, দোহাই,
সব গাধা যদি হইবে ঘোড়াই
কে বহিবে তবে মোদের বোঝাই
ভাবুন খোড়া!
কি হবে মশাই সকল গাধারে
করিয়া ঘোড়া?"

২

জুতাও কহিল নানান ছুতায়
চরণ ধরি'—
"গাধার লোমেতে গেল যে মোদের
অঙ্গ ভরি!
চরণ বাঁচাই পথের হাঁটায়,
ধূলা ও বালিতে, কাঁকরে কাঁটায়,
গাধার পিঠের সংঘাতে হায়
সরমে মরি।
গাধার চাইতে কাদাকেও মোরা
বরণ করি।"

৩

গাধা-উদ্ধার-সমিতির নেতা
ভাবিয়া সারা,
দক্ষিণ পাণি গণ্ডে রাখিয়া
আত্মহারা।
"কদাকার জীব, পাঁশুটে বরণ,
চীৎকার করে শ্রুতি-বিদারণ,
জুতাও নারাজ—হায়রে তখন
নাই ত চারা!"
হাঁটু নাচাইয়া ভাব ভরে দিল
গোঁফেতে চাড়া!

৪

সহসা তাহার হাঁটুর নাচনি
গেল যে থেমে ;
দেখিল সে যাহা তাহাতে বাছনি
উঠিল ঘেমে।
অর্থাৎ শেষে দেখা পেল তাই,
যাহা সে বেচারা মোটে ভাবে নাই,
দেখিল পড়েছে অনেক ঘোড়াই
গাধার প্রেমে।
নব-সমস্যা! কলকল করে
উঠিল ঘেমে।

৫

"ভয় নাই কিছু" দিল সান্ত্বনা
বৈজ্ঞানিক,
"গাধা-উদ্ধার, হয় যদি হবে
এতেই ঠিক!
ঘোড়ার সঙ্গে মেলা-মেশা করে'
হয়ত গাধারা যেতে পারে তরে',
ঘোড়ার সাথেতে ওরা প্রাণ ভরে'
মিশিয়া নিক!
বোলোনাক কিছু" কহিল আসিয়া
বৈজ্ঞানিক।

৬

গাধা ও ঘোড়ার মিলন হইল
গভীরতর ;
বৈজ্ঞানিক সে কহিল কেবল
"ধৈর্য ধর!"
ধৈর্য ধরিয়া দিবা নিশি যায়,
গাধা ও ঘোড়ার মিলনেতে হায়
এ কি অদ্ভুত! হল শেষটায়
অশ্বতর!
নেতা কহিলেন—"হে বৈজ্ঞানিক
হর্ষ কর!"

বৈশাখ ১৩৪১

বামুন

সজনীকান্ত দাস

[রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি রচিত হইবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এযুগে এই সকল কবিতার ভাষা ও ছন্দ একরূপ অচল হইয়া আসিয়াছে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্তমানে যে ধরনের ভাষা ও ছন্দের তরফে ওকালতি করিতেছেন এ লেখাগুলির ভাষা ও ছন্দ সেই শ্রেণীর নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতেই এগুলি বাতিল। আমরা এগুলিকে আধুনিক ভাষা ও ছন্দে ফেলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়া রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে চাই। এই কবিতাটি তাঁহার সুবিখ্যাত 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটিরই আধুনিক রূপ। গত বৈশাখের 'উদয়নে' রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের মেঘনাদ-বধ কাব্যকে যে ছন্দে ফেলিয়া জোরালো করিতে চাহিয়াছেন কবিতাটি সেই ছন্দে অনূদিত হইল। এই ভাবে আমরা তাঁহার অন্যান্য কবিতারও রূপান্তর ঘটাইব স্থির করিয়াছি।—লেখক]

আঁধার কালো বনের ছায়ায় সরস্বতীর পাড়ে
ডুবল গিয়ে সাঁঝের রবি ; আসল কখন ফিরে
একদম-চুপ আখড়াটাতে মুনির বেটা যত
মাথায় করে কাঠ-কুটো সব কুড়িয়ে নিয়ে এল
অন্য বনের থেকে তারা, আনল তারা ডেকে
বন-আখড়ার গোয়াল ঘরে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি চোখ
হাঁপিয়ে ওঠা 'হোমে'র গরু যত, সাঁঝের বেলায়
শেষ করে গা-ধোয়া সবাই কুঁড়ের উঠানটাতে
হোম-আগুনের আলোর ভিতর বসল পিঁড়ি নিয়ে
ঘিরে গুরু গৌতমকে। চোখ-বোজা চুপচাপ
ফাঁকায় মস্ত আকাশটাতে—তারাগুলো সবাই
চুপটি করে বসে আছে, ফ্যালফেলিয়ে যেন
ঠাণ্ডা বোবা চ্যালার মত। ঘুপচি আখড়া হঠাৎ
চুলবুলিয়ে চাঙ্গা হ'ল, মুনির সেরা মুনি
গৌতম সে বলল কথা—"বাছারা সব শোন,
বেহ্ম-বিদ্যে বলব কিছু—"
এমন সময় দেখ,
উঠোনটাতে ঢুকলো এসে ছোকরা কচি এক—
দুই মুঠোতে পূজোর জিনিস ফলফুল সব দিয়ে
মুনির ঠ্যাঙে জানিয়ে পেনাম অনেক ভক্তি করে
কোকিল পাখীর মতন ভারী মিষ্টি মিহিন গলায়
বলল, "বাবা, বেহ্ম-বিদ্যে শিখতে আমার সাধ,
দীক্ষা নিতে এসেছি, মোর কুশ-খেতেতে ঘর,
সত্যকাম নামটি আমার।"
খানিক মুচকি হেসে

বেহ্ম-ঋষি বলেন তারে মিঠা স্নেহের সুরে,
"চেহারা-ভালো ছোকরা ওহে, তোমার ভালো হোক!
গোত্রটি কি তোমার বাপু? বামুন শুধু পারে
বেহ্ম-বিদ্যে শিখতে হেথা।"—
আস্তে ছোকরা বলে
"গোত্র তো নাই জানি বাবা, শুধিয়ে মাকে কাল
বলব এসে তোমায় আমায় হুকুম কর তুমি।"
এইনা বলে মুনির পায়ে একটা সেলাম করি
সত্যকাম গেলই চলে, আঁধার কালো বন
পায়ে হেঁটেই পার হল সে। রোগা সরস্বতী
তল অবধি যায় যে দেখা এমনি পরিষ্কার
ঠাণ্ডা ভারী; বালির ওপর ঘুম দেওয়া চুপচাপ
গাঁয়ের শেষে মায়ের কুঁড়েয় ঢুকল ছোকরা এসে।
সাঁঝের পিদিম জলছে ঘরে, মা জবালা তার
দুয়োর ধরে দাঁড়িয়ে ছিল চেয়ে পথের পানে
বেটায় বুকে টেনে নিয়ে চুলগুলো তার শুঁকে
ভালো হবার বলেন কথা—শুধায় সত্যকাম,
"কও মোরে মা, বাবার আমার নামটি কি যে ছিল,
কোন বংশে পয়দা আমার? দীক্ষা নিতে গেনু—
গোতম গুরু বললে মোরে শুনছ ওহে বাপু,
বামুন শুধু পারে বেহ্ম-বিদ্যে শিখতে হেথা,
দোহাই তোমার মাগো, বল গোত্রটি কি আমার?"
বেটার কথা শুনে মায়ের হেঁট হল যে মাথা,
বলেন তিনি চুপি চুপি, "জোয়ান বয়স কালে
কাঙালপনার দুখে অনেক—অনেক সেবা করি
পেয়েছিলাম তোমায় বাবা, জন্মেছিলি তুই
নাই-ভাতারী এই জবালার কোলখানারে জুড়ে,
গোত্র তোমার নাই জানিরে বাপ—"
পরের দিন
মুনির বনের গাছের মাথায় মুচকি-মুচকি-হাসা
ছোকরা সকাল উঠল জেগে, বাচ্ছা মুনি যত
শিশির-ধোওয়া যেন তারা কাঁচা দিনের আলো,
ভক্তি চোখের জলে ধোয়া নয়া পুণ্য জলুষ,
ভোর বেলাতে চান করে সব যেন ঠাণ্ডা ছবি,
ভিজে ভিজে মাথায় জটা, বুড়ো বটের তলায়
হাসি-হাসি মূর্তি এবং জলুষ-দেওয়া-গায়ে
শুধ্‌ধু হয়ে বসল, গুরু গৌতমকে ঘিরে।
পাখীর গান আর মৌমাছিদের গুনগুনানি যত,
কলকলানি জলের এবং তারি সাথে সাথে
উঠছে মিহিন এবং মোটা ছোকরা গলার সুর
অনেকগুলি একই সাথে অবাক লাগে শুনে,
মিঠা সামের গান।

দেখ, ঠিক এমনই সময়
সত্যকাম মুনির ঠ্যাঙে করল পেনাম এসে,
ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে চেয়ে রইল সে চুপচাপ।
আশিস্ করে মশাই তখন তাকে শুধায় ফের,
"দেখতে ভালো ছেলে তোমার গোত্র কি তা বল?"
মাথা তুলে ছোকরা কহে, "শুনুন তবে বাবা,
নাই জানি কি গোত্র আমার, শুধিয়ে এলেম মাকে,
বলেন তিনি, অনেক জনের অনেক সেবা করে
পেলাম তোরে জন্মেছিলি বাপরে সত্যকাম,
নাই-ভাতারী এই জবালার কোলখানারে জুড়ে
গোত্র কি তোর নাই জানিরে—"
এই না খবর শুনি
পড়োরা সব ফিসফিসিয়ে করল সুরু কথা;
মৌচাকেতে ছুঁড়লে ঢেলা মৌমাছিরা যেমন
এলোমেলো উড়তে থাকে পাগল পারা হয়ে
অবাকে 'থ' হল সবাই, হাসল বা কেউ কেউ,
টিটকিরি দেয় নিলাজ নীচু জাতের দেমাক দেখে।
গোতম মুনি পিঁড়ি ছেড়ে বাড়িয়ে দুটি হাত
জাপটে ধরে ছোকরাটিরে বলেন, "আমার বাবা,
বামুন তুমি নও একথা বলতে নাহি পারি
সাচ্চা কুলের বাচ্ছা তুমি সব বামুনের সেরা।"

আশ্বিন ১৩৪২

সোশ্যালিস্ট্

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

লালগোলার ফেরিতে গঙ্গা পার হইয়া গোদাগাড়ি ঘাটে যখন ট্রেনে উঠিলাম, তখন ইণ্টার ক্লাসটাকে একেবারে ফাঁকা দেখিয়া বেশ বড় রকম একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। কাল রাত এগারোটায় শিয়ালদায় ট্রেনে চাপিয়াছি, কিন্তু এই সকাল সাতটা পর্যন্ত অসম্ভব ভিড়ের চাপে কিছুতেই দুই চোখের পাতা এক করিতে পারি নাই। তার উপর শেষ রাত্রি পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের দুই স্ফীতোদর উকিল ভদ্রলোক ত্রিপুরী, সুভাষ, এম. এন. রায়, এ. আই. সি. সি. লইয়া এমন উদ্দাম পলিটিক্যাল আলোচনা চালাইয়াছেন যে, সামান্য এতটুকু তন্দ্রা যাও বা আসি-আসি করিতেছিল, তর্কের তাড়নে বিপর্যস্ত হইয়া সে বেচারা দুই পাশের অন্ধকার -নিমগ্ন বনপ্রান্তর ডিঙাইয়া বিতাড়িত গরুর মত ঊর্ধ্বপুচ্ছ হইয়া পলাইতে পথ পায় নাই।

ছারপোকা-চিহ্নিত ময়লা খাঁকি গদিটার উপরে বিছানাটা পাড়িয়া চিৎ হইয়া পড়িলাম, এতক্ষণে মুখ হইতে পরম আরামে বাহির হইয়া আসিল, আঃ!

বাঁশি বাজাইয়া ট্রেনটা হাত কয়েক অগ্রসর হইতেই খট করিয়া কামরার দরজাটা খুলিয়া গেল এবং এক বিচিত্র মূর্তির আবির্ভাব ঘটিল। রূপ দেখিয়াই বিরূপ হইয়া উঠিলাম, বাজে লোক ভাবিয়া আভিজাত্যে গলা ভারী করিয়া কহিলাম, ইয়ে ডেড়া ভাড়াকা হ্যায়, দোসরা গাড়িমে যাও।

কিন্তু ভুল যে কতখানি করিয়াছি, সেটাও তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিলাম। ততোধিক রুক্ষস্বরে পালটা জবাব আসিল, এটা প্রলিটারিয়েটের যুগ এসেছে মশাই, ওসব বুর্জোয়া গায়ের জোর এ যুগে চলবে না, বুঝলেন? সবহারা যারা, দুনিয়ায় তারা সবের মালিক হবে, এ দেড়া ভাড়ার গাড়ি তো কোন্ ছার!

কথাগুলো এমনই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক যে, তাহারা একেবারে দমদম বুলেটের মত আসিয়া কানের মধ্য দিয়া সোজা আমার মগজে গিয়া বিঁধিল। উঠিয়া বসিলাম ও এতক্ষণে ভাল করিয়া লোকটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

মাথায় একরাশ তেলহীন ঝাঁকড়া চুল, তামাটে ব্রণ-অঙ্কিত মুখে পনেরো দিনের দাড়ি সজারুর কাঁটার মত উদ্ধত হইয়া আছে, এক কানে আধপোড়া একটা বিড়ি গোঁজা। গায়ে মোটা একটা খদ্দরের জামা, ঘামে এবং ময়লায় সেটাতে বস্তু বলিয়া কিছু অবশিষ্ট নাই। পরনের ময়লা ফুলপাড় ধুতি খদ্দরের সঙ্গে বিচিত্র সমন্বয় ঘটাইয়াছে, পায়ে বাটার স্যাণ্ডেল। বকের মত শীর্ণ দেহ, কালি-লেপা কোটরের মধ্য হইতে ঠেলিয়া-উঠা চোখ দুইটা তীক্ষ্ণ করিয়া সে আমার পানে তাকাইল।

মুখ কিন্তু বন্ধ হইবার নয়। দরজার গায়ে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া সে বক্তৃতার ধরনে নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া চলিয়াছে, মার্ক্স বলেছেন, 'The proletariats have nothing to lose but their chains', কতদিন তাদের আর আপনারা ঠেকিয়ে রাখবেন? আকাশে বাতাসে কি শুনতে পাচ্ছেন না জাগ্রত গণ-শিশুর বিপুল ক্রন্দন, মানবতার উচ্চণ্ড জয়ধ্বনি? সেদিনও কম্যুনিস্ট্ পার্টির এইটিনথ কংগ্রেসে স্টালিন বলেছেন যে, বর্তমান যুগের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে, 'The complete elimination of the remnant of exploiting classes, the welding of the workers, peasants and intellectuals into one common front of working people'।

কথার তোড়ে দমবন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। কেঁচো খুঁড়িতে এমন গোখরো সাপ বাহির হইয়া পড়িবে, সেটা কে ভাবিয়াছিল! পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে সোশ্যালিস্ট্ বন্ধুর অভাব নাই, তাহাদের অজস্র বক্তৃতা প্রত্যহ ঘন্টাকয়েক অন্তত দুই কান পাতিয়া শুনিতে হয়. এমন কি তাহাদের দলে পড়িয়া এমন মুখচোরা আমি পর্যন্ত 'মে দিবসে' ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঝাঁঝালো একটা বক্তৃতা দিয়াছিলাম। কিন্তু এমন উগ্র, অহেতুক ও অসংযত সোশ্যালিজমের আত্মপ্রকাশ বন্ধু হিরণ ভটচায বা হৃষী চক্রবর্তীর মধ্যে পর্যন্ত দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

শশব্যস্তে বলিলাম, থামুন মশাই, থামুন। এটা অ্যালবার্ট হল নয়, গোলদীঘি নয়, মনুমেন্টের তলায় বিরাট জনসভাও নয়—আপনার কথাগুলো নেহাৎ বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে না চিনতে পেরে যে বেফাঁস কথাটা ব'লে ফেলেছি, জোড়হাতে ক্ষমা চাইছি সেজন্যে। কাল সারারাত ট্রেনে ঘুম হয় নি, দয়া ক'রে চুপ করুন, ঘুমুতে দিন একটু।

সোশ্যালিস্ট্ এবার মন্থর গতিতে আমার দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং দেশ-দেশান্তর ও যুগ-যুগান্তরের ধূলিসঞ্চিত বেশবাস লইয়া যেভাবে আমারই বিছানাটার উপর ধপাৎ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া বিছানার দুর্গতি কল্পনায় শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। সোশ্যালিস্ট্ কিন্তু শুধু বসিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, ধূসর চরণ দুইখানিকেও অতি অবলীলাক্রমেই বিছানার উপর তুলিয়া দিলেন। ঠোঁটের আগায় প্রতিবাদমূলক কি একটা কথা যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বুদ্ধিমানের মত সেটাকে চট করিয়া গলার মধ্যে সাফাই করিয়া ফেলিলাম।

সোশ্যালিস্টের লাল শিরা বাহির করা হলদে রঙের ঢ্যালা ঢ্যালা উগ্র চোখ দুইটা ততক্ষণে খানিকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। কহিলেন, ঘুমোনোর কথা কি বলছেন মশাই, ঘুমোবার কি আর সময় আছে! সমস্ত পৃথিবী আজ রাশ্যার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে চলেছে বোলশেভিজমের পথে, মেটিরিয়ালিস্ট্ নেচারের প্রচণ্ড ডাইনামিজ্‌ম তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এক নতুন রাষ্ট্রে, এক অভিনব সাম্যমূলক ইউটোপিয়ার দেশে। এখন ঘুমোয় কে, কোন্ কাপুরুষ?

কাতর কণ্ঠে বলিলাম, এ আলঙ্কারিক ঘুম নয় মশাই, রীতিমত শারীরিক ঘুম। অক্টোবর রেভোলিউশানের আগেও স্বয়ং লেনিন পর্যন্ত এমনই ঘুমুতেন, আমরা আর কি দোষ করলাম, বলুন? তবে আইডোলজিক্যালি আমিও দস্তুরমত জেগে আছি মশাই, পলিটিকসে আমার দারুণ ইন্টারেস্ট, চার আনা দিয়ে বি-পি-সি-সি-র মেম্বার হয়েছি।

কথাটা আর শেষ করিতে হইল না, কানের কাছে সশব্দে যেন বোমা ফাটিয়া গেল। সোশ্যালিস্ট্ গর্জিয়া কহিলেন, কংগ্রেস, পলিটিকস! ক্যাপিটালিস্ট কংগ্রেস, বুর্জোয়া কংগ্রেস, ফ্যাসিস্ট কংগ্রেস, প্যাটেল দেশাই গান্ধীর কংগ্রেস! আর পলিটিকস! যে পলিটিকস শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধামা ধ'রে আছে, পিপলস ফ্রন্টের গলা টিপে মারাই যার উদ্দেশ্য, সে পলিটিকসের মূল্য কি! Down with—

কিন্তু স্লোগানটা শেষ করিবার পূর্বেই বাহিরে তাকাইয়া সোশ্যালিস্ট কি যেন দেখিলেন এবং চোখের পলক না ফেলিতে ধাঁ করিয়া ল্যাভেটরির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। চমকিয়া ভাবিলাম, পুলিস নয় তো! বক্তৃতার যে তোড়, তাহাতে উদ্ব্যস্ত হইয়া যদি তাহারা চলন্ত গাড়িতে আসিয়া লাফাইয়া উঠে, তবে সেটাও নিতান্ত আকস্মিক হইবে না। কিন্তু পুলিস নয়, ফুটবোর্ড বাহিয়া সাদা টুপি পরা ফ্লাইং চেকারের প্রবেশ ও প্রস্থান।

মিনিট খানেকের মধ্যেই সোশালিস্ট বাহির হইয়া আসিলেন। যেন কিছুই হয় নাই, এমনই ভাবে নির্বিকারচিত্তে আসিয়া আবার আমার বিছানায় বসিলেন এবং কানের আধপোড়া বিড়িটা নামাইয়া কহিলেন, দেশলাই আছে?

বাহির করিয়া দিলাম। সোশ্যালিস্ট বিড়ি ধরাইয়া বাক্সটাকে নিজের পকেটেই রাখিয়া দিলেন, বোধ হয় ভুল করিয়াই। এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়ের নামটা?

বলিলাম।

যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

পূর্ণিয়া।

চাকরি করেন সেখানে?

না, বেড়াতে যাচ্ছি।

বারুদের স্তূপ যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, বিস্ফোরণ ঘটিতে যা দেরি। বেড়াতে যাচ্ছেন! লজ্জা করল না কথাটা উচ্চারণ করতে? পৃথিবীর পনেরো আনা মানুষ যখন বস্তির অন্ধকারে অনশনে দিন কাটাচ্ছে, তখন তাদের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না ক'রে নিছক বুর্জোয়া লাকসারির খাতিরে এই যে রেল কোম্পানির পকেটে এতগুলো টাকা ঢেলে দিচ্ছেন, জানেন এ কত বড় অপরাধ?

ঘুমাইবার আশা তো বহুক্ষণ পূর্বেই তিরোহিত হইয়াছিল, এই ডিক্টেটর-মেজাজী সোশ্যালিস্টের পাল্লায় পড়িয়া বিব্রত হইয়া উঠিলাম। সবিনয়ে বলিতে গেলাম, কেন, রেলওয়েতেও বিস্তর মজুর খাটছে। এই টাকাতে তাদের একটা অংশ—

অংশ! সোশ্যালিস্ট হিংস্রভাবে দাঁত বাহির করিলেন, হুঁ, অংশই বটে! তাদের এক্সপ্লয়েট ক'রেই তো আজ ধনবাদী ব্রিটিশ গবর্মেন্ট বছর বছর লাখে লাখে টাকা দেশে চালান দিচ্ছে আর সেই টাকায় কামান এরোপ্লেন সাবমেরিন গ্যাস তৈরি ক'রে পৃথিবীতে ইম্পিরিয়েলিজমের বনিয়াদ খাড়া হয়ে উঠছে। রেল-কোয়ার্টার্সের লাল বাড়িগুলো দেখেছেন তো? ওগুলো লেবারারদের রক্তে রাঙা।

এতক্ষণে বুঝিলাম, অতিরিক্ত পড়াশুনা করিয়া এবং বক্তৃতা শুনিয়া লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, একেবারে উদ্দাম পাগল। কে জানে, শিকল ছিঁড়িয়াই পলাইয়া আসিয়াছে কি না। কিন্তু চট করিয়া তখনই মনে পড়িল, চেকার দেখিয়া বাথরুমে পলাইবার মত বুদ্ধিটুকু তো বেশ পরিষ্কার আছে। হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু এত যে বক্তৃতা দিচ্ছেন, দেশ জাতি জাতি ব'লে চিৎকার করছেন, পরেছেন তো খদ্দরের সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টারের বিলিতী কাপড়!

সোশ্যালিস্ট মুখের এমনই একটা ভঙ্গি করিলেন যে, আমার হাসিটা এক সেকেণ্ডের মধ্যে বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল। হাঁটুতে একটা সশব্দ চাপড় মারিয়া সগর্বে কহিলেন, হুঁ, ওইটুকুই যদি বুঝবেন, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি! ওসব বুর্জোয়া ন্যাশানালিটির নেশা এখন দূর করুন মশাই, এটা বিশ্বমানবতার যুগ। আজ আর ল্যাঙ্কাস্টার আমেদাবাদে কোন ব্যবধান থাকবে না, থাকতে পারে না। শ্রমিক-কিষাণদের কোন দেশ নেই, জাতি নেই, তারা এক বিরাট বিশ্বজাতিতে পরিণত হয়েছে, তাদের সম্মেলনের বাণী বাজছে আকাশে বাতাসে— **Proletariats of all countries, unite**।

অন্য সময় হইলে এই ধরনের কথাগুলো একেবারে খারাপ লাগিত না, চাই কি খানিকটা উপভোগও করিতে পারিতাম। কিন্তু চোখ দুইটা আপাতত ঘুমে ভারী হইয়া চিড়বিড় করিয়া জ্বলিতেছে, মাথাটা যেন আর কাঁধের উপর স্থির হইয়া থাকিতে রাজি নয়। এ অবস্থায় এই অসহ্য বকুনি শুনিয়া মনে হইল, লোকটার ঘাড় ধরিয়া সোজা জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিই।

কিন্তু নানা কারণে সেটা অবশ্য আর সম্ভব নয়। হাল ছাড়িয়া কহিলাম, কোথায় নামবেন?

মালদা, ইংলিশ বাজার।

আরও তিন স্টেশন! ট্রেনটা যে ভাবে ছ্যাকড়া গাড়ির মত ঝিমাইতে ঝিমাইতে ঘন্টায় দশ মাইল স্পীডে চলিতেছে, তাহাতে অন্তত পুরা দেড়টি ঘন্টার ধাক্কা। হতাশ হইয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলাম, বলিলাম, আমার দেশলাইটা দিন তো দয়া ক'রে।

সোশ্যালিস্ট ভ্রু বাঁকাইলেন, মানে? আপনার দেশলাই আবার কোথায়?

বাঃ, নিলেন যে!

সোশ্যালিস্ট এবার সমস্ত মুখটাই বাঁকা করিলেন, নিয়েছি বটে দেশলাই, কিন্তু সে তো আপনার নয়।

মানে? আমি একেবারে বিশ হাত উঁচু হইতে পা হড়কাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আবার বলছেন আমার নয়! এ তো আপনার গায়ের জোর দেখছি!

আলবৎ, নিশ্চয়। সজোরে সোশ্যালিস্ট বেঞ্চির উপরে একটি কিল মারিলেন, ওই তো আপনাদের বুর্জোয়া মনের দোষ মশাই। প্রপার্টি ইনস্টিংক্ট এমন প্রবল ব'লেই তো পৃথিবীতে আপনারা এত গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন। ইনডিভিজুয়্যালিজম গ'ড়ে উঠেছে, মেনশেভিকেরা মাথা তুলেছে, মস্কো-কনসপিরেসি সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীতে কোন্ জিনিসে আপনার স্বতন্ত্র অধিকার? জানেন Proudhon বলেছেন, All property is theft?

দুই হাতে কান চাপিয়া কহিলাম, দোহাই, থামুন থামুন, দেশলাই আমার চাই না। পরের স্টেশনেই আমি গাড়ি বদল করছি মশাই, সম্প্রতি মিনিট দশেকের জন্য অব্যাহতি দিন।

সোশ্যালিস্ট জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, কাপুরুষ। তারপর তেমনই অবিশ্রাম বকিতে বকিতে পুনর্বার উঠিয়া বাথরুমের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। এবার অবশ্য ফ্লাইং চেকার ছিল না, বুঝিলাম, ফিরিতে তাঁহার কয়েক মিনিট বিলম্ব হইবে। সুযোগ পাইবামাত্র আমি আর সময় নষ্ট করিলাম না, বিছানার উপরে হাত পা মেলিয়া লম্বা হইয়া পড়িলাম। রাজ্যের ঘুম যেন ইহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, দুই চোখের পাতা ভরিয়া হুড়মুড় করিয়া তাহারা নামিয়া আসিল এবং পরক্ষণেই ক্লান্ত দেহ, চলন্ত ট্রেন এবং বকন্ত সোশ্যালিস্ট মনের বাহিরে অতল অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু, কি ঘুম তোবে পেয়েছিল হতভাগিনী!

ঘুম ভাঙিল একেবারে কাটিহার জংশনে আসিয়া। এখানে গাড়ি বদলাইতে হইবে। যাত্রীর কোলাহল, কুলীর চিৎকার এবং পান-বিড়ি-খাবারের ঐকতানে চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিলাম। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, গাড়িটা তেমনই ফাঁকা, সোশ্যালিস্ট বোধ হয় ইংলিশ বাজারেই নামিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একি! আমার গ্লেজ কিড চামড়ার চমৎকার নূতন পাম্পশু-জোড়ার পরিবর্তে তাহার জায়গায় সোশ্যালিস্টের ছেঁড়া বাটার স্যাণ্ডেল-যুগল আমাকে যেন দাঁত বাহির করিয়া ভেংচি কাটিতেছে।

বাঃ! লাফাইয়া উঠিলাম, কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বিলম্ব ছিল। বাঙ্কের উপর হইতে সুটকেসটিও বই কাপড় জামা এবং গোটা পঁচিশেক টাকা সহ পাদুকাদ্বয়েব পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে। আপাতত সম্বল শুধু পকেটের টিকেটখানি এবং মাত্র কয়েক আনা পয়সা।

চোখে জল আসিতেছিল। মুহূর্তে কানের মধ্যে সোশ্যালিস্টের শেষ কথাগুলো বাজিয়া উঠিল ঃ প্রপার্টি ইনস্টিংক্ট বিসর্জন দিতে হবে মশাই, মনে রাখবেন, এই শতাব্দীতে কারও কোন ইন্‌ডিভিজুয়াল সম্পত্তিই থাকতে পারে না। All property is theft!

তাহাই বটে!

(কাহিনীটি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্জাত, সোশ্যালিজমকে বিন্দুমাত্র কটাক্ষ করিবার উদ্দেশ্য ইহাতে নাই। আমার সমাজতান্ত্রিক বন্ধুদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া এজন্য কোন অপরাধ গ্রহণ না করেন। সমস্ত পথ ও মতবাদের মধ্যেই অজস্র সুলভ ভণ্ডামির প্রশ্রয় আছে, এই লেখাটিকে সেই দিক হইতে গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।—লেখক)

শ্রাবণ ১৩৪৬

বাণী ও ভস্ম

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

মহামানব প্রেমানন্দ মহাপ্রয়াণ করিবেন। প্রধান শিষ্যদের ডাকিয়া ঘরোয়া বৈঠকে সেই সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন।

বলিলেন, জগতের কাছে আমার যা বলার ছিল, আমি বলেছি। মানুষের মুক্তির পথ, আনন্দের পথ আমি নির্দেশ করেছি। সে পথে চলার দায়িত্ব তোমাদের—জগতের মানুষের। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

বলিলেন, কিন্তু ভুলো না আমি দেহত্যাগ করলেও বেঁচে থাকব। বেঁচে থাকব আমার বাণীর ভেতরে—তোমাদের অন্তরে, তোমাদের কর্মে। যেখানে প্রেম থাকবে, ভালবাসা থাকবে, সহজ সরল অনাড়ম্বর নিষ্কাম জীবনাদর্শ থাকবে, সেইখানেই আমি বেঁচে থাকব।

শিষ্যগণ কোঁচার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া অধোবদন হইলেন।

শিষ্য মাধবানন্দ কহিলেন, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু। আপনার যাবার সময় হয়েছে, আমরা বাধা দেব না।

শিষ্য যোগানন্দ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিলেন, না, বাধা দেওয়া আমাদের সঙ্গত হবে না।

শিষ্যা আনন্দময়ী নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

মহামানব শিষ্য ভাবানন্দের দিকে এক ঝলক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু হাস্য করিলেন। সরলকণ্ঠে বলিলেন, এই আমি আশা করেছিলাম। জানতাম, তোমরা বাধা দেবে না। তেমন শিষ্য তোমরা নও। তবে তাই হোক। আর একটা কথা। আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে আমার কতকগুলি নির্দেশ আছে। অক্ষরে অক্ষরে সেগুলি পালন করতে হবে। আমি নিজে হাতে নির্দেশপত্র লিখে রাখব।

সভা ভঙ্গ হইল। শিষ্যগণ উঠিয়া গেলেন। শুধু ভাবানন্দ উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আসিয়া মহামানব প্রেমানন্দের কাছে বসিলেন।

সব চ'লে গেছে?—মহামানব প্রশ্ন করিলেন।

হ্যাঁ।—ভাবানন্দ জবাব দিলেন।

ব্যবস্থা সব ঠিক আছে?

আছে।

মহামানব কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, জীবনে একবার মাত্র—এই প্রথম আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। এ মিথ্যায় পাপ নেই ভাবানন্দ। কারণ এ মিথ্যার প্রয়োজন আছে। সত্যান্বেষী আমি, সত্য আমাকে জানতে হবে। আমার ধর্ম, আমার জীবনাদর্শের সঙ্গে এ মিথ্যার কোন বিরোধ নেই।

ভাবানন্দ বলিলেন, আমি বুঝেছি গুরুদেব।

মহামানব প্রেমানন্দের মহাপ্রয়াণের পর এক বৎসর পার হইয়াছে। এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর মহামানব প্রেমানন্দ ভাবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিঃসংশয় হইয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে কোনদিকে কাহারও মনে কোন সংশয় ঘটে নাই। প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পর্যন্ত মহাসমারোহসহকারে সর্বত্র সম্পন্ন হইয়াছে, কোন প্রশ্ন ওঠে নাই। কোন শ্রাদ্ধবাসরে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন।

ধীরপদক্ষেপে স্বীয় আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। আশ্রমের শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বনি শুনা

গেল।

কিসের শব্দ?—মহামানব জিজ্ঞাসা করিলেন।

পূজা হইতেছে।—ভাবানন্দ জবাব দিলেন।

কিসের পূজা? কোন বিশেষ দেবতার প্রতিষ্ঠা তো আমি করি নি।

ভাবানন্দ বলিলেন, এঁরা বোধ হয় করেছেন। জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।

আশ্রমযাত্রী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিস্মিত এবং আহত হইলেন। বলিলেন, আপনারা এখানে নতুন এসেছেন?

হাঁ।

কিন্তু এও আশ্চর্য। তীর্থে এসেছেন, কোন্ তীর্থে জানেন না!—ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, মহামানব প্রেমানন্দ যেখানে তিরোভাব করেছিলেন, সেখানে দিবারাত্রি আরতি হয়। জেনে রাখুন।

ভদ্রলোক দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেলেন।

মহামানব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাবানন্দের পানে তাকাইলেন। উভয়ে নীরবে চলিতে লাগিলেন।

একদল লোক আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রেমানন্দ বলিলেন, ভুখ মিছিল ব'লে মনে হচ্ছে। দেখ তো। ভিখারীর দলও হতে পারে।

ভাবানন্দ একটি লোককে থামাইয়া ব্যাপারটি জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, আশ্রমে কি আজ ভিখারী-বিদায় হচ্ছে?

লোকটি চটিয়া উঠিল, কি বলছেন মশাই? ভিখারী-বিদায় মানে? আমরাই ভিক্ষে দিয়ে এলুম। বুঝেছেন?

পাশের লোকটি নরমসুরে কহিল, ভিক্ষে নয়, চাঁদা' দুদিনের খাওয়ার খরচ বাঁচিয়ে চাঁদা দেবার হুকুম হয়েছিল। এখানে আমরা সবাই গরিব মানুষ তো! খাওয়া বন্ধ না করলে চাঁদার টাকা কোত্থেকে হবে? আর চাঁদা না হ'লে এই সব বড় বড় কাজ হবেই বা কি ক'রে?

কি কাজ?—মহামানব প্রশ্ন করিলেন।

অনেক কাজ।—লোকটি বলিল, দেশে দেশে আমাদের আশ্রমের শাখা-আপিস আছে। সেখানে টাকা পাঠাতে হয়। মাতা আনন্দময়ী যেখানে আছেন সেখানে খাঁটি গাওয়া ঘি বা দুধ কোনটাই নেই। একখানা উড়োজাহাজে রোজ দুধ আর ঘি পাঠাতে হয় তাঁব কাছে। স্বামী যোগানন্দ—

একটু ধীরে বল ভাই।—ভাবানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, একখানা উড়োজাহাজে তা হ'লে ঘি আর দুধ পাঠাতে হয়?

না পাঠালে চলবে কি ক'রে? মাতা আনন্দময়ীর আবার সাত্ত্বিক আহার তো? তা ছাড়া শুধু দুধ ঘিটাই—একমাত্র কথা নয়। এতে ক'রে বিদেশে আশ্রমের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যায়।

মহামানব হঠাৎ চলিতে শুরু করিলেন। ভাবানন্দ সঙ্গ লইলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করিতেই একজন আশ্রমবাসী অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে, এদিক দিয়ে আসুন।

কোথায়?—ভাবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আশ্রমবাসী একটু বিস্মিত হইল।—আগে দেখে নেবেন না?

কি দেখব?

আগন্তুকদের অজ্ঞতা আশ্রমবাসী ক্ষমা করিল। বলিল, মহামানব কোথায় বসতেন, কিসে বসতেন, কোথায় শুতেন, কি পরতেন, কি দিয়ে লিখতেন—এই সবই লোকে এসে আগে

দেখে কিনা। অবশ্য আপনাদের অভিরুচি।

মহামানব প্রেমানন্দ এবার কথা বলিলেন, আমরা যত শীঘ্র সম্ভব, স্বামী মাধবানন্দের দেখা পেতে চাই।

তবে ওই দিকে যান।

আশ্রমবাসী সরিয়া গেল।

সুসজ্জিত কক্ষে স্বামী মাধবানন্দ দেখা দিলেন।

মহামানব নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

আপনারা বিলম্বে এসেছেন।—মাধবানন্দ কহিলেন, কিছু পাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু বেশি নয়।

কি জিনিস?—ভাবানন্দ প্রশ্ন করিলেন।

জবাবে বাধা পড়িয়া গেল। একজন আশ্রম-কর্মী প্রবেশ করিয়া স্বামী মাধবানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বাগদাদ থেকে চিঠি এসেছে। এক হাঁড়ি পাঠাতে অনুরোধ করেছে।

এক হাঁড়ি পারব না।—মাধবানন্দ হুকুম দিলেন, এক প্যাকেট রেজিস্ট্রি ক'রে পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা।—আশ্রম-কর্মী চলিয়া গেল।

কি জিনিস?—ভাবানন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

স্বামী মাধবানন্দের দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু অসীম মনোবল তাঁহার। মুহূর্তে ক্রোধ দমন করিয়া প্রশান্ত বদনে বলিলেন, আপনারা কি ভস্ম নিতে আসেন নি?

কিসের ভস্ম?—মহামানবের রুদ্ধকণ্ঠ যেন ভাঙিয়া পড়িল।

মহামানব প্রেমানন্দের চিতাভস্ম, যা নিতে সকলে আসে। আপনারা কেন এসেছেন?

ভাবানন্দ বলিলেন, ভস্ম নিতে হয় আমরা জানতুম না। আমরা এসেছি আপনার শ্রীমুখে মহামানবের বাণী শুনতে। তাঁর ধর্ম, তাঁর জীবন, তাঁর নির্দেশ আপনার জীবনে প্রতিফলিত দেখব, দেখে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করব—এই আশা ক'রেই আমরা এসেছি।

তার অর্থ—মহামানবের ভস্মে আপনার বিশ্বাস নাই। কিন্তু আমরা বিশ্বাসী। অত সব বাণী, ধর্ম, জীবন, নির্দেশ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না, সময় কম। আচ্ছা, আসুন তবে।—মাধবানন্দদ উঠিলেন।

দাঁড়াও। বজ্রকণ্ঠে মহামানব গতিরোধ করিলেন। ছদ্মবেশ খুলিয়াফেলিলেন।

চিনতে পার?

বিবর্ণ মৃতপ্রায় পতনোন্মুখ মাধবানন্দকে ভাবানন্দ ধরিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্তমাত্র। মহামানব পুনরায় ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। অসীম ঘৃণাভরে কহিলেন, শোন মূঢ়, ভেবেছিলাম এই মিথ্যার তাসের ঘর ভেঙে দিয়ে আবার নূতন ক'রে সত্যের প্রতিষ্ঠা করব। সে ভুল আমার ভেঙেছে। সত্যের মৃত্যু হয়েছে। আমার মৃত্যুই তবে সত্য হোক।

ভাবানন্দের হাত ধরিয়া মহামানব দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আশ্বিন ১৩৫৫

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি

নারায়ণ দাশশর্মা

১। প্রথম পাতা ঃ স্ট্যাটিসটিক্স

ইংরেজীতে যে বলে থাকে, মিথ্যা তিনরকম—মিথ্যে, ডাহামিথ্যে আর স্ট্যাটিসটিক্স; আমরা, স্বভাবতঃ মিষ্টভাষী বাঙালীরা, তেমন করে বললে পরিসংখ্যানবিজ্ঞানের ওপর বড়ই অন্যায় করা হবে। ওই ইংরেজী প্রবচনটির বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত এই ঃ সত্য তিনরকম—সত্যি, বউয়ের কাছে তিন সত্যি, আর পরিসংখ্যান।

সেই গল্পটা আপনারা সবাই শুনেছেন। সেই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার জাঁদরেল প্রধানমন্ত্রী স্মাট্‌স যখন কালা আদমীর চাইতে সায়েবরা ক্রমবিবর্তনের ধাপে দু-সিঁড়ি উঁচুতে রয়েছে এই তথ্যটা পার্লামেন্টে প্রমাণ করার জন্যে জুতসই স্ট্যাটিসটিক্স চেয়ে পাঠালেন পরিসংখ্যানের সেরা পণ্ডিতের কাছে; আর তিনদিন তিনরাত একনাগাড়ে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ঘেঁটে শেষ করেও সেই পণ্ডিত মশাই পরিসংখ্যান কায়দা করতে পারলেন না; তখন স্মাট্‌স সায়েব যা করেছিলেন—সেই গল্পটা? ঝুড়ি ঝুড়ি সংখ্যার ফুলঝুরি ফুটিয়ে পার্লামেন্টকে হতবাক করে তারপর বুড়বাক হয়ে যাওয়া পণ্ডিতের বিস্ময়কে আশ্বস্ত করেছিলেন উনি এই কথা বলে, "আরে মশায়, আপনিই যে পরিসংখ্যান কায়দা করতে পারলেন না তিনদিন বসে, পার্লামেন্টের সাধ্য কি তিনঘন্টার মধ্যে সেইসব বানিয়ে বলা সংখ্যার ভুল ধরবে?"

এ গল্পটা, আমার বিশ্বাস, একেবারেই বানানো গল্প। কিন্তু পরিসংখ্যান নিয়ে যত কথা শুনেছেন তার সবগুলো বানানো নয় তাই বলে।

যেমন ধরুন, যে ভদ্রলোক ভাঁটার সময় খিদিরপুরের ছোটগঙ্গা হেঁটে পেরোতে গিয়ে সে-বছর ডুবে মারা গিয়েছিলেন তিনি যে সেচ-বিভাগের পরিসংখ্যান থেকেই জেনেছিলেন, ভাঁটার সময় টালির নালার গড়পড়তা গভীরতা মাত্র দু ফুট দেড় ইঞ্চি—এটা তো আর বানানো কথা নয়। চার ফুট আর শূন্য ফুটের গড় যে মাত্র দু ফুট, এই সোজা কথাটা না বোঝাতেই এই বিপত্তি। গড়ের গড়খাইতে নিমজ্জন।

গড়ের মজায় শুধু ইনি নন, অনেকেই মজেছেন আরও। বিলেতের 'পাঞ্চ' পত্রিকা একবার গড়ের পায়ে গড় করে লিখেছিল, "সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারলুম, এদেশের প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোকের গড়পড়তা ২·২-টি করে সন্তান আছে; আমরা বলি কি, ওই দশমিক ভগ্নাংশ বাচ্চা নিয়ে মেয়েদের নিশ্চয়ই ভারী অসুবিধে হচ্ছে, সরকার থেকে সাহায্য-টাহায্য দিয়ে আরও আট দশমিক সন্তান প্রসব করার জন্যে ওদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে করে প্রতিটি মায়ের ছেলেপুলের সংখ্যা ভাঙাচোরা না থেকে গোটা-গোটা হতে পারে।" এমন একটা সঙ্গত প্রস্তাবে কেন যে ব্রিটিশ সরকার কান দেন নি আমি তো কিছুতেই ভেবে পাই না।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমি সেদিন এক লরি ড্রাইভারের সাফাই শুনেছিলাম। বেচারী নাকি কাকে চাপা দিয়ে ভবযন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। পুলিস বলে, লরিটা ঘন্টায় আশি মাইল বেগে ছুটছিল সে-সময়; কিন্তু পরিসংখ্যান দেখিয়ে ড্রাইভার প্রমাণ করে দিলে মশাই, যে তার গাড়ির স্পীড গড়পড়তা ঘন্টায় পাঁচ মাইলেরও কম ছিল। কেন না, চাপা দেবার আগেকার চব্বিশ ঘন্টায় লরিটা মোট একশো আট মাইল রাস্তা চলেছে, অর্থাৎ একশো আট ডিভাইডেড বাই চব্বিশ ইকোয়েল্‌স্‌ টু চার পয়েন্ট পাঁচ মাইল্‌স্‌ পার আওয়ার; গড় হিসাবে একরকম গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল গাড়িটা। তবু যদি কেউ তার নীচে চাপা পড়ে

মারা যায় তবে ড্রাইভারের দোষ কী?

আমি তো সত্যি বলতে কি কোন দোষ দেখতে পেলাম না ওর। একটা লোক মারা গিয়েছে তা না হয় মেনেই নেওয়া গেল, কিন্তু লোকটা ওই লরির নীচে চাপা না পড়লেও তো মরতে পারত। ভেবে দেখতে গেলে, লোকটার মারা যাবার সময় তো আসলে ঢের আগেই হয়ে গিয়েছে; বাঙালীর গড় আয়ু একুশ বছর পার হবার পরও সে যে বেঁচেছিল তা থেকেই বোঝা যায় পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ওপর লোকটার একদম শ্রদ্ধা নেই; গড় সম্বন্ধে একদম আইডিয়া নেই ওর; কাজেই, আইডিয়ার একান্ত অভাববশতঃই, গড়ে পাঁচ মাইল স্পীডে চলা একটা গাড়ির ধাক্কায় অক্কা পেয়ে সেই জ্ঞানহীন লোকটা অবশেষে প্রমাণ করে গেল—স্ট্যাটিসটিক্সকে হেলাফেলা করা কতখানি বিপজ্জনক।

২। দ্বিতীয় পাতা ঃ পলিটিক্স

ইংরেজদের আর একটি কহাবৎ হচ্ছে, দেয়ার ইজ নাথিং আন্‌ফেয়ার ইন্ লভ অ্যাণ্ড ওয়ার—প্রেমে ও রণে অন্যায় বলে কিছু নেই। আমবা, বাঙালীরা, ও দুটো ব্যাপারেই একরকম অভিজ্ঞ—সিনেমার প্রেম এবং ডকুমেন্টারীর যুদ্ধ পর্যন্তই আমাদের অধিকাংশের দৌড়; দুচারজনের কপালেই শুধু উড়ো আপদের মতন প্রেমের কটাক্ষ ও যুদ্ধের বোমা এক-আধটা স্প্লিন্টারের খোঁচা দিয়ে থাকবে। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে আমরা ইংরেজদের চাইতে সকলেই বেশী সুদক্ষ—তা হচ্ছে পলিটিক্স। আমরা তাই ইংরেজী ওই কহাবৎটি একটু বদলে নিয়েছি, দেয়ার ইজ নাথিং ফেয়ার ইন পলিটিক্স—রাজনীতিতে ন্যায় বলে কিচ্ছু নেই। সবই অন্যায়।

ইংরেজদের রাজনীতি তেমন একটা আসে না, এর কারণ বোধ করি ওদের রাজা আছে। অর্থ থাকতে যেমন অর্থনীতির মারপ্যাঁচ ভাল খেলতে চায় না মাথায়, রাজা থাকলেও তেমনি রাজনীতিতে উৎসাহ জাগতে চায় না প্রজাদের। অর্থনীতির প্রেরণা দেয় ফাঁকা পকেট, রাজনীতির প্রেরণা নৈরাজ্য। আমরা সবাই রাজনতিবিদ্ আমাদের এই প্রজার রাজত্বে।

আর পলিটিক্স মানেই পার্টি-পলিটিক্স; দলের মাদল না বাজাতে পারলে রাজনীতির মহুয়ায় আমরা তেমন সোয়াদ পাই না। আমরা তিন কোটি বাঙালী শেষ পর্যন্ত তিন কোটি দল বানাব হয়তো, কিন্তু দলছাড়া হয়ে পার্টির সাইনবোর্ড কপালে না টাঙিয়ে পলিটিক্স করতে পারব না। যত মত তত পথ নয়, আমাদের মটো হচ্ছে যত মাথা তত মত। না, তাই বা কেন, মাথার চাইতেও মতের সংখ্যা হবে বেশী; যত লোকের মুখ থেকে রাজনীতির মত বেরোয় হামেশা, বাংলাদেশে তত লোকের সকলের কি মাথা আছে সত্যিই?

এবং এরাই বলে থাকে, মাথা থাকলেই মাথা ঠোকাঠুকি হয়। তা হয়তো হয়—যেমন ভেড়ার মাথার সঙ্গে ভেড়ার মাথায়; কিন্তু মাথা না থেকে তার মধ্যে যদি মগজ বলে একটুখানি নরম বস্তুও থাকে তবে মাথা থাকলেই ঠোকাঠুকি কেন হবে, আমি বুঝতে পারি না।

প্রত্যেকটি বাঙালীই রাজনীতিতে এক্সপার্ট হলে এরই মধ্যে আবার নানান রকম ইতরবিশেষ আছে; অর্থাৎ রাজনীতিবিদ্‌দের প্রত্যেকের ইতরতা একপ্রকার নয়, তাতে কারও কারও বিশেষ অধিকার আছে। চায়ের দোকানে, সিনেমা-ঘরের কিউতে, ট্রামে এবং রকে যাঁরা পলিটিক্স করেন, অন্যত্র নয়—তাঁরা হচ্ছেন সৌখীন পলিটিশিয়ান; পলিটিক্স এঁদের পেশা নয়, কেন না ভাল হোক, মন্দ হোক, অন্য একটা পেশা আছে এঁদের ঃ কারও পেশা কলম পেষা, কারও বিড়ি পাকানো, কারও বা শুধু বেকারী। যাঁদের এসব কিচ্ছু নেই, তাঁরা হন পেশাদার পলিটিশিয়ান। আমাদের ছেলেবেলায় যাঁর অন্য কিছু করার কায়দা না পেয়ে

হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করতেন, আমাদের ছেলেদের আমলে এখন সেই গুড-ফর-নাথিং-এর দল পলিটিক্সের পেশাদার হন। সে যুগে নামের সঙ্গে ওঁরা জুড়তেন এইচ্-এম্-বি ; এ যুগে এঁরা জোড়েন এইচ্-এম্-ভি—হিজ মাস্টার্স ভয়েস।

জানি, বন্ধুরা আমাকে সিনিক বলবেন ; আর শত্রুরা আন্দাজ করবেন, নিশ্চয় আমি গত ইলেকশনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু ছিটগ্রস্তই বলুন আর ইলেকশনে মার খাওয়াই বলুন, পলিটিক্স এবং পলিটিশিয়ান সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি বদলাতে পারব না।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন, পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে নয়। সেই উপদেশ ভেঙেচুরেই আমরা অনেক ইষ্টমন্ত্র বানিয়েছি ঃ ঘুষকে হজম কর কিন্তু ঘুষিকে নয়। সে পর্যন্ত যদি বা আমি সহ্য করতে প্রস্তুত, তবু এ কথা আমি শুনব না যে পলিটিশিয়ানকে বর্জন করেও আমাদের পক্ষে পলিটিক্সকে বর্জন না করা সম্ভব। প্রথমটিকে যদি আমি 'স্থানত্যাগেন' মন্ত্রে পূজা করি, তবে শেষেরটিকেও অন্ততঃ 'হস্তসহস্রেণ' মন্ত্রজপে এড়িয়ে চলব।

কেন না, সংবিধানের খসড়াপ্রণেতা স্বর্গত ভীমরাও আম্বেদকার তাঁর তপশীলী দলের জন্য যে নির্বাচনী প্রতীক বাছাই করেছিলেন, তা আসলে—বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি—আমাদের দেশের পলিটিক্সেরই যথার্থ প্রতীক। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, বিবেকহীন চল্লিশ কোটির পশুশালায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ছায়ানুসারী যে রাজনীতি—তা একটি বিরাটকায় শ্বেতহস্তী ছাড়া আর কী?

৩। একটি কুঁড়ি ঃ ফিলসফি

আত্মার তত্ত্ব বোঝাবার জন্য নচিকেতাকে যমালয় পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছিল ; আমার জ্ঞানস্পৃহা এবং দুঃসাহস দুই-ই নচিকেতার চাইতে অনেক কম—আমি যমের বাড়ি না গিয়ে যমুনার বাড়িতে গিয়েছিলাম পরশু সন্ধ্যেবেলায়।

যমের বোন যমুনা নয়, এ যমুনা আমার স্ত্রীর বোন—শালী। শালী বলেই তাচ্ছিল্য করবেন না যমুনাকে ; সে ফিলসফিতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট, কলেজের অধ্যাপিকা।

ঝাড়া আড়াই ঘন্টা ইংরেজী-বাংলা-সংস্কৃত-পালি নানান ভাষায় কত না শাস্ত্র থেকে কোটেশন শুনিয়ে শুনিয়ে নানারকম আত্মার ব্যাখ্যা বোঝাল সে। কিন্তু আমার মাথায় যদি একটুও ঢুকত সে সব!

শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিলসফিতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট যমুনা একেবারে অদার্শনিক শালীজনোচিত কপট কোপ দেখিয়ে বলল, "আত্মা কি আপনার বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের 'ঈ', যে নিটোল একটি ডেফিনেশন বানিয়ে দেব তার? আত্মা অনুভব করার বস্তু, দর্শনের তত্ত্ব; ওটা গণিতের ফর্মুলা নয় মশাই। যান, বাড়ি গিয়ে ঘুমোন। রাত সাড়ে দশটা বাজল।"

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন যমুনাকে 'আত্মা'-র গাণিতিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিচ্ছি ; জলের মত সোজা—ক্লাস সেভেনের মেয়েকে বোঝানো যায়, এত সোজা।

স্বপ্নে পাওয়া সেই ডেফিনেশন যমুনাকে অবশ্য শোনাই নি আমি ; যমুনার দিদিকে না। কিন্তু আপনাদের শোনাতে ক্ষতি কী? আপনারা তো আমার স্ত্রী কিংবা শালী নন। শুনুন তবে ঃ

মৌল স্বতঃসিদ্ধ— Brevity is the soul of wit (অর্থাৎ উইটের আত্মা হচ্ছে সংক্ষেপ।)

অর্থাৎ, $B=S$ of W

অথবা, $S=B$ of $^{1}/_{W}$

মানে, Soul is the brevity of wit reversed.

অর্থাৎ উইটের ঠিক উলটো ব্যাপারটিকে সংক্ষিপ্ত করলে যা দাঁড়ায় দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় তাকেই বলে আত্মা।

উইটের সেই উলটো ব্যাপারটি কী, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। হামেশাই দেখতে পাই তাদের, সেই হাফ উইট ব্যর্থ বিদূষকদের, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু সোজাসুজি সাদা কথায় আমি বলতে চাই নে বুদ্ধির সেই বিপরীত কথাটি কী, যা সংক্ষিপ্ত করলে গাণিতিক ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় আত্মার সংজ্ঞার্থ। বলতে চাই নে, পাছে আপনার আত্মা দুঃখ পায়!

ভাদ্র ১৩৬৭

আন্দামান

অ. কু. রা

বিপ্লবী যুগ। অগ্নি-রাঙা দিন।

দেশকে স্বাধীন করিব। অগ্নি-হোত্রী গুরুর নিকট বুকের রক্তের অক্ষরে শপথ লইয়াছি, দেশকে মুক্ত না করিয়া সংসারাশ্রমে ফিরিব না।

'আনন্দমঠে'র সন্তানের কৃচ্ছ্রতা, উদাত্ত আহ্বানে বিবেকানন্দের ডাকের রোমাঞ্চ, ম্যাটসিনি-গ্যারিবলডীর প্রেরণা, সব কিছু জড়াইয়া মিশাইয়া সে দিনের সে এক বিচিত্র আমি!

ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম মুক্তি-আন্দোলনের সাগ্নিক কল-কল্লোলে।

আমাদের দেশ। বন্দেমাতরমের গানের কলি মনে পড়িত। সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং। হাটে ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতাম, গানের ছবির সহিত বাস্তব। যতটুকু মিল পাইয়াছি, তাহাতেই প্রাণ জুড়াইয়াছে। শৈশব কৈশোর কাটিয়াছে শ্যামলা পূর্ব-বাংলার বিস্তীর্ণ নদীকূলবর্তী গ্রাম্য শহরে। টিমটিমে কেরোসিন ল্যাম্পের আলো, খোয়া-ওঠা রাস্তা, ফুটবল টিমের মাতন, বারোয়ারী পূজার শখের থিয়েটারের দ্বন্দ্বকলহ, নতুন-ওঠা কোঠাবাড়ির মাঝে কচুরি আর শালুক ফুলের জাজিম-বিছানো স্বপ্নময় প্রান্তর, পিছনে বলেক-ছোটা ছ্যাকরা-গাড়ি, পথের পাশের কেরোসিন-কাঠের নড়বড়ে গাড়ির দোকান, মাইক্রো-ফিলমের ছবির মত আচ্ছন্ন করিয়া আছে আমার স্মৃতির অণুকোষ। শোক-আকাল-দৈন্যের চাপে নুইয়া-পড়া শান্ত নিরীহ লোকগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িত। আমার দেশবাসী। এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা।

মনে মনে তীব্র বেদনা অনুভব করি। করি মহতের আকূতি। এই দেশ, এই মানুষ, এই মাটিতে রহিয়াছে ইন্দ্রলোকের সুপ্ত ঐশ্বর্য! পরশকাঠি ছোঁয়াইয়া কে ভেদ করিবে এই মলিনতা, দারিদ্র্য-অজ্ঞতার চক্রজাল? কে খুলিয়া দিবে এই বদ্ধ-ঘোলা-জলে-আটকাইয়া-পড়া স্রোতের রুদ্ধ প্রবাহ? কে? কোথায় সে অতি-পুরুষ?

আমি। আমি। আমার মধ্যে রহিয়াছে সেই মহতী মিশনের দায়িত্ব।

সহকর্মীদের সহিত নূতন প্রেরণায় নূতন উদ্যমে কাজ করিতে থাকি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের যজ্ঞে।

হে লাঞ্ছিতা জননী! মা যাহা হইবেন—সত্যানন্দের সেই ধ্যানমূর্তি আমরা ভুলিব না।

কোনদিন তাহা ভুলি নাই। গভর্নরের উপর যেদিন বোমা ফেলিয়াছিলাম, সেদিনও না। সেদিনও চোখের সামনে ছিল তোমার সেই ধ্যানমূর্তি।

ধরা পড়িয়াছিলাম অকুস্থলেই। নির্ভীক দৃঢ়তায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম সকল নির্যাতনও।

আমার দেশ। আমার দেশের মানুষ। তোমাদের ভালবাসিয়াছি। তোমাদের কল্যাণ-কামনার মহতী প্রেরণায় সব কিছু নির্যাতন পীড়ন হাসিমুখে অতিক্রম করিব।

বিচারের প্রহসনও অতিক্রম করিয়াছিলাম এমনি ভাবেই। জেল ফাঁসি দ্বীপান্তর হইবে, তাহা তো আমরা অগ্নিমন্ত্রে শপথ লইবার সময়ই জানিতাম। তবু ধৈর্য ধরিয়া শুনিয়া যাইতাম বিচার-প্রহসনের পালা। বিবিধ আইনের ধারা-উপধারা ভাষ্য-টীকার ধূম্রজালের অন্তরালে আমাদের আসল অপরাধটি নিপুণ চাতুর্যে নেপথ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। মারাত্মক ধারা-উপধারার নাগপাশকন্টকিত অভিযোগগুলি স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের পক্ককেশ বিচারকেরা পেচকের স্তব্ধ গাম্ভীর্যে দিনের পর দিন শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাহার পর একদা রায়ও দিলেন, যাহাতে আসামীদের কোনই আগ্রহ ছিল না।

দ্বীপান্তর! আন্দামান!

মনে পড়ে, জাহাজ বাহির-সমুদ্রে পড়িলে বঙ্গোপসাগরের দিগ্বলয়ের সবুজ তটরেখাকে প্রণতি জানাইয়াছিলাম। আন্দামান কেন, গোলার্ধের সুদূরতম প্রান্তে নির্বাসনে পাঠাইলেও ভুলিব না এই মাটি ও ইহার মানুষ। আন্দামানের পাষাণ-কারা হিমশীতল করিতে পারিবে না এই উত্তাপ।

২

কালচক্র আবর্তিত হইতেছে।

আন্দামানের দিগন্তে কত সূর্য উঠিল, কত সূর্য অস্ত গেল, তাহার হিসাব হারাইতে বসিয়াছিলাম।

একটির পর একটি দিনের মালা গাঁথিয়া চৌদ্দটি বছর ঘুরিয়া গেল।

সহসা একদিন দেখিলাম, কারামুক্ত হইয়া গিয়াছি।

বাহিরের জগৎকে আবার নূতন করিয়া দেখিলাম। এই চৌদ্দ বছরে বাহির-পৃথিবীতে কি যে তোলপাড় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার কত খবরই রাখিতে পারি নাই। বদলাইয়া গিয়াছে যেন সমস্ত কিছু—রাজনীতি, মানুষ, দেশ। শতাব্দীর সুপ্তি ভাঙিয়া মহাজননাগ অস্থির চাঞ্চল্যে ফুঁসিতেছে। দীর্ণ হইয়াছে বুঝি বিদেশী শাসনের ভিত্তি! মুক্তির দ্বারপ্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে দেশ!

আন্দামান বন্ধ্যা হয় নাই আমাদের জীবনে।

দেশপ্রেমীর নির্বাসনভূমি হে ক্ষুদ্র দ্বীপমালা, বেদনার্ত স্মৃতি মন হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া প্রসন্ন মনে আজ তোমার বক্ষ হইতে বিদায় লইতেছি।

সেদিনের সে ভাব ও আবেগরুদ্ধ এলোমেলো চিন্তাগুলি মনে পড়িয়া আজও হাসি পায়।...

দ্বীপান্তর হইতে দেশ। আবার সেই বাংলার মাটি। বাঙালীর স্নেহ। দেশ আমাদের ভোলে নাই। জাহাজ-ঘাটে নামিয়া ভারী ফুলের মালা ও জয়ধ্বনির মাঝে সাশ্রুনয়নে তাহা অনুভব করিলাম।

ঘটনাবলী যেন বিদ্যুতের পাখায় ভর করিয়া আবর্তিত হইতেছে। মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হইতেছে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যাবলী। কত নূতন কুশীলব, নূতন কোলাহল, নূতন কলহ জুটিযাছে ইহার বিষয়বস্তুতে। পুলকিত চিত্তে নির্বাক হইয়া ভাবিতে থাকি।

শেষ অঙ্কে একদিন সুপ্রভাতে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, প্রতি গৃহশীর্ষে ত্রিবর্ণরঞ্জিত চক্রলাঞ্ছিত পতাকা শোভা পাইতেছে। রাজপথে পথিকজন স্বাধীনতার সামগান গাহিতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়া গেল। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সত্য—কঠিন সত্য।

১৫ই আগস্ট।

দলের খ্যাতনামা কয়েকজন মন্ত্রীত্বের গদি পাইলেন। অখ্যাত, স্বল্পখ্যাত আমরা তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ব আলোকিত করিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ঘুরঘুর করিতে লাগিলাম।

৩

স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কঠিন সত্য ইহাও।

দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। আসিবার কারণ আছে, স্বীকার করি। কিন্তু এ কি? এত কেন? এত লোকের স্থান কোথায় এখানে? স্থান নাই, স্থান নাই ছোট এ ভূমি।

মন্ত্রীদের সহিত আমরাও বিচলিত হইয় উঠি।

তবু উহারা আসে। সাত পুরুষের ভিটার দিকে চাহিয়া চোখের জল ফেলিয়া, তিলে তিলে বুকের রক্তে জমানো আজীবন সঞ্চয়ের টাকায় তৈরি বাড়ি-ঘর রিকুইজিশনের লুণ্ঠনে

সদ্যরাজ্যলাভকারীদের হাতে তুলিয়া দিয়া আত্মসম্মান ও দুরন্ত আশা পুঁজি করিয়া নূতন সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসে।

৪

তাই আবার আন্দামানে চলিয়াছি।

যাহাদের ভালবাসিবার অপরাধে একদা আমাকে আন্দামানে পাঠানো হইয়াছিল, আজ তাহাদেরই বিপুল সংখ্যায় আন্দামানে পাঠাইবার সম্ভাবনা পরীক্ষা করিতে চলিয়াছি মন্ত্রীবরের সহিত। পূর্ব অভিজ্ঞতা গাইডরূপে তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

জাহাজ বাহির-সমুদ্রে পড়িলে আবার দূরের সবুজ তটরেখার দিকে দৃষ্টি পড়িল।

চৌদ্দ বৎসর পূর্বেকার কথা মনে পড়িতে লাগিল। আবার কেন আন্দামানে যাইতেছি?

বিদেশীরা আমাকে আন্দামানে পাঠাইয়াছিল, কারণ ইংরেজের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইংরেজের আইনে সেটা ছিল অপরাধ।

কিন্তু আজ যাহাদের আন্দামানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে চলিয়াছি, তাহাদের অপরাধটা কি? কেন তাহারা আন্দামানে যাইবে? দেশে বসিয়া কেন তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইল না?

এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা ক্রমাগত থাকিয়া থাকিয়া মনের মাঝে পাক খাইতে লাগিল।

অকস্মাৎ ডেকের অন্য প্রান্তে কোলাহল শুনিয়া চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সেখানে অনেকগুলি লস্কর জড়ো হইয়া হাসির উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিয়াছে।

কৌতূহল হইল, উহাদের এই সহাস্য জটলার কারণ জানিতে সেদিকে আগাইয়া গেলাম।

একটি ছোকরা-গোছের লস্কর তাহার সম্মুখের স্বল্পশ্মশ্রু সঙ্গীকে রহস্যভরে বলিতেছে, তোর কপাল ভাল রে পিরজাদা। দিয়াছিলি এক জোড়া, পাইলি তিন জোড়া।

সঙ্গীরা সশব্দে হাসিতে লাগিল।

ব্যাপার এই।

পিরজাদা তিন মাস আগে কলিকাতা হইতে এক জোড়া গিনিপিগ কিনিয়াছিল। গিনিপিগ-দম্পতিকে সে সহকর্মী রহমনের হেফাজতে রাখিয়া বাড়িতে ছুটি ভোগ করিতে যায়। ছুটি ভোগের পর কাজে যোগ দিয়া সে রহমানের কাছে আজ গিনিপিগগুলির খোঁজ লইতে যায়। যাইয়া দেখিয়া অবাক! ছিল এক জোড়া, এখন হইয়াছে তিন জোড়া!

রহমান, পিরজাদা ও তাহার সঙ্গীদের সশব্দ হাসির কারণ ইহাই।

৫

অকস্মাৎ, আমার প্রশ্নটির একটা সুসমাধান মিলিয়া গেল।

বুঝিতে পারিলাম, কেন উদ্বাস্তুদের আন্দামানে যাইতে হইতেছে?

ইহাদের অপরাধ, ইহারা গিনিপিগ-ধর্মী হইতে পারে না।

গিনিপিগ-ধর্মী হইয়া ইহারা যদি সংখ্যাবৃদ্ধির সম্প্রদায়গত ম্যারাথন রেসে প্রথম পুরস্কারটি লটকাইতে পারিত, তাহা হইলে আজ কে ইহাদের আন্দামানে পাঠাইত? ত্যাগ, নির্যাতন, কারাবরণ, জালালাবাদ, বুড়ীবালাম, বলেশ্বরের ঐতিহ্য সৃষ্টি না করিয়া ইহাদের আত্মজন যদি সে সময় শুধু গিনিপিগ-ধর্মপালনে মন দিত, তাহা হইলে হয়তো ইহারা আজ নব্য লঙ্কাভাগের ন্যায়নীতিতে দেশে বসিয়াই স্বাধীনতার ফলভোগ করিতে পারিত। যাইতে হইত না আন্দামানে।

যে ভুল করিয়াছে, তাহাতে আন্দামানই উহাদের প্রশস্ত স্থান।

বৈশাখ ১৩৫৬

দলন-মঞ্চ

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

পশ্চিম-বঙ্গ-বিড়ি-ফ্যাক্টরি একটা নামজাদা বিড়ির দোকান। দশ-বারোজন বিড়ি-শ্রমিক সকাল সাতটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত যেখানে অবিশ্রাম কাজ করে, তার নাম ফ্যাক্টরি শুনিয়া কেহ নাক সিটকাইলে মালিক শ্যামকিশোর গ্রাহ্য করে না। বলে, আলবৎ ফ্যাক্টরি।

মালিক শ্যামকিশোর দাপটের লোক। কিন্তু নবকান্তকে বেশ সমীহ করে। কারণ, নবকান্ত মাইনর-পাস। মনিব হইলেও শ্যামকিশোর মোটে উচ্চ-প্রাইমারি। তা ছাড়া বিড়ির কাজে নবকান্তের পাকা হাত। সকলে ওস্তাদ বলিয়া মানে, ভক্তি করে।

বেশি টাকার দরকার যেদিন, নবকান্তর হাত সেদিন কলের চেয়েও দ্রুত চলে। দুই হাজার বিড়ি শেষ করিয়া দিয়া টাকা চাহিয়া বসে ছয়টা।

চার টাকার তো কাজ হয়েছে!—শ্যামকিশোর আপত্তি করে।

দু টাকা বেশি লাগবে। একটু দরকার আছে।—নবকান্ত গম্ভীর হইয়া উঠে। কালকেই শোধ ক'রে দোব।—আশ্বাস দিয়া বলে।

শ্যামকিশোর টাকা দিয়া দেয়।

দেখাদেখি আরও দুই-একজন বাড়তি টাকা চায়। শ্যামকিশোর দেয় না; ঝামটা দিয়া উঠে। কোন কোন দিন মেজাজ ভাল থাকে। সকলকেই খুশি করে।

মাঝে মাঝে নবকান্তর উপরও বাঁকিয়া বসে।—টাকা নেই। পারব না।

সেদিন সন্ধ্যার আগেই নবকান্ত কাজ বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, গোটা চারেক টাকা লাগবে।

একটাও পারব না।—শ্যামকিশোর সংক্ষেপে জবাব দিল।—বিক্রি নেই, টাকা কোথায় পাব?

আমার যে না হ'লেই চলবে না।

টাকা নেই।

খুব দরকার যে। বেশ, দু টাকাই দিন।—নবকান্ত রফা করিল।

একদম নেই, দেখি যদি আমদানি হয়।—শ্যামকিশোর পাকা ব্যবসায়ীর জবাব দিল।

এখুনি যেতে হবে আমাকে।

কেন? টকি দেখতে?—তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্যামকিশোর প্রশ্ন করিল।

না। কাজ আছে।

কি করব! টাকা থাকলে তো দিতামই।

নবকান্ত ক্রমে অধীর এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বড় ঠেকা। মেজাজ দেখাইলে চলিবে না। বলিল, বেশ, এক টাকাই দিন। দু টাকার কাজ হয়েছে আমার।

ঐ তো তোমার দোষ!—শ্যামকিশোর চটিয়া উঠিল।—হাজার বার বলছি, টাকা নেই। তবু বলবে—টাকা দিন, টাকা দিন। বিক্রি নেই, বাটা নেই, টাকা কোথা থেকে দোব?

নবকান্ত রাগে গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বাড়িতে নবকান্তর স্ত্রী তখন ভাল শাড়িখানা পরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নবকান্ত শুষ্কমুখে আসিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, টাকা দিলে না আজ।

আশারাণীর মুখের হাসি ফুৎকারে নিবিয়া গেল।—ওমা! তা হ'লে কি হবে?

এক কাজ কর।—নবকান্ত বুদ্ধি দিল।—আট আনা পয়সা সেদিন তুমি সরিয়ে রেখেছিলে, সেটা রয়েছে তো? আমার কাছে আট আনা আছে। টিকিটের পয়সা হয়ে যাবে।

আশারাণীরও বুদ্ধি কম নাই। তৎক্ষণাৎ ঝাঁঝিয়া উঠিল, ওই আট আনার হিসেব আর এ বছরে শেষ হবে না। নেই আমার কাছে।

তবে থাক।—নবকান্ত রাগ করিয়া বলিল, এ দিকে শখ তো ষোল আনা!

শখে আমার কাজ নেই।—আশারাণী দুমদুম করিয়া ঘরে গেল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিল, শখ থাকলেই তো আর হয় না। সোয়ামীর মুরোদ দেখতে হবে তো!

নবকান্ত ফাটিয়া পড়িবার পূর্বেই বাহিরে কে ডাকিল। শুধু একটা নিশ্বাসের সঙ্গে বেগটা ফাটিয়া গেল। বাহিরে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া ছিল একজন ছোকরা-বয়সী লোক, চেনা মুখ।

ভাল আছেন?—গণেশ সদালাপ আরম্ভ করিল।

নবকান্ত খানিকটা কাষ্ঠহাসি বাহির করিল।—আছি এক রকম।

বেশ।—গণেশ যেন বিশ্বাস করিল না।—কিন্তু কই, আপনারা কিছু ঠিক করলেন?

কিসের?

বাঃ! আপনাদের ইউনিয়ন একটা ক'রে ফেলুন।

ইউনিয়ন? ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইউনিয়ন করব আমরা।—নবকান্ত তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল।

গণেশ যেন লাফাইয়া উঠিল।—তা হ'লে চলুন।

কোথায়?

সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে ঠিকঠাক করতে হয়।

কিন্তু আজ না। আজ থাক। নবকান্ত বড় অবসন্ন বোধ করিল।—কালকে আমি সকলের সঙ্গে আলাপ ক'রে রাখব। সন্ধ্যেবেলা আপনি আসবেন। সেই ভাল হবে।

পরের দিন দুপুরবেলায় শ্যামকিশোরের অনুপস্থিতির সুযোগে ছোকরা-বয়সী আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবেন ঘোষ।

নবকান্ত বলিল, হ্যাঁ। আমাদের ঠিক হয়ে গেছে। করব ইউনিয়ন। গণেশবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা আসবেন তিনি।

শিবেন ঘোষ আঁতকাইয়া উঠিল।—গণেশ? গণেশ কেন? না না না না। সবাই আমাদের ইউনিয়নে যোগ দেবে। শুধু আপনারাই আলাদা একটা ইউনিয়ন করবেন নাকি? তাতে লাভ কি হবে? এই সব ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে ফাইট দিতে চাই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। শ্রমিকের প্রধান শক্তি হ'ল—একতা, এ কথা ভুলবেন না।

শিবেন এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া দম লইতে লাগিল। উত্তেজিত হইলেই শিবেনের বক্তৃতা করা অভ্যাস। আরও বলিত, কিন্তু একটু ফাঁক পাইয়া নবকান্ত কথা কয়টি গুঁজিয়া দিল, গণেশবাবু আর আপনারা কি আলাদা দল নাকি?

হ্যাঁ। বলছি কি! সম্পূর্ণ আলাদা।

কেন?

কেন!—শিবেন ঘোষ বাক্যের অভাবে হাতড়াইতে লাগিল। দেখুন, দেখি, কি রকম প্রশ্ন! আরে, ওদের হেড-অফিস হ'ল কলকাতায়। আর আমাদের হেড-অফিস মাদ্রাজ। ওদের লিডার হ'ল কে, আর আমাদের লিডার হ'ল কে!

কিন্তু নবকান্ত লেখাপড়া জানে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজ পড়ে। বলিল, কিন্তু আদর্শ? আদর্শ তো এক?

শিবেন ঘোষ শব্দটা যেন কাড়িয়া লইল। আদর্শ! ঠিক কথা। আদর্শই সম্পূর্ণ ভিন্ন

যে!

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো একই মনে হচ্ছে।—নবকান্ত তর্ক আরম্ভ করিল।—দু টাকা হাজার-দরে আর কাজ করব না আমরা। আড়াই টাকা চাই। রোজকার টাকা রোজ চাই। আরও নানা রকমের সুবিধে চাই। এই সবই তো?

এসব তো আছেই। এ ছাড়া আরও অনেক ব্যাপার আছে—আচ্ছা, আমি অন্য সময় আপনাকে সব বুঝিয়ে দোব। চার পয়সার বিড়ি দিন তো।—শিবেন ঘোষ হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া চার পয়সার বিড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

শ্যামকিশোর আসিয়া পড়িয়াছে।

ঘন্টাখানেক পরে শ্যামকিশোর আবার কি কাজে বাহির হইয়া গেলে নবকান্তরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিল। কি করা যায় তা হ'লে?—এই প্রশস্ত প্রশ্নটা ভিত্তি করিয়া আলোচনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

সন্ধ্যের সময় গণেশবাবু তো এসে পড়বে। তাকেই বা কি বলা যায়?—নবকান্ত সকলের মাথার উপর দিয়া দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইল।

রামু দত্ত বলিল, কাউকে কোন কথা দিয়ে কাজ নেই। কোন্ দল ভাল, আগে বুঝে নিই আমরা।

তাই ভাল।—সকলেই সায় দিল।

কিন্তু দেরিও করা যায় না আর। নবকান্ত অত সহজ সিদ্ধান্ত পছন্দ করিল না।—আমার মনে হয়, গণেশবাবুদের দলই জোরদার।

রামু বলিল, কিন্তু শিবেনবাবুর কথায় তো মনে হ'ল, আর সকলের সঙ্গে ওদের কথা হয়ে গেছে। আমরা তা হ'লে একা প'ড়ে যাব যে?

নবকান্ত উড়াইয়া দিল। বাজে কথা। ননী, রাধিকা, পটল সবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। শেষ কথা কারও সঙ্গেই হয় নি এখনও। টোকাচ্ছে, এইমাত্র।

কালু বলিয়া উঠিল এবার, টোকাক আরও কিছুদিন।

আবার সকলে সায় দিল। তাই ভাল, টোকাক আরও কিছুদিন।

নবকান্ত অধীর হইয়া উঠিল, তাতে লাভ নেই কিছু। ইউনিয়ন আমাদের করতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

রামুর মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল। বলিল, তা হ'লে আজ রাত্রেই আমাদের একটা মীটিং করতে হয়—সবাইকে ডেকে।

প্রস্তাবটা সকলেরই খুব মনঃপূত হইল। কিন্তু নবকান্তর মেজাজ হঠাৎ খারাপ হইয়া উঠিল। ভাল বুদ্ধির কথা বলার অধিকার নবকান্তের। রামুর সেখানে টকটক করিবার দরকার কি?

কিন্তু প্রস্তাবটা এতই যুক্তিসঙ্গত যে, সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বলিল, আজ না। কালকে রাত্রি এগারোটায়।

বলিয়াই নবকান্ত নিজের উপর খুশি হইয়া উঠিল। বুদ্ধি এখনও উপরে।

শ্যামকিশোর আসিয়া পড়ায় আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। চোখের ইশারায় প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু এসব কার্যে ধৈর্য চাই, অধ্যবসায় চাই। গণেশের ছিল। রাত্রিতে নবকান্তকে বাসায় ধরিয়া ফেলিল। বলিল, শহরের সমস্ত বিড়ি-শ্রমিকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সকলেই প্রস্তুত। কালকেই মীটিং ক'রে ইউনিয়ন গঠন করতে হবে। বিড়ি-শ্রমিক-ইউনিয়ন।

কিন্তু আমরা তো—

গণেশ কথা শেষ করিতে দিল না। আপনারা নিজেদের ভালও কি নিজেরা বুঝবেন না? তার জন্যেও খোশামোদ—

খোশামোদ করেন কেন আপনারা?—নবকান্ত ঘাড় বাঁকা করিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিল।

গণেশ অসহিষ্ণু হইয়া জবাব দিল, করি আপনাদের জন্যে। দু টাকার জায়গায় আড়াই টাকা রেট পেলে লাভ হ'ল কার?

নবকান্তকে একবার চটাইলে বাগ মানানো কঠিন। বলিল, কিন্তু গরজ তো আপনাদেরই বেশি দেখছি।

এতক্ষণে গণেশের জ্ঞান হইল। ভুল হইয়াছে। মারাত্মক ভুল হইয়াছে। তাড়াতাড়ি সংশোধনের চেষ্টায় মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া জ্ঞানগর্ভ ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, গরজ আমাদেরই, সত্যি কথা। কিন্তু আমরা গরজ না করলে আপনারা কিছুই করেন না ব'লেই তো। আপনারা লেখাপড়া জানেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাবুন দেখি, অশিক্ষিত কৃষক, অশিক্ষিত কুলি-মজুরদের কথা। আমরা তাদের পথ না দেখালে তারা কোনদিন কিছু করতে পারে? যুগে যুগে তারাই তো সাম্রাজ্যবাদের শোষণে, ধনিকের শোষণে নিপীড়িত হচ্ছে। সেই নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনগণকে আপনারা আমরা যদি পথ না দেখাই, আমরা যদি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ না করি, তবে তারা যে কোনদিনই নিজেদের শক্তি বুঝতে পারবে না।

নবকান্ত শব্দ-চাপে কাবু হইয়া গেল। মূঢ়ের মত কহিল, ঠিক।

কিছুক্ষণ ভাব-ঘোরে কাটিবার পর গণেশ বলিল, তা হ'লে এই কথাই রইল।

নবকান্ত সচেতন হইল।—কোন্ কথা?

গণেশ ঢোক গিলিয়া আত্মসংবরণ করিল।—ইউনিয়নের কথা বলছি।

কিন্তু শিবেনবাবু এসে ফ্যাসাদ ক'রে গেলেন যে!

শিবেনবাবু? কি বলেছেন তিনি?

তিনি বলেছেন ওঁদের সঙ্গে ইউনিয়ন করতে।

গণেশ গর্জিয়া উঠিল, না। বিড়ি-শ্রমিক-ইউনিয়ন আমাদের।

নবকান্ত মধ্যস্থের মত বলিল, এক কাজ করুন। আপনারা শিবেনবাবুদের সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলুন।

আপনি যা বলেছেন অতি ভাল কথা।—গণেশ পরম ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বলিল, কিন্তু আপনিই বুঝে দেখুন। ওরা যখন মিউনিসিপ্যাল-কর্মী-ইউনিয়ন করে, আমরা কথাটি বলি নি। ইচ্ছে করলে আমরা ভাঙচি দিতে পারতাম না? আমরা দিই নি। করছে করুক। এখন ওদের এ ভাবে বাগড়া দেওয়া কি ভাল হচ্ছে?

নবকান্ত বুঝিল, বিষয়টায় গুরুত্ব যেমন আছে, আমোদও আছে। বলিল, সে এখন ওদের সঙ্গে বুঝুন।

গণেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, কোন দরকার নেই। ইউনিয়ন হ'ল আপনাদের। আপনারা যা স্থির করবেন তাই চূড়ান্ত।

নবকান্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, এটা ভাল প্রস্তাব। তাই করব আমরা।

বেশ।—গণেশকে বলিতে হইল।—কিন্তু মনে রাখবেন, ওদের কোন আদর্শই নেই। কোন কর্মপন্থা নেই। অযথা হৈ-চৈ করা হ'ল একমাত্র প্রোগ্রাম।

গণেশ চলিয়া গেল।

পরের দিন রাত্রি এগারোটায় বিড়ি-শ্রমিকদের ঘরোয়া মীটিং বসিল। অনেক বাদানুবাদ, অনেক পরামর্শ, অনেক হিসাবনিকাশ হইল, কিন্তু মীমাংসা হইতেছে না।

পটল ঠাট্টা করিয়া বলিল, আমাদের ওই কলকাতার হেড-অফিসের দলই ভাল। যাই হোক, বাঙালী-কোম্পানি তো বটে!

নবকান্ত খবর রাখে। সে বলিল, কিন্তু ব্রাঞ্চ অফিস আছে সব জায়গায়। গণেশবাবু বলছিলেন। যাই হোক, পটলের প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। শিবেনবাবুদের সঙ্গে আমাদের বনবে না। বড় ফরফর করে। তা হ'লে গণেশবাবুকে কাল খবর দিয়ে দিই। হাঙ্গামা যা

করবার ওরাই সব করবে।

উপস্থিত হাঙ্গামা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সকলেই সম্মতি দিল।

পরের দিনই বিড়ি-শ্রমিক-ইউনিয়ন গঠিত হইল। গণেশ হইল সেক্রেটারি, নবকান্ত অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি, আর গণেশদের দলের বিশ্বনাথ বাগচী হইল প্রেসিডেন্ট।

সদস্যদের চাঁদার প্রসঙ্গে আসিয়া গোলমাল বাধিল।

চাঁদা? চাঁদার কথা তো আগে বলা হয় নি?—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে একজন বলিয়া উঠিল।

গণেশ বুঝাইয়া দিল, ইউনিয়নের অনেক খরচ আছে। অফিসের ঘর-ভাড়া, কাগজপত্র, ফাইল, ছাপার খরচ, আরও অনেক রকমের খরচ আছে। তা ছাড়া কারও অসুখবিসুখ হ'লে তাকেও দেখতে হবে তো?

শেষের কথাটায় মন্ত্রের মত কাজ হইল। সর্বসম্মতিক্রমে চাঁদার প্রস্তাবও পাস হইয়া গেল।

তা হ'লে রেট আমাদের আড়াই টাকা হবে তো?—রামু জিজ্ঞাসা করিল।

নিশ্চয়।—গণেশ মাদুরে কিল মারিয়া কহিল, আড়াই টাকা দিতে বাধ্য। অমনই কি আর দেবে? দিতে বাধ্য হবে।

পরের দিন শ্যামকিশোর দোকানে আসিয়া হাতবাক্সটা সম্মুখে লইয়া গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ভাবান্তরটা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া যখন বোধ হইল, তখন মুখ খুলিল।—আরে, শ্যামু দাস খবর রাখে। এইখানে ব'সে ব'সে সব খবরই রাখে শ্যামু দাস। তাই যদি না পারতাম, তবে আর এত বড় কারবার চালাতে পারতাম না।

প্রতিক্রিয়া কি রকম হইতেছে, লক্ষ্য করিবার জন্য শ্যামকিশোর থামিল। রাস্তার দিকে তাকাইয়া আবার বলিল, ইউনিয়ন করা হয়েছে! হুঁ! ইউনিয়ন! মরবার বুদ্ধি কাকে বলে?

কেহ কোন জবাব দিল না। কিন্তু শ্যামকিশোরের উপর সকলের শ্রদ্ধা বাড়িল।—ঠিক খবর নিয়েছে। একেবারে ঘুঘু।

কিন্তু দিন কয়েক পরেই ঘুঘু ব্যবসায়ী শ্যামকিশোরেরও টনক নড়িল। নোটিস আসিয়াছে। বিড়ি-শ্রমিকের নানাবিধ দাবির নোটিস। প্রথম দফায় বিড়ির মজুরি আড়াই টাকা চাই।

কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ শ্যামকিশোর ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। বলিল, দোব না। যা পার করগে। ঘর থেকে টাকা দিয়ে ব্যবসা করব নাকি? কি আমার সুখ রে!

নবকান্তরা সকলে নিঃশব্দে বিড়ি বানাইতে লাগিল। বাদানুবাদ নিষেধ আছে। তা ছাড়া নবকান্ত আজ চটাইতে পারে না। বিশেষ ঠেকা আছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই গা-ঝাড়া দিয়া নবকান্ত উঠিল। বলিল, পাঁচটা টাকা দিন। একটু দরকার আছে।

শ্যামকিশোর বিনাবাক্যব্যয়ে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিল। বলিয়া দিল, দু টাকা বেশি গেল কিন্তু। খাতায় লিখিয়া রাখিল।

আর সকলে হাতের কাজ বন্ধ রাখিয়া সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিল। এক নোটিসেই এতটা কেহ আশা করে নাই। ভারি কায়দা তো? উত্তেজনায় বিড়ির হাত দ্রুততর চলিতে আরম্ভ করিল।

সেদিনও আশারাণী আশা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নবকান্ত আসিয়াই বলিল, চটপট তৈরি হয়ে নাও। সময় নেই। রান্না কি এসে করবে?

কি ভুলো মন তোমার!—আশারাণী অবাক হইয়া বলিল, ওবেলা পাথর পাথর ক'রে

চেঁচালে না? তক্ষুনি তো বললুম, তলার চাল ঝেড়ে মুছে রান্না হয়েছে।

তবে?

আসবার পথে দোকান থেকে চিঁড়ে নিয়ে এলেই হবে।—আশারাণী সমাধান করিয়া দিল।

আশ্বস্ত হইয়া নবকান্ত ইস্তিরি-করা জামা-কাপড় পরিতে লাগিল। সিনেমায় যাইতে নবকান্ত একটু ভাল পোশাকই পরে।

কি সুন্দর টকি! ফিরিবার পথে আশারাণীর উচ্ছ্বাস উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।—ছেলেটা বেশ, না? যেমন চেহারা, তেমনই স্বভাব-চরিত্র!

আর মেয়েটা?—নবকান্ত কোথায় যেন একটু খোঁচা খাইয়া বলিয়া উঠিল, ভারি চমৎকার করেছে মেয়েটা। গানখানা যা গেয়েছে! নবকান্ত একটা চোঁ-চোঁ শব্দ করিয়া থামিয়া গেল।

শ্যামকিশোররা বিড়ি-শ্রমিক-ইউনিয়নের নোটিস গ্রাহ্য করিল না। কোন জবাবই দিল না। অবশ্য শ্রমিকদের কাছে মতামত খোলাখুলিভাবে জানাইতে কেহই বিলম্ব করে নাই। সুস্পষ্ট বক্তব্য তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

গণেশ আর বিশ্বনাথ আনন্দে হাস্য করিল। বলিল, এর জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। ধর্মঘট—শ্রমিকের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

যুদ্ধ-ঘোষণার মত দ্বিতীয় নোটিস পড়িয়া গেল।—ধর্মঘট। সাত দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হইলে ধর্মঘট।

সর্বত্র পোস্টার পড়িয়া গেল। বড় বড় হরফে লাল কালিতে লেখা—বিড়ি-শ্রমিকের দাবি মানতে হবে। আড়াই টাকা রেট চাই। শ্রমিক ভাই এক হও।

আসন্ন যুদ্ধের উত্তেজনায় বিড়ি-শ্রমিক-ইউনিয়ন থমথম করিতেছে।

যুদ্ধ! এই হ'ল আসল যুদ্ধ!—গণেশ শ্রমিকদের বলে।

শিবেনের দলের লোক শিবেনকে দোষারোপ করিতেছে।—এত বড় একটা ফিল্ড হাতছাড়া হ'ল তোমার দোষে। অত হৈ-হৈ করলে কি কাজ হয়?

ফিল্ড্!—শিবেন বলিয়া উঠিল।—কি আর এমন! দুদিনে নিবে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ-বিড়ি-ফ্যাক্টরিতে কাজ এখনও চলিতেছে। কিন্তু মালিকে-শ্রমিকে ব্যক্যালাপ নাই। যে যাহার হিসাব মত টাকা লইয়া চলিয়া যায়। শ্যামকিশোর গম্ভীর, টাকা দেয়, কথা বলে না। শ্রমিকরাও গম্ভীর। বিড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে গান করে না আর। ঝড়ের পূর্বেকার অবস্থা।

সাত দিনের আর এক দিন বাকি! মালিক-পক্ষ হইতে আজও কেহ কোন জবাব দেয় নাই, মুখে সকলেই বলিয়াছে, পারব না—সোজা কথা। ঘর থেকে দোব্ নাকি, না পোষালে?

ধর্মঘট অনিবার্য।

রাত্রিতে শ্যামকিশোর আজ মুখ খুলিল। বলিল, কি? তোমাদের ধর্মঘট তা হ'লে হচ্ছে?

নবকান্ত পদোচিত গাম্ভীর্যসহকারে জবাব দিল, সে তো আপনাদের হাতে। আমাদের দাবি মেনে নিলে আর ধর্মঘট হবে কেন?

দোকান বেচে দোব। দাবি করলেই হ'ল?—শেষ মন্তব্য করিয়া শ্যামকিশোরও উঠিয়া দাঁড়াইল। সহজভাবে বলিল, দোকান বন্ধ করা যাক।

আমাদের টাকা দেন নি।—নবকান্ত সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল।

টাকা নেই। দেখি, কাল যদি প্যারি।—শ্যামকিশোরের ভঙ্গী একেবারে নির্বিকার।

তার মানে?—নবকান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল।—কাল আমরা কেউ আসব না।

কি করব?—টাকা নেই।

না থাকলে চলবে না। টাকা দিতে হবে।

শ্যামকিশোর তাকাইয়া দেখিল। বলিল, জোর নাকি?

জোরের কোন কথা নেই এতে।—নবকান্ত বুদ্ধিমানের মত বলিল, কাজ করেছি, টাকা চাই।

টাকা না থাকলেও তৈরি ক'রে দোব নাকি?—শ্যামকিশোর আর একবার সকলকে দেখিয়া লইল। খট করিয়া কাঠের বাক্সটা খুলিয়া ডালা তুলিয়া ধরিল। বলিল, আছে টাকা? থাকে তো নাও।

অপ্রত্যাশিত 'পরিস্থিতি'। এ রকম কোন সমস্যা সম্বন্ধে কোন পরামর্শই নেওয়া হয় নাই। নবকান্ত সকলের দিকে চাহিল, সকলে নবকান্তর দিকে চাহিল। ওদের না জিজ্ঞেস ক'রে মারামারি করা উচিত হবে না।—নবকান্ত ভাবিল।

আচ্ছা।—নবকান্ত বলিল, কিন্তু কাল টাকা দিতে হবে, মনে রাখবেন।

শ্যামকিশোর কোন কথা না বলিয়া দোকান বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

আজ ধর্মঘট।

বিড়ি-শ্রমিক আর মাঝে মাঝে গণেশের দলের লোক মিলিত হইয়া মিছিল বাহির করিয়া ফেলিল। অসংখ্য প্ল্যাকার্ডের ভাষা স্লোগানে উচ্চারিত হইয়া শহরের আকাশ-বাতাস কম্পিত করিতে লাগিল। স্লোগানের পদকর্তার মুখে চোঙ থাকায় একাই একশত লোকের নিনাদ বাহির করিতেছে। আর দোহারে সমস্ত মিছিল গর্জন করিয়া উঠিতেছে।

বিড়ি-শ্রমিকের দাবি—মানতে হবে।

আড়াই টাকা—রেট চাই। ইত্যাদি।

শ্যামকিশোর দোকান খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। মিছিল এই পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। নবকান্তরা কয়েকজন মিছিল হইতে খসিয়া দোকানের সম্মুখে গেল। মিছিল চলিতে শুরু করিল।

আমাদের টাকা দিন।—নবকান্ত দাবি করিল।

শ্যামকিশোর গোঁ ধরিল, টাকা নেই।

বাক্স খুলুন। আমরা দেখব।

খুলব না।

শ্যামকিশোর নিজের নির্বুদ্ধিতায় বিপদ ডাকিয়া আনিল। বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া রাস্তায় টানিয়া নামাইয়া সকলে মিলিয়া মারিতে শুরু করিল। চটপট কাজ শেষ করিয়া নবকান্তরা ছুটিয়া সরিয়া গেল।

ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ১৪৪ ধারা। সরকারী তৎপরতায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা জারি হইল শহরে। মিছিল বে-আইনী হইয়া গেল। ধর্মঘটী শ্রমিকগণ প্রায় বেকার হইয়া পড়িল। কারণ দেওয়ালের গায়ে পোস্টার মারার কাজ গণেশ তাহাদের দলের লোক দিয়াই করায়।

অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি নবকান্তরও বিশেষ কোন কাজ নাই। মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া গণেশ ও বিশ্বনাথের নিকট মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপদেশ গ্রহণ করে। আর সকলের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিবারও দায়িত্ব নেয়, কিন্তু ঠিকমত পালন করিতে পারে না।

ঘুরিয়া ফিরিয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া দিনটা নবকান্তর মন্দ কাটিতেছে না। এটা ওটা বিক্রি করিয়া খাইয়া কিংবা না খাইয়া মনোবল এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

আর কদিন?—গণেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলে, দিনে কত টাকা ওদের লস যাচ্ছে জানেন?

সেদিন তাস খেলিতে বসিয়া রামু খবর দিল, বড় পাটগোলায় নাচ হইবে। বাইজী-নাচ।

তাস ফেলিয়া দিয়া লাফাইয়া উঠিল সবাই।—কবে? কবে রে?

কিন্তু পরক্ষণে সকলে বসিয়া পড়িল।—পয়সা? এ শালার ধর্মঘটে তো সর্বনাশ ক'রে ছাড়বে!

নবকান্ত কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া পড়িল। সে অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি। ফস করিয়া মনের কথা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অসঙ্গত। বাড়ি গেল।

আশারাণী বাহিরে কাজ করিতেছিল। চাবির গোছাটা বালিশের নীচে পাওয়া গেল। সতর্কিতে বাক্স খুলিয়া আশারাণীর ভাঙা নাকছাবিটা লইয়া বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। আপিসে কাজ আছে।

আশারাণী সকাল হইতে কথা বলিতেছে না। এখনও বলিল না। মুখখানা বাঁকা করিয়া ফিরাইয়া লইল।

পাটগোলায় পটল রামু ইত্যাদি অনেকের সঙ্গেই দেখা হইল। আর লজ্জা করিয়া লাভ কি ভাবিয়া নবকান্ত প্রাণ খুলিয়া মিশিয়া গেল।

পরের দিন সকালেই আশারাণী ধরিয়া ফেলিল। রণচণ্ডী মূর্তিতে নবকান্তর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—আমার নাকছাবি কোথায়, বল?

আমি কি ক'রে জানব?—নবকান্ত চুরির আসামীর মত কহিল।

তুমি জান। তুমি চুরি করেছ।—আশারাণী নবকান্তর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।—চোর—চোর তুমি। আমার নাকছাবি এনে দাও।

নবকান্ত অতিকষ্টে মুক্ত হইল। আশারাণী কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ধর্মঘটআলারা সর্বনাশ করেছে, এবারে বাইজী ধরেছে! লজ্জা করে না, বউয়ের গয়না বেচে বাইজী-নাচ দেখতে! আমি জানি নে কিছু!

পাগলের কথা! কোথায় বাইজী-নাচ?—নবকান্ত আড়াল হইল।

মালিক-পক্ষ একটুও টলিতেছে না। গণেশরা চিন্তিত হইল। শ্রমিকদের মনোবল মটমট করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। তীব্র আন্দোলন করা প্রয়োজন। এদিকে ১৪৪ ধারা।

১৪৪ ধারা ভাঙিতে হইবে। বিশ্বনাথ ও গণেশ মীটিং ডাকিয়া বক্তৃতা দিল, শহরের জনমত আমাদের দিকে। শহর কাঁপিয়ে তুলতে হবে। জনমতের চাপে মালিকরা সোজা হয়ে যাবে। শুধু জনমত কেন, গভর্মেন্ট চাপ দিতে বাধ্য হবে। এই একমাত্র পথ। আবার মিছিল।

আবার মিছিল।

হুঙ্কার দিতে দিতে মিছিল কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পুলিস আসিল। মৃদু লাঠি চার্জ! মিছিল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কতক রাস্তায় পড়িয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক পরে দুইজন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়া নবকান্ত গৃহে ফিরিল। মাথায় পট্টি দেখিয়া আশারাণী চিৎকার করিয়া উঠিল।

একে একে নবকান্তর বাড়িতে আর কয়জন জমা হইয়া জটলা করিতে লাগিল।

রামু দুঃখ করিয়া বলিল, কিন্তু আমাদের তো গভর্মেন্ট দখল করার ইচ্ছা ছিল না। তবে ওবা এ রকম করলে কেন?

কেহ কোন জবাব দিতে পারিল না।

গণেশ-বিশ্বনাথেরা জয়োল্লাসে মাতিয়া উঠিল। জয়, জয়! এরই নাম জয়।

পটল বলিল, দশজনের মাথা ফেটেছে।

ফাটুক।—গণেশ যেন লাফাইয়া উঠিল। ওই ফাটার মধ্যেই আমাদের জয়।

পটল বুঝিতে পারিল না।

শিবেনরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে। গণেশদের ভাগ্যে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বলে, ওদের পার্টি-পজিশন অনেক ভাল হয়ে গেল। ভারি চমৎকার প্লাটফর্ম ক্যাপচার করেছে।

পরস্ব

আর্যকুমার সেন

বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ মুখুজ্জের মেজাজ ভাল ছিল না।

থাকার কথাও নয়। আগের দিন সন্ধ্যায় অভ্যাসমত পার্কে পায়চারি করিবার সময় একটা মাতাল হড়হড় করিয়া গায়ে খানিকটা বমি করিয়া দেয়। শুধু তাহাই নয়, লোকটাকে কয়েক ঘা লাঠি বসাইয়া দিবার পর সে বাংলা ও হিন্দী মিশ্রিত অপরূপ ভাষায় যে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা পুনরুচ্চারণের যোগ্য মোটেই নয়।

তাহার পরে পুরা চব্বিশ ঘন্টা কাটিয়া গিয়াছে। বমনসিক্ত কাপড় ও জামা ধোপা-বাড়ি গিয়াছে, তিনিও স্নান করিয়া খানিকটা শুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু মেজাজটা এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক টেম্পারেচারে পৌঁছায় নাই।

যে ঠিকা চাকরটা কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, সে বেচারা অকারণে খানিকটা গালাগালি খাইয়াছে। রান্না সেই করে। ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য হওয়া এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয়, যে কারণে তাহার পিতৃপুরুষ গঞ্জনা খাইতে পারে। সে মুখে বিশেষ কিছু বলে নাই, কিন্তু মনে মনে ঠিক করিয়াছে, পরদিন হইতে আর আসিবে না।

নীলকণ্ঠবাবুর তিন কুলে কেহ আছে বলিয়া কেহ জানে না। এককালে টাকা পয়সা ছিল, এখন বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। কিছু গিয়াছে উকিলের পকেটে, কিছু একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় জুয়াচোর মালিকদের পকেটে।

তবু যাহা আছে, তাহা একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। বালিগঞ্জে ছোটখাটো একখানা বাড়ি আছে, একটা কাপড়ের কলের শেয়ার হইতে ভদ্ররকম একটা মুনাফা যাণ্মাসিক পাওয়া যায়। কাজেই অভাব বলিয়া কিছু নাই।

যাহা আছে, তাহাকে কৃপণতা বলিয়া অভিহিত করিলে দোষ হয় না। বাজে-খরচ তিনি করেন না, চাকরবাকরের বাহুল্য অকারণ বাহুল্য বলিয়াই মনে করেন।

অন্য দিন রাত দশটার আগেই তিনি ঘুমাইয়া পড়েন, আজ বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, কালকের মাতাল বেটাকে হাতের কাছে পাইলে আরও কয়েক ঘা বসাইয়া দেওয়া চলিত। মারের চোটে হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে তবে রাগ খানিকটা যায়।

তিনি নিজে জীবনে কখনও মদ স্পর্শ করেন নাই, মাতালকে তিনি বর্ষাকালের বৃহদাকার কোলাব্যাঙের মত ঘৃণা করেন। আর তাঁহারই গায়ে কিনা—

নাঃ! অকারণে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত কাটাইয়া দিলে শরীর খারাপ হইবে। পঁচাত্তর বছর বয়সের পক্ষে তিনি দিব্য শক্ত আছেন, কিন্তু তাই বলিয়া শরীরের উপর অত্যাচার করা চলে না।

একটু তন্দ্রা আসিতেছে। সহসা অস্পষ্ট আওয়াজ হইল, ধপ। চোখ খুলিলেন না। চোখ খুলিলে তন্দ্রার ঘোরটুকু কাটিয়া যাইবে, আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে বাকি রাতটা সাধ্যসাধনা করিতে হইবে। কিসের আওয়াজ? বিড়াল? না, বোধ হয় পাশের বাড়িতে। দরকার কি চোখ খোলার?

কিন্তু পরপর খসখস, খচখচ, মড়মড়, এমন কতকগুলি শব্দ হইয়া গেল যে, ইচ্ছা

করিলেও চোখ বন্ধ করিয়া রাখা চলে না। নীলকণ্ঠবাবু চোখ খুলিলেন।

ঘরে অস্পষ্ট অন্ধকার। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গেল, আলনার পাশে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়াইয়া তাঁহার জামার পকেট হাতড়াইতেছে।

বয়স হইলেও নীলকণ্ঠের সামর্থ্য ছিল, উপরন্তু উপস্থিতবুদ্ধি ছিল। তিনি হাঁউমাউ করিয়া লোক জড়ো করিবার চেষ্টাও করিলেন না, চাদর মুড়ি দিয়া (সাধারণত এ অবস্থায় লোকে যাহা করিয়া থাকে) নিরাপদ হওয়ারও প্রয়াস পাইলেন না।

লোকটা ছোটখাটো, বিনা চশমাতেও এটুকু বোঝা যাইতেছে, এবং পিছন ফিরিয়া রহিয়াছে। অতএব—

বিড়ালের মত নিঃশব্দে নীলকণ্ঠ বিছানার পাশ হইতে আবলুস কাঠের লাঠিটা তুলিয়া লইলেন, এবং চোর ফিরিবার পূর্বেই প্রচণ্ড বিক্রমে সেটিকে চোরের উপরে নামাইয়া আনিলেন। চোর একবার গাঁক করিয়া ভূতলশায়ী হইল। নীলকণ্ঠ আলো জ্বালিলেন।

মাথায় মারিবার, অথবা এতটা জোরে আঘাত করার ইচ্ছা বোধ হয় নীলকণ্ঠের ছিল না। লোকটা মরিয়া গেল না তো? নীলকণ্ঠ চশমাটা এপাশ ওপাশ ও বালিশের তলায় খুঁজিলেন, পাইলেন না। অগত্যা অনেকটা আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া ঘরের কোণ হইতে কালো রঙের জলের কুঁজাটা আনিয়া চোরের মাথায় উপুড় করিয়া দিলেন।

কাজ হইল। একটু পরেই চোর মিটমিট করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। ব্রহ্মতালুটা নৈনিতাল আলুর মত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ লোক হইলে এই সময় ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, আ—মি কো—থায়? কিন্তু চোরেরা ঠিক সাধারণ মানুষ নহে, টিকেট-কলেক্টর এবং ডিক্টেটরদের মতই অসাধারণ, কাজেই উপস্থিত এ ধরনের কোন প্রশ্ন শোনা গেল না। চুপচাপ নির্জীবের মত পড়িয়া থাকাই বুদ্ধির কাজ ঠিক করিয়া সে একটিও কথা কহিল না।

কথা বলিলেন নীলকণ্ঠ। শ্লেষজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, তারপর? কি মনে ক'রে?

চোরের নৈরাশ্যের অবধি ছিল না। দেখাই যাইতেছে, সে বাড়ি ভুল করিয়াছে। এত করিয়া তিন দিন ধরিয়া যোগাড়যন্ত্র করিয়া এমন ঠিকে ভুল! নাঃ, পাশাপাশি তিন চার খানা বাড়ি এক রকম থাকিলে রাতের অন্ধকারে ভুল না হয় কার? আর শা—র ঠিকেদারগুলাও কি একটু মৌলিকত্ব দেখাইতে পারে না? শা—একেবারে এক রকম প্ল্যানে পাশাপাশি শা— এতগুলা বাড়ি তৈয়ারি করিয়া বসিল!

অথচ চোর বেচারা বহুকষ্টে পাকা খবর সংগ্রহ করিয়াছিল। বাড়িতে পুরুষমানুষ কেহ থাকিবে না, শুধু গোটা তিনেক মেয়েমানুষ। প্রায় আধ বাণ্ডিল বিড়ি খরচ করিয়া সে চাকরের কাছ হইতে খবর লইয়াছে। আর মজা এই যে, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। আর সে এক সাতকেলে বুড়ার হাতের লাঠির ঘা খাইয়া ভির্মি খাইয়া পড়িয়া আছে। বরাত-খারাপ ইহাকেই বলে!

নীলকণ্ঠ উত্তর না পাইয়া বলিলেন, কি রে ব্যাটা, বোবা কালা নাকি?

চোর নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল, আজ্ঞে না তো।

বাঃ, এই তো বেশ কথা ফুটেছে দেখছি! তারপরে, এত রাতে কি পথ ভুলে নারকেলগাছে চড়েছ নাকি?

চুরি-ব্যবসায়ে ধরা না পড়া পর্যন্ত কি কি করা উচিত, তাহার একটা বিশেষ পাঠ আছে। কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলে যে কি করিতে হয়—

চোর বলিল, আজ্ঞে, সেসব তো জানেনই।

কথাটার মধ্যে বেয়াদবির মাত্রাধিক্য ছিল, কিন্তু নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে সেটা লক্ষ্য করিলেন না। সহসা সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, বাপু, তোমার গলার স্বর তো আমার চেনা। চশমাটা ছাই গেল কোথায়?

চোর সভয়ে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে হাসিল। চশমা বহুক্ষণ পূর্বে তাহার হাফ-শার্টের পকেটে আশ্রয় লইয়াছে। অবশ্য রোল্ডগোল্ড হইতে পারে, কিন্তু সোনা হওয়াও আশ্চর্য নয়।

এক এক জন লোকের গলার স্বর মনে করিয়া রাখার ক্ষমতা অসাধারণ। হঠাৎ নীলকণ্ঠ বলিলেন, ওরে বেটা, তুই তো সেই মাতাল হারামজাদা, কাল আমার গায়ে বমি ক'রে দিয়েছিলি। দাঁড়া, তোকে আমি খুন করব।

চোর সবেগে এবং সবিনয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল, দোহাই আপনার হুজুর, বিশ্বেস করুন, জীবনে এক ফোঁটা মদ কোন দিন ছুঁই নি। আপনি লোক ভুল করেছেন হুজুর।

হুজুর কিন্তু সে কথা মোটেই বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, ওঃ, প্যারীচরণ সরকার আর কি! আচ্ছা, আমার কাছে মাতলামোর ভাল ওষুধ আছে।

চোর গলার স্বর করুণতর করিয়া বলিল, না হুজুর, নেহাৎ পরিবার ছেলেপুলে না খেয়ে মরছে ব'লেই না এ পথে এসেছি। তা ব'লে মদ! ঘৃণায়, লজ্জায়, চোরের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া আসিল।

নীলকণ্ঠ ইতিপূর্বে কোন দিন চোর ধরেন নাই। কাজেই এই মিথ্যাবাদী মাতাল চোরটাকে লইয়া কি করিবেন, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। লোকটা এদিকে আবার বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। যাক, ভারী লাঠিটা হাতের কাছেই আছে, প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করা চলিবে। তিনি শুনিয়াছিলেন, চোরকে খুন করিলে ফাঁসি হয় না।

বলিলেন, তোমার বয়স কত?

চোর একটু ভাবিয়া উত্তর দিল, আজ্ঞে, চল্লিশ পঞ্চাশ হবে। আমার বড় ছেলেটাই তো—

নীলকণ্ঠ একটা কথাও বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু উপস্থিত চশমাটা হাতের কাছে না থাকায় ভাল করিয়া দেখার উপায় ছিল না। সে যাহাই হোক, লোকটার বয়স যে ত্রিশের বেশি উপরে নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বলিলেন, জেল খেটেছ?

চোর আহত কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে? যেন বাচস্পতি পণ্ডিতকে প্রশ্ন করা হইতেছে, তিনি আহ্‌দে মিঞার মুর্গি চুরি করিয়া খাইয়াছেন কি না।

নীলকণ্ঠ চটিয়া বলিলেন, বাছা রে আমার! কিস্‌সু জান না! হারামজাদা! ফাটক বোঝো? শ্বশুর-বাড়ি?

চোর চুপ করিয়া রহিল। নীলকণ্ঠ মৌন সম্মতি স্বীকৃতির লক্ষণ বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কবার?

চোর ইতস্তত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা প্রায় বার দুত্তিন। আমার কোন দোষ ছিল না হুজুর, কুসঙ্গে মিশে—

নীলকণ্ঠ বাধা দিয়া বলিলেন, চোপরও। ঠিক ক'রে বল, কবার। পাঁচ বার? ছ বার?

চোর অনিচ্ছার সহিত বলিল, আজ্ঞে, ঐ রকমই হবে। কি করব হুজুর, পরিবার—

নীলকণ্ঠ এইবার ইংরেজীতে বলিলেন, shurrup! চোর চুপ করিল।

নীলকণ্ঠ হিসাব করিয়া বলিলেন, যখন তোমার হিসেবে পাঁচ ছ বার, তখন আসলে অন্তত দশ বার! এইবার নিয়ে এগারো বার হবে।

চোর এইবার একেবারে আঁতকাইয়া উঠিল। বলিল, সর্বনাশ, সে কি হুজুর?

নীলকণ্ঠ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর! তবে তুমি কি ভেবেছিলে, তোমায় পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পুজো ক'রে ফলার খেতে দোব?

চোর সম্ভবত অদৃষ্টবাদী। সে কথা কহিল না।

নীলকণ্ঠ বলিলেন, তোর নাম কি?

আজ্ঞে, ভজহরি।

আর কটা নাম আছে?

চোর অবাক হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সে কি হুজুর, নাম আবার কটা থাকবে? তবে ডাকনাম আছে, খোকা।

নীলকণ্ঠ এইবার অতীব ধীর কণ্ঠে বলিলেন, দেখ বাপু, আমি যা যা জিজ্ঞেস করছি, যদি ঠিক ঠিক উত্তর দাও তো ছেড়ে দিতেও পারি। কিন্তু আগড়ুম-বাগড়ুম করলে ঠিক পুলিসে দোব। নাও, এবার ঠিক ক'রে বল, কটা নাম আছে।

চোর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা গোটাকতক আছে।

কি কি?

ভজহরি, গোপাল, বানোয়ারী, ইউসুফ, আর—আর—বাকিগুলো মনে পড়ছে না।

যাক, ঐতেই হবে।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। দূরের একটা ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। অর্থাৎ সাড়ে বারোটা হইতে পারে, একটা হইতে পারে, দেড়টা হওয়াও আশ্চর্য নয়। নীলকণ্ঠের ঘুম পাইতেছিল। ভাবিতেছিলেন, এইবারে চোরটাকে ছাড়িয়া দিলে কেমন হয়, এমন সময় চোর বলিল, হুজুর, এবারে যাই? সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠের মতপরিবর্তন হইল। তিনি লাঠিটা দেখাইয়া চোরকে বলিলেন, খবরদার, ব'সে থাক ওখানে। চোর বসিয়াই রহিল।

কিন্তু চশমাটা না পাওয়া যাওয়ায় বড় অসুবিধা হইতেছে। চোরটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখা গেল না। তবে গলার স্বরটা—! সহসা নীলকণ্ঠ বলিলেন, এই শুয়ার, ওদিকে কি দেখছিস?

একটি টিপয়ের উপরে ভারী রূপার ফ্রেমে বাঁধানো একটি সুশ্রী বালকের ছবি। নিঃসন্দেহে চোরের দৃষ্টি ফ্রেমটার দিকে পড়িয়াছে।

চোর এক মুহূর্তে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে, ছবিটা দেখছিলাম। বেড়ে চেহারা খোকাবাবুর—দিব্যি রাজপুত্তুরের মত।

খোকাবাবুর উল্লেখে নীলকণ্ঠের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। চোরের কথার উত্তরে তাহার পিতৃপুরুষকে আপ্যায়িত না করিয়া শুধু বলিলেন, আমার নাতির ছবি, হিরণ্ময়ের। গলার স্বর ভারী।

চোর একটু কৌতূহলীভাবে বলিল, মারা গেছেন বুঝি?

গাঢ় স্বরে উত্তর আসিল, হ্যাঁ, পনরো বছর আগে। জলে ডুবে।

চোর সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, চ্‌ক্‌ চ্‌ক্‌।

বৃদ্ধ কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। দূরের ঘড়িতে আর একবার একটা, অর্থাৎ দেড়টা বাজিল। বাহিরে নিস্তব্ধ অন্ধকার। আলোকোজ্জ্বল ঘরে ততোধিক নিস্তব্ধতা।

অকস্মাৎ নীলকণ্ঠ কথা কহিলেন। হয়তো মনে ছিল না, তাঁহার শ্রোতা একজন চোর। হয়তো শ্রোতা যে আছে, সে কথা খেয়াল ছিল না।

অনেকটা আত্মগতভাবেই বলিলেন, পনেরো বছর আগে হিরণ একটা ভয়ানক অপরাধ ক'রে ফেলে। ভয়ানক একটা অন্যায় কাজ। শুধু কুসঙ্গের ফলে।

চোরের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অপরাধটা কি এবং তাহার গুরুত্ব কতখানি এবং তাহাতে মাথায় লাঠির বাড়ি খাওয়া চলে কি না। কিন্তু সাহসের অভাব থাকায় চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আবার বলিলেন, মা-বাপ-মরা ছেলে, আমি মানুষ করেছিলাম। হয়তো আমি মাফ করতে পারতাম, সেই সুযোগ দিলে না।

চোর মনে মনে বলিল, সে আবার কোন্ দিশী কথা রে বাবা!

বৃদ্ধ বলিলেন, শুধু একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিল যে, সে আর ফিরবে না। ফিরলও না। সাত আট দিন পরে গঙ্গায় তার দেহ পাওয়া গেল, তার অর্ধেক মাছে খেয়ে ফেলেছে—বীভৎস, চেনা যায় না।

বৃদ্ধ শিহরিয়া চুপ করিলেন।

একটি প্রাচীন হৃদয়ের অস্ফুট বেদনায় বাহিরের অন্ধকার আকুল হইয়া উঠিল।

চোর সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আজ্ঞে, তখন তাঁর বয়েস কত?

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, বছর চোদ্দ।

চোর মনে মনে কি যেন খানিকটা হিসাব করিয়া বলিল, আজ্ঞে একটা কথা বলব?

বৃদ্ধ চমক ভাঙিয়া বলিলেন, কি?

আচ্ছা, লাস তো আপনারা আন্দাজী সনাক্ত করেছিলেন। চেনা তো আর যায় নি। বলছিলাম—

অসহ্য ক্রোধে বৃদ্ধ বলিলেন, কি বলছিলে?

আজ্ঞে, হয়তো আপনারা ভুল লাস দেখেছিলেন। হয়তো তিনি বেঁচেই আছেন—

অদ্ভুত স্বরে নীলকণ্ঠ বলিলেন, কি বললে?

চোর অবলীলাক্রমে বলিল, ধরুন, আমি যদি বলি, আমিই হিরণ—

বৃদ্ধ চিৎকার করিয়া বলিলেন, কি বললি, কি বললি?

চোর সভয়ে বলিল, আজ্ঞে, কিছু না।

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা।

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কেন মিথ্যে কথা বললি, কেন—

আজ্ঞে, ওটা কি রকম অভ্যোসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

তোমার অভ্যোস আমি বের করব, শুয়ার, মাতাল, পাজী, মিথ্যেবাদী—

চোর নির্বিকারভাবে শুনিয়া গেল।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। নীলকণ্ঠের চোখের জল তখনও শুকায় নাই, তবে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মুখ-চোখের ভাবও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে।

চোর উসখুস করিতেছিল। তাহার পুত্র-পরিবারের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও তাহার একটি বান্ধবী ছিল। খেঁদী নামক একটি রমণীকে কথা দিয়া আসিয়াছে, আজ রাতেই তাহাকে একটা কিছু উপহার দিয়া আসিবে। উপহারের জিনিস যোগাড় হইয়াছে, কিন্তু রাতও প্রায় কাবার হইতে চলিল।

নীলকণ্ঠ মুখ তুলিয়া বলিলেন, এবার তুমি যাও। চোর কৃতজ্ঞ চিত্তে আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

নীলকণ্ঠ বাধা দিয়া বলিলেন, এই, ওদিকে না।

চোর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

নীলকণ্ঠ অপর দিকের দরজার সহিত সংলগ্ন ছোট্ট বারান্দাটুকু দেখাইয়া কহিলেন, যে পথ দিয়ে এসেছ, সেই পথ দিয়েই নেমে যাও।

চোর সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, এত রাতে, যদি প'ড়ে গিয়ে—

আমি পীরের দরগায় শিন্নি চড়াব।

চোর ঢোক গিলিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা ঠিক নয়, মানে—বলছিলাম, এত রাতে ও রকম বেখাপ্পা রাস্তা দিয়ে নামতে দেখলে লালপগ্‌গ বেটারা বড় ছ্যাঁচড়ামো করে, তাই—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া কহিলেন, সে আমি জানি না। ওঠার সময় মনে ছিল না?

অগত্যা চোর নামিয়া গেল। দূরে টহলরত পাহারাওয়ালার দৃষ্টি এড়াইয়া প্রথমে চুলটা একটু ঠিক করিয়া হাফ-শার্টের কলারটা তুলিয়া দিল। তাহার পরে এক পাশে লুকানো জুতোজোড়া বাহির করিয়া পায়ে দিয়া সাধারণ ভদ্রলোকের মত বিড়ি টানিতে টানিতে রওনা হইল।

খুনে বেটার ঘর হইতে রূপার ফ্রেম সমেত ছবিখানা বেশ সহজেই হাতানো গিয়াছে, খেঁদী খুশী হইবে, যদিও আজ রাত্রে আর সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু যে কথাটা মনে পড়িয়া চোরের, অর্থাৎ ভজহরি, ওরফে গোপাল, ওরফে বানোয়ারী, ওরফে ইউসুফ, ওরফে দাশু, ওরফে হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়ের হাসি আসিতেছিল, তাহা এই যে, মিথ্যা কথা বলাই যাহার পেশা, তাহাকে দিয়া সত্য কথা বলার শপথ করাইয়া লইয়া, সত্য কথা শুনিয়া নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে অতখানি চটিয়া গেলেন কেন!

আশ্বিন ১৩৪৭

রোমদ্‌গমক *

সজনীকান্ত দাস

স্যাদাচ্ছুরিতকং হাসঃ সোৎপ্রাসঃ স মনাক্‌স্মিতং।
মধ্যমঃ স্যাদ্বিহসিতং রোমাঞ্চো লোমহর্ষণং।।

—অমরার্থচন্দ্রিকায়াং স্বর্গবর্গঃ।

বাজে বাদিত্র, আতোদ্য বাজে, ঘন, বল্লকী, বীণ্,
নিষাদ-ঋষভ-ধৈবতাদি ক্রমে কাকলী-লীন।
কভু কল-প্রক্কাণ মধুর,
তার-মন্দ্র নিকট দূর,
ঊর্ধ্বক, যশঃপটহ, ঢক্কা, বিপঞ্চী পরিক্ষীণ।
আরণ্যক জন্মিল ক্ষ্মায়, নাকে সম্মদ দিন।

ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক, শুষির বাজে আনদ্ধ, তত ;
ডমরু, মড্ডু, ডিণ্ডিম বাজে হুড়ুক্ক অবিরত।
প্রসেবক কাঁপে, প্রবাল
উপনাহ হইল ঘাল;
সঘনে কাঁপে কোলম্বক ধ্বনি-নির্হ্রাদ-হত,
নিক্কাণ, নিক্কণ, ক্কাণ, ক্কণ সহস্র শত।

তৌর্যত্রিকমুখর ত্রিদিব, নাচে ভ্রকুংসকুল,
হর্ষমগন দ্রুহিণাচ্যুত অন্ধকরিপু-স্থূল,
লাসিকা পরিবাদিনী করে
ওঘ-ঘন ছন্দে বিহরে,
পোড়ে কুম্ভোলূখলক-আদি কৌশিক গুগ্‌গুল্,
ক্ষীরসাগরকন্যকা সুখে বিশুষ্ক করে চুল।

[অতঃপর আরণ্যক মানুষের জন্মহেতু কোন্ কোন্ নক্ষত্রপাত হইল, অরণ্যে পর্বতে কি কি বিপর্য্যয় সাধিত হইল, চন্দ্রকতরণী আকাশমার্গে ভাসিল কিনা ইত্যাদির সুগম্ভীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।]

সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল নরনারী ছন্দমাত্র সার,
ভুজঙ্গসঙ্গতা,মত্তা, ত্রিষ্টুভ কি অনুষ্টুপ আর ;
মঞ্জুভাষিণী, ছায়া, স্রগ্ধিণী,
কভু গুরু, কভু কলকিঙ্কিণী,

* কবিতাটি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মানুষের জন্মক্ষণে স্বর্গে উত্তেজনা হইতে আধুনিক বর্তমান পর্যন্ত বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কবির ভাষারও ক্রমবিবর্তন ঘটিয়াছে, এবং এরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। অন্যান্য কবিরা এই বিষয়টি উপেক্ষা করেন বলিয়া তাঁহাদের কবিতা প্রাণবতী হয় না। বৈদ্যবাটির বিখ্যাত কবি ক্ষীণেন্দ্রধ্রুপদগায় ওরফে গদাধর গুপ্ত মহোদয় এই কবিতাটিকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই কবিতাটি প্রকাশিত করিবার পূর্বেই ইহার অনুকরণে একটি কবিতা বর্তমান সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৩৫) কল্লোলে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যে এরূপ জুয়াচুরী নিতান্ত পরিতাপের কারণ।

প্রমিতাক্ষরা, মালতী, মদিরা, সুরসা, তন্বী, ভার,
বিপুলা, চপলা, উদ্‌গাতা, কভু পয়ার চমৎকার।

[মানুষ তারপর নিজেকে বিস্মৃত হইল ; সভ্যতা খ্যাঁকশেয়ালী শ্মশান-সৃষ্টিতে তৎপর হইল ; চিত্তরূপ সীতা বন ছাড়িয়া আসিয়া পাতাল প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ মানুষ চিত্তবৃত্তি হারাইল।]

নাহি জানি কোন্ ক্ষণে ভুলি অরণ্যের ব্যাকুলতা,
মানুষের চিত্তে জাগে শিবা-সভ্যতার আবিলতা,
চষিতে শিথিল এই মাটি,
বস্ত্র পরিহিল পরিপাটী,
ভুলিল দুর্ভাগা নর অরণ্যের নগ্ন বর্বরতা,
এক নারী এক নর নিয়ে হ'ল ভোগসুখরতা

ইট-কাঠ পাথরের জঙ্গলেতে ঢুকিল মানব,
ঘোরায় তাহারে নাকে দড়ি দিয়া যন্ত্র ময়দানব,
সিমেন্ট কংক্রীট আদি ধীরে—
দ্যালে তারে ফেলিল যে ঘিরে,
সোম-সুরা ছেড়ে ক্রমে ধরিল সে ধানের আসব,
ঢেকে ঢুকে দেহটারে ফেরে নর যেন জ্যান্ত শব।

[তারপর, Electric light, Stop-watch, মশারী, Sewing machine, lift, injection, cockscrew, tincture of iodine, coal-gas, Independent Party, cooperation, ইত্যাদির বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২০ stanza ব্যাপী অনুযোগ ; capitalist ও aristocracyর বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ, গণতন্ত্রপ্রচার, সাম্যবাদ ইত্যাদির কথা আড়াই পৃষ্ঠা ও সর্বশেষে কবির ব্যাকুল আহ্বান।]

ঝুটো এ-বেশ ফ্যাল্ ছুঁড়ে ফ্যাল্, আদিম মানুষ বন্‌কে চল্,
দূর পাহাড়ের গা বেয়ে দ্যাখ্, আদিম ধারার নাম্‌ল ঢল ;
ন্যাংটো, ক্ষ্যাপা আয়রে ছুটে,
আয়রে মজুর, আয়রে মুটে
উবু হ'য়ে ডাবা হুঁকোয় তামাক খেতে বাঁধ্‌বি দল,
মাতাল হ'য়ে নাচ্‌বি রে আয় দূর ক'রে দে সভ্য ছল।

লম্বা লোমে গতর ঢেকে লাথিয়ে রে তোর কাঁচিয়ে পাকা 'ঘুঁটি—
পয়লা জোড়া মর্‌দী জোয়ান যেম্‌নি ধারা উদ্‌মো এল ছুটি',
তেম্‌নি ধারা মাইরি তোরা আয় রে,
বনের হাওয়া চোখ মেরে যে যায়রে,
ট্যাক্ ভারী যার, নাই এল সে,—আয়রে গফুর আয়রে পটল পুঁটি,
বনে গিয়ে লোম গজিয়ে বুনো হ'য়ে ছিঁড়্‌ব ওদের টুঁটি।

বৈশাখ ১৩৩৫

ভগবান রাক্ষস

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

অদ্ভুত দেশ।

কবে কেমন করিয়া এই দেশের প্রজা হইলাম, কিছু মনে পড়ে না। মনে করিবার অবসরও নাই। রাক্ষস-রাজার লোমশ হাতের চড় খাইয়া চিন্তাসূত্র যখন-তখন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

অসহ্য ক্রোধে কবিতা লিখিতে বসিলাম। এমন কবিতা লিখিব যে, আগুন ধরিয়া যায়। কিন্তু মায়াবী রাক্ষস নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া কবিতার খাতায়ই আগুন ধরাইয়া দিল। নিজে নূতন খাতা দিয়া বলিল, লেখ।

সভয়ে লিখিলাম। পদ্য মিলাইয়া লিখিলাম, এমন রাজ্য আর এমন রাজা হয় না।

ধমক দিয়া উঠিল।—ওতে হবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে লিখতে হবে।

কিন্তু বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি ঘুলাইয়া গিয়াছে।

কানে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। লোহার কারখানায় ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, কাজ কর।

অল্পক্ষণেই ঘামিয়া উঠিলাম। অসম্ভব। পলাইয়া আসিলাম। ভাবিলাম দেখিতে পান নাই। বাড়ি আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া খাইতে দিতে বলিলাম। স্ত্রী নাই। রাক্ষসটা সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঘের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা স্ত্রী কাপড়ের কারখানা হইতে ফিরিয়া আসিল। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৈফিয়ত চাহিলাম। কয়েকটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, বাজার থেকে চাল ডাল তরকারি নিয়ে এস। তবে খাওয়া হবে। বাড়িতে যা ছিল সব নিয়ে গেছে।

স্ত্রী কারখানায় চলিয়া গেলে আমি ফুলের চাষে মন দিলাম। ভাল গোলাপ ফুলের চারা আনিয়াছি। কিন্তু—আসিয়া পড়িল। সেগুলি কাড়িয়া ভাঙিয়া চুরিয়া পায়ের নীচে দলিতে দলিতে হুকুম দিল, এখানে পেঁয়াজের চাষ করতে হবে।

রাক্ষসের পেঁয়াজ কম পড়িয়াছে !

সংসারে বৈরাগ্য আসিয়া গেল। ব্রহ্মচর্য পালন করিতে আরম্ভ করিলাম। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। আমার স্ত্রীকে চুলে ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে। আমার বিছানায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ওসব চলবে না। আজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পাঁচটা ছেলে চাই। আমার লোকের দরকার।

পেঁয়াজের চাষ আরম্ভ করিয়াছি। কারখানার কাজের চেয়ে ভাল। কিন্তু বাধা দিল। একা একা নয়। পেঁয়াজের চাষের সংঘ আছে। মিলেমিশে করতে হবে।

সংঘ সহ্য করিতে পারি না। কাজেই ছাড়িয়া দিয়া ছবি আঁকিতে শুরু করিলাম। রাক্ষস আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, আঁক, ঘর্মাক্ত মানুষ বল্টুতে নাট কষছে।

আঁকিলাম। রাক্ষসের পছন্দ হইয়াছে। বলিল, এখানে নয়। অঙ্কন-সমিতির সভ্য হয়ে যাও। এক লক্ষ তাদের সভ্য। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আঁক।

হঠাৎ অসম্মত হইলাম। দাঁত বাহির করিল। সেই দাঁত! সম্মত হইলাম।

দলবদ্ধ হইয়া ছবি আঁকিতে শুরু করিলাম। কিন্তু কয়েক দিনেই হাঁপাইয়া উঠিলাম। কাস্তে আর বল্টু আঁকিতে আঁকিতে হাত শক্ত হইয়া উঠিতেছে।

কবিতাই ভাল। রাক্ষস বলিল, তাই লেখ। কিন্তু কবিতাসমিতিতে যোগ দিতে হবে।

কবিতারও সমিতি!

নিশ্চয়। পঞ্চাশ হাজার কবি তার সভ্য।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে কবিতা লিখিতে শুরু করিলাম।

কবিতা লিখিতে প্রেরণা চাই। নদীতীরে, অরণ্যে, দ্বিপ্রহরে, জ্যোৎস্না-রাত্রিতে প্রেরণার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু প্রেরণা কোথায়? যে দিকে চাই, সে দিকে রাক্ষস। তাড়াইয়া লইয়া আসিল একেবারে জুতার ফ্যাক্টরিতে। বলিল, প্রেরণা নাও।

প্রাণভরে দম বন্ধ করিয়া প্রেরণা লইলাম। কি লিখিয়াছি নিজের খেয়াল নাই। কিন্তু রাক্ষসের পছন্দ হইয়াছে। বলিল, চলবে। আরও প্রেরণা নিয়ে এস। আরও লেখ।

খুব প্রশংসা পাইলাম। খবরের কাগজে বাহির হইল যে, পঞ্চাশ হাজার কবির মধ্যে আমি প্রথম হইয়াছি। দৈনিক দশ হাজার শব্দের কবিতা একমাত্র আমিই উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি। আর্থিক দিক দিয়াও অনেক সুবিধা হইল। প্রতি হাজার শব্দে দিন-মজুরি হিসাবে দৈনিক দশ গুণ আয় হইতে লাগিল।

কিন্তু শীঘ্রই ফুরাইয়া গেলাম। উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পাইতে অবশেষে পেট টিপিয়াও দৈনিক বেতনের এক হাজার শব্দ বাহির করিতে পারিতেছি না।

কবিতার চাকরিও গেল।

এবার মাস্টারি লইলাম। স্কুল-মাস্টারি।

পড়াইতে পড়াইতে একদিন কেমন ভাবগ্রস্ত হইয়া দর্শন পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ঈশ্বর কি, আত্মা কোন্‌টা, ইহকাল পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ গালের উপর প্রচণ্ড একটা চড় খাইয়া ধাতস্থ হইলাম। আসিয়াছে!

বিশাল লোমাবৃত বক্ষে হাত রাখিয়া বলিল, আমি ঈশ্বর। হাতের পেশী নাচাইয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, এই আত্মা। পেটের উপর কিল মারিয়া কহিল, এই ইহকাল, এই পরকাল।

ভুল সংশোধন করিয়া ছাত্রদের বুঝাইয়া দিলাম!—বুঝলে?

আশ্চর্য! এবার সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছে।

আর চুপ করিয়া সহ্য করা যায় না। কষিয়া প্রবন্ধ লিখিলাম, এই অত্যাচার দেশবাসী কতকাল নীরবে সহ্য করিবে?

সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসদ্রোহের অপরাধে বন্দী হইয়া জেল খাটিতে লাগিলাম। তিন বৎসর সশ্রম।

তিন বৎসর পরে বাহিরে আসিয়া জীবনধারণ বিড়ম্বনা মনে হইল। আত্মহত্যার মতলব করিলাম। একগাছা শক্ত দড়ি কিনিয়া আনিয়া কড়িকাঠে বাঁধিয়া ঝুলিতে যাইব, সে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তোমার প্রাণটাও আমার। তোমার কোনও অধিকার নেই ওতে।

অনধিকারচর্চার অপরাধে আবার তিন বৎসর। সশ্রম। ঘানি টানিতে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। বিশেষ কষ্ট হইল না।

দাগী হইয়া বাহির হইলাম। সোজা চলিয়া গেলাম রাক্ষসের কাছে। করজোড়ে বলিলাম, ভগবান রাক্ষস! তুমি আমাকে একেবারে খেয়ে ফেল না কেন? তোমার পেটের মধ্যে আমি বরং সুখেই থাকতে পারব!

চারি কোণের চারিটি লম্বা দাঁত প্রকাশিত করিয়া হাস্য করিয়া সে বলিল, আমার পেটের মধ্যেই তো আছিস রে বেটা! টের পাচ্ছিস না?

লজ্জায় কিছুদিন শয্যা আশ্রয় করিলাম। স্ত্রী কাপড়ের ফ্যাক্টরিতে কাজ করিয়া যাহা পায়, তাহাতেই কোন রকমে দিন চলিয়া যাইতেছে। আমি বিশ্রাম লইতেছি। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ভারটা নিজের হাতে লইলাম। আর খুশিমত পড়াইতে লাগিলাম।

কিন্তু তাহাদের কাড়িয়া লইয়া গেল। বলিল, ছেলেমেয়ে তোমার নয়, আমার।

আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া লাফাইয়া উঠিলাম।—কি?

মৃদু চপেটাঘাতে জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম, মূর্খ! আমার মানে—আমার সম্পত্তি, তোমার কোন অধিকার নেই ওদের ওপর।

উহাদের টানিয়া লইয়া গেল। আমি নিরুপায় বসিয়া রহিলাম।

শীঘ্রই আমাদেরও টান পড়িল। যুদ্ধ লাগিয়াছে। শত্রুকে রুখিতে হইবে। রাক্ষসের শত্রু—আমার শত্রু, তোমার শত্রু!

রণদামামা বাজিয়া উঠিল। সে এক হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত সমস্ত দেশ যেন নাচিয়া, বকিয়া, লাফাইয়া, ছুটিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। আমি যুদ্ধে গেলাম। আমার স্ত্রী যুদ্ধে গেল। রাক্ষসের সম্পত্তি—আমার ছেলেমেয়েদের খবর জানি না।

হাসপাতাল হইতে একটা পা এবং নাকটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া অকর্মণ্য প্রমাণিত হইয়া বাড়ি আসিলাম। সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলাম, আমার স্ত্রী এখনও অকর্মণ্য হয় নাই। কোন্ এক অফিসারের কাজে লাগিতেছে। শরীরে যেন আগুন ধরিয়া গেল।

জাগিয়া দেখিলাম, সিগারেটের আগুনে শুধু আঙুলটা একটু পুড়িয়াছে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্ন!

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

বাজার

নারায়ণ দাশশর্মা

বড়বাজার, লালবাজার আর 'আনন্দবাজার'-'অমৃতবাজার' যে দেশের গৌরব, সেই বঙ্গ-দেশেরই নিজস্ব ভাষায় 'বাজার' শব্দটা কী করে এমন তুচ্ছতাবোধক হয়ে উঠল, সে আমার এক পরম বিস্ময়! যে কোন বিশেষ্যের সঙ্গে 'বাজারে' বিশেষণ জুড়লেই সে বিশেষ রকম ব্যাজার হয়ে ওঠে, বাংলা ইডিয়মের কেন এই ইডিয়টিক রীতি?

আর সব যেমন-তেমন, সাহিত্যের বেলা তো বিষম কাণ্ড। বাজারে কাটতির দিকে নজর না রেখে কে কোথায় মাল তৈরি করেছিল বলুন? কিন্তু কোন সাহিত্যিককে বাজারে লেখক বলে সামলান দেখি! সাহিত্যের বাজারে সব শিয়ালের এক রা—কমার্শিয়াল হতে রাজী নয় কেউ। চিত্রশিল্পে শুনতাম বটে ফাইন আর কমার্সিয়াল দু রকম শিল্পীর কথা, তা আর্ট স্কুলেও এখন কমার্শিয়ালের নাম হয়েছে অ্যাপ্লায়েড আর্ট; আর সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ তো চিরকালই এই যে যিনি ফাইন বলে খ্যাতি না পান, তিনি হলেন সুপারফাইন। বাংলা পর্ণোগ্রাফি লিখতেও সুপারফাইন সাহিত্যিক মশাই কলমের ডগা কামড়ে এমন দু-চারখানা মোক্ষম লাইন না হাঁকড়ে ছাড়বেন না যার উপরে দু-চার পাতা ব্যাখ্যা লেখা চলে ওজস্বিনী ভাষায়—কী জানি, যদি তাঁর লেখাটা স্কুলফাইনালের পাঠ্যতালিকায় উঠেই পড়ে কখনো!

'বাজারে' হতে যত বাজারে যেতে তার চেয়েও বেশী আপত্তি সাহিত্য-ভাস্কর অমুক-চন্দ্র থেকে সাহিত্য-তস্কর তমুক-জোনাকি পর্যন্ত প্রতিটি মহাশয়ের। তাই বলে ভাববেন না সত্যি বুঝি এঁরা কেউ বাজার করেন না। বিলক্ষণ! আপনার-আমার মতই এঁরাও নিত্যি তিরিশ দিন মাগগি-দরের বিরুদ্ধে অতি কঠোর বাক্য স্বগত উচ্চারণ করেন; প্রত্যহ প্রতিজ্ঞা করেন বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নিজে গিয়ে মেসে উঠবেন; তারপর মুখ বাঁকিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই বউয়ের লেখা ফর্দ হাতে সেই বাজারে গিয়েই ঢোকেন: কেবল আপনার আমার চাইতে ঘন্টা দুয়েক বেলা করে। একটু বেলা না হলে ঝিঙে-পটলের দর থাকে চড়া, এটা অবশ্য গৌণ কারণ; মুখ্য কারণ হচ্ছে মুখ্যু লোকদের এড়ানো। নইলে হয়তো ঠিক মাছের দোকানে কনুই-গুঁতোনো অবস্থাতেই আপনি ওঁকে দেখে ফেলেছেন এবং চিনে ফেলেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলে: ঝিঙে কিনতে দুটো পয়সা বেশী খরচা হওয়া তবুও সহ্য হয় কিন্তু সাহিত্যিককে বাজার করতে দেখে ফেলবে হয়তো ওঁর অন্যতম ভক্ত—হয়তো বা একতম ভক্তই আপনি—সে সর্বনাশের ওষুধ কী! কাজেই তেমন অবস্থায় উনি অর্ধং ত্যাগ করার পাণ্ডিত্য দেখিয়ে, দর-কষাকষির অধ্যবসায় অর্ধপথেই মুলতুবি রেখে, 'আকাশ এসো এসো ডাকিছ বুঝি ভাই'-গোছের ঢুলু ঢুলু চোখে সওদা করার সাহিত্যিকজনোচিত বিহ্বল ঔদার্যে আপনাকে মুগ্ধ করে রেখে যাবেন। সাহিত্যিক বাজার করছে এ-দৃশ্য আপনার যদি শুধু মর্মস্পর্শী মনে হয় তো তিনি মেছুনির সঙ্গে দর-কষাকষি করছেন এ হবে মর্মবিদারক।

অথচ বাজার করব কিন্তু দর-দস্তুরি করব না, এ যেন থ্রি-ডাইমেনশন ছবি দেখব কিন্তু পোলারাইজার চোখে আঁটব না। কিংবা খবর-কাগজ কিনব কিন্তু ল-কোর্ট রিপোর্ট পড়ব না। বিয়ে করব কিন্তু শালীর সঙ্গে কথা কইব না। বাজার করা নামক দুশ্চর তপস্যার দর-কষাকষিরূপ সুজাতার প্রেরণাই তো আমাদের প্রধান সম্বল। বাজার করেছি অথচ দর করি নি এতবড় অপবাদ একটি দিনের জন্যও আমাকে কেউ দিতে পারবে না। বরঞ্চ, বাজার করি নি—শুধু দর-কষাকষি করেছি, এ কৃতিত্বের তৃপ্তিতে আমার বহু-বহু দিন সমুজ্জ্বল! দর-

কষাকষি, তুমি আছ বাজার করাতে তাই আছে রুচি—নহিলে পুরুষ বুঝি চলে যেত মেসে।

অবশ্য এ কথা বলে যদি বোঝাতে চাই যে দরকষা-বিজ্ঞানে পুরুষই কৃতবিদ্য, উত্তম পুরুষের খাতিরে অসত্যভাষণ করেছি তবে। বস্তুতঃ আঁক কষায় মহিলাদের যতখানি বিতৃষ্ণা, দর কষায় ততখানি কৃতিত্ব। বলতে কি, গড়িয়াহাট মার্কেটে একদিন আমি যে অপরাজেয় দরকষা-প্রতিভা দেখেছি তাতে করে মহিলা জাতির সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল এক জুতোর দোকানে, বড় হরফের বিজ্ঞপ্তি টাঙানো ছিল সেখানে : "এক দর—Fixed Price." তখন পর্যন্ত আমি ও ধরনের দোকানগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারতাম না ; আমার ধারণা ছিল বাংলা পঞ্জিকার বর্ষফলের মতই ওখানকার সওদার ঘোষিত দাম অভ্রান্ত, ইংরেজী পঞ্জিকার মাসিক দিন-সংখ্যার মতই "অপরিবর্তন" বুঝি তা। সেদিন হল আমার প্রজ্ঞা-চক্ষুর উন্মীলন। দেখলাম, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে যেমন করে কার্জনের settled fact unsettled হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি একজোড়া চটিজুতোর ন' টাকা পনের আনা লেখা fixed price unfixed হয়ে ছ' টাকা সাড়ে তিন আনায় নেমে এল। নেমে এল সোজা ভদ্রমহিলার পায়ের নীচে।

আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

সেই থেকে বাজার করা আমার কাছে রোমান্সের বার্তা বয়ে আনে। ভদ্দরলোকের—কোম্পানির ইংরেজীতে যার নাম the bhadralogas—রীতি হচ্ছে বাজারের নামেই গলদঘর্ম হয়ে ওঠা। কিন্তু আমি—বোধ হয় সুপার-ভদ্রলোক বলেই—শুধু ঘর্মে থামি না, স্বেদের পরে হর্ষ অতঃপর পুলক এবং সর্বশেষ রোমাঞ্চ পর্যন্ত গড়িয়ে তবে ছাড়ি। বাজারে ঢুকেই আমার মনে হয় যেন জমাট রকমের একখানি রহস্যরোমাঞ্চ-সিরিজের মধ্যে ঢুকে গেছি স্বয়ং তার ডিটেকটিভ নায়ক হয়ে। আমার চতুর্দিকে গিজগিজ করছে চোর-ডাকাত-খুনী, গুণ্ডা-বদমাশ-পকেটমার ; এদের মাঝখান থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে—শুধু অক্ষতদেহে নয়, উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। অর্থাৎ শূন্য থলিটি পূর্ণ করে।

এবং সেই পূর্ণতা-সন্ধানে আমি সর্বপ্রথম যেখানে অভিযান করি তা হল আলুর দোকান।

আলুর কথা ভাবতে গেলেই আপনি যদি একটু ভাবালু হয়ে না পড়েন তো আপনাকে বলিহারি যাই। আলুর এই ভাবালুতা দোষের প্রধান কারণ—আলুওয়ালাদের সার্বজনীন আলুদোষ (ওদের দিক থেকে দেখলে আলুগুণই বলা উচিত অবশ্য!)। এ দ্রব্যটির ওজনের একক স্থান-কাল-পাত্রভেদে বারো থকে পনের ছটাক পর্যন্ত অনেক রকম হতে দেখেছি (আইনস্টাইন কি আলুর দোকান থেকেই আপেক্ষিক তত্ত্বের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন?)—পুরো ষোল ছটাক দেখার অভিজ্ঞতা এখনও বাকী।

তবু আলুর দোকানের দয়ালুতা অস্বীকার করা যায় না—এক টাকা থেকে একশ টাকা পর্যন্ত যে কোন অঙ্কের নোট আপনি অবলীলাক্রমে ভাঙাতে পারবেন আলুওয়ালার কাছে একপো আলু কিনেই (একপো'র বেশী কিনতে গেলে একশ টাকা ছাড়া আর কোন্ নোটেরই বা এমন কিছু ভাঙানি থাকে শুনি?)। আলুর দোকানে নোটের ভাঙানির এমনতর প্রাচুর্য দেখে অনেক দিন আমার মনে হয়েছে, ওরা সম্ভবতঃ আলু আর নোট এক জমিতেই চাষ করে!

তাই বলে ওই নোট ভাঙিয়েই যদি আপনার ভাবালুতার সমাপ্তি ঘটে তো আমার ধারণা হবে, আপনি সেই জাতের লোক যারা বেলভেডিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠগৃহে গিয়ে মোহন সিরিজ পড়তে বসে। বস্তুতঃ আলু বস্তুটিকে একটি তরকারিমাত্র মনে করলে গোড়াতেই আপনি ভুল করবেন। আলু হচ্ছে বঙ্গ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমূর্ত রূপক।

যাকে আজ শুধুই আলু বলে চেনে আপনার ছেলে, তার নাম স্মরণ করে দেখুন, আপনার ছেলেবেলায় ছিল গোল আলু ; আর আপনার বাবার ছেলেবেলায় বিলিতী আলু। উনিশশো পাঁচ সালের স্বদেশী আন্দোলনে বিলিতী কাপড় বিলিতী নুনের সঙ্গে বিলিতী আলুও হয়েছিল নিষিদ্ধ। (পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আলু আজও অস্বীকৃত।) তারপর ক্রমশ আলুর ম্লেচ্ছ-অপবাদ ঘুচতে লাগল, শেকড় ছড়াতে লাগল সে কাটোয়া-তারকেশ্বরের ধুলোট জমিতে আর জঠরের কর্ড লাইন বয়ে বাঙালীর হৃদয়ে। স্বদেশী হয়ে গেল আলু : সাত্ত্বিক রুচির সর্বজনস্বীকৃত উপকরণ হয়ে দাঁড়াল আলুভাতে ভাত। তবু কিছু 'গোল আলু' নামের বিশেষণ-প্রয়োগে বলা হত যেন, এ আলুর স্বদেশীয়ানায় গোল আছে কিছু। আজ আর কোন গোল নেই শেষে ; আজ আলুই হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম আলু, আলু নামের পুরনো শরিকের দলই বরঞ্চ রাঙা আলু শাঁক আলু মেটে আলু ইত্যাদি সসঙ্কোচ বিশেষণের আড়ালে মুখ গুঁজেছে। বাংলা দেশে আলু প্রবর্তনের শতাব্দীকালব্যাপী এই ইতিহাস অনুসরণ করলেই পাওয়া যাবে সমকালীন বঙ্গীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সংগুপ্ত কাহিনীটি। পোটাটোর মূল হোকগে দক্ষিণ আমেরিকার সুদূর অরণ্যে, আলুর পুলিপিঠে তবু বাঙালীর একান্ত স্বকীয় সৃষ্টি ; ঠিক যেমন নাকি রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অরিজিন্যাল, তার মধ্যে থাকুক না কেন য়ুরোপীয় কবিমানসের যা-খুশি প্রেরণার প্রভাব।

কলকাতার বাজারে দাঁড়িয়ে যদি আরও দীর্ঘকাল আলু আলোচনায় পক্ষপাত দেখাই মাছকে উপেক্ষা করে, তো—এই বাংলা-বিহার বর্ডার-ডিসপুটের ডামাডোলে আমার টনটনে জাতীয়তাবাদে হয়তো আপনার সন্দেহ হয়ে বসবে। চলুন তবে মেছোবাজার।

কলকাতার বাজারে যারা মাছ বেচতে বসে তারা কেউ বা সঙ্গে বঁটি আর মুগুর নিয়ে আসে, কেউ বা আনে না। কিন্তু এহ বাহ্য। কেন না, ওদের বঁটি শুধু লোক-দেখানো অস্ত্র, ভুলেও ওরা আপনার গলা কাটবার জন্যে ওদের বঁটি তুলবে না। তার জন্যে রয়েছে আলাদা অস্ত্র : দাঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা, যা সঙ্গে নিয়ে আসতে ওদের কস্মিনকালেও ভুল হয় না। এ বস্তুর পাল্লায় একবার যে পড়েছে (কেই বা না পড়েছে, শুনি?) সে হয় স্বয়ং কেটে পড়েছে, নয় মেছুনিই তাকে কেটেছে, পুঁচিয়ে-পুঁচিয়ে না হোক পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। সে বড় মোক্ষম প্যাঁচ। মেছোবাজারের গীতায় স্পষ্ট বলা আছে, "ফলেষু এব অধিকারস্তে মা কর্মনি কদাচন" : মেছুনি দয়া করে যেটুকুন দেয় সেই ফলপ্রাপ্তিতেই তুষ্ট থাক, দাঁড়িপাল্লার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া? সে কর্মে তোমার অধিকার নেই। ওদের কাঠের মুগুর তো কেবল মরা রুইয়ের ঘাড়েই পড়ে, কিন্তু বাটখারার ঘায়ে ঘায়েল না হয়েছে এমন কোন ওস্তাদ তো দেখি নে। মাছ-বেচা বাটখারাকে বিশ্বাস করার চাইতে খাঁড়াকে বিশ্বাস করতে আমি রাজী আছি, সে খাঁড়া আমার মাথার উপর ঝুলে থাকে, তবু। চাণক্যপণ্ডিতের উপদেশ উপেক্ষা করে কোন কোন স্ত্রীলোককে আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, অস্ত্র হাতে নরসুন্দরকেও যে একেবারে অবিশ্বাস করে থাকি তাও নয় ; কিন্তু যিনি একাধারে স্ত্রীজাতীয় এবং শস্ত্রপাণি, সেই মেছুনিকে বিশ্বাস? ঈশ্বর রক্ষা করুন!

মাছের বাজারই হচ্ছে বাজার-রূপ রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের সবচেয়ে রোমহর্ষক পরিচ্ছেদ। মাছ তো নয়, অঞ্চলবিশেষের উচ্চারণ ভঙ্গীই বুঝি যথার্থ;—ইনি হচ্ছেন 'Miss'! বাংলা দেশে mass contact করার নির্ঘাৎতম স্থান এই মেছোবাজার।

'গভীর জলের মাছ'—বাংলা ভাষায় নিন্দার অভিধা : অল্প জলে ফরফর করার কৃতিত্বে যে যত পারদর্শী, যত Miss এর মধ্যে সে তত কৃতী।

অন্ধ-বিশ্বাসের বাঁধানো পাড়ে ঘেরা 'ইজম'-এর ঘোলাটে জলের পুকুর থেকে যে Miss-এর আমদানী তারই সবচেয়ে চড়া দর এখানে। বাঁধা-ধরা পথের যাত্রী, নিস্তরঙ্গ-সাবধান

মিঠে-জলের খাল-বিল-নদীর অধিবাসীও তবু হয়তো কিছু বিকোয়, কিন্তু সমুদ্রের? নৈব নৈব চ। পৃথিবীর গভীর রসাস্বাদনে চোখের জলের মত সমুদ্র যে লবণাক্ত ; সে যে অনন্ত, অপার ; সে যে দিগন্তের নিত্যসঙ্গী, আকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী। সমুদ্রের মাছ বাঙালীর পেটে সয় না—বদহজম হয়। আমাদের প্রিয় মাছ ইলিশ আর চিংড়ি : একজন ভীরু, পলাতক—সাগরের বিস্তৃতি থেকে সঙ্কীর্ণতা অভিমুখী প্রতিক্রিয়ার যাত্রী ; আর অন্যজন মেরুদণ্ডহীন ক্লিন্ন দেহকে পালিশকরা খোলসের আহামরি ছদ্মবেশে লুকিয়ে বিবরবাসী জীবনের ধ্বজাবাহী।

মৎস্য-অবতারের আমরা বড়ই ভক্ত। এত ভক্ত যে মাৎস্যন্যায় ছাড়া কিছুই আমরা ন্যায় বলে মানতে রাজী নই। রুলের মধ্যে আমাদের ঝোঁকটা মবরুলে ; রুল অব্‌ল নয়, রুল অব্‌ হ-য-ব-র-ল। আমাদের চুনোদের গেলবার জন্য পুঁটিরা সদাই উদ্‌গ্রীব ; পুঁটিদের জন্য রামপুঁটিরা, বোয়ালেরও পেছনেই আছেন রাঘববোয়াল ; তিমির তিমিঙ্গিল। এক কথায় আমাদের জাতীয় রাশি হচ্ছে মীন-রাশি। শত্রুরা হয়তো বলবে mean-রাশি, কিন্তু বাঙালীর শত্রু তো মাছ-এর শত্রু—তারা বুর্জোআ কিংবা রেনিগেড—তাদের কথায় কে কান দেয়!

৩

হাঁপিয়ে উঠলেন কি এরই মধ্যে?

আলু আর মাছের বাজার তো তবু সমগ্র বাজার-বস্তুটির ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ। যদি সব ঘুরে দেখতে চান তবে তো অধৈর্য হলে চলবে না ভাই, বাজারের কি শেষ আছে!

শুধু বাংলা কথায় যাকে বাজার বলি তাই তো কত বড়। আর সেই তো সবটা নয়। আমাদের বাজারের সীমারেখা স্পষ্ট : সে এই আলু মাছের বাজার থেকে বেরিয়ে বউবাজার ধরে লালদীঘির পাড়ে চাকরির বাজার পর্যন্ত। কিংবা বউবাজারের সোজা পথে যখন বেশী ভিড় তখন কেউ বা বরের বাজারের মধ্য দিয়েও চাকরির বাজারে পৌঁছয় খিড়কির পথে। এ ছাড়া দু চারটে অন্ধকার রাস্তা চোরা-বাজারের, কালো-বাজারের—সে সব হল ঘুষের বাজারের ভেতর দিয়ে। ওরই একটা রকমফের আছে ফাটকা-বাজার। ব্যাস্‌ এই তো সব। আরও অবশ্য একটা রয়েছে—লালবাজার—যে কোন বাজার থেকে পা ফসকালে সে বাজারে যাবার রাস্তায় আসা যায়। কিন্তু বাংলা বাজারের চাইতে ইংরাজী বাজার বুঝি ঢের ব্যঞ্জনাময়—কালীঘাটের পটশিল্প সেখানে Bazar painting : 'বাজারে' বিশেষণ আর তুচ্ছতাবোধক নয়, বাজার এবারে গণসম্পর্কদ্যোতক পরিচয়ফলক।

কিন্তু সে হল একেবারে অন্য কথা : আমার প্রবন্ধের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে।

বলাই বাহুল্য, ফাইন কিংবা সুপারফাইন কোন রকমের সাহিত্যিক হবার অ্যাম্বিশন আমার নেই। সে-ট্যালেন্টই আমার নেই। এই সাদা কথাটা যে-পাঠক এখনো বুঝে উঠতে পারেন নি, তিনিও নিশ্চয় বুঝেছেন সাহিত্যিক হবার পক্ষে আমার রুচিই নেহাত নীচু। আমার বাজার-সহিষ্ণুতা এবং দরকষা প্রবণতা থেকেই এ-সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক্ষমতা এবং রুচি উভয়ের ত্রুটিবশতঃ তাই আমার রচনার আঙ্গিক লঘুপ্রবন্ধের এবং বিষয়বস্তু বাজার। প্রখ্যাত এক সাহিত্যিকের মতে লঘুরচনার সাম্প্রতিক প্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের অধঃপতনের সূচক, এ কথা জেনেই আমার এ-আঙ্গিক নির্বাচনের সাহস। কিন্তু বিষয় নির্বাচন করে এখন দেখছি এ তো সহজ নয়। বাজারের দিকে যতই তাকাই ততই আমার সাহস যে কমে আসে। বাজার দেখে দেখে দেখা তবু শেষ হয় না, চিনে চিনে সম্পূর্ণ হয় না চেনা।

দুনিয়াদারীর ক্লাসিকাল উপমা ছিল অভিনয়মঞ্চের সঙ্গে—এ বোধ করি সব দেশে।

আমার কিন্তু এ উপমা আর নিখুঁত বলে মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীর এই উত্তরমধ্যাহ্ন পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ-প্রবাহের সুষ্ঠুতর উপমা বুঝি পাওয়া যায় বাজারের মধ্যে। আমি তাই জীবনরোমাঞ্চের স্বাদ নিতে শূন্য পকেটেও বাজারে দাঁড়িয়ে থাকি দীর্ঘপ্রহর।

দাঁড়িয়ে থাকি, আর দেখি সকালবেলা বাজারের পরিচিততম রূপ। ক্রয়-বাণিজ্য বিক্রয়-বাণিজ্যের অয়ন-প্রত্যয়ন হাওয়া বইছে একঘেয়ে মত্ত শব্দে আর আমাদের দৈনন্দিনতার জীর্ণপাল নৌকো ভেসে চলেছে অকারণে—দিগন্তহীন অনিশ্চয়তার সমুদ্রে! আবার দুপুর বেলার বাজার দেখি। স্তব্ধ-গুমোট সারাগোসা-সাগরের শৈবাল নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী সে নৌকো মূঢ় ভ্রান্ত নির্বাক। নির্জন আধোঘুম বাজারের থমথমে আঁসটে গন্ধ, পোকায়-কাটা বিবর্ণ কতকগুলো বেগুন, রোদে ঝলসানো কটা মুলো, এখানে ওখানে খোলা হাইড্রান্টে ঘোলা জলের মন্থর প্রবাহ—জীবন ধারার অন্যতর রূপ। তারপরও বিকেল হয়, সন্ধ্যা হয়, আলো নিবিয়ে অন্ধকারটি গায়ে দেবার সময় আসে পৃথিবীর। তখনও দেখি নতুন বেসাতি সাজাচ্ছে কারা, বাজারের পাশের সরু গলিটির মুখে সাদা সাদা কী গভীর সাদা বেল-কুঁড়ির মালা ; আর বুঝি-বা সেই মালাই খোঁপায় জড়িয়ে রাখা বাজারের সর্বশেষ বেসাতি—যাদের চোখের তারার সবটুকু কালো ধুয়ে ধুয়ে এসে চোখের পাতার কোলে জমেছে পঙ্কিল পলির মত।

ভোর হবার অনেক আগে থেকে বাজারে আসে প্রথম বিক্রেতার দল, লক্ষ্মীকান্তপুরের ছিমন্ত পারুই কিংবা আমতলির লক্ষ্মীমণি দাসী ; রাত দুটোয় তারা বাড়ি থেকে বেরোয় কলকাতার বাজার উদ্দেশ করে, দশটা পর্যন্ত বেচে ডাব কিংবা কাঁকুড়, ঝিঙে কিংবা সজনে। জমিদারের খাজনা দেয়, ঝাড়ুদারের তোলা দেয়, রেলের বাবুর ঘুষ দেয়, দেয় পুরনো খদ্দেরকে ধার আর নতুন খদ্দেরকে ফাউ—চা-মুড়ি, পান-বিড়ি খেয়ে বাড়ি ফেরে আড়াইটের ট্রেনে। আর মাঝরাতের বেশ কিছু পরে ফিরে যায় শেষ ক্রেতার দল অর্ধচেতন বিস্রস্ত দেহ বিশৃঙ্খল রিক্সায় এলিয়ে দিয়ে। এদের সঙ্গে ওদের দেখা হয় না দুই কি তিন ঘন্টার ব্যবধানে, সেই দু-তিন ঘন্টা বাজার হয়তো ঘুমোয় তার কুকুরগুলোকে কোলে জড়িয়ে।

আমি যদি শিল্পী গগ্যাঁ হতুম তো একখানি ছবি আঁকতুম কলকাতার জীবন কাহিনীর ; যে তিনটি রঙের ইম্প্রেশন দিয়ে সে-ছবি ট্রাইকলার প্রিন্টে ছাপা হত তা এই বাজারের তিন রঙ —সকালের, দুপুরের, রাত্রের। প্রাণচঞ্চল বন্দী রক্তের কৃষ্ণাভ গাড় লাল, উপোসে মরা শিশুর চোখের পাণ্ডুর পীত, মুমূর্ষু সামন্তীয় আভিজাত্যের রহস্যময় নীল।

৪

সাহিত্যের ব্যাকরণ অনুযায়ী এ-প্রবন্ধের সমাপ্তিরেখা এখানেই টানতে হয়। তবু তা টানলাম না পাঠকের একটি উদাত্ত প্রশ্ন অনুভব করে, যার উত্তর না দেওয়া সাহিত্যের রীতি বটে, ভদ্রতার নয়।

প্রশ্নটির উল্লেখ বাহুল্য। জবাবই লিখছি শুধু।

আগেই বলেছি, ফাইন কিংবা সুপারফাইন সাহিত্যিক হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কলমমাত্র যাঁদের পুঁজি তাঁদের কাম্যদশা বলে কেবল দুটি বস্তুতে আমি বিশ্বাস করি : সরকারী অফিসে কেরানী আর বাজারে সাহিত্যিক ; আমার সাহিত্যিক-সত্তার অ্যাম্বিশন তাই বাজারে হওয়া। আর সেই জন্যই এ-প্রবন্ধে আমার বক্তব্য সাজালাম বাজারীয় রীতিতে। পাঠক নিজ নিজ রুচি অভিরুচি অনুযায়ী ইচ্ছে হয় আমের মত খোলা-আঁটি ছেড়ে শাঁস খান, বাদামের মত শুধু আঁটি খান, কিংবা চালতের মত কেবল খোলা-ই খান—আমি সর্বপ্রকার সওদা সাজিয়ে নিরঙ্কুশ।

বাজারে সাহিত্যিকের ডেফিনিশনই এই : সে কোন গোষ্ঠীর নয়, কোন গোষ্ঠীর জন্যও

নয় ; কোন বিশেষ রীতির রচনায় তার অতুলন দক্ষতা নেই, কোন রীতিতে অক্ষমতাও নেই ; সাহিত্য তার ব্যবসা, তাই বলে সে ব্যবসাকে সাহিত্য-নামে চালাতে জানে না ; ব্যবসাদারী নয়, বিজনেস-লাইক ওয়ে।

মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির আধ্যাত্মিক মোহ নেই তার এবং নেই প্রোপাগাণ্ডা-সাহিত্যে সমাজ-সচেতনতার লেবেল এঁটে মেটিরিয়ালিস্ট প্রিটেনশনের প্রচণ্ড ধাপ্পা।

পৌষ ১৩৬২

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

সঙ্কর্ষণ রায়

২৫শে বৈশাখ। বঙ্গীয়-রবীন্দ্র-পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনগরে সমারোহের সঙ্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে ব'লে সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তাতে অংশ নেবেন ব'লে প্রকাশ।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার কথা। বীরচাঁদ মিঠৌলিয়ার গদির হিসাবরক্ষক জয়ন্ত পৌনে পাঁচটা নাগাদ তার হিসাবের খাতাটি ফিতে দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে ভাবছিলো যে, এখন রওনা হ'লে সোয়া পাঁচটার মধ্যে রবীন্দ্রনগরে পৌঁছানো যাবে কি না! শহরের প্রধান অনুষ্ঠান—অতএব প্রচণ্ড ভিড় হবার সম্ভাবনা।

জয়ন্তর পাশে গলার স্বর সপ্তমে তুলে হিন্দী আর্যা আওড়াতে আওড়াতে হিসেব লিখছিল বীরচাঁদের ভাগ্নে সুখনলাল। খাতা বাঁধা শেষ হ'লে পর জয়ন্ত তাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, সিন্দুকের চাবিটা দিন তো সুখনলালজী।

আর্যা আবৃত্তি বন্ধ হ'ল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুখনলাল বললে, এত্‌না জলদি চলা যাওঁে হায় বাবুজী? গম্ভীর মুখে জয়ন্ত বললে, কাজ আছে।

রোজই আপনার কাম থাকে বাবুজী। কাল সাড়ে চার বাজে বোললেন আপনার ভাইয়ের বেমারী আছে। আজ পৌনে পাঁচও বাজে নি, আজভি বোলছেন—কাম আছে। এইসা করনেসে চোলবে কি ক'রে বাবুজী?

জবাবদিহি করবার মত সময় আমার নেই—চাবি দিন।

আচ্ছা!—সুখনলালের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ফুটে ওঠে। জবাবদিহি কোরবার সময় হোবে না আপনার! কি এমন রাজকাজ আছে?

আরক্তমুখে জয়ন্ত বললে, চাবি দিন। নয়তো এই খাতা রইল—আপনি সিন্দুকে তুলে রাখবেন।

আহা-হা, নারাজ হচ্ছেন কেন? এই নিন চাবি।

সিন্দুকের মধ্যে হিসাবের খাতাটি রেখে সুখনলালের হাতে চাবিটি ফেরত দেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই জয়ন্ত দেখলে যে, তার সুমুখে বীরচাঁদ গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। নিমেষে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল—হৃৎকম্প শুরু হ'ল বুকের ভিতর।

এত তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছেন বাবুজী?—বপুর বহরমাফিক গলায় বীরচাঁদ বললেন, পৌনে পাঁচভি বাজে নি।

জবাব দেবার চেষ্টায় জয়ন্তর ঠোঁট দুটি বার কয়েক কেঁপে উঠল, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। বীরচাঁদ তার হাতে কতকগুলি কাগজ দিয়ে বললেন, খাতামে এইগুলো এনট্রি ক'রে তবে যাবেন বাবুজী। ব'লে তিনি পাশের ঘরে, অর্থাৎ তাঁর খাস কামরায় ঢুকে পড়লেন।

ম্লানমুখে জয়ন্ত আবার সিন্দুক থেকে হিসাবের খাতাটি বের ক'রে ব'সে পড়ল।

বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে সুখনলাল বললে, বীরচাঁদজীকে বললেন না কেন যে, আপনার জরুরী কাম আছে?

তার মুখের ওপর জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে জয়ন্ত নীরবে তার কাজে মন দিলে, কিছু বললে না।

গদি থেকে বের হতে জয়ন্তর প্রায় সোয়া পাঁচটা বেজে গেল। তার সৌভাগ্যক্রমে তখন বীরচাঁদের বাড়ির সামনে রবীন্দ্রনগরের বাস এসে দাঁড়িয়েছে। সে ছুটতে ছুটতে

তাতে উঠে পড়ল।

রবীন্দ্র-পরিষদের হলের মধ্যে ভিড় ঠেলে ঢোকে জয়ন্ত। হলে যদিও প্রচণ্ড ভিড়, বসবার জায়গার অভাবে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে, তবু স্টেজের সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। বোধ হয় জায়গাটুকু বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। কিংবা হয়তো স্টেজের খুব নিকটবর্তী ব'লে ভীরু জনতা ঐটুকু জায়গা ছেড়ে বসেছে। জয়ন্ত ওখানেই ব'সে পড়ে। তার সামনে একটি সুসজ্জিত তরুণী সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোকের পাশে ব'সে। জয়ন্তর কানে এল মেয়েটি বলছে—বেশ উচ্চৈঃস্বরেই বলছে যাতে হলের সবাই শুনতে পায়—সোফারকে ব'লে এসেছ তো গাড়ি পাহারা দিতে? হরদম গাড়ি চুরি যাচ্ছে আজকাল। সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দেন, তা আর বলি নি! আমাকে কি কাঁচা ছেলে পেয়েছ মল্লিকা? আমার কি আর খেয়াল নেই যে, আমাদের গাড়িটা প্যাকার্ডের লেটেস্ট মডেল? ভদ্রলোকের কথাগুলি হলের প্রায় অর্ধেক লোকের শ্রুতিগোচর হয়।

দুপাশে দুটি ছোটো মেয়ের হাত ধ'রে একজন তরুণী জয়ন্তর ডান পাশের দরজা দিয়ে হলের মধ্যে ঢুকল। তাকে দেখেই জয়ন্ত চিনতে পারলে, সুমিত্রা হালদার। বিয়ে হয়েছে বুঝি? কবে? কার সঙ্গে? যুগপৎ কয়েকটি প্রশ্ন তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

সুমিত্রা জয়ন্তর মুখের পানে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়, বোধ হয় সে তাকে চিনতে পারে নি। জয়ন্তর সামনেই সুমিত্রা তার দু পাশে মেয়ে দুটিকে বসিয়ে নিজে বসল। কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্ত শুনতে পেল যে, সুমিত্রা বলছে—মিতা, নীতা, একদম কথা বলবে না। চুপচাপ সব মন দিয়ে শুনে যাবে। সামনে ঐ দেখছ কবিগুরুর ছবি, ঐ দিকে চেয়ে মনে মনে ওঁর চেহারা ধ্যান কর। মনে মনে আবৃত্তি কর—

মেয়ে দুটির মধ্যে যেটি বড়, সে তার বোনের দিকে চেয়ে তার মার বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে বিকৃত মুখে, বড্ড শক্ত রবি ঠাকুরের কবিতা। সুমিত্রা কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে মেয়েটির মুখের পানে অগ্নিদৃষ্টি হানে। তার চোখের দৃষ্টি থেকে নির্গত নীরব তিরস্কারের প্রতিক্রিয়া মেয়েটির মুখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা দিল। জয়ন্ত দেখল যে, তার চোখ দুটি ছলছল করছে।

উদ্বোধন-সঙ্গীত আরম্ভ হয়। গানের প্রথম অংশ হলের গণ্ডগোলের আড়ালে চাপা প'ড়ে যায়। কে একজন ব'লে ওঠে, মাইক কাজ দিচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে তার কথাগুলির প্রতিধ্বনি ক'রে অনেকে মিলে সমস্বরে কলরব ক'রে ওঠে, মাইক কাজ দিচ্ছে না। মাইক—মাইক—

সুমিত্রার ছোট মেয়ে তার মায়ের মুখের পানে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে, মাইক কি মা? সুমিত্রার বড় মেয়েটি তার বোনের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে বলে, তাও জানিস না। ওই যে নলের মাথায় চোঙ বসানো রয়েছে, ওটাই মাইক। সুমিত্রা চাপা গলায় ধমক দিয়ে ওঠে, আঃ! তোরা চুপ কর্ তো। স্টেজের অনতিদূরে বসেছিল ব'লে মাইক ঠিক কাজ না দিলেও গান শুনতে জয়ন্তর কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু গানে তার মন ছিল না। তার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে এই কথাটি বার বার এসে তীব্র খোঁচা দিয়ে জেগে উঠছিল যে, সুমিত্রা তাকে চিনতে পারে নি। মেয়েরা কি এত সহজেই ভুলে যায়?

কেয়া তামাসা হোগা রে আবদুল?—কথাগুলি জয়ন্তর কানে যেতে সে পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, বক্তা একটি হিন্দুস্থানী কিশোর। বক্তার পাশে বসা আর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে চিন্তিত মুখে বললে, কেয়া জানে। সুক্কুরনে বোলা থা কাক্কু নাচেগী আওর লতামঙ্গে-স্করনে গায়েগী। প্রশ্নকর্তার চোখ দুটি অসম্ভব রকম বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, বলে, সচ্! কাক্কু আওর লতা কল্‌কত্তেমে আয়ী? উত্তর আসে, হাঁ। আজ হাওয়াই জাহাজমে আয়ী।

এখন আমরা সভাপতি মহাশয়কে বরণ করব। যান্ত্রিক গোলযোগ সংশোধিত হওয়ার দরুন হলের সব কটি লাউডস্পীকার কলরব ক'রে ওঠে। সভাপতিকে দেখবার জন্য মুখ

তুলে চেয়ে সভাপতির নির্দিষ্ট আসনে বীরচাঁদ মিঠোলিয়াকে দেখে চমকে ওঠে জয়ন্ত।

জয়ন্তর পাশের ভদ্রলোক বললেন, রবীন্দ্র-পরিষদকে পাঁচ হাজার টাকা ডোনেট করেছেন। ওঁকে সভাপতি না ক'রে উপায় কি?

তাঁর কথাগুলি জয়ন্তর কানে যায় না। সে বীরচাঁদের পাশে সুখনলালকে দেখছিল। সুখনলালও এসেছে!

সভাপতিকে মাল্যদান শেষ হ'লে পর সুখনলাল লম্বা মাইকটির সুমুখে উঠে দাঁড়াল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে সুখনের মুখের পানে চেয়ে জয়ন্ত ভাবলে, সুখন দেবে বক্তৃতা!

সুখনলাল বলতে শুরু করে, আজ রবি-ইন্দ্রনাথজীকি বার্থডে আছে। সেইজন্য বহুৎ গানা-বাজা হোবে। গানা-বাজা শুরু হবার আগে পহেলে হামি আপনাদের কাছে সভাপতিজীকো ইনট্রোডিউস করিয়ে দেবে। সভাপতিজী বীরচাঁদ মিঠোলিয়ানে ভারী বেওসাদার আছে। উনকে তেল আওর ঘেওকে বেওসা সারা বাংলা মুলুক জুড়ে হোয়ে থাকে। ফি বছর এক লাখ, দেড় লাখ রূপেয়াকা মুনাফা হোয়। বেওসামে বীরচাঁদজীকে বেশির ভাগ টাইম চ'লে গেলেও ইনি তুলসীদাসজীকি রামায়ণ আওর কবীরজীকি দোঁহা পড়েন। মাঝে মাঝে রবি-ইন্দ্রনাথজীকি পোয়েট্রিভি প'ড়ে থাকেন। ইনি ধার্মিকভি আছেন। কলকত্তেমে বহুৎ মন্দির নির্মাণকা ওয়াস্তে বিশ-পঁচিশ হাজার রূপেয়া দান করেছেন। তেতাল্লিশ সালকা ফেমিনকা টাইমে কলকাত্তা শহরমে ইনি বহুৎ নঙ্গরখানা খুলে দিয়েছিলেন।

ওমা সুমি—তুই! খুব পরিচিত মধুর কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে জয়ন্ত তার সুমুখে দৃষ্টিপাত করল। দেখলে, সুমিত্রার কাছে লাল রঙের প্ল্যাস্টিকের ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে একটি সুন্দরী মেয়ে ব'সে আছে। কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে থেকে জয়ন্ত তাকে চিনতে পারলে, মীরা মিত্র। সুমিত্রা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, ওমা মীরু যে! আয়, কাছে আয়। মীরা কাছে আসতেই তার একটি হাত চেপে ধ'রে সুমিত্রা বল্‌লে, উঃ! কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল। ব্যাপার কি বল্ তো। বিয়ের পর একেবারে ডুব মেরে গেছিস, ভুলেও একবার আমাদেব ওখানে পা মাড়াস না? মীরা বলে, তুইও তো যাস না আমাদের ওখানে? সুমিত্রা উত্তর দেয়, একদম সময় পাই না ভাই। রোজ দশটা থেকে চারটে ইস্কুল, বাদ বাকি সময় মেয়েদের ও মেয়েদের বাবার তদারক করতে কেটে যায়। সুমিত্রার মেয়ে দুটির দিকে চেয়ে মীরা বললে, ওমা, তোর মেয়ে দুটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে তো। কতটুকুন দেখেছিলাম ওদের। ভারি মিষ্টি হয়েছে কিন্তু দেখতে—ঠিক তোর মত। গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলে সুমিত্রা প্রশ্ন করে, তোর কিছু হয় নি? লাল হয়ে ওঠে মীরার মুখ। চাপা গলায় সে বলে, না। তারপর কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললে, শিগগিরই হবে।

তখন প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণ পাঠ আরম্ভ করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যু' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি নাকি তাঁর ডক্টরেটের থীসিসের সারাংশ। কলেজের ছাত্রছাত্রীর একটি দল হলের মাঝখানে ব'সে চীনাবাদাম চিবুচ্ছিল। তারা হঠাৎ ব'লে উঠল, হরিবল্! তার পরেই তাদের মধ্যে কে একজন বললে, মৃগাঙ্কবাবুর বইটা থেকে বড্ড বেশি টুকে ফেলেছে। একটু র'য়ে-স'য়ে টোকা উচিত ছিল।

সুমিত্রা প্রশ্ন করে, হ্যাঁ রে মীরা, তুই কি একা এসেছিস? মীরা বলে, না, উনিও এসেছেন। ওই যে স্টেজে ব'সে আছেন, আজকের ফাংশনের গানগুলি সব উনিই কনডাক্ট করছেন কিনা। স্টেজের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সুমিত্রা বললে, কই? মীরা বললে, ওই যে দেখতে পাচ্ছিস না, হারমোনিয়মের সামনে ব'সে আছেন, রীমলেস চশমা চোখে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি। বাঃ, তোর বরের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে তো! বিয়ের আগে তো রোগা-পটকা ছিলেন একেবারে। খুব যত্ন-আত্তি করছিস বুঝি?

মাথা নীচু ক'রে মীরা অস্ফুটকণ্ঠে বললে, যাঃ! তারপর মুখ তুলে মৃদু হেসে বলে, তুই বুঝি একা মেয়েদের নিয়ে চ'লে এসেছিস?

না, না, আমার কর্তাও এসেছেন। তিনিও স্টেজের ওপর ব'সে আছেন, একটা প্রবন্ধ পড়বেন কিনা!

কই তোর বর? দেখিয়ে দে না ভাই।—মীরার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম অনুনয় ফুটে ওঠে।

বাঁ দিকে দেখ্।—ব'লে সুমিত্রা স্টেজের উত্তরপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তর মনে হ'ল, সুমিত্রার মুখের দীপ্তি যেন একেবারে নিবে গেছে। সে একটু বিস্মিত হয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখতে পেল যে স্টেজের উত্তরপ্রান্তে খদ্দরের পাঞ্জাবি-পরা একজন ভদ্রলোক একটি তরুণীর কানের কাছে মুখ এনে কথা বলছেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মেয়েটির মুখে চোখে কৌতুক উপচে উঠছে।

চিত্রার সঙ্গে কথা বলছেন যিনি, তিনি তোর বর?—মীরা সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

হুঁ।—গম্ভীরমুখে সুমিত্রা জবাব দেয়।

চিত্রার সঙ্গে সত্যেনবাবুর আলাপ আছে বুঝি? চিত্রাকে তুই চিনিস তো? খুব ভালো গান গায়। আজকাল দারুণ নাম করেছে। এক কালে অবশ্য ওঁরই ছাত্রী ছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ওঁরই হাতে গড়া মেয়েটি। অবশ্য আজকাল ওর দেমাক হয়েছে খুব। সব্বাইকে ব'লে বেড়াচ্ছে যে, ও একেবারে সেলফ্-মেড।

বিয়ে হয়েছে তো?

বিয়ে! ওর বিয়ে করার দরকার আছে নাকি!—চাপা গলায় মীরা বললে।

সমবেত কণ্ঠে গান শুরু হয়েছে। মীরা স্টেজের দিকে চেয়ে বললে, প্রায় পঞ্চাশজন একসঙ্গে গাইছে—দেখছিস সুমি?

হুঁ।

স্টেজে তিলধারণের জায়গাও নেই। ওঁর কিন্তু এতোগুলো মেয়েকে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না একেবারে। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই নিয়েছেন। এদের মধ্যে সঙ্গীতভবনের পরিচালকদের বাড়ির মেয়ে আছে পঁচিশটি। ভাল গাইতে পারে এমন সব মেয়েদের বাদ দিয়ে এদের নিতে হয়েছে। যে মেয়েটি ওর বাঁ পাশে ব'সে আছে না—ঐ যে সবুজ শাড়ি-পরা, এর পরেই ওর সোলো আছে। শুনিস কি রকম বিশ্রী গায় মেয়েটা! গলা নেই, তালজ্ঞান নেই, তবু ওকে সোলো গাইবার চান্স দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু ওর বাবা হচ্ছেন রায় বাহাদুর শুভেন্দু সান্যাল। সত্যি ভাই, এক্জিকিউটিভ কমিটীর মেম্বার, ডোনার, পেট্রন সবাইকে ওবলাইজ করতে করতে উনি প্রাণান্ত হচ্ছেন। এত অসুবিধার মধ্যে ওঁকে কাজ করতে হচ্ছে যে বলবার নয়। অথচ তুই তো জানিস ওঁর কি রকম সাধ ছিল সঙ্গীতভবনটি সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার! প্রথম যখন সঙ্গীতভবনের প্রতিষ্ঠা হ'ল—

মীরার পাশের একজন ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন, একটু আস্তে।

মীরা রুষ্ট মুখে ভদ্রলোকের মুখের ওপর ভ্রূকুটি হেনে নীরব হ'ল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে সুমিত্রার কানের কাছে মুখ এনে সে বললে, ভারি অসভ্য তো লোকটা! স্টেজের দিকে দৃষ্টি রেখে সুমিত্রা অন্যমনস্ক ভাবে বললে, হুঁ।

মীরার উচ্ছ্বসিত বাক্যস্রোতের এক বর্ণও যে তার কানে যায় নি, তার মুখের ভাবে জয়ন্ত বুঝতে পারল। স্টেজের যে অংশে সত্যেন ও চিত্রা পাশাপাশি ব'সে গল্প করছিল সুমিত্রার দৃষ্টি সেখানে আঠার মত আটকে গেছে, পলক পড়ছে না তার।

জয়ন্তর মনে হ'ল, চিত্রা ও সত্যেনের আলাপ যেন ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে। পঞ্চাশ-ষাটজনের কানের পর্দাবিদারী কোরাসে তাদের কথোপকথনে বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটছে না। সত্যেনের কথা শুনতে শুনতে চিত্রা ঘন ঘন তার চোখের পল্লব দুটি তুলে সত্যেনের মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

সুমিত্রা হঠাৎ ব'লে ওঠে, আচ্ছা বেহায়া মেয়েটা তো!

কার কথা বলছিস?—ব'লে মীরা সুমিত্রার মুখের পানে তাকাল। তারপর সুমিত্রার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে স্টেজের ওপর দৃষ্টিপাত ক'রে সে বললে, সত্যি চিত্রার চক্ষুলজ্জা বলতে কিছু নেই। কথা বলতে বলতে তোর বরের গায়ে প্রায় ঢ'লে পড়ছে। মেয়েটা একটা ডাইনি, বুঝলি? আমার ওঁকেও চেষ্টা করেছিলো ফাঁদে ফেলবার জন্যে।

সেই হিন্দুস্থানী ছেলেটি ব'লে ওঠে, কাঁহা তুমহারা লতামঙ্গেস্কর, আবদুল? ঝুট বাত বোলা শালা সুক্কুর। আবদুল নির্লিপ্তস্বরে জবাব দেয়, কেয়া জানে।

প্যাকার্ডের ফিফটিটু মডেল কিনেছেন বুঝি? হাউ ওয়াণ্ডারফুল!—মল্লিকার পার্শ্ববর্তিনী উগ্র-প্রসাধনে এনামেল করা মূর্তি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, আমারও ভারি ইচ্ছে প্যাকার্ডের এই মডেলটি কেনবার। ওঁকে এত বলি যে, ওঁর ঐ মান্ধাতা আমলের ফোর্ডটা একেবারে রিডিকুলাস, উনি কানেই তোলেন না আমার কথা। প্যাকার্ডের ফিফটিটু মডেলের মালিক সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথাগুলি ছেড়ে দিলেন, সত্যি মিস্টার সেনের একেবারে রুচি নেই।

আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন না মিস্টার বাসু। বরং একটা কাজ করুন, কাল আফটারনুনে আপনারা আপনাদের এই গাড়ি ক'রে আমাদের ওখানে আসুন। হ্যাভ টী উইথ আস। তখন না হয়—

ও সুমি, তোর পাশে রেখা এসে বসেছে যে!—সুমিত্রার কাঁধে খোঁচা মেরে ব্যগ্র কণ্ঠে মীরা বললে।

কই?—ব'লে সুমিত্রা তার বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখলে, সত্যিই রেখা তার পাশে ব'সে আছে।

রেখার পাশে একজন বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর বিপুল বপু বিস্তার ক'রে ব'সে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ জয়ন্ত ও তার আশেপাশে কয়েকটি তরুণের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি রেখার মুখের পানে চেয়ে গম্ভীরগলায় বললেন, বউমা, তোমার ঘোমটাটা আর একটু টেনে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সো। ছোঁড়াগুলো কি রকম হাঁ ক'রে তাকাচ্ছে দেখ না, যেন গিলে খাবে। তাঁর গলার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সামনের সারি থেকে একজন প্রৌঢ়া মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে উদ্ভাসিত মুখে ব'লে উঠলেন, ওমা, বকুলফুল যে! বকুলফুল বললে, কে গা? ওমা তুমি! কি ভাগ্যি!

মীরা বললে, মেয়েটা কি রকম গাইছে শুনছিস সুমি? অন্তরাতে আসতেই তাল কেটে যাচ্ছে। ডিসগাস্টিং।

একটু হেসে সুমিত্রা বললে, মেয়েটার গলা কিন্তু বেশ মিষ্টি।

এই ক্যানক্যানে গলার স্বরকে তুই মিষ্টি বলিস! মীরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। উনি বলেন—

এমন সময় হঠাৎ রেখা যে একদৃষ্টে তাদের দুজনের মুখের পানে চেয়ে আছে তা নজরে আসতেই মীরা তার বাক্যবিন্যাসে ব্রেক কষল। তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সুমিত্রার কাঁধে ঠেলা মেরে সে বললে, এই, রেখা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুমিত্রা রেখার মুখের পানে তাকাল। দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

চিনতে পেরেছিস তা হ'লে?—মীরা বললে।

পেরেছি বইকি—দেখেই পেরেছি। আমার মনে হচ্ছিল, তোমরাই আমাকে চিনতে পার নি বোধ হয়।

না পারাই তো উচিত।—মীরা হেসে বললে, যে জরদগবের মত সাজ ক'রে এসেছিস! আমি তো তোর এই চওড়া-পাড় শাড়ি, কানের প্রকাণ্ড মাকড়ি, মোটা সিঁদুরের ফোঁটা দেখে ভড়কে গিয়েছিলুম। তোকে দেখে কে বলবে, এই সেই স্কটিশ চার্চের বিখ্যাত রেখা রায়!

রেখার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে।

রেখার পার্শ্ববর্তিনী বর্ষীয়সী মহিলার দিকে চেয়ে মীরা বললে, উনি তোর শাশুড়ী বুঝি?

মাথা হেলিয়ে মৃদুকণ্ঠে রেখা বললে, হ্যাঁ।

তুই ওঁর সঙ্গে এসেছিস! তোর বর আসে নি?

নত নেত্রে অস্ফুটস্বরে রেখা বললে, না।

তোর শাশুড়ী বুঝি খুব কনজারভেটিভ? তোকে তোর বরের সঙ্গে বেরুতে দেন না?

নত নেত্রে রেখা আঁচলের এক প্রান্ত আঙুলে জড়াতে লাগল, কোনও জবাব দিল না।

সহসা সক্ষোভে ব'লে ওঠে মীরা, ওমা, ওঁর সোলো শুরু হয়ে গেছে যে! ইস।—হায়, হায়, আরম্ভটা মিস করলুম।

কেয়া ভেড়াকা মাফিক চিল্লাতা হায়।—মীরার স্বামীর গান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করে আবদুল, এ কেয়া গানা গাতা হায়, না, রোতা হায়! চল্ রহমান, হিঁয়া রহনেসে আওর কুছ ফয়দা নেই। তুমহারা সুক্কুর নে ঝুটবাত বোলা থা। রহমান উঠে দাঁড়িয়ে বললে, শালা সুক্কুর।

অ বউমা!—রেখার শাশুড়ীর কাংস্যবিনিন্দিত গলার স্বর শোনা গেল, ওদিকে স'রে বসেছ কেন? এদিকে এস। ঘোমটাটা আর একটু টেনে দাও। হ্যাঁ, হয়েছে। এবারে ইদিকে স'রে এস দিকিন। নাও, একে পেন্নাম কর। বকুলফুল, এ আমার ছেলের বউ।

দিব্যি বউটি তো! থাক্, থাক্, হয়েছে বাছা, হয়েছে। শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক—শতায়ু হও। কোলে সোনার চাঁদ ছেলে আসুক।

আঃ!—চাপা বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে মীরা ব'লে ওঠে, গানটা শুনতে দেবে না দেখছি! কোথাকার বাঙাল রে বাবা! কিছুক্ষণ বাদে ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে আবার বললে, হল-সুদ্ধ কেউ শুনছে না গান। সকলেই গল্পগুজব নিয়ে মশগুল। কারুর খেয়ালই নেই যে, এটা স্মৃতিসভা। লোকগুলোর এতটুকু শালীনতাবোধও যদি থাকে! সত্যি সুমি, বাঙালী জাতটা একেবারে অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলেছে।—ব'লে বোধ হয় তার কথার সমর্থনে কিছু শোনবার প্রত্যাশায় সুমিত্রার মুখের পানে তাকাল মীরা। সুমিত্রার কানে তার কথাগুলো পৌঁছেছে ব'লে জয়ন্তর বোধ হ'ল না। সে দেখলে, স্টেজের দিকে নিষ্পলক, অঙ্গারের মত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সুমিত্রা। তার মুখের পানে তাকিয়েই জয়ন্ত স্টেজের ওপর দৃষ্টিপাত করল। দেখলে, সেখানে চিত্রার হাত থেকে তার রুমালটি নিয়ে মুখ মুছছে সত্যেন। যতক্ষণ সে মুখ মুছল তার মুখের পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল চিত্রা।

মীরার স্বামীর গান শেষ হ'ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরা বললে, এত ভাল গাইলেন উনি, অথচ কেউ মন দিয়ে শুনলে না!

এবারে সত্তইয়েনবাবু পর্‌বন্ধ্ পাঠ করবেন।—সভাপতি ঘোষণা করলেন। সভাপতির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হলের প্রায় অর্ধেক লোক উঠে দাঁড়াল। কলেজের ছেলেমেয়েদের সারি থেকে কে একজন বেশ জোরে ব'লে উঠল, ওরে, সেই স্যাটেন প্রবন্ধ পড়ছে রে। আর একজন বললে, আশ্চর্য বদলে গেছে কিন্তু ভদ্রলোক। ছিল পেলব রায় মার্কা চেহারা—এখন একেবারে গণেশ। আর একটি মেয়ে বললে, চিত্রা তালুকদারের ওল্ড ফ্লেম্। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠের হাসিতে হলঘর ভ'রে গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে পেছন দিকে তাকায় সুমিত্রা।

সত্যেনবাবু তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে বিরাট একটি কাগজের তাড়া বের ক'রে প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করলেন। প্রবন্ধটির আকার দেখে ভয় পেয়ে জয়ন্তও উঠে দাঁড়াল।

স্টেজের ওপরে সভাপতি সত্যেনের মুখের পানে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে হাই তুললেন। গায়ক-গায়িকারা পরস্পরের মধ্যে গল্পগুজব শুরু ক'রে দিল। কেবলমাত্র চিত্রা তার আয়ত চোখ দুটির মুগ্ধ দৃষ্টি সত্যেনের মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে একাগ্র মনে তার প্রবন্ধ পড়া শুনতে লাগল। স্টেজের ওপর তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টি হেনে সুমিত্রা উঠে দাঁড়ায়। জয়ন্ত

দেখলে যে, বাঁশপাতার মত তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে।

এখুনি উঠলে কেন মা?—সুমিত্রার ছোট মেয়ে বললে, বাবা যে এখনও পড়ছে!

পড়ুক গে।—ব'লে মেয়ে দুটির হাত ধ'রে সুমিত্রা হল থেকে বেরিয়ে গেল।

জয়ন্তও বেরিয়ে যাবার জন্যে ধীরে ধীরে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ভাদ্র ১৩৬০

লোকাপসারণ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

অনেক সরালে, থামো থামো মহাশয়,
আগন্তুকেতে পূর্ণ যে যমালয়।
দেশ তো উজাড় করিয়া এনেছ প্রায়,
যে কটা রয়েছে নজর দিও না তায়,
সংহর ক্রোধ—করি সবে অনুনয়।

২

লোকাপসারণ দ্রুতই চলিছে যবে,
দুদিনে দেশটা নিজেই সাহারা হবে।
যখন জাতির রন্ধ্রেতে বসে শনি
অমঙ্গলকে বরে মঙ্গল গনি'
চৌদ্দভুবন ঘুরি নির্বাণ লভে।

৩

রচিতে চাহিছ যে বৃহৎ ব্যাসকাশী
ম'রে যা হইত, হবে তা সেখানে আসি।
বুদ্ধগয়ায় লেপচারা দেবে হামা
তিব্বত ছাড়ি আসিবে যাবৎ লামা,
হবে আমদানি টাসিলাম্পুর চাষী?

৪

রাজপুতানায় শক্ত ফলানো পান,
বরিশালে কি সে জন্মাবে জাফ্রান?
কঙ্কর-ভূমে ল্যাংড়া ধরানো দায়,
পেস্তা কিছুতে ফলিবে না পোস্তায়
খান্দেশী কৃষি ইন্দাশে হায়রান।

৫

দেশটাকে করা যায় না পিঁজরাপোল,
একীকরণেতে বৃদ্ধি গণ্ডগোল।
লোক ধান গম তিসির বস্তা নয়
একই গুদামে হয় না সমন্বয়
সেধে ডেকে এনে খাওয়ানোই হবে ঘোল।

পৌষ ১৩৫৩

বাঘ-ছাগলের কথা

(বনপীরের গান)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল,—
ওই রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ,—
সুযোগ বুঝে শৃগাল মামা ডাক্তার ডাকাইল,
এক সুবিজ্ঞ রামছাগ।
ডাক্তার আসি শৃঙ্গ দাড়ি নাড়ি যুগপৎ
দুই চক্ষু মুদে কয়—
কঠিন অপারেশন ভিন্ন নাই যে অন্য পথ,
নইলে অক্কা পাবার ভয়।
এক দিকে তার মুণ্ড রাখি আর এক দিকে ধড়,
আমি তবে খসাই হাড়,
বেদম হয়ে আসছে রুগী হও সবে তৎপর ;
শুনে সবাই নাড়ল ঘাড়।
কেউ কেউ বলেছিল—ক'রো না গো এমন কাজই
এতে বাঘটি যাবে ম'রে।
ডাক্তার ছাগল বলেছিলেন, দেখাচ্ছি ভোজবাজী
আমি দক্ষিণ রায়ের বরে।
সাঙ্গ হ'ল রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের গলা কাটা,
আর, বাহির হইল অস্থি,
ভারত-জোড়া হরিণ ভেড়া ভাবে, চুকল ল্যাটা,
এবার ফিরে পেলাম স্বস্তি।
রক্তরাঙা গাঙের ধারা ভিজে বালুর চর,
আহা যেন খাঁড়ার দাগ,
এক পারে তার মুণ্ড পড়ে আর পারে তার ধড়,
হায় দু-কাটা পড়ল বাঘ।

দক্ষিণ রায়ের বরে মুণ্ড তবু ছাগল খায়।
তার ক্ষুধা নাহি মেটে।
পেট নেই তার পেট ভরে কি? চালান করে হায়
সব এপারের এই পেটে।
কাটামুণ্ডের ভয়ে ওপার হয় বা ছাগলহীন,
আর এপারে হাঁসফাঁস!
এপারের সব ছাগলগুলি ভাবছে নিশিদিন—
কোথা মিলবে এত ঘাস?

উভয় পারের ছাগল মিলে চলছে গুঁতোগুঁতি,
বাধে বিষম গণ্ডগোল,
এমন সময় কাটামুণ্ড দিল প্রতিশ্রুতি—
আর খাইমু না ছাগল।

তাই না শুনে নানা মুনি দিলেন নানা মত,
ওই সম্ভব অসম্ভব,
কেউ বলে, বাঘ দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে শাক্ত পথ
এবার হইয়াছে বৈষ্ণব।
কেউ বা বলে, বাঘের কথায় ক'রো না প্রত্যয়
ভাই দিচ্ছি মাথার কিরে।
কেউ বা বলে, এপারের ঘাস মোটেই মিষ্টি নয়
এবার চল গো সব ফিরে।
দোটানায় পড়িয়া সবাই করে হুড়োতাড়া,
আহা কত যে হয় ঘাম।
ফকির কহে—উভয় পারের যত হতচ্ছাড়া
ওরে বারেক তোরা থাম্।
ভাল ক'রে দেখ্ রে চেয়ে—কাটামুণ্ডু ওটা,
ও ত নয়কো আসল বাঘ,
আর, নিজের পানে তাকা—তোরাও মানুষ গোটা গোটা,
নয় রে কসাইখানার ছাগ।

এই, বাঘ-ছাগলের কথা যদি শুনে ভক্তিভরে
আর শোনায় বন্ধুজনে
ধড়ে মুড়ে জোড়া লাগে দক্ষিণ রায়ের বরে
এক পরম শুভক্ষণে।

আষাঢ় ১৩৫৭

পুরাতনী

সজনীকান্ত দাস

কয়েক দিন পূর্বে দীর্ঘকালসঞ্চিত পুরাতন কগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হাতের লেখা কয়েকটি পৃষ্ঠা আবিষ্কার করিলাম 'শনিবারের চিঠি'র চিঠির কাগজে বিভিন্ন হাতে লেখা কবিতার পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি—তন্মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা পাঁচটি পৃষ্ঠা। স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত হইল। মনশ্চক্ষুতে পুরাতন দিনটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ঃ—

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর। 'শনিবারের চিঠি' বৎসর-কালের অজ্ঞাতবাসের শেষে ৩২/৫/১ বীডন স্ট্রীটে সদ্য-স্থাপিত নিজস্ব ছাপাখানা "শনিরঞ্জন প্রেস" হইতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে (আশ্বিন, ১৩৩৮)। রবীন্দ্রনাথমৈত্র রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পাকাপাকি রকম ডেরা বাঁধিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি' আপিসে প্রত্যহ নিয়মিত আড্ডা জমিতেছে—প্রায় নন্-স্টপ ; তবে তেজটা সন্ধ্যার ঝোঁকেই বেশি। দীর্ঘ বিরোধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়াছে। তিনি প্রায় আসিতেছেন এবং হাসি গান ও পানের পিকে আসর সরগরম করিয়া তুলিতেছেন ; পাশেই অবস্থিত চায়ের দোকানটি কাজেই দ্রুত ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাদের ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইডের কাজ করিতেছেন। মনিটর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসের চাকুরি অন্তে বৈকালে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের মুখে দৈনিক রোঁদ সারিয়া চলিয়া গেলে আমাদের নিশীথ মজলিস বসিত, শত্রুরা অন্যায় করিয়া বলিত—ভৈরবী-চক্র। নলিনীকান্ত সরকার প্রায়শই প্রথমার্ধের উৎসাহ বর্ধন করিয়া দ্বিতীয়ার্ধে কাটিয়া পড়িতেন, রাত্রির গভীরতার সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিবিড়তর হইত, পাশেই দুই হাতের যন্ত্রহীন ছাপাখানায় কম্পোজের কাজ চলিতে থাকিত।

একদিনের বৈকালিক সভা, তারিখ ঠিক মনে নাই ; এইটুকু স্মরণ আছে—১৯৩০-এর অসহযোগোত্তর-আন্দোলন প্রশমনের জন্য সরকার কি একটা কঠিন আইন জারি করিয়াছেন, সেই দিন প্রাতেই দুঃসংবাদ দৈনিকপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্র মৈত্র খালি গায়ে একটি মোটা কম্বল চাদরের মত জড়াইয়া খবরের কাগজ বগলে প্রবেশ করিলেন, হাতে কলেজ স্ট্রীট প্রাঙ্গণ হইতে সদ্য-কেনা একটি বই—রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনী ও অনেকগুলি কৌতুকাবহ পাদপূরণ-কবিতার সংগ্রহ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নূতন মেরুন-রঙের ক্রাইসলার গাড়ি হইতে তাম্বুলরাগরঞ্জিতবক্ষ কাজী নজরুলের প্রবেশ এবং হুঙ্কার, "দে গরুর গা ধুইয়ে"। এটি তাঁহার সন্ধ্যা-ভাষায় চায়ের হুকুম। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পাশের দোকান অভিমুখে ছুটিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও কম্বলের খোলস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার মুখখানা বজ্রবর্ষী মেঘের মত থম্‌থম্ করিতেছিল। চা আসিতেই সর্বাগ্রে একটি বাটি টানিয়া লইয়াই তিনি বোমার মত ফাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, এবার এই নতুন নাগপাশের জ্বালায় ছেলেরা আর বাঁচবে না। আমরা চায়ের বাটিতে হাত রাখিয়া প্রশ্নাতুর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতেই তিনি বজ্রনির্ঘোষে নূতন আইনের সংবাদ ঘোষণা করিয়া টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, প্রতিবিধান চাই। নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকবে তোমরা! নজরুল এই অবসরে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত বইখানির পাতা উলটাইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, বেশ, কাজে লেগে পড়া যাক। রসসাগরের পাদপূরণ-পদ্ধতিতে আমরা এর প্রতিবাদ করি

এস। বলিয়াই তিনি শুরু করিলেন—

পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ
ভাগো ভাগো, মীন-বৎস!

আমরা জুড়িয়া দিলাম—

আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য।

সকলের সমবেত চেষ্টায় শেষটা এইরূপ দাঁড়াইল—

ফেলিয়া খ্যাপ্‌লা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই কাৎলা,
চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাৎলা।
পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশ্‌টে গন্ধে,
এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের গিঁঠানো রন্ধ্রে।
লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে ;
অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়ায়ে
ভরিবে কোঁচড়ে কটিতে।
কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইবি তরিয়াই।

এই পাদপূরণ-খেলায় রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ অনেকখানি প্রশমিত হইলে তিনি প্রস্তাব করিলেন, এই পংক্তিগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কবিতা লেখা হোক এবং তা কাগজে প্রকাশ করা হোক।

আবার উৎসাহের সঙ্গে বসা গেল, এবার কাগজ-কলম লইয়া। শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হইতে একে একে অনেকেই সরিয়া দাঁড়াইলেন। সঞ্চিত পাণ্ডুলিপি আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরে প্রমাণ দিতেছে যে, কাজী নজরুল ও আমি শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিলাম। যে দুইটি 'মহাকাব্য' রচিত হইয়াছিল, তাহা তখন প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই, না, পুলিসের ভয়ে প্রকাশ করা হয় নাই, আজ তাহা মনে নাই। এইটুকু মনে আছে, 'জেলে' শব্দের দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জনার তারিফ সকলেই করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে শুধু পুরাতন দিনের ইতিহাস হিসাবে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি দুইটি হুবহু মুদ্রিত করিলাম।—

বেড়াজাল

পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ,
ভাগো ভাগো মীন-বৎস!
আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য।

ফেলিয়া খ্যাপ্‌লা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই-কাৎলা,
চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাৎলা।
পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশ্‌টে গন্ধে,
এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের গিঁঠানো রন্ধে।
চটিয়াছে আজ জেলেরা ভীষণ,
সেদিন নাকি রে দৈবাৎ
এড়াইতে জাল রুই গোটা দুই
লাফ দিয়েছিল দুই হাত ;
লাফের সময় লেগেছিল চাপ
তলপেটে এক জেলিয়ার,
সজ্ঞানে নাকি 'পুকুরলাভ' রে
হ'ল সে জেলের ছেলিয়ার।
নাহিকো বাঁচোয়া, আজিকে প্যাঁচোয়া
জাল বিছায়েছে জেলে তাই,
শান্ত-শিষ্ট লেজ-বিশিষ্ট!
উঠিস্‌ নে আর ঠেলে ভাই!
লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে,
অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়ায়ে
ভরিবে কোঁচড়ে কটিতে।
বিশ-শ সনের গিঁট দেওয়া জাল
গাব দিয়ে মাজা তায় রে,
এ জাল ছিঁড়িতে হবি পয়মাল
চুপ ক'রে মরি আয় রে!
কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইবি তরিয়াই।
রোহিত-মৃগেলে ভয় নাই বাবা
হউক যতই বড় সে,
আগেভাগে মাথা-মোটা কাৎলারা
খাবি খেয়ে মর মর সে!
ওরা অহিংস জলান্দোলন
করিবে খানিক খুব জোর,
মাগুর, সিঙ্গি, ট্যাংরা ও কই—
ইহারাই মেছো জোচ্চোর।
হউক না চুনো, কণ্টকিত যে
উহাদের ক্ষুদে অঙ্গ,

কাঁটা মারিয়াই লুকায় গর্তে,
মরিতেও করে রঙ্গ!
কান্‌কো বাধিয়া ধরা প'ড়ে গেলে
তবুও ধরিতে ডর পায়,
আঁশ-বঁটি দিয়া কুটিয়া উনুনে
চড়ালেও তবু তড়্‌পায়!
চুনো পুঁটি সব ভয় আমাদেরি
উহাদের সাথে মোরা যে
নিষ্কন্টক—লাফাতে জানি না
তবুও উঠিব তরাজে।
নদীর পাশেই আটঘাট-বাঁধা
আমাদের পুষ্‌করিণী,
ঢোকে নাকো যেন বেনোজল সাথে
কুম্ভীর-হাঙ্গরিণী।
খেত আমাদের, সেই সাথে সাথে
দু-একটা জেলে-বৎস
ধরিয়া খাইত! দাঁত বের ক'রে
হাসিত চিতল-মৎস্য!

কাজী নজরুল ইসলাম

মৎস্যগন্ধার আবেদন

মৎস্য পুরাণে লিখেছিল কবে
মৎস্য-বন্দ্য কে এসে
ঘটেছিল যাহা এ মৎস্য-দেশে
একদা নিশীথে, ধেয়ে সে
আসিল যতেক জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য,
পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল হাঁকে—
ভাগো ভাগো মীন-বৎস।
কে হাঁকে? হাঁকিছে মাছের জননী
অভাগী মৎস্যগন্ধা—
হাঁকে আর কাঁদে, ভাবে হ'ত ভাল—
যদি হইতাম বন্ধ্যা!
ফেলিয়া খ্যাপ্‌লা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই কাৎলা,
চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাৎলা।
পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশ্‌টে গন্ধে,
এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের গিঁঠানো-রন্ধ্রে।

লোলুপ হইয়া জেলের ছেলেরা—
জাল ফেলিয়াছে পুকুরে,
রাগেরও কি যেন ঘটেছে কারণ ;
শুনিনু সেদিন দুপুরে—
ফেলেছিল জাল, এড়াইয়া জাল—
হতভাগা ছেলে রোহিতে,
লাফ দিয়ে পেটে হানিল আঘাত—
সে কোন্ জেলের, শোণিতে
রাঙা হ'ল কালো পুকুরের জল—
তারি শোধ নিতে জেলেরা
আজিকে এসেছে রুদ্র মূরতি—
চুপ ক'রে থাক্ ছেলেরা।
লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে,
অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়ায়ে
ভরিছে কোঁচড়ে কটিতে,
কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইবি তরিয়াই!
দুষ্টামি বাছা কে ঢোকাল শিরে -
মায়ের আদরে বাঁচিয়া—
কাদা আর জলে পার যত দিন
বেড়াও কুঁদিয়া নাচিয়া।
দেখ তো, কাতলে মৃগেলে তাহারা
হিংসা করে না কাহারে
জলের উপরে নির্ভয়ে থাকে—
লুকায় না পাঁক-পাহাড়ে!
যত গোল কর মাগুর সিঙ্গি
ট্যাংরা ও কই তোমরা—
সোজাপথে তোরা চলিলি না আজো—
পিছে পিছে মুখ গোমড়া
করিয়া ফিরিস, সুবিধা পেলেই
কুচ ক'রে কাঁটা ফুটায়ে
জেলের অঙ্গে, কোন্ সে গর্ভে
থাকিস নিজেরে গুটায়ে।
আমি জানি তোরা দুষ্টপ্রকৃতি—
শিখেছিস কাছে গরিলার—
নতুন পন্থা—গোপনে থাকিয়া
মারিয়া শত্রু মরিবার!
তোদের জন্যে বৃথা মার খায়
চুনো পুঁটি রুই কাৎলা—

মার খেয়ে খেয়ে হ'ল বুঝি পুরু
তাদের চামড়া পাৎলা!
যা হবার হ'ল, চুপ ক'রে থাক্
লাফাস না বেশি বাইরে—
শোন্ অভাগিনী জননীর কথা—
রাত বেশি আর নাই রে।
এ কোণে ও-কোণে চারি কোণে ঘুরে
ভাবিল মৎস্যগন্ধা—
দুরযোগ হেরি মনে হয়, ভাল
হ'ত আমি হ'লে বন্ধ্যা।

আশ্বিন ১৩৫৭

পাগলা-গারদের কবিতা

অ. কৃ. ব.

চিচিং ফাঁক

চুরি-চৌকস চল্লিশ চোর সুদূর পথের বাঁকে
অদৃশ্য হয়ে যায়। আলিবাবা চুপি চুপি সেই ফাঁকে
গুহার সুমুখে রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে হাঁকে
অতি সাবধানী অতি মৃদু সেই ডাক,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

*　　　*　　　*

আশেপাশে কেহ আছে নাকি? কেহ শুনিছে কি সেই স্বর?
নাই, কেহ নাই। পাতায় পাতায় আছে শুধু মর্মর
উদাসী হাওয়ার না-দেখা পরশে একান্ত নির্ভর,
ঝোপের আড়ালে আছে ঝিঁঝিদের ঝাঁক।
যেন কানে কানে আলিবাবা কহে, "খোল দ্বার সত্বর,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

*　　　*　　　*

গাছের আড়ালে অতি সাবধানে গোপনে রয়েছে বাঁধা
পিঠে ঝুলি সহ অতি প্রশান্ত বিশ্বাসী দুটি গাধা,
একজন হ'ল কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বাকিটি তাহার দাদা,
শোনে দুই ভাই বিস্ময়ে হতবাক্
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

*　　　*　　　*

হতে বহু দূর ভেসে আসে সুর, বাঁশি বাজে মাঠ-পারী,
কে যেন কোথায় ঘাট-পারে ব'সে গায় গান ঘাট-পারী,
আলিবাবা আজ চোরের ওপর করবেই বাটপাড়ি
ইন্‌শা-আল্লা, বরাতে যা থাকে থাক্
বদ্ধ দ্বারের সম্মুখে তাই ডাকে মৃদু হাঁক ছাড়ি
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

*　　　*　　　*

হায় দুনিয়ার দৌলত, তুমি জান যে জবর যাদু,
সাধুরে বানাও চোর তুমি ভাই, চোরেরে বানাও সাধু,
কত হাঁদারে যে চালাক বানাও, চালাকেরে কর হাঁদু,
শাক দিয়ে মাছ, মাছ দিয়ে ঢাকো শাক,
আলিরে ডাকাও মৃদু স্বরে, যেন নাতিরে ডাকিছে দাদু,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

*　　　*　　　*

ঘায়েল হয়েছে অনেক বছর, খেয়ে অতীতের থাবা,

মহাবিশ্বের সাথে মহাকাল অনেক খেলেছে দাবা,
কত বাপ হ'ল ঠাকুরদা, আর কত ছেলে হ'ল বাবা,
কত না পদ্মে হেসেছে কত না পাঁক।
আজ কোথা সেই চল্লিশ চোর? কোথা সেই আলিবাবা?
তবু মনে হয় আজো শুনি তার ডাক,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

ফাঁকি

যারে ফাঁকি দিতে করিনু চেষ্টা
ফাঁকি দিয়ে গেল সেই যে শেষটা
পকেট-কাটার পকেট গেল সে কেটে!
তারি কথা ভেবে উদাসী চিত্ত
থেকে থেকে করে করুণ নৃত্য,
সে নাচের জের সহজে কভু কি মেটে?

যে-ই শোনে সে-ই কহে সহাস্য
"এ যেন গীতার নূতন ভাষ্য,
সেয়ানার সাথে সেয়ানার কোলাকুলি।
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
সরিষার বীজ করিলে বপন
সরিষার ফুলে ভরিতেই হবে ঝুলি।"

রামেরে খাওয়ালে পচানো ভেট্‌কি
ফাঁপিতে পারে না শ্যামের পেট কি?
উদোর পিণ্ডি পড়ে না বুদোর ঘাড়ে?
নিজে নেব যদি নিজেরি ঝুঁকি
বেঁচে তবে আর জগতে সুখ কি?—
'দুত্তোর' ব'লে ভাবি আমি বারে বারে।

চাঁদ ও তুমি

চাঁদ ডুবে গেছে মেঘের আড়ালে
তবু আমি চেয়ে আছি।
মনে মনে ভাবি, তুমি কোথা আজ?
আমি তো রয়েছি রাঁচি।
স্বাধীন রয়েছি গণ্ডির মাঝে,
কাটে রাত দিন কাজে ও অকাজে,
হাসি পেলে হেথা হাসি হি-হি ক'রে
নাচ পেলে পরে নাচি।

তুমি একবার ঢেকেছিলে মুখ
সুন্দর কালো চুলে

হয়তো সে কথা তুমি ভুলে গেছ,
আমি তো যাই নি ভুলে
আর ভোলে নাই জানি মহাকাল,
আজো মনে করে সকাল বিকাল,
কচ্ কচাকচ্ কাটে সে সময়
হাতে অনন্ত কাঁচি।
তুমি কোথা আছ নাহি জানি আজ
আমি তো রয়েছি রাঁচি।

গহীন রাতে

আজি এই গহীন রাতে
শূন্য হাতে
গাইব যে গান আপন মনে
সঙ্গোপনে বিজন ছাতে
যদি তা হাওয়ায় ভেসে
চ'লে যায় তোমার দেশে,
দু কানের ভেতর দিয়ে
মরমে পৌঁছে শেষে
তোমায় করে আনমনা—
হয়তো আমি জানব না গো
জানব না গো জানব না।

নিরালায় তাই তো ভাবি
তোমার দাবি,
কেনই বা আর দিয়ে ফাঁকি
লুকিয়ে রাখি মনের চাবি?
আমি যে আপন ভোলা,
রেখে দিই দুয়ার খোলা,
তুমি সেই সুযোগ নিয়ে
যদি দাও দোদুল-দোলা
আমায় ক'রে আনমনা
তখন আমি কোনই মানা
মানব না গো মানব না।

তারার প্রতি

ওগো অগুনতি তারা,
জানি নে তোমরা কারা,
কে আমি তোমরা জান নাকো নিশ্চয়;
তবু আমাদের হোক দেখাদেখি, না-ই হ'ল পরিচয়।

চাঁদের প্রতি

"বন্ধু হে চাঁদ, পিছন ফিরিয়া বারেক দাঁড়াও ভাই,
পৃষ্ঠে তোমার কৃষ্ণ পাহাড় দেখিব আছে কি নাই,
সমুখে যেমন দেখি।
ক্ষণিকের তরে অনুরোধ রাখিবে কি?"
অনুরোধ চাঁদ রাখিত হয়তো, কিন্তু দেখিল কবি
উজল আলোকে সারাটা আকাশ ভরিয়া দিয়াছে রবি।

আদার্শনিক

কোথা হতে আসি, কোথা চ'লে যাই,
আমি নাহি চাই জানতে
মাস-কাবারেতে যদি পারি ভাই
মোটা টাকা ঘরে আনতে
জীবাত্মা আর পরমাত্মায়
কোথা মিল আর তফাত কোথায়,
ভেবে হেন যা-তা ঘামাই নে মাথা
মনে মনে বলি "বেশ তো
মিল থাকে ভাল, না থাকে না থাক,
দুয়ে যেথা খুশি যাক বা না যাক,"
আমি শুধু দেখি পকেটে আমার
আছে কি না আছে রেস্তো।

*   *   *

"চিরদিন জয়ী ধর্মের আলো"
এই কথা শুনি বার বার
আমি তো দেখছি বেশ আছে ভাল
যারা করে চোরা-কারবার।
গৌর, মহাত্মা এবং বুদ্ধ
গিয়েছেন ব'লে তাঁহারা সুদ্ধ
প্রেম-হাতিয়ারে করিতে যুদ্ধ
ল'য়ে অহিংসা-ডাণ্ডা,
আমি তো দেখছি, প্রেম দিতে গেলে
প্রেম-পাত্রেরা ঠেলে দেয় ফেলে,
ঠাণ্ডার প্রতি গরম সবাই
গরমের প্রতি ঠাণ্ডা।

*   *   *

শুনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আসন
পেল যে ভারতবর্ষ,
তার নাকি একমাত্র কারণ
ত্যাগের মহা আদর্শ।
না জুটলে পরে ভোগের খরচা

আপনি আসবে ত্যাগের চর্চা,
হাতের পাঁচ তো রয়েছেই ত্যাগ,
ভোগ করি তাই দিল্‌খুল
কি সত্য আর কি যে অসত্য
বুঝি নাকো অত তত্ত্ব-ফত্ত্ব
খাও দাও আর ফুর্তি উড়াও
এই বুঝি ভাই বিল্‌কুল্।

আগুন

ওরে ভাই, আগুন লেগেছে মোর মনে
কেমনে লাগাল কে যে
একদম জানি নে যে
কেন বা লাগাল কোন্ ক্ষণে!
কোথায় বা দমকল!
কোথা পাইপের জল?
আগুন নিভাতে ডাকি কাহারে?
নদীরা যদিও জানি
সাগরেতে ঢালে পানি
উৎপাত করে আগে পাহাড়ে।
দুটি চোখ জুড়ে মোর
নেমেছিল ঘুম-ঘোর
সহসা জাগিনু এ লগনে
জেগে দেখি, হায় হায়,
করি আমি কি উপায়?
আগুন লেগেছে মোর মনে।

একটি কথা

তুমি আমায় বলেছিলে—হয়তো তোমার নেই মনে—
"আমার মনের ফুল-বাগানে রাখব তোমায় মালী।
তুমি আমার বাগান সেঁচে
সেরা সেরা কুসুম বেছে
যেমন খুশি তেমন ক'রে গাঁথবে মালা খালি।"
আজকে মনে পড়ল তোমার শেষ-না-করা সেই কথা।
মালী আমায় কর নি তো, হয় নি গাঁথা মালা।
তবুও আমি আপন মনে
হেথায় ব'সে সঙ্গোপনে
তোমার তরেই সাজিয়ে রাখি আমার বরণ-ডালা।

খবরদার

দুই চোখে মোর দূরবীন আছে,
রসনায় আছে ক্ষুরধার।

আমার সামনে প'ড়ো না কেউ
খবরদার।
সচিবের শালা, লাটের বেহাই
মোর কাছে কারো নেই কো রেহাই,-
খুঁত পেলে আমি ভূত ছাড়াবই
ঝাড় ফুঁক দিয়ে জোরদার
আমার সামনে প'ড়ো না কেউ
খবরদার!

ঘুঘু দেখেছ কি? দেখ নাই ফাঁদ?
দেখাব আস্তে আস্তে।
ভেবেছ কি হবে আকাশের চাঁদ
কাস্তে?
অচেনার মত চলি চুপি চুপি
বহুরূপ ধ'রে আমি বহুরূপী,
পণ্ডিত দেখি পণ্ডিতি করে
সর্দারি করে সর্দার
ভাব দেখি যেন পানের সঙ্গে
জর্দার।

এমনিতে আমি নিরীহ নেহাৎ
সহজে যাই নে লাগতে,
ক্ষেপে গেলে তবু সময় পাবে না
ভাগতে।
বাঘের পেছনে লাগে যথা ফেউ,
আমার পেছনে লেগো নাকো কেউ,
মাথা চ'ড়ে গেলে দেখি নে তফাত
ছোড়দার সাথে বড়দার
আমার পেছনে লেগো না কেউ
খবরদার!

ভাদ্র ১৩৫৫

যদি গদি পাই

কুমারেশ ঘোষ

কিছু দিন আগে এই ভঙ্গবঙ্গের ভোট-রঙ্গের সময় ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ-গজাইয়া-উঠা কত না জনহিতৈষী ও সমাজসেবীদের দেখা পাইয়াছিলাম! তাঁহাদের দেখা পাইয়াছিলাম বাড়ির দেওয়ালের গায়ে, খবরের কাগজে, হ্যাণ্ডবিলে, সভা-সমিতিতে,পথে-ঝুলানো চ্যাটাইয়ের গায়ে, এবং মিথ্যা বলিব না, ভোট ভিক্ষার আশায় অধমের বাড়ির দরজায়।...তাঁহাদের কথা আজও ভুলি নাই। বিশেষ করিয়া যখন জানি তাঁহারা অনেকেই শুধু কথা দিয়া তৈয়ারি, তখন তাঁহাদের কথা সহজে ভোলা সম্ভবপর নহে! তাঁহাদের মত আলাদা, পথ আলাদা কিন্তু আকাঙ্ক্ষা এক—আমাদের ভাল করিবার আকাঙ্ক্ষা, আমাদের মাথায় দুঃখ-তাপহরা ছাতা ধরার আকাঙ্ক্ষা। আমাদের উন্নতির নানারূপ লোভনীয় ফিরিস্তি চোখের সামনে ধরিয়া ভোট-প্রার্থীরা বলিলেন, এই সব চাও? ভোট দাও। আমরা বহু প্রকার পরোপকার ও সৎকার, মানে সৎকার্য করিতে পারি—যদি গদি পাই।

কিন্তু এই ভূলোকে কুলোকের অভাব নাই। লোকের নিন্দা করিতে তাহাদের জিব লক্‌লক্ করিয়া উঠে—আর, কাহারও প্রশংসা করিতে গেলে তাহাদের বুক ধক্‌ধক্ করে বোধ করি। তাহারা হাসিল এবং গান বাঁধিল—

বাণী এবং বিবৃতিতে
পয়সা তো আর হয় না দিতে
মুখেতে তাই ফোটে যেন খৈ!
বিশ্বাসীরা ভোলে কথায়
চড়ে গিয়ে গাছের মাথায়
শেষে দেখে নিচেতে নেই মৈ।

এবং গদ্য করিয়া বলিল—তোমরা সত্যই বলিতেছ, যদি গদি পাই অসাধ্য কিছুই নাই। অর্থাৎ তখন তোমরা সব করিতেই পার; এমন কি আমাদের কলা দেখাইতেও ছাড় না।

কিন্তু আমরা বলি, গদি পাইলেই কি লোককে ভূতে পায়! গদিয়ান লোক কি সত্যই অদ্ভুত! তাহারা কি ছলা-কলা ও কাঁচ-কলা দেখাইতে অভ্যস্ত? গদি বুঝি মানুষকে এমনি করিয়াই অমানুষ করিয়া তোলে। গদির যদি এতই ক্ষমতা, অর্থাৎ মানুষ গদিতে চড়িলেই যদি অমানুষ হইয়া যায়, তবে তো অমানুষরা গদি-চাপা পড়িলে মানুষ হইতে পারে! তবে কি গদিতে না চড়িয়া গদি-চাপা পড়াই বাঞ্ছনীয়?—জটিল প্রশ্নগুলি মাথার মধ্যে যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে।

অতএব শেষ সূত্র ধরিয়াই জট খুলিতে বসি। মানুষকে গদি-চাপা পড়িতে তো দেখিতেছি আমরা। গাড়ি চাপা পড়িয়া মানুষ মরিয়া বাঁচে, কিন্তু গদি চাপা পড়িয়া মানুষ বাঁচিয়া মরিতেছে। অভাবে অমানুষ মানুষ হওয়া দূরে থাকুক, মানুষ ক্রমেই অমানুষ হইতেছে। আমার কথা বিশ্বাস হইতেছে না? বেশ তো কাছাকাছি রুষো-মেসো আছে, জিজ্ঞাসা করিও, সঠিক জবাব দিবে। খবরদার পৃথিবীর উল্টো পিঠের শ্যামু খুড়োর কাছে ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিও না যেন; এমন সব উল্টা ও ফাঁকা কথা বলিয়া দিবে যে, সব তোমার গুলাইয়া যাইবে। লোকটা গোলা লোক দেখিলেই 'গুল্' দিয়া তাহার বুদ্ধি গোলমাল করিয়া দেয়।

হাঁ, যা বলিতেছিলাম।

গদি যদি মানুষের উপরে বা নীচেয় থাকিয়াও মানুষকে অমানুষ করিতে পারে অর্থাৎ মানুষকে বিলাতী খানার ন্যায় স্যাণ্ডুইচড্ এবং দেশী ফলারের 'চিঁড়ে চ্যাপ্টা'য় পরিণত করিতে পারে, তবে মানিতেই হইবে, গদির ক্ষমতা মানুষের অপেক্ষাও বেশি।

মানুষ কি দিয়া তৈয়ারি ঠিক জানি না। তবে, গদি তো কি দিয়া তৈয়ারি জানা আছে! ছোবড়া, তুলা বা স্প্রিঙের গদি কে না দেখিয়াছে! শুধু দেখিয়াছি কেন, আমরা অনেকেই অনেক জায়গায় অনেক রকম গদিতে বসিয়াছি, শুইয়াছিও!

লিষ্টি দিব? কেন, বড়লোক বন্ধুর বাড়ির ড্রইংরুমে গিয়া চেস্টারফিল্ড সোফার স্প্রিঙের গদিতে বসিয়া তাহার বোনের নরম হাতের গরম চা পান করিয়াছি তো? (আর তুমিও পান কর নাই কি!) কিংবা বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হইয়া তাহার সহযাত্রী হিসাবে সাজানো দামী মোটর গাড়ির মোলায়েম গদিতে কি বসি নাই? অথবা ট্রেনের থার্ডক্লাসের টিকিট কাটিয়া তাড়াতাড়ি (?) ইণ্টার ক্লাসের ছোবড়ার গদিতেও তো বসিয়াছি (মানে, অনেকেই বসিয়াছে); আবার ট্রামের ভিড়ে দাঁড়াইয়া থাকিলেও কখনো কখনো তাহার শক্ত রেক্সিন মোড়া গদিতে বসিবার সৌভাগ্যও হইয়াছে। আর, আর শুইয়াছি ফুলশয্যার রাত্রে শ্বশুর মহাশয়ের দেওয়া তুলার গদিতে, তাঁহারই দেওয়া সালঙ্কারা কন্যাকে লইয়া। (অবশ্য, আরও অনেকেই।)

অর্থাৎ এই যে আমরা, এত রকম জায়গায় এত রকম গদিতে এতদিন শুইয়া বসিয়া কাটাইলাম; কিন্তু কই, আমাদের তো অতিবড় শত্রুও বলিতে পারিবে না (অবশ্য, পিছনে কেহ বলে কি না জানি না) যে, আমরা অমানুষ হইয়া গিয়াছি বা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি।

খুব আনন্দ? না? ভাবিতেছ, ভারি শক্ত লোক তুমি, তাই গদি তোমাকে কাবু করিতে পারে নাই। তবে আসল কথাটাই বলি: মনুষ্যত্ব হারাইবার গদি ওগুলি নহে। অমানুষ-করা গদি ছোবড়া, তুলা বা স্প্রিং-লেস, অথচ আরাম-দায়ক, মান্য-দায়ক, অর্থ-দায়ক এবং পরচক্ষু-কষ্ট-দায়ক? এক কথায়, এখানে গদি মানে 'গদি' নহে—পদোন্নতি বা পদবৃদ্ধি।

পদবৃদ্ধিই বটে! মুরুব্বির শ্রীপদে তৈল-মর্দন করিতে করিতেই তো নিজের পদবৃদ্ধি অর্থাৎ 'গদি'-প্রাপ্তি। আবার এই গদি-প্রাপ্তি বা পদ-বৃদ্ধি হইলেই অনেকে আচার-ব্যবহারে চতুষ্পদ জন্তুবিশেষের সহিত তুলনীয় হয়। আরও দেখা যায়, এই পদবৃদ্ধি বা 'গোদ' রোগ দেখা দেয় 'গদি-প্রাপ্ত' হইলেই। কারণ, 'গদি'র জন্য যে লোক তোমার (আচ্ছা, তোমার নহে, রামের বা শ্যামের) গোদা-পা ধরিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সে এখন 'গদি' পাইয়া নিজেই গোদ বা 'পায়া-ভারী' রোগে এমনি ভুগিতেছে যে, পরে রাম বা শ্যাম তাহার বাড়ি যাইলে, দোতলা হইতেই নামিয়া আসিতে পারে না।

অনেক ঔষধের দোকানে অনেকেই হয়তো বিজ্ঞাপন দেখিয়াছেন: দোকানের দরজার দুই পাশে দুইটি সাইনবোর্ডের একটিতে একটি রোগা লোকের ছবি ও তাহার তলায় লেখা—অমুক সালসা সেবনের পূর্বাবস্থা, এবং আর একটিতে একটি স্বাস্থ্যবান লোকের চেহারা আঁকা ও তলায় লেখা—সেই সালসা সেবনের পরের অবস্থা। সালসা সেবনে মানুষের ঐরূপ অবিশ্বাস্য পরিবর্তন হয় কি না জানি না, তবে মানুষের গদি পাইবার পূর্বের ও পরের অবস্থা সত্যই লক্ষ্য করিবার।

বিশ্বাস না হয়, লোকে গদি পাইবার পূর্বে ও পরে, কি কি করে তাহার একটি চমকপ্রদ ফিরিস্তি দিলেই সংশয় মিটিয়া যাইবে।

লোকে গদি পাইবার পূর্বে:

(১) বেশি কথা বলে, লোক জড়ো করিয়া।
(২) বেশি কাজ করে, লোক দেখাইয়া।
(৩) *চাঁদা দিতে থাকে, না চাহিলেও।*
(৪) পরের দুঃখে কাঁদে অযথা।

(৫) নিজের দুঃখে হাসে স্বেচ্ছায়।
(৬) ঘন ঘন জুতা কেনে তলা ক্ষয় বলিয়া।
(৭) ছাতি কেনে তোমার আমার জন্য।
(৮) মণ-মণ তেল কেনে পরের চরকার জন্য।
(৯) সদর-দরজা খোলা রাখে সর্বদা।
(১০) দেখা করিতে গেলেই চা-টা খাওয়ায়।
(১১) অন্যের অন্যায় দেখিলে গরম হয়।
(১২) 'যদি গদি পাই, কি করি' জানাইতে থাকে।

এবং লোকে গদি পাইবার পরে ঃ

(১) শুধু বাণী ও বিবৃতি দিতে থাকে।
(২) নানারকম উদ্ভট পরিকল্পনা করে।
(৩) হরদম চাঁদা চাহিতে থাকে।
(৪) পরের দুঃখে হাসে বা কাশে।
(৫) নিজের দুঃখে উত্তেজিত হইয়া পড়ে।
(৬) এক জোড়া জুতা একাধিক বছরেও ছিঁড়িতে পারে না, বরং বাড়ি বা অফিসের মেঝের কার্পেটে ও গাড়িতে পাপোশে জুতার তলা শুধু পালিশ হইতে থাকে। কিংবা আরও ঘন ঘন জুতা কিনিতে হয়, পায়ের গোদ বাড়িয়া ক্রমেই 'পায়া-ভারী' হইতে থাকে বলিয়া।
(৭) হ্যাট বা ক্যাপ কেনে নিজের মাথার জন্য।
(৮) নিজের মাথায় ও পায়ে ঘন ঘন সাবান মাখে—কারণ, তখন অন্যে তাহার তেলামাথা ও পা হরদম তৈলাক্ত করিতে থাকে।
(৯) শুধু সদর দরজা কেন, নবদ্বার তখন বন্ধ রাখে ও কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করে।
(১০) কাহাকেও মুখ দেখাইতে চাহে না, এবং দেখাইলে ভেংচি কাটে বা চাঁটি মারিতে উদ্যত হয়।
(১১) ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞানশূন্য হইয়া কাদার মত নরম বা নরম মুড়ির মত মিয়াইয়া থাকে।
(১২) 'যদি গদি ছাড়ি তবে সব রসাতলে যাইবে' বলিয়া ভয় দেখাইতে থাকে। এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ তাহার পা ধরিয়া গদি হইতে টানিয়া নামাইতে গেলে গদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতে থাকে।

* * *

আরও গদি-মাহাত্ম্য প্রচার করিবার আমার ইচ্ছা ছিল। এবং ইচ্ছা ছিল আমি যদি গদি পাই, কি কি করি তাহার একটা বিস্তৃত ফিরিস্তি দিবার। কিন্তু সে সময় হঠাৎ বুধুয়া চাকরটা আমার ঘরে আসিয়াই সব গোলমাল করিয়া দিল। সে আসিল বলিয়া নয়, সে আমার হাতে যে লেফাফাখানি দিল তাহাই সব গুলাইয়া দিল। লেফাফাখানির ভিতরকার চিঠি আমার বুক দুলাইয়া দিল আনন্দে—মহানন্দে। সে চিঠি আমার কর্মস্থল হইতে আসিয়াছিল ঃ—You are promoted to ... আর যেন পড়িতে পারিলাম না। মাসখানেকের ছুটিতে ছিলাম। সেই ফাঁকে আমার অফিসের মুরুব্বি পরলোকের পথে যাত্রা করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত গদি পাইবার পথ আমার জন্য সুগম করিয়া গিয়াছেন। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঐ চিঠি।

গদি যখন পাইয়াছি, তখন 'যদি গদি পাই' কথাটি অনর্থক। তাই যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা মুচড়াইয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলাম রাস্তায়। পরে এক হাতে চিঠি ও অন্য হাতে প্রায়-খোলা কোঁচা ও কসি চাপিয়া ধরিয়া ছুটিলাম গৃহিণীর খোঁজে। গৃহিণীও আসিতেছিলেন

গরম চায়ের কাপ হাতে করিয়া। মাঝপথে হঠাৎ দেখা হইতেই কোন রকমে ব্রেক কষিলাম; গৃহিণীও কষিলেন; কাজেই কলিশন হইতে বাঁচিলাম বটে, তবে খানিকটা চা চলকাইয়া পড়িল।

আর একটু হ'লে চা গায়ে পড়ছিল যে!—গৃহিণী যথারীতি মুখঝামটা দিলেন, বলি, ব্যাপারটা কি? অমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছিলে কেন? কাছা তো দেখছি মাটিতে লুটোচ্ছে!

তাই নাকি! অপ্রস্তুত হইয়া বাঁপা দিয়া কাছাটিকে কয়েকটা ঝাপটা মারিয়াও চিঠিসুদ্ধ হাতে ধরিতে না পারিয়া বলিলাম, যাকগে কাছা। তোমার কাছে যাচ্ছিলাম একটা সুখবর দিতে।

গৃহিণীর মুখে হাসি।—কি সুখবর?

হাসিয়া বলিলাম, আমার উপরওয়ালার গদি এখন আমার। বল, তোমার কি চাই?

গৃহিণী একগাল হাসিয়া বলিলেন, বেশ একখানা 'মনে রেখো' শাড়ি দিয়ো। নতুন উঠেছে।

শুধু 'মনে রেখো' শাড়ি কেন, মনের আনন্দে মনে করিয়া করিয়া আরও অনেক জিনিস তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছি।

গদি পাইয়াছি যে!

* * *

কিন্তু, সম্পাদক মহাশয়, কিছু মনে করিবেন না, আমার এই অসম্পূর্ণ বাজে লেখাটি আপনি কি মনে করিয়া রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া আপনার সুপ্রচলিত পত্রিকায় পত্রস্থ করিলেন? নিশ্চয়ই আমাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য! আমি গদি পাইয়াছি, অমনই লোকের চক্ষু কর্‌কর্‌ করিয়া উঠিল! সাধ করিয়া কি বলিয়াছি, গদি পরচক্ষু-পীড়াদায়ক!

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

শেয়াল-রাজা

নিশিকান্ত

ভগবান! তব অনুকম্পায় ভব-অরণ্য মাঝারে
আজো পরাজিত করে নি তো এই অনন্য-রাজারে।
মোর ফন্দির খানা-খন্দের তলে
ঠেলে ফেলি কত হোঁৎকা-হাতির দলে,
ষণ্ডের সেথা শিঙ ভাঙে আর গণ্ডার হয় শ্রান্ত,
ছুটোছুটি ক'রে বনাবরাহ হয়ে যায় দিক্‌ভ্রান্ত।
জগদীশ্বর! আমি যে করেছি অতি অদ্ভুত পণ—
জয়-কুরঙ্গ দখল করব, করব না কোন রণ ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব ;
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

বড়দের লীলা করব পণ্ড, ছোটদের খেলা চুকাব,
কাঁকড়া-পাড়ার নিরীহ-বিবরে লোমশ-লেজুড় ঢুকাব ;
মুখে ঝুলে-পড়া নরম খাবার ভেবে
অতিলোভে যেই কুটুস-কামড় দেবে,
তখনি হঠাৎ লেজটি তুলেই সজোরে ঝাপট ঝাড়ব,
মহাউল্লাসে সব কটাকেই আছড়ে আছড়ে মারব ;
পরমেশ্বর! তোমারি প্রসাদ তারা যে আমারি তরে
চিবিয়ে চিবিয়ে খাব যে তাদের পরমানন্দভরে ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব ;
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

শাঁস খেয়ে ফেলে ছাগলগুলোর চামড়ায় চুন রেখেছি,
তাই দেখিয়েই টাঁকশাল-খাওয়া টাকার কুমীরে ডেকেছি।
তার সাথে মোর সখি-সখি ভাব,
সেও ভাবে তার হবে খুব লাভ ,
পোষা-ছাগলের পাল পেয়ে যাবে, সুখে ভক্ষণ করবে।
আমি জানি, সে তো চুন-ঠাসা ঠুলি খেয়ে তক্ষনি মরবে ;
হে ইচ্ছাময়! তোমারি ইচ্ছা তখন পূর্ণ হবে ;
তার পেটফাটা সোনারূপোগুলো সবি তো গর্ভে র'বে
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

ভেড়াপল্লীতে লাফিয়ে পড়েছে, কিছু বুঝি খেতে পায় না,
হ্যাংলামি তার বড় বেড়ে গেছে, হন্যে হয়েছে হায়না

আমার কাছেই চালাকি শিখে সে
আমারি ঘাঁটিতে হানা দেয় এসে,
আক্কেল তার গুড়ুম করব, দেখাব ঘোড়ার অণ্ড,
ভেড়াগুলো সব শেষ ক'রে তাকে খাওয়াব হাড়ের খণ্ড ;
বিপদবারণ। তোমার বরেই হয়ে যাব আমি পার
বিপদের যত নালা-নর্দমা, বিপদের পারাবার ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

আমি পেচকীর নিশাচর সখা, আমি শকুনীর বঁধুয়া,
ভালুকীর সাথে ভাব ক'রে খাই মধুচক্রের মধুয়া।
অতি অনায়াসে মেনে গেছে পোষ
বুনো মুর্গী ও বুনো খরগোশ,
মোর প্রচারক কুকুর পাঠিয়ে শেখাই তাদের ধর্ম,
বোঝাই তাদের আমার উদার হুক্কাহুয়ার মর্ম ;
হে দয়ালপ্রভু! তোমারি অপার দয়ায় তাদের পাই
তোমারি দয়ায় যখন তখন যেটাকে সেটাকে খাই,
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

ছলে-কৌশলে সমরে নামাব দুই মহাবল-পশুরে,
আমার স্বর্গ কেড়ে নিতে চায় শুধু ঐ দুটো অসুরে।
তাদের শিরার সংগ্রামশিখা জ্বালি
স্বর্গ কাড়ব সে-গুড়ে মেশাব বালি,
মোর লাঙ্গুল সঙ্কেতে তারা হবে যে ভীষণ ক্রুদ্ধ,
ভব-কান্তারে শুরু হয়ে যাবে সিংহ-বাঘের যুদ্ধ ;
ভগবান! তারা করবে ধ্বংস দুইজনে দুজনাকে,
আমি পেয়ে যাব তাদের মুখের নধর হরিণটাকে ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

পৌষ ১৩৫৩

আবোল-তাবোল

ভোলা সেন

শুষ্কং কাষ্ঠং

মহারাজ বিক্রমাদিত্য নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবি বররুচি ও উদীয়মান নব্য-কবি কালিদাস।

ভবভূতি ভারি রাশভারী লোক ছিলেন, এদের মত বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন না। দণ্ডকারণ্যের গুরুগম্ভীর বর্ণনা শুনে মহারাজ পর্যন্ত তাঁকে ভয় ক'রে চলতেন।

পথে যেতে যেতে সামনে দেখতে পেলেন, প্রকাণ্ড একখণ্ড শুকনো কাঠ। মহারাজের কাব্যপিপাসা জেগে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, কিমেতৎ? অর্থাৎ, পদ্য করে বল, ওটা কি?

অনুষ্টুপের একটি চরণ রচনা ক'রে বররুচি বললেন, শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতাগ্রে।

মহারাজ মুচকে হেসে কালিদাসের পানে চাইলেন, সেকালে যাকে 'স্মিতহাস্য' বলত। কালিদাস বললেন, নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি। ছন্দটা আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শার্দূলবিক্রীড়িত। বাংলা ছন্দে তারে নাচা, এক চাকার সাইকেল চড়া, শূন্যে ঝোলা, ঘোড়দৌড় এবং ঘোড়ার পিঠে বাঁদর চড়া প্রভৃতি সব রকমের কশরৎ থাকলেও বাঘের খেলা নাই। অবিলম্বে এই অভাব পূরণ করা উচিত। আগেরটিও অনুষ্টুপ কিনা ছন্দঃশাস্ত্র না দেখে সঠিক ক'রে বলতে পারি না।

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমাদিত্য গলা থেকে মুক্তার মালা খুলে কালিদাসের গলায় পরিয়ে দিলেন। সেকালের রাজারা এক ডজন ক'রে মুক্তার মালা সব সময় নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন, কখন কি কাজে লাগে। বিদ্যোৎসাহী!

আমার মনে হয়, বিক্রমাদিত্য নব্য-কবির প্রতি অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধ কবির প্রতি অবিচার করেছিলেন। ললিতলবঙ্গলতা নয়, প'ড়ে ছিল একখানা শুকনো কাঠ—অমসৃণ, কদাকৃতি। ওর যোগ্য কবিতা ছিল ঐ 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'। যেমন বিষয়, তেমনি তার কাঠখোট্টা ভাষা। তবু বররুচি রাজার খাতিরে তিন-তিনটে অনুপ্রাস যোজনা করেছিলেন।

নীরস তরুবর বলতে বড় জোর মস্ত বড় মরা গাছ বুঝায়। পুরতঃ মানে সম্মুখে, মেনে নিলাম। স্বর্ণ, রৌপ্য, এমন কি কাঁচ প্রভৃতি উজ্জ্বল পদার্থ ভাতি—'আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশি' সূর্যকিরণোজ্জ্বল সমুদ্রতীরের সমুজ্জ্বল বর্ণনা, স্বীকার করি; কিন্তু রোদে পুড়লে কাঠের রঙ আরও কালো হয়, চকচক করা তো দূরের কথা। লালিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কালিদাস বিষয়-বস্তুকে বিকৃত করেছিলেন।

আমি হ'লে, উজ্জয়িনীর বাজার থেকে বুড়ো বররুচিকে দু আনার বাদামভাজা আর কালিদাসকে দু পয়সার কাঁচা কদমা কিনে দিতাম। তাতে বররুচির রুচি খুলত, কালিদাসের হ'ত বস্তুজ্ঞান।

প্রগতি

যৌবনের জোয়ার ক'মে এলেই স্বাস্থ্য নিয়ে একটা ম্যানিয়া জন্মে সবারই মনে। বন্ধুরও তাই হয়েছিল।

তিনি যখন মটরশুঁটি দেওয়া বাঁধাকপির তরকারি খেতেন, তার আস্বাদের কথা তাঁর মনেই আসত না; শুধু ভাবতেন, কি খেলেন, ভিটামিন-এ, না, ভিটামিন-বি?

শাঁখআলুর রস নিংড়ে চুমুক দিতেই ভিটামিন-বি'র কার্যকলাপ স্মরণ ক'রে পুলকিত হতেন। চিবিয়ে খাওয়ার উপায় ছিল না।

কমলালেবু, ডাবের জল আর টম্যাটো খাবার সময় মানসনয়নে ভিটামিন-সি'র দিব্যমূর্তি ধ্যান করতেন।

বিস্বাদ এবং অখাদ্য কুঁড়া-মাখা চালের ভাত ভিটামিনের খাতিরে অম্লানবদনে গলাধঃকরতেন। এমন কি, কড্‌লিভার অয়েলের দুর্গন্ধও তাঁর নাকে ঠেকত না।

কিন্তু এত ক'রেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। অথচ, তাঁরই প্রসাদভোজী উৎকলীয় পাচকের নধরকান্তি তাঁর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করত।

সহজ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্য চাই যৌবনের ক্ষুধা, রসনাতৃপ্তির উগ্র বাসনা। ভিটামিন নিয়ে যিনি যত বেশি মাথা ঘামাবেন, তাঁর স্বাস্থ্য সেই পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হবে।

মনে হয়, প্রগতি-সম্বন্ধে যে সাহিত্য যত অধিক সজাগ, তার গতি তত মন্থর। চাই যৌবন, চাই ক্ষুধা, চাই তৃপ্তি, তবেই—সে পাবে স্বাস্থ্য, সুন্দর সহজ সরল গতি।

বাস্ত কেন?—শুকনো পাতা ঝরবেই,
নূতনকে জায়গা দিতে পুরাতন সে সরবেই।

জনমত

পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একখানা হারানো খাতা খুঁজে পেলাম। যৌবনে লেখা গান, কবিতা, গল্প—এই সব। কতকগুলো তার ভাল লাগল। পাঠিয়ে দিলাম ভিন্ন ভিন্ন মাসিক-পত্রিকায়।

মাসিক-পত্রিকার নিয়ম এই যে, ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হয় না। ভাবলাম, আমি তো আর ডাকটিকিট দিচ্ছি না, অতএব পাত্রপক্ষের যদি মেয়ে পছন্দ না হয়, লজ্জার কোন কারণ থাকবে না।

লেখাগুলোর কতক করলে নিরুদ্দেশ যাত্রা, বাকি কয়েকটা আসরে গিয়ে জায়গা পেলে।

আমার দুর্ভাগ্য, জনৈক সম্পাদক ভদ্রতা ক'রে ডাকটিকিট না থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। দুঃখপ্রকাশ ক'রে চিঠিও দিয়েছেন একটা। ভরসা দিয়েছেন, আমার (বর্তমানে ৬০-এর কাছাকাছি) ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তবে ভবিষ্যতে তাঁর পত্রিকায় কবিতা পাঠাবার আগে, আমি যেন একটা প্রাথমিক জনমত সংগ্রহ করি।

সম্পাদক দুঃখিত হ'লেও, আমার কোন দুঃখের কারণ ছিল না; বেশ মনে আছে, কবিতাগুলি ডাকবাক্সে ফেলেই আমি অনুতপ্ত হয়েছিলাম।

আমার আসল দুঃখের কথাটা মন দিয়ে শুনুন—

ডাকপিয়ন যখন প্যাকেটটি দিয়ে যায়, আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। পড় তো পড়, অমনোনীত কবিতা সব একেবারে নাতি-নাতনীদের হাতে। ঘরে ফিরে আসতেই তারা আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের নিজের রচা একটি উৎকৃষ্ট কবিতা আওড়াতে লাগল—

পদ্য লেখে লুকিয়ে গো,
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

ব'সে পড়লাম। সবচেয়ে ছোট নাতনীটি আমার কোলে ব'সে আমার সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে সস্নেহ হাস্যে বললে, ঘালে লো।

ক্রমে তাদের তৈরি ছড়াটা পাড়ায় পাড়ায় র'টে গেল। আমাকে দেখতে পেলেই সকল পাড়ার ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়ায় আর সমস্বরে ওটা আউড়ে যায়।

বিস্কুট লেবেনচুস ঘুষ দিলাম। কিন্তু ফল হ'ল উলটো। ক্রমেই আমার কবিযশ সকল পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল।

এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে, আমার পিছনে জনমত নাই।

ভাদ্র ১৩৫৫